পৌরবিজ্ঞান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক
পাঠ্যপুস্তক-রূপে অনুমোদিত

'সিভিক্‌স্'-এর বঙ্গানুবাদ

*　　*　　*　　*

সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের উপাধ্যক্ষ
শ্রীঅরুণকুমার সেন
এম. এ., এম. এস-সি. (ইকন., লণ্ডন) প্রণীত





[illegible] অ্যাণ্ড কোং লিঃ ।। কলিকা[illegible]

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত

চতুর্থ সংস্করণ :: ভাদ্র, ১৩৬০

মূল্য ৭॥০ টাকা

কলিকাতা, ২ কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (পৃষ্ঠা ১—২০০) ও 'ভারতের শাসন-পদ্ধতি' (পৃষ্ঠা ২০১—৩১৮) শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—পক্ষে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক এবং 'অর্থবিদ্যা' (পৃষ্ঠা ১—১৯০) ও 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' (পৃষ্ঠা ১৯১—৩৫০) কে, পি, বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা—পক্ষে শ্রীত্রিদিবেশ বসু কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান (POLITICS)

ভারতের শাসন-পদ্ধতি
(INDIAN ADMINISTRATION)

[illegible] খণ্ড ঃ অর্থবিদ্যা (GENERAL ECONOMICS)

ভূমিকা

চতুর্থ সংস্করণ

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করিয়াছেন যে আই. এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ইচ্ছা করিলে বাঙ্‌লা ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিতে পারিবে। বহু ছাত্রছাত্রী এই সুযোগ গ্রহণ করিতে উৎসুক, কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের অভাববশতঃ তাহারা বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতেছিল। তাহাদের এই অসুবিধা বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যে আমি আমার প্রণীত ইংরেজী 'Hand Book of Civics' পুস্তকখানির ভাবানুবাদ করিয়া কিছুকাল পূর্বে বর্তমান গ্রন্থখানি 'পৌরবিজ্ঞান' নামে প্রকাশ করিয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থটি শিক্ষকগণ এবং শিক্ষার্থীদের নিকট খুবই সমাদর লাভ করিয়াছে। এত অল্প দিনের মধ্যে এরূপ বৃহদায়তন গ্রন্থের যে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইবে তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই। এই সংস্করণটি সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত আকারেই প্রকাশিত হইল। এই জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হইতেছে পরিভাষার অপ্রতুলতা। পরিভাষা সম্পর্কিত বিষয়ে আমাকেও কম অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। আমার বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষার এই দৈন্য অচিরেই বিদূরিত হইবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তকের মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। তাই আমার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ইহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। আশা করি বিভিন্ন কলেজের সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দ আমার এই ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করিবেন এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে যাহাতে গ্রন্থখানি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইতে পারে সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন।

সিটি কলেজ
কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৬০

শ্রীঅরুণকুমার সেন

ভারতীয় অর্থবিদ্যা
(INDIAN ECONOMICS)

বিষয়		পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ও
ভারতের
শাসন-পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং আলোচনা-পদ্ধতি

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Subject-matter of Civics):

পৌরবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র বা বিজ্ঞান যাহা নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে।

পৌরবিজ্ঞানকে ইংরাজীতে বলে 'সিভিক্স' (Civics)। 'সিভিক্স' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'সিভিটাস' (Civitas) এবং 'সিভিস' (Civis) হইতে আসিয়াছে। 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ নগর-রাষ্ট্র এবং 'সিভিস' শব্দের অর্থ নাগরিক বা পুরবাসী। সুতরাং শব্দগত অর্থ ধরিলে 'সিভিক্স' বা পুরবাসীর বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা।

পৌরবিজ্ঞান নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করে

পূর্বে নাগরিকের জীবনের একটি মাত্র দিক ছিল; নাগরিক মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের সভ্য ছিল। তখন অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ছিল এক একটি নগর লইয়া; এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকিত না। এই কারণে মানুষকে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে দেখাই যথেষ্ট ছিল। তখন রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্বন্ধে আলোচনা করা, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং উভয়ের প্রত্যেকের সহিত সংযুক্ত সমস্যাগুলির আলোচনা করাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

পূর্বে পৌরবিজ্ঞান মানুষকে মাত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে দেখিত

কিন্তু আজ আর মানুষকে মাত্র রাষ্ট্রের নাগরিক বা সভ্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না। মানুষ আজ যেমন রাষ্ট্রের সভ্য তেমনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংগঠনেরও সভ্য। রাষ্ট্রের সমস্যা লইয়া সে বিব্রত, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা লইয়াও সে কম বিব্রত নয়। সুতরাং এই পরিবর্তিত অবস্থায় পৌরবিজ্ঞান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, পৌরসভা ও য়ুনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয়

মানুষ আজ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংগঠনেরও সভ্য, ইহার ফলে পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়েরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে

প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবেও মানুষের আচরণের আলোচনা করে।

বর্তমান যুগে নাগরিক জীবনের উপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। দেশব্যাপী রেল ধর্মঘটের সম্ভাবনা আমাদের বিশেষ চিন্তার কারণ; পৌরসভার কর্মচারিগণের ধর্মঘটের সম্ভাবনাও কম চিন্তার কারণ নহে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান যুগে নাগরিক জীবন হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। সুতরাং প্রাচীন কালের মত বর্তমানে নাগরিককে মাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখিলেই চলিবে না, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবেও দেখিতে হইবে। উপরন্তু, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকতার শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ক্রমশঃই প্রাধান্য লাভ করিতেছে। এই কারণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আলোচনাও পৌরবিজ্ঞানের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নাগরিক জীবন হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকতার শিক্ষাকেন্দ্র

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পরস্পরের আর্থিক নির্ভরতার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। ফলে, নাগরিক জীবনের উপর আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের প্রভাবও কম নয়। প্যালেস্টাইনের কোন ঘটনা, মালয়ে নির্বাচন ও কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতিতে বিলম্ব, সুয়েজ খাল অঞ্চলে মিশর ও ইংলণ্ডে সংঘর্ষ, এই সকল আন্তর্জাতিক ব্যাপার অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের সুখশান্তি নষ্ট করিতে পারে। এইজন্যই আমরা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন লইয়া মাথা ঘামাই, কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত আলোচনার সংবাদ মনোযোগের সহিত পাঠ করি, মিশর-ইংলণ্ড আলোচনার ফলাফল মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করি। অতএব দেখা যাইতেছে যে আজিকার দিনে নাগরিকের পক্ষে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করাই যথেষ্ট নয়। তাহাকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সফলতার জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে।

নাগরিক জীবনের উপর আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের প্রভাব

পৌরবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজ-গঠনের প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতিগত।

সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সংঘ বা সংগঠন থাকে। শ্রেষ্ঠ সামাজিক সংগঠন হইল রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র। শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহা চরম বা একমাত্র সংঘ নয়। মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য সমাজ সংগঠন করে। একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথ খুঁজিয়া পায় না। তাই সমাজের মধ্যে অন্যান্য সংঘের প্রয়োজন হয়; যথা—সঙ্গীত-বিদ্যালয়, শ্রমিক-সংঘ, বণিক-সমিতি, সেবা-সমিতি, সাহিত্য-সভা, ধর্ম-সংগঠন প্রভৃতি। অনেক সময় এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্যক্ষেত্র রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়; যেমন—রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা পৃথিবীর সর্বত্র আছে। ফলে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হয়। কি করিয়া এই বন্ধন বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে একই সূত্রে গাঁথা যায়, তাহাও পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার বস্তু।

রাষ্ট্র একমাত্র সামাজিক সংগঠন নয়

সংঘের প্রয়োজনীয়তা

সংঘ ও আন্তর্জাতিকতা

পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ হইল আদর্শ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, আদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র এবং আদর্শ মানব-সমাজ স্থাপন করা। কি করিয়া এই আদর্শ উপলব্ধি করা যায় পৌরবিজ্ঞান তাহারই নির্দেশ দিতে চেষ্টা করে।

পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ

পৌরবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পদবাচ্য? (Civics—a Science or an Art?):

প্রশ্ন হইতেছে, পৌরবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত না কলা-পর্যায়ভুক্ত? পৌর-বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানও নয়, আবার সম্পূর্ণভাবে কলাও নয়—ইহা উভয়ের সংমিশ্রণ। যাহা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্দেশ করে এবং কি করিয়া সেই লক্ষ্যে পৌছান যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহাকে কলা বলা যায়। পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ হইল জনসাধারণের কল্যাণ—যে কল্যাণ সুপরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। এই আদর্শ সিদ্ধির জন্য পৌরবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করে। এই দিক হইতে পৌরবিজ্ঞান চারুকলার ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ।

পৌরবিজ্ঞান বিজ্ঞান ও কলা উভয়েরই সংমিশ্রণ

পৌরবিজ্ঞান আবার বিজ্ঞানও, যদিও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়। এ্যারিস্টটলের মতে

রাষ্ট্রবিজ্ঞানই চরম বিজ্ঞান। এই মতের বিরুদ্ধে কোন কোন লেখক বলেন যে, পৌরবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক আচরণের আলোচনা করে, কিন্তু মানুষের রুচি, স্বভাব প্রভৃতি এত ভিন্ন যে পৌরবিজ্ঞান পদার্থবিদ্যা অথবা রসায়নের মত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। যে উপকরণের উপর পৌর-বিজ্ঞান নির্ভরশীল তাহা পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের উপকরণের মত স্থির ও অপরিবর্তনীয় নয়।

পৌরবিজ্ঞান বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত নয়

অপর পক্ষে লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, মানুষের চিন্তা, প্রকৃতি, ভাব, কর্ম প্রভৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও মানুষের প্রকৃতিতে মূলগত ঐক্য আছে; এই ঐক্যের সাহায্যে মানুষের কার্যপদ্ধতির কারণ ও সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। কোন বিষয় যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করা যায় তাহা হইলে তাহা বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পশ্চাতে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। সুতরাং এই বিষয়গুলি যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয় তবে পৌরবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে, যদিও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সমুদয় গুণ বা লক্ষণ ইহাতে নাই।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতি (Methods of study of Civics):

পৌরবিজ্ঞান বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়, তাই ইহার আলোচনা-পদ্ধতিও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। পৌর-বিজ্ঞান নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করে, কিন্তু মানুষকে লইয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে না; রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে গবেষণাগারে মানুষকে লইয়া পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের অধীনে অথবা চরম দাসত্বের পীড়নে মানুষের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে পরীক্ষা করা অসম্ভব। আলোচনা যখন পরীক্ষামূলক নয় তখন বিজ্ঞানীকে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। বিজ্ঞানী এই ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাহা হইতে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বাহির করিতে চেষ্টা করেন। পরবর্তী

কোন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ন্যায় পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতি পরীক্ষামূলক নয়

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহাকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলে

ঘটনায় এই সকল নিয়ম প্রয়োগ করা যায় কিনা তাহাও তিনি বিচার করিয়া দেখেন।

পৌরবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্বন্ধ (Relation of Civics with other Social Sciences) :

(১) পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Civics and Politics) :

'সিভিটাস্' (Civitas) অর্থাৎ নগর-রাষ্ট্র এবং 'সিভিস্' (Civis) অর্থাৎ নাগরিক শব্দ হইতে যেমন 'সিভিক্স' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তেমনি 'পলিস্' (Polis) অর্থাৎ নগর-রাষ্ট্র এবং 'পলিটিস্' (Politis) অর্থাৎ নাগরিক শব্দ হইতে 'পলিটিক্স' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং শব্দগত অর্থ ধরিলে 'সিভিক্স' বা পৌরবিজ্ঞান এবং 'পলিটিক্স' বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলতঃ এক—উভয়েই নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানতঃ রাষ্ট্রের আলোচনায় এবং পৌরবিজ্ঞান প্রধানতঃ নাগরিকদের আলোচনায় সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র এবং নাগরিক পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নাগরিকদের লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকার নির্ধারিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের আলোচনায় নাগরিকদের আলোচনা অপরিহার্য; আবার নাগরিকদের অবস্থা আলোচনা করিতে হইলে রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং উভয়েরই বিষয়বস্তু অনেকাংশে এক। তথাপি পৌরবিজ্ঞান প্রাধান্য দেয় নাগরিককে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাধান্য দেয় রাষ্ট্রকে।

পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অনেকাংশে এক, তবে পৌরবিজ্ঞান প্রাধান্য দেয় নাগরিককে এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞান প্রাধান্য দেয় রাষ্ট্রকে

(২) পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Civics and History) :

পৌরবিজ্ঞান সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করে। এই আলোচনার চরম লক্ষ্য হইল আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য প্রয়োজন ঐতিহাসিক তথ্যের, কারণ ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যতিরেকে সমাজের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। আজিকার দিনের সমাজ-ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, ইহার ত্রুটি কোথায়—এই সকল প্রশ্নের বিচার আমরা করিতে পারি না,

ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই পৌর-বিজ্ঞানের নীতি নির্ধারিত হয়

যদি না ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের সংগ্রহে থাকে। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই পৌরবিজ্ঞানের নীতি নির্ধারিত হয়। এই কারণেই বলা হয় যে পৌরবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহাদের কোন ভিত্তি থাকে না।

ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা পৌরবিজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন ইতিহাসও সার্থকতা-বিহীন। ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ইঙ্গিত দিয়া মানুষকে কল্যাণময় জীবনযাত্রার পথে পরিচালিত করাতেই ইতিহাসের সার্থকতা। তাহা না হইলে ইতিহাস অতীতের শুষ্ক ঘটনাবলীর সংকলন ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব ঐতিহাসিকের কর্তব্য সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সূত্র নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করা। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সূত্র নির্ধারণ পৌরবিজ্ঞানেরও উদ্দেশ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাস মানব-সভ্যতার কাহিনী এবং পৌরবিজ্ঞান বর্তমান সমাজ-সম্পর্কিত শাস্ত্র হইলেও উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ।

ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ

(৩) পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান (Civics and Economics) :

এই উভয় বিজ্ঞানেরই লক্ষ্য এক—সামাজিক মঙ্গলসাধনই উভয়ের আদর্শ; কিন্তু ইহাদের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। পৌরবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সুপরিচালনার নীতি নির্দেশ করিয়া সামাজিক মঙ্গল বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। ধনবিজ্ঞানের কাজ হইল অর্থের সদ্ব্যয় কিভাবে হয় তাহা নির্দেশ করিয়া সামাজিক মঙ্গল সাধনের ব্যবস্থা করা। উভয় বিজ্ঞানই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ধনবিজ্ঞান কলা হিসাবে পৌরবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সামাজিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধনবিজ্ঞান প্রত্যেক শ্রমিককে প্রত্যহ আট ঘণ্টা শ্রম করিবার নির্দেশ দিবে, কিন্তু উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ব্যতীত জনস্বাস্থ্য-উন্নয়নের এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে না। যে ব্যবস্থাপক সভা এই আইন প্রণয়ন করে, তাহার সংগঠন এবং পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা করা পৌরবিজ্ঞানের কার্য।

উভয়েরই লক্ষ্য এক; এবং উভয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল

আবার পৌরবিজ্ঞান ধনবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। পৌরবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আলোচনা করে। অর্থ বিনা কোন প্রতিষ্ঠানই পরিচালিত

হয় না। এই কারণেই রাষ্ট্রের আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে রাষ্ট্রের আয়ের পথও জানিবার প্রয়োজন আছে। আধুনিক যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পরিত্যক্ত হইবার ফলে রাষ্ট্রের অধিকাংশ সমস্যাই অর্থনৈতিক সমস্যা রূপে গণ্য হইতেছে। ফলে, পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হইয়াছে যে কেহ কেহ ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ রূপে গণ্য করেন।

(৪) পৌরবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান (Civics and Sociology):

সমাজবিজ্ঞান মানুষের সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং পৌরবিজ্ঞান রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে। রাষ্ট্রও একপ্রকারের সমাজ। সমাজবিজ্ঞান প্রাচীনতম যুগের সমাজ-সংগঠনের আলোচনা করে; সমাজ যখন রাষ্ট্রীয় রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহা পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হয়। সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় সমাজের আদর্শ পৌরবিজ্ঞান হইতে গ্রহণ করে। এই কারণে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র অনেকাংশে বিস্তৃত। আবার, পৌরবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান হইতে প্রাচীনতম সমাজের সংগঠন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া সমাজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং ইহার মঙ্গলের পথ নির্দেশ করে।

পৌরবিজ্ঞান অপেক্ষা সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র বিস্তৃততর

(৫) পৌরবিজ্ঞান এবং নীতিবিজ্ঞান (Civics and Ethics):

নীতিবিজ্ঞান মানুষের নৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করে। নৈতিক আচরণ বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয়ই হইতে পারে,—অর্থাৎ মনের চিন্তা ও বাহ্যিক ব্যবহার উভয়ই নৈতিক আচরণের অন্তর্ভুক্ত। অতএব চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই নীতিবিজ্ঞানের প্রয়োগ রহিয়াছে। নীতিবিজ্ঞান চৌর্য-বৃত্তিকে দূষণীয় বলে, আবার প্রতিবেশীকে ঈর্ষা করাও অন্যায় বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু পৌরবিজ্ঞান মানুষের কেবলমাত্র বাহ্যিক আচরণের আলোচনা করে। মানুষের মনের চিন্তা বা হৃদয়ের অনুভূতি যতক্ষণ না সামাজিক আচরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, ততক্ষণ ইহা পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

নীতিবিজ্ঞান মানুষের মনের চিন্তা ও বাহ্যিক ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করে; পৌরবিজ্ঞান কেবলমাত্র বাহ্যিক আচরণের আলোচনা করে

সুতরাং পৌরবিজ্ঞান চুরি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, কিন্তু প্রতিবেশীকে ঈর্ষা করা সম্বন্ধে ইহা নীরব। এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় শাস্ত্রই মানুষ সম্বন্ধে আলোচনা করে; এবং মানুষ নীতিপরায়ণ জীব। এই কারণে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে অনেকাংশে মিল আছে। পৌরবিজ্ঞান সুনীতিকে ভিত্তি করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে এবং দুর্নীতিমূলক আইন অপসারণ করিতে চেষ্টা করে। এই ভাবে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশে পরিচালিত হইয়া সামাজিক মঙ্গলের আদর্শ উপলব্ধি করাই পৌরবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

উভয় শাস্ত্রের মধ্যে কিন্তু অনেকাংশে মিল আছে

পৌরবিজ্ঞান আলোচনার উপযোগিতা (Utility of the study of Civics):

সম্যকভাবে পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করিবার ফলে মনের প্রসার বৃদ্ধি পায়। সমাজের বৃহত্তর জীবনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ইহা মানুষের বুদ্ধি এবং চিন্তাকে সুসংবদ্ধও করে। সর্বোপরি ইহা সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে মানুষকে গভীর ভাবে সচেতন করিয়া সামাজিক কল্যাণের ভিত্তি স্থাপন করে। সুতরাং সুনাগরিক হইবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করিলে পাওয়া যায়। সর্বসাধারণের মঙ্গল তখনই আশা করা যায় যখন নাগরিক শ্রেণী সুশিক্ষিত এবং শুভ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করিলে নাগরিক সামাজিক কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন হয়

নাগরিক হিসাবে মানুষের অধিকার এবং কর্তব্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হইতেছে কিনা, এবং কি ভাবে তাহাদিগকে দোষমুক্ত করা যায়, তাহা নির্ধারণ করিতেও পৌরবিজ্ঞান আমাদিগকে সাহায্য করে।

নাগরিক হিসাবে মানুষের কর্তব্য ও অধিকার পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করা প্রয়োজন

ভারতের জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদার পরিবর্তনের ফলে পৌরবিজ্ঞান আলোচনার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন আর আমরা বিদেশী শাসকের প্রজা নই—আমরা এখন স্বাধীন দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক। দেশের ভাগ্য আমাদের উপরই নির্ভর করে। জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে আমাদের পৌরবিজ্ঞান পর্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the subject-matter and scope of Civics. (১-৩ পৃষ্ঠা দেখ)।

2. Discuss the relations of Civics with Politics, History, Sociology and Ethics. (৫-৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

3. What, in your opinion, is the utility of the study of Civics? (৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ এবং ব্যক্তি

সমাজ (Society):

পৌরবিজ্ঞান সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করে। সমাজ কি? কোনও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কিছু সংখ্যক লোক সংঘবদ্ধ হইলে তাহাকেই সমাজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সমাজের দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকে: (১) সংঘবদ্ধতা, (২) বিশেষ উদ্দেশ্য। এই অর্থে শ্রমিক-সংঘ হইল শ্রমিক-সমাজ; ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কোন সংগঠন হইল ধর্মীয় সমাজ; পল্লীবাসীর সংগঠন হইল পল্লীসমাজ।

সমাজের বৈশিষ্ট্য: (১) সংঘবদ্ধতা, (২) বিশেষ উদ্দেশ্য

বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতা না-ও থাকিতে পারে। সংঘবদ্ধতা কল্পনা করিয়া অনেক সময় কোন মানব-সমষ্টিকে সমাজ আখ্যা দেওয়া হয়। এই অর্থে সমগ্র মানব জাতিকে অনেকে মানব সমাজ বলিয়া অভিহিত করেন, যদিও মানব জাতি আজও সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই। বৃহত্তর পরিধির সমাজ যখন কল্পনা করা হয় তখন সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়; যেমন, মানব সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র থাকে।

সংঘবদ্ধতা কাল্পনিকও হইতে পারে

ভারতকে অনেক সময় একটি সমাজ বলিয়া কল্পনা করিয়া ভারতীয় সমাজ আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয় সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন সংঘ আছে। সমাজের বিভিন্ন সংঘের মধ্যে

বৃহত্তর পরিধির সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন থাকে

রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা চরম বা একমাত্র সংঘ নয়।

সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্য ঃ

এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে স্বভাবতঃই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। এই কথার অর্থ হইল যে মানুষ সমাজের বাহিরে বাঁচিতে পারে না ; বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেও মানুষ হিসাবে নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং জীবন-রক্ষার প্রয়োজনে সমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু সমাজকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে উন্নততর জীবন সম্ভব করিবার জন্য।

মানুষ সমাজের বাহিরে বাঁচিতে পারে না ; পারিলেও নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারে না

সত্যই সমাজ ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না। শৈশবে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজনের স্নেহযত্ন না পাইলে কোন শিশুই বাঁচিতে পারে না। পশুপক্ষীর পক্ষে মাতার অল্প কিছুদিনের যত্নই যথেষ্ট। মানব-শিশুর পক্ষে দীর্ঘদিন লালন-পালনের প্রয়োজন। মানব-মাতার পক্ষে সন্তান পালন করা সম্ভব হয় না, যদি না সে অপরের সহযোগিতা পায়। সুতরাং শিশুর জীবনরক্ষার জন্য পরিবার গঠনের প্রয়োজন।

পরিবার গঠিত হয় মানুষের সহজাত সঙ্গপ্রিয়তার জন্যও। মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না। স্বাধীনতাকামীর নিকট বন্দিত্ব যেরূপ দুঃসহ, মানুষের নিকট সঙ্গিহীন অবস্থাও সেইরূপ দুঃসহ। ফলে, পরিবার গঠিত হইল। পরিবারই আদিমতম সমাজ।

পরিবারই আদিমতম সমাজ

প্রত্যেক জীবকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। ইহাকেই বলে জীবন-সংগ্রাম। এই জীবন-সংগ্রামে মানুষ বিনষ্ট হইয়া যাইত, যদি না সে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত। আদিম যুগে মানুষকে আহার সংগ্রহ করিতে, জীবন রক্ষা করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এইখানেই যে মানুষের বিচার-শক্তি আছে। পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিয়া সে বিচার-শক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারিল যে একতাই বল—সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধতা। ঐক্যবদ্ধ হইয়াই মানুষ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইল।

মানুষ ঐক্যবদ্ধ হইয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছে

উন্নততর জীবনের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের সহজাত। ঐক্যবদ্ধতা ব্যতিরেকে উন্নততর জীবন সম্ভব হয় না। সুতরাং মানুষ সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

ঐক্যবদ্ধ হইয়াই মানুষ উন্নততর জীবন সম্ভব করিয়াছে

সমাজ-জীবনের বিবর্তন (Evolution of Social Life):

সমাজ-জীবনের উৎপত্তি কবে হইয়াছিল তাহা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যায় না; তবে পরিবারই যে আদিমতম সমাজ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষের স্বাভাবিক সঙ্গপ্রিয়তা ও জীবন-রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ফলে পরিবারের উদ্ভব হইয়াছিল। পরিবার (Family) হইতেই সমাজ-জীবনের বিবর্তন-ধারার সুরু হইয়াছে, সে ধারা আজও চলিয়াছে।

পরিবার হইতে সমাজ-জীবনের যে বিবর্তন সুরু হইয়াছে তাহা আজও চলিতেছে

পরিবারের পর আসিল গোষ্ঠী (Clan), গোষ্ঠীর পর উপজাতি (Tribe)। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার বহু অংশে বিভক্ত হইল। একই পরিবার যখন বহু পরিবারে পরিণত হইল তখন তাহারা সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত হইল। এই ক্ষেত্রে সমাজবন্ধনের মূলসূত্র হইল গোষ্ঠীপতির শাসন।

পরিবারের পর আসিল গোষ্ঠী, গোষ্ঠীর পর উপজাতি

গোষ্ঠী প্রসারিত হইয়া উপজাতিতে পরিণত হইল। এখানেও পুরাতন রক্তের সম্বন্ধ অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করা হয়, কারণ উপজাতির প্রত্যেক ব্যক্তি একই পূর্বপুরুষের বংশধর বলিয়া নিজেকে মনে করে এবং একই প্রকারের আচার-পদ্ধতি অনুসরণ করে।

তারপর প্রতিষ্ঠা হইল রাষ্ট্রের। প্রাচীন গ্রামের ন্যায় রাষ্ট্র প্রথমে অনেক ক্ষেত্রে একটি নগরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ বিশাল ভূখণ্ড জুড়িয়া রাষ্ট্রের পত্তন হইল। সমগ্র সভ্য জগৎ কতকগুলি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল। ব্যবহারিক অর্থে রাষ্ট্রই বর্তমানে বৃহত্তম সমাজ সংগঠন।

তারপর প্রতিষ্ঠা হইল রাষ্ট্রের

প্রাচীন কাল হইতেই দার্শনিকগণ বিশ্বব্যাপী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

দেখিতেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (League of Nations) প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বব্যাপী সমাজ প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টা সফল হইল না, কারণ আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে উঠিতে পারিল না।

বিশ্বব্যাপী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঐ একই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও অদ্যাপি সমগ্র মানব-সমাজে আশার মশাল জ্বালিতে পারে নাই। দার্শনিক ও মানবহিতৈষীর বিশ্বব্যাপী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কখনও সফল হইবে কিনা কে জানে?

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ (The Individual in relation to the Society):

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আমরা দেখিয়াছি যে সমাজের বাহিরে মানুষ বাঁচিতে পারে না; বাঁচিতে পারিলেও নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারে না। এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির ইচ্ছা সমস্ত জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই সুখী হউক। সুখী হওয়ার জন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধতার, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার। অপরের সহযোগেই মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারে। আর মানুষ সুখী হয় নিজেকে উপলব্ধি করিয়া, পশুর মত জীবনযাপন করিয়া নয়।

সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ

অনেকের মতে সামাজিক বিধি মানুষের ব্যক্তিত্ব-উপলব্ধির পথে বাধার সৃষ্টি করে; অর্থাৎ মানুষ যদি নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে না পারে তবে সে নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই মতবাদ বর্তমান যুগে গ্রহণীয় নয়। সমাজ ব্যক্তির সমবায়েই গঠিত হয় এবং সামাজিক মঙ্গল সর্বসাধারণের মঙ্গলের সমন্বয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানুষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সমাজ যে-সকল বিধি প্রণয়ন করে তাহা সকলেরই কল্যাণের জন্য। সামাজিক বিধি যে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ করিয়া সামান্য-সংখ্যক ব্যক্তির অসুবিধা করে, ইহা সত্য। কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষমতা মানুষকে তাহার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পথে সহায়তা করে না। সুতরাং সামাজিক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ফলে যাহাদের অসুবিধা

সামাজিক বিধি মানুষের কল্যাণেরই জন্য

হয়, তাহাদের কোনরূপ প্রকৃত স্বার্থের হানি হয় না। অন্যভাবে বলিতে গেলে নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পথে বাধার সৃষ্টি করে না।

মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন অপরের সহযোগিতা। অধিকারের সমতা থাকিলেই মানুষ সহযোগিতার পথে অগ্রসর হয়। সামাজিক বিধি ক্ষমতার আধিক্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া, অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা করিয়া উন্নততর জীবনযাত্রার পথ প্রস্তুত করে। অতএব, ব্যক্তি এবং সামাজিক স্বার্থের মধ্যে যে বিরোধ এবং অসঙ্গতির কল্পনা করা হইয়াছে তাহা ভ্রান্তিমূলক।

সামাজিক বিধি উন্নততর জীবন-যাত্রার পথ প্রস্তুত করে

প্রশ্নোত্তর

1. Trace the evolution of society. (১১-১২ পৃষ্ঠা দেখ)
2. Is there any conflict between society and the individual? (১২-১৩ পৃষ্ঠা দেখ)

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

রাষ্ট্র (State) কাহাকে বলে ?

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার আরম্ভ ও শেষ হইল রাষ্ট্রকে লইয়া। সুতরাং প্রথমেই জানা প্রয়োজন রাষ্ট্র কাহাকে বলে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং ইহার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট উইলসনের মতে রাষ্ট্র হইল 'কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনানুসারে সংগঠিত জনসমষ্টি'("A State is a people organised for law within a definite territory")। অধ্যাপক বার্জেসের মতে, "মানবজাতির কোন সংখ্যাকে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে দেখা যায়, তবে তাহাই রাষ্ট্র।" অধ্যাপক গার্নার বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি মিলাইয়া রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই বিশেষ সুপরিচিত। এই সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্যের উপরই সমান জোর দেওয়া হইয়াছে। গার্নারের মতে, রাষ্ট্র হইল "বহুসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত এমন এক জনসমাজ যাহা একটি নির্দিষ্ট

রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা

ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যাহার উপর কোনও প্রকার বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ নাই, এবং যাহার এমন একটি সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে যাহার (অর্থাৎ সেই শাসন-ব্যবস্থার) প্রতি জনসাধারণ স্বভাবতঃই আনুগত্য স্বীকার করে।") (A State is "a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent, or nearly so, of external control, and possessing an organised Government to which a great body of inhabitants render habitual obedience.")

অধ্যাপক হলের সংজ্ঞার সহিত অধ্যাপক গার্নারের সংজ্ঞার বিশেষ মিল আছে। হলের মতে, রাষ্ট্র হইল 'রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী, বহিঃশাসন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ।'

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—(১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার, (৪) সার্বভৌমিকতা

গার্নারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের চারিটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যায়; যথা,—(১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার বা সুগঠিত শাসন-ব্যবস্থা, এবং (৪) সার্বভৌমিকতা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

জনসমষ্টি—রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল জনসমষ্টি। জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্র হয় না; দুস্তর জনশূন্য মরুভূমিতে কখনও রাষ্ট্রের উদ্ভব হইতে পারে না। রাষ্ট্র হইল একটি সংগঠন,—সংগঠন মনুষ্য ব্যতিরেকে হয় না।

প্রত্যেক রাষ্ট্রে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একদল লোক প্রয়োজন। ইহাদের বলা হয় শাসক। আর যাহারা পরিচালিত হয়, তাহাদের বলা হয় শাসিত। শাসিতেরা সংখ্যায় শাসকগণ অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—শাসক ও শাসিত।

জনসমষ্টির শ্রেণীবিভাগ—(১) শাসক, (২) শাসিত

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অনেক সময় রাষ্ট্রের জনসমষ্টির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ে কোন প্রচলিত বা স্থায়ী বিধি নাই। একটি রাষ্ট্রের জনসমষ্টি সংখ্যায় কয়েক লক্ষ হইতে পারে, কয়েক কোটিও হইতে পারে। এ্যারিস্টটলের মতে, জনসমষ্টি সংখ্যায় হইবে রাষ্ট্রের স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃহৎ এবং সুশাসনের জন্য সম্ভাব্যরূপে

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যা সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট বিধি নাই

স্বল্প। এ্যারিস্টটল অবশ্য তাঁহার সময়ের নগর-রাষ্ট্রের আত্মনির্ভরশীলতা ও সুশাসনের দিক হইতেই ঐরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু জনসংখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার মূল কথা—সুশাসনের উপযোগী জনসংখ্যাই কাম্য—আজও কার্যকরী। আজিকার বিশাল রাষ্ট্রের পক্ষেও জনসংখ্যার পরিমাণ রাষ্ট্রের আয়তন ও সম্পদের আপেক্ষিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জনাধিক্য যে শুধু সুশাসনের অন্তরায় তাহাই নহে, ইহা আর্থিক জীবনকেও বিপর্যস্ত করিয়া তুলে। বিপুল হারে বর্ধমান জনসংখ্যা বর্তমানে এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা।

সুশাসনের উপযোগী জনসংখ্যাই কাম্য

প্রত্যেক রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীর অধিবাসী থাকে; যথা—নাগরিক, প্রজা ও বিদেশী। নাগরিক (Citizen) তাহারাই যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উভয় প্রকার অধিকারই পূর্ণভাবে ভোগ করে। বিদেশীরা (Alien) বহিঃরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং ইহার ফলে তাহারা যে রাষ্ট্রে বাস করে সেখানে কেবল সামাজিক অধিকারগুলিই ভোগ করিতে পারে, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে না। নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে প্রজা (Subject)। প্রজাদের আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি এবং তাহারা রাষ্ট্রের দ্বারাই শাসিত, কিন্তু কোন-না-কোন গুণের অভাবে বা দোষের ফলে তাহারা মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এই ধরণের লোক কিছু-না-কিছু আছে—যেমন, শিশু, নাবালক, উন্মাদ, অপরাধী প্রভৃতি। নাবালকত্ব হইল সাবালকত্বের অভাব। এই অভাব দূর হইলে শিশু বা নাবালক নাগরিকতা প্রাপ্ত হইবে। উন্মত্ততা হইল উন্মাদের দোষ। এই দোষ হইতে মুক্ত হইলে অর্থাৎ সুস্থ হইলে সেই ব্যক্তি নাগরিকতা লাভ করিবে।

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির অন্য এক শ্রেণীবিভাগ—(১) নাগরিক, (২) প্রজা, (৩) বিদেশী

ভূখণ্ড—প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজন সীমারেখা দ্বারা নির্ধারিত কোন বিশেষ ভূখণ্ড। ভূখণ্ড না থাকিলে রাষ্ট্র হয় না। ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্র বলিয়া কিছুই কল্পনা করা যায় না; যাযাবরেরা রাষ্ট্রগঠন করিতে পারে না। প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে পৃথিবীর অন্যতম সুসভ্য জনসমাজ ইহুদীরা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

ভ্রমণকারী রাষ্ট্র বলিয়া কিছুই কল্পনা করা যায় না

রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা বা চরম ক্ষমতা। এ

সার্বভৌমিকতা বর্তমান যুগে ভূমিগত, ব্যক্তিগত নহে। রাষ্ট্রের যদি কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড না থাকে, তবে নির্ধারণ করা যায় না যে ইহার সার্বভৌমিকতার এলাকা কতদূর। সার্বভৌমিকতার এলাকা, ভূখণ্ড ছাড়াও, উপকূলবর্তী সমুদ্রের তিন মাইল পর্যন্ত এবং উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলে বিস্তৃত। সার্বভৌমিকতা ভূমিগত হওয়ার জন্যই সামান্য একটি গ্রাম বা দ্বীপ বা চর লইয়া দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমিকতা—ভূমিগত, ব্যক্তিগত নহে

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির পরিমাণের মত ভূখণ্ডের আয়তন সম্বন্ধেও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। এ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করিয়া ভূখণ্ডের বেলাতেও আমরা বলিতে পারি যে ভূখণ্ডের আয়তন স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃহৎ এবং সুপরিচালিত হইবার জন্য সম্ভাব্যরূপে ক্ষুদ্র হইবে। বর্তমান যুগে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্র পাশাপাশি অবস্থিত আছে বটে, কিন্তু ঘটনার গতি হইল বৃহদায়তন ভূখণ্ড সম্বলিত রাষ্ট্রের দিকে। বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী, কারণ তাহা হইলে বিরোধের সম্ভাবনা অধিক মাত্রায় থাকে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা সহজে সম্ভব নয়; উপরন্তু বৃহদায়তন রাষ্ট্র কর্তৃক বিজিত ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবার ভয়ও থাকে। এই সমস্ত কারণে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ অনেক সময় পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে অথবা আঞ্চলিক সংগঠনে সম্মিলিত হয়।

ভূখণ্ডের আয়তন সম্বন্ধেও কোন বিধি নাই

বর্তমান যুগের গতি হইল বৃহদায়তন ভূখণ্ড সম্বলিত রাষ্ট্রের দিকে

ভূখণ্ডের আয়তনই রাষ্ট্রের শক্তি বা গৌরবের চিহ্ন নয়। রাষ্ট্রের শক্তি ও গৌরব নির্ভর করে তাহার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামরিক শক্তি, আর্থিক সঙ্গতি ও শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্বের উপর। অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও সভ্যতাকে অনেক কিছু দান করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র এথেন্স অনন্যসাধারণ ভাবে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র রোমের সাম্রাজ্য সভ্যজগতের এক বৃহৎ অংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিবাসী ইংরাজ যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সূর্য অস্ত যাইত না। অপর দিকে বৃহৎ চীনদেশ পরোক্ষে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন য়ুরোপীয় দেশের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ভূখণ্ডের আয়তন কোন মতেই রাষ্ট্রের শক্তি বা গৌরবের নির্দেশক নহে।

ভূখণ্ডের আয়তনই রাষ্ট্রের শক্তি বা গৌরবের চিহ্ন নয়

সরকার—রাষ্ট্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল শাসনযন্ত্র বা সরকার। সরকারই রাষ্ট্রের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করে। রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ধারণা মাত্র; ইহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে সরকারের মধ্যে। রাষ্ট্রের ইচ্ছা আছে, নীতি আছে। এই ইচ্ছা ও নীতিগুলি প্রকাশিত ও কার্যকর হয় সরকারের মাধ্যমে। সুতরাং সরকারকে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নীতি কার্যে পরিণত করিবার যন্ত্র বলিয়া গণ্য করা যায়।

রাষ্ট্র সরকারের মধ্যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে

এক কথায়, শাসক-গোষ্ঠীকে সরকার নামে অভিহিত করা হয়। শাসক-গোষ্ঠীর দ্বারাই রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নীতি সংগঠিত, প্রকাশিত ও কার্যে পরিণত হয়। সরকারই শাসন-কার্য পরিচালনা করিয়া রাষ্ট্রের আদর্শ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে।

শাসক-গোষ্ঠীই সরকার

সার্বভৌমিকতা—সার্বভৌমিকতা (Sovereignty) রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, কারণ ইহাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক করে। সার্বভৌমিকতার অর্থ চরম ক্ষমতা—চরম আদেশ বা নির্দেশ দিবার ক্ষমতা এবং আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য করার ক্ষমতা। সার্বভৌমিকতার ঊর্ধ্বে আর কোন ক্ষমতা নাই; সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে কাহারও কাছে নালিশ বা আপীল করা যায় না। অন্যান্য সংগঠনেরও স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কিন্তু স্বাধীন সত্তা নাই। সকল সংঘই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে। সার্বভৌম ক্ষমতা বিভাজ্য ও হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া একমাত্র রাষ্ট্রই ইহার অধিকারী হইতে পারে। কোন সংজ্ঞার মধ্যে ইঙ্গিত না পাইলেও বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। তাহা হইল অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। এইরূপ স্বীকৃতি না পাইলে আইনতঃ কোন সংগঠনকে রাষ্ট্র বলা যায় কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। আফ্রিকার জঙ্গলে কোন সর্দারের অধীনে ভূখণ্ড, শাসনযন্ত্র, কার্যতঃ সার্বভৌমিকতা ও জনসমাজ থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাকে রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হয় না। পরাধীন দেশ স্বাধীন হইলেও যতক্ষণ না অন্ততঃ কয়েকটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে ততক্ষণ তাহাকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যায় না।

সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘ হইতে পৃথক করে

অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

স্থায়িত্ব হইল রাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান অবশ্য

গার্নারের সংজ্ঞাতেই পাওয়া যায়। তবে এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণকালে এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ সচরাচর করা হয় না। জনসমাজ স্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করিলেই তবে রাষ্ট্র আখ্যা পাইতে পারে। অস্থায়ী বা সাময়িক রাষ্ট্র বলিয়া কিছু নাই।

স্থায়িত্ব আর একটি বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্র এবং সরকার (State and Government) ঃ

সাধারণ ভাষায় অনেক সময় রাষ্ট্র এবং সরকার একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমিকতা প্রভৃতি কয়েকটি হইল রাষ্ট্র-গঠনের উপাদান। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের অংশমাত্র। অংশ কখনও সমগ্রের সমান হইতে পারে না। তাই সরকারকে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করা সম্পূর্ণ ভুল।

রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য ঃ

১। সরকার রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সুতরাং অংশ মাত্র

গার্নার সুন্দর ভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। রাষ্ট্রকে যদি জীবদেহের সহিত তুলনা করা হয়, তবে সরকার বা শাসনযন্ত্রকে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক বলা যায়। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে আবার সমগ্র যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার সহিত তুলনা করা যায়। যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হইল সমগ্র প্রতিষ্ঠান, পরিচালকমণ্ডলী তাহার একটি অংশমাত্র। কিন্তু এই পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশেই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় এবং ইহার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হয়।

এই মূল পার্থক্য ছাড়াও রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের মধ্যে অন্যান্য পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সংগঠন হয় দেশের সমুদয় নাগরিক ও প্রজা লইয়া; কিন্তু সরকারের সংগঠন হয় স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তি লইয়া। যাঁহারা শাসন-ব্যবস্থা ও বিচার-বিভাগ পরিচালনা করেন তাঁহাদিগকে লইয়াই সরকার গঠিত হয়। শাসক ও শাসিত মিলিয়াই রাষ্ট্র; শুধু শাসক-সম্প্রদায়ই সরকার গঠন করে।

২। রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সমস্ত নাগরিক ও প্রজাকে লইয়া; সরকার গঠিত হয় শাসক সম্প্রদায়কে লইয়া

রাষ্ট্র স্থায়ী, সরকার কিন্তু পরিবর্তনশীল। অনেক সময় সরকারের পরিবর্তন আবার ঘন ঘন হয়। সরকারের পরিবর্তন হইলেও রাষ্ট্র অপরিবর্তিত অবস্থায়

থাকে। রাশিয়ায় জারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুশ-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই বা চিয়াং-কাইশেকের পতনের ফলে চীন-রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটে নাই। এই দুই ক্ষেত্রে শাসনযন্ত্র পরিবর্তিত হইয়াছে মাত্র; রাষ্ট্র অপরিবর্তিত অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে।

৩। রাষ্ট্র চিরস্থায়ী, কিন্তু সরকার চিরপরিবর্তনশীল

রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ধারণা মাত্র, সরকার রাষ্ট্রের বাস্তব রূপ। রাষ্ট্র কখনও কার্য করে না, কারণ ইহা একটি ধারণা যাহা বুদ্ধির গম্য অথচ দৃষ্টির অগম্য। সরকার কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তির সমষ্টি, যাহা দৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সকল রাষ্ট্রেরই প্রকৃতি এক; প্রত্যেক রাষ্ট্রই জনসমষ্টি প্রভৃতি উপাদানে গঠিত। সরকার কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে; যেমন, অভিজাত-তান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, নিয়মতান্ত্রিক প্রভৃতি।

৪। সকল রাষ্ট্রের প্রকৃতি এক; সরকার কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের হয়

নাগরিকগণের কাহারও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার নাই, থাকিতেও পারে না; কারণ নাগরিকগণের সংগঠনই রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকের অধিকার বলিতে নাগরিকের নিজের বিরুদ্ধে অধিকার বুঝাইবে; সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় ও অবাস্তব। নাগরিকের অধিকার আছে সরকারের বিরুদ্ধে।

৫। কাহারও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার থাকিতে পারে না; অধিকার থাকে সরকারের বিরুদ্ধে

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (State and other Associations):

প্রকৃতিগত কারণেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের বাহিরে সাধারণ মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, তাই তাহার পক্ষে সমাজের বাহিরে বাস করা সম্ভব নয়। সমাজের মধ্যে অনেক সংঘ বা সংগঠন থাকে; রাষ্ট্র হইল অন্যতম সংঘ। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রই সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংঘ। তথাপি মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্রই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রনৈতিক দিক ছাড়াও মানুষের প্রকৃতির আরও অনেক দিক আছে। সেগুলিরও বিকাশ প্রয়োজন। সুতরাং অপরিহার্য ভাবে রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া ছাড়াও মানুষ স্বেচ্ছায়

ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে একমাত্র রাষ্ট্র যথেষ্ট নয়

অন্যান্য সংঘের সভ্য হয়; যেমন—সাংস্কৃতিক পরিষদ, ধর্মসংক্রান্ত সংগঠন, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি। এখন দেখিতে হইবে যে রাষ্ট্র ও এই সমস্ত সংঘের মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

প্রত্যেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের এক বা কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে; যেমন, কোন ধর্মীয় সংঘের কার্য হইল সভ্যদের মধ্যে ধর্মভাব জাগাইয়া তোলা বা বিধর্মীদের সেই ধর্মে দীক্ষিত করা। এক কথায়, ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াই এই প্রকার সংগঠনের কার্য; কোন ধর্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের মজুরী বা ক্রীড়া-জগতের ঘটনা লইয়া মাথা ঘামায় না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সর্বসাধারণের কল্যাণ-সাধন। এই জন্যই রাষ্ট্রের কার্যাবলী অসংখ্য এবং ইহার কর্তব্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমান যুগের আদর্শ হইল এই যে, রাষ্ট্র নাগরিকের জীবনে বন্ধু, দার্শনিক ও পথ-প্রদর্শকের কার্য করিবে।

১। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে প্রথম পার্থক্য হইল উদ্দেশ্য লইয়া

রাষ্ট্র একটি বিশেষ ভূখণ্ডে অবস্থিত থাকে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এই ভূখণ্ডের সীমানা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না; সুতরাং ইহার কার্যকলাপও উহার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অন্যান্য সংগঠন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ নহে। এই সমস্ত সংগঠন রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে, অথবা ইহার যে কোন অংশে, ব্যাপ্ত হইতে পারে; যেমন, রামকৃষ্ণ মিশন কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নয়, ইহার শাখা পৃথিবীর সর্বত্র আছে। সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড্, ওয়াই. এম. সি. এ. প্রভৃতিও বিশ্বব্যাপী সংগঠন। একটি সংগঠনের কর্মক্ষেত্র পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারিত হইবার ফলে, যে-কোনও দেশ হইতে ইহার সভ্য মনোনয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের সভ্যপদ কেবল সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; যেমন, আমেরিকা ইংলণ্ড হইতে লোক মনোনয়ন করিয়া তাহাকে সুবিধামত আমেরিকার নাগরিকে পরিণত করিতে পারে না।

২। রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবস্থিত থাকে; অন্যান্য সংঘের কার্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নাও থাকিতে পারে

রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘের মূল পার্থক্য হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা, যাহা অন্যান্য সংঘের নাই। রাষ্ট্রের ইচ্ছা এবং কর্তৃত্বের নিকট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে, প্রত্যেক সংঘকে অবনত হইতে হয়। অন্যান্য সংঘেরও

৩। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা আছে, অন্যান্য সংঘের নাই

স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সহিত এই ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত হইলে এই ইচ্ছা পরিবর্তন অথবা ত্যাগ করিতে হইবে। রাষ্ট্র সার্বভৌম হইবার ফলে ইহার অভ্যন্তরে এমন কোনও সংঘ থাকিতে পারে না যাহা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অস্বীকার করিতে পারে।

রাষ্ট্র সার্বভৌম হওয়ার ফলে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে আরও তুইটি পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র তাহার সভ্যদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে। নাগরিকেরা যদি রাষ্ট্রের আদেশ অমান্য করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আইন মান্য করাইবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। কিন্তু অন্যান্য সংঘ অবাধ্য সভ্যগণকে কেবলমাত্র অনুনয় করিতে পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে, কিন্তু জোর করিয়া তাহাদিগকে নিয়ম পালনে বাধ্য করিতে পারে না।

৪। রাষ্ট্র তাহার সভ্যদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে, অন্যান্য সংঘ পারে না

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া বাধ্যতামূলক; অন্যান্য সংঘের সভ্য হওয়া সংঘের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। যদি কোনও সংঘের সভ্য উক্ত সংঘের অনুসৃত কার্যাবলী অনুমোদন করিতে না পারে, তাহা হইলে সে সেই সংঘ ত্যাগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের কিন্তু এই স্বাধীনতা নাই। সংঘের সভ্যপদের ন্যায় রাষ্ট্রের সভ্যপদ ত্যাগ করা স্বাভাবিক অধিকার নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ এক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে; কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম নয়। উপরন্তু, একই সঙ্গে বহু সংঘের সভ্য হওয়া যায়, কিন্তু একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া যায় না। কোন নূতন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করার অর্থ পুরাতন রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের বিলোপ।

৫। রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া বাধ্যতামূলক, অন্যান্য সংঘের সভ্য হওয়া সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন

৬। একই সঙ্গে বহু সংঘের সভ্য হওয়া যায়; কিন্তু একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া যায় না

সর্বশেষে, রাষ্ট্র স্থায়ী, কিন্তু অন্যান্য সংঘ স্থায়ী নাও হইতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিভিন্ন সংঘের উদ্ভব ও বিলোপ ঘটিতেছে; কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যে রাষ্ট্র অপরিবর্তিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে।

৭। রাষ্ট্র স্থায়ী, অন্যান্য সংঘ স্থায়ী নাও হইতে পারে

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে এত পার্থক্য সত্ত্বেও এক বিষয়ে কিন্তু ঐক্য আছে—উভয়েই মানুষের আত্মোপলব্ধির পথে সহায়তা করে।

যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি রাষ্ট্র কিনা? (Are the Units of a Federation States?)

যুক্তরাষ্ট্র একপ্রকার দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা (Dual Polity)। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই একটি সমগ্র দেশের সরকার ও কতকগুলি স্থানীয় অংশের সরকার থাকে। স্থানীয় অংশগুলি রাজ্য অথবা প্রদেশ (State or Province) এই নামে অভিহিত। যেমন, কানাডায় অংশগুলি প্রদেশ নামে পরিচিত; কিন্তু ভারতের স্থানীয় অংশগুলিকে রাজ্য বা State বলিয়া অভিহিত করা হয়। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রে অংশগুলি রাজ্য বলিয়াই অভিহিত; যেমন, নিউইয়র্ক রাজ্য (The State of New York)। ইংরাজীতে State শব্দটি ব্যবহার করিলেও, যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে রাষ্ট্র বলা যায় না। রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা; যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলির সার্বভৌমিকতা নাই। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রও সার্বভৌম নহে। অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার সন্ধান পাওয়া যায় শাসনতন্ত্রে (Constitution)। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি কোন মতেই রাষ্ট্র নহে। অতএব ইংরাজীতে এই অ-সার্বভৌম অংশগুলিকে অনেক সময় State বলিলেও বাংলায় আমরা সেগুলিকে রাজ্য বলিয়াই অভিহিত করিব।

যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি রাষ্ট্র নয়—তাহাদের সার্বভৌমিকতা নাই

ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি রাষ্ট্র কিনা? (Are the British Dominions States?)

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, প্রজাতন্ত্রী ভারত, পাকিস্থান ও সিংহল—এই কয়টি দেশ লইয়া ব্রিটিশ জাতিসংঘ গঠিত। ইহাদের মধ্যে চারিটি (কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ড) ১৯৩১ সালের ওয়েস্টমিন্‌স্টার আইনের (Statute of Westminster) বলে ডোমিনিয়ন মর্যাদা (Dominion Status) লাভ করে। পরবর্তী কালে দুইটি পৃথক আইনের দ্বারা ভারত, পাকিস্থান ও সিংহলকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দান করা হয়।

ব্রিটিশ জাতিসংঘ বা ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথ্ বা কমন্‌ওয়েলথ্ অফ্ নেশনস্ (Commonwealth of Nations)

প্রকৃতপক্ষে ডোমিনিয়ন শব্দের আইনের দেওয়া কোন সংজ্ঞাই নাই ; তবে ওয়েস্টমিন্স্টার আইনের মুখবন্ধে ডোমিনিয়ন মর্যাদার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য এবং ডোমিনিয়নগুলি ব্রিটিশ জাতিসংঘের স্বায়ত্ত-শাসিত অংশ, মর্যাদায় তাহারা পরস্পরের সমতুল্য এবং আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় কেহ কাহারও অধীন নয় ; ব্রিটিশরাজের (British Monarch) প্রতি আনুগত্যই পরস্পরের মধ্যে বন্ধন। বর্তমানে ওয়েস্টমিন্স্টার আইনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ প্রজাতন্ত্রী ভারত ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে না। তবে 'ব্রিটিশ' জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে বন্ধন হিসাবে ভারতবর্ষ ব্রিটিশরাজকে "Head of the Commonwealth" রূপে স্বীকার করে।

ডোমিনিয়ন মর্যাদার স্বরূপ

ভারত ও পাকিস্থানকে যখন ডোমিনিয়ন মর্যাদা দেওয়া হয় তখন তাহাদের উভয়েরই গণপরিষদকে সার্বভৌম বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই সার্বভৌমিকতার ফলে ভারত ডোমিনিয়নের পক্ষে প্রজাতন্ত্রী ভারতে পরিণত হইবার পথে সকল বাধা দূর হয়।

এই সার্বভৌমিকতার জন্য ডোমিনিয়ন অবস্থাতেই ভারত ও পাকিস্থানকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়ার পক্ষে কোনই বাধা ছিল না। সুতরাং প্রজাতন্ত্রী ভারত রাষ্ট্র কিনা, এই সম্বন্ধে সন্দেহ করার প্রশ্ন মোটেই উঠে না।

প্রজাতন্ত্রী ভারত রাষ্ট্র কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই

অন্যান্য ডোমিনিয়নগুলি আইনতঃ সার্বভৌম কিনা এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও, কার্যতঃ তাহারা যে সার্বভৌম সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে ব্রিটেন যুদ্ধরত হইলেও ডোমিনিয়নগুলি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। ডোমিনিয়নগুলি ইচ্ছা করিলে 'ব্রিটিশ' জাতিসংঘের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে (U. N.) ডোমিনিয়নগুলি নিজ নিজ অধিকার-বলে সভ্যপদ লাভ করিয়াছে। সুতরাং আইনের চক্ষে ডোমিনিয়নগুলি রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হউক আর না হউক, বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে উহারা রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নহে।

ডোমিনিয়নগুলি কার্যতঃ সার্বভৌম সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই

প্রশ্নোত্তর

1. Define State and distinguish between State and Government. (C.U., 1943) (১৩-১৯ পৃষ্ঠা দেখ)

2. What do you mean by the term "State"? How does the State differ from other types of social organisations? (C.U., 1945)

(১৩-১৮, ১৯-২১ পৃষ্ঠা দেখ)

3. What is meant by Dominion Status? (C.U., 1946, 1947)

(২২-২৩ পৃষ্ঠা দেখ)

4. What is meant by the term "State"? Is the State of New York a State? Give reasons for your answer. (C.U., 1951) (১৩-১৮, ২২ পৃষ্ঠা দেখ)

5. What do you mean by the following terms: Society, State and Government? Illustrate your answer. (C.U., 1952)

(৯, ১৩, ১৮-১৯ পৃষ্ঠা দেখ)

6. Describe the nature of the constituent elements of a State. In what respects does a State differ from (*i*) the State of West Bengal, (*ii*) all associations of students in your own college. (C.U., 1953)

(১৩-১৮, ১৯-২২ পৃষ্ঠা দেখ)

চতুর্থ অধ্যায়

কয়েকটি মৌলিক ধারণা : জনসমাজ, জাতীয়তা, জাতি ও রাষ্ট্র

'রাষ্ট্র' শব্দের সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি করিবার পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আরও কতকগুলি মূল ধারণার আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণ কথাবার্তায় অনেক সময় রাষ্ট্র (State), জনসমাজ (People), জাতি (Nation), জাতীয় জনসমাজ (Nationality) প্রভৃতি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই সকল শব্দের বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে।

জনসমাজ (People) :

জাতি (Nation) এবং জনসমাজ (People)—এই শব্দ দুইটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একই অর্থবাচক নয়। বার্জেসের মতে, জনসমাজ বলিতে আমরা বুঝি একই ভূখণ্ডবাসী এমন একটি জনসমষ্টি যাহাদের ভাষায় ও সাহিত্যে,

ইতিহাসে ও ঐতিহ্যে, আচার-ব্যবহারে, অধিকারবোধে এবং অভিযোগে ঐক্য আছে। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে জনসমাজের কতকগুলি উপাদান নির্ধারণ করা যায়। ভৌগোলিক সান্নিধ্য, ভাষাগত ঐক্য, আচার-ব্যবহারের সমতা এবং অধিকারবোধ ও অভিযোগে সম-চেতনা—এগুলিই হইল 'জনসমাজ'-গঠনের উপাদান। সমাজবদ্ধ হইতে গেলে কতকগুলি সামাজিক বন্ধন থাকা প্রয়োজন। ভাষাগত ঐক্য, আচার-ব্যবহারের সমতা প্রভৃতি হইল কয়েকটি সামাজিক বন্ধন যাহা থাকিলে জনসমষ্টি জনসমাজে পরিণত হয়।

জাতি ও জনসমাজ (Nation এবং People) এক নহে

জনসমাজের উপাদান

জনসমাজ গঠনের জন্য উদ্ভবগত ঐক্য এবং গভীর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা প্রয়োজন হয় না। এই দুইটি উপাদান থাকিলে জনসমাজ পরবর্তী স্তরে উন্নীত হইয়া জাতীয় জনসমাজে (Nationality) পরিণত হয়। বাসস্থানগত, ভাষাগত, চিন্তাগত, আচার-ব্যবহারগত ঐক্যই জনসমাজের বৈশিষ্ট্য।

জনসমাজের বৈশিষ্ট্য

জাতীয় জনসমাজ (Nationality):

ইংরাজী Peopleকে বাংলায় যদি আমরা জনসমাজ বলি তবে Nationalityকে জাতীয় জনসমাজ বলিতে পারি। শব্দগত অর্থে জাতীয় জনসমাজ এমন একটি জনসমাজ যাহার সভ্যগণ নিজদিগকে রক্তের বন্ধনে একত্রিত বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ জনসমাজ গঠনের পক্ষে যে যে উপাদান প্রয়োজন, তাঁহার উপর যদি উদ্ভবগত ঐক্যে বিশ্বাস ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা থাকে তবে জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয়।* আবার জাতীয় জনসমাজের যদি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র থাকে তাহাকে জাতি (Nation) বলা হয়। অতএব, জনসমাজ পরের স্তরে উন্নীত হইলে জাতীয় জনসমাজে পরিণত হয় এবং জাতীয় জনসমাজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইলে জাতিতে পরিণত হয়। একই রাষ্ট্রের অধীনে বহু জাতীয় জনসমাজ থাকিতে পারে, কিন্তু বহু জাতি থাকিতে পারে না।

জনসমাজ ও জাতীয় জনসমাজের মধ্যে পার্থক্য

জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য

একই রাষ্ট্রের অধীনে বহু 'জাতীয় জনসমাজ' থাকিতে পারে, বহু 'জাতি' থাকিতে পারে না

* অনেকের মতে উদ্ভবগত ঐক্য জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য উপাদান নয়।

উপরোক্ত আলোচনা সম্পর্কে অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলমানদিগকে উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। ইংরাজ শাসনের যুগে সমগ্র ভারতবাসী এক জনসমাজে পরিণত হইল; দুঃখকষ্টের সমতা অনুভূত হইল এবং একই শাসনাধীনে থাকার ফলে চিন্তাগত ঐক্যের সৃষ্টি হইল। পরে মুসলমানেরা তাহাদের সম্প্রদায়গত ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দাবী করিতে লাগিল। তখন তাহাদের মধ্যে জাতীয় জনসমাজের সৃষ্টি হইল। অতঃপর পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহারা জাতিতে পরিণত হইল।

কি কি উপাদানে জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন প্রশ্ন এই যে, এই সকল উপাদান জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য কিনা। জাতীয় জনসমাজের বৈশিষ্ট্যকে জাতীয় ভাব বলা যাইতে পারে। জাতীয় ভাব গঠনে উদ্ভবগত ঐক্য বা রক্তের বিশুদ্ধতাকে আজকাল বিশেষ মূল্য প্রদান করা হয় না। পৃথিবীর অন্যতম সুসভ্য জাতিদ্বয়—ইংরাজ এবং ফরাসী—বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছে। যে জনসমষ্টি নিজেদের বিবাদ-বিরোধ ভুলিয়া নিজদিগকে একই বংশোদ্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে এক জাতি হইতে উদ্ভূত না হইলেও তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাব বর্তমান। প্রশ্ন হইল বিশ্বাসের, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক সত্যের নহে। ভারতের মুসলমানেরা বিশ্বাস করিল যে তাহারা একটি পৃথক জাতীয় জনসমাজ; এই বিশ্বাসের ফলেই তাহারা প্রথমে জাতীয় জনসমাজে ও পরে জাতিতে পরিণত হইল। অনেক সময় আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে উদ্ভবগত ঐক্যে বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইয়াছে।

উদ্ভবগত ঐক্য জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়

জাতীয় ভাব

ভাষার ঐক্য জাতীয় ভাব গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। ভাষার ঐক্যের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা হয় এবং জাতীয় ভাবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ভাষা জাতীয় ভাব গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। বেলজিয়ামবাসীরা দুই ভাষায়, সুইজারল্যাণ্ডবাসীরা তিন ভাষায় কথা বলে; তথাপি তাহারা একই জাতি এবং তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

ভাষার ঐক্য জাতীয় ভাব গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়

ভৌগোলিক সান্নিধ্যও জাতীয় ভাব গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। প্যালেস্টাইনে রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে পৃথিবীর নানা দেশে বিক্ষিপ্ত ইহুদীরা এক জাতীয় জনসমাজ ছিল।

ভৌগোলিক সান্নিধ্যও অপরিহার্য নয়

এককালে ধর্মগত ঐক্য জাতীয় ভাবের অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল। ধর্মগত কারণে রাষ্ট্র গঠনের নজির ইতিহাসে আছে। ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান দুই পৃথক জাতীয় জনসমাজ,—এই ধারণার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র ভাঙিয়া দুইটি রাষ্ট্র স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতার নীতি স্বীকৃত হইবার ফলে জাতীয় ভাবের উপাদান হিসাবে ধর্মের গুরুত্ব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। জার্মাণীতে, সুইজারল্যাণ্ডে, ইংলণ্ডে ধর্মের ঐক্য না থাকা সত্ত্বেও জনগণ জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিয়াছিল।

ধর্মগত ঐক্যও অপরিহার্য নয়

অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও কৃষ্টিগত ঐক্য না থাকা সত্ত্বেও জাতীয় ভাবের উদ্ভব হইয়াছে। অনেক সময় আবার পরাধীনতা বা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুঃখকষ্ট একই ভাবে ভোগ করার জন্য জাতীয় ভাবের উদ্ভব হয়। আমেরিকার উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের ইংরাজদের সহিত ভাষাগত, উদ্ভবগত, ইতিহাসগত, ধর্মগত, কৃষ্টিগত ঐক্য থাকিলেও ইংলণ্ডের করনীতিই উপনিবেশগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোন উপাদানই অপরিহার্য নহে, কিন্তু কয়েকটি উপাদান প্রয়োজন। অপরিহার্য কোন বাহ্যিক উপাদানের সন্ধান না পাইয়াই অধ্যাপক রেনান বলিয়াছেন যে, জাতীয়তার ধারণা সম্পূর্ণ ভাবগত।

ঐতিহাসিক ও কৃষ্টিগত ঐক্যও অপরিহার্য নয়, সমভাবে দুঃখ-কষ্টভোগ জাতীয় ভাবের সৃষ্টি করে

জাতীয়তার ধারণা সম্পূর্ণ ভাবগত

একটি জনসমষ্টির মধ্যে কোন কোন কারণে ঐক্যবোধের ফলে জাতীয় ভাবের সৃষ্টি হয়। জাতীয় ভাবের সৃষ্টির অর্থ এই যে, ঐ জনসমাজের সভ্যেরা নিজেদের পৃথিবীর অন্য সমস্ত মনুষ্য হইত পৃথক করিয়া দেখে। সুতরাং ঐক্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্যবোধেরও সৃষ্টি হয়। যে শক্তি এই পার্থক্য বা বিভিন্নতা সৃষ্টির জন্য কার্য করে তাহাকে জাতীয়তাবাদ বা স্বাজাত্য-বোধ (Nationalism) বলে।

জাতীয় ভাব ও জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

জাতীয় জনসমাজকে আবার Race হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। জাতীয় জনসমাজের বৈশিষ্ট্য হইল জাতীয় ভাব। জাতীয় ভাব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, বস্তুগত বা জীবগত নহে। Race হইল বাস্তব সত্তা। কোন জনসমষ্টির যদি আকৃতিগত ও ভাষাগত ঐক্য থাকে তবে তাহাকে Race বলা হয়—যেমন, বাঙ্গালী।

আকৃতিগত ও ভাষাগত ঐক্যই Race-এর বৈশিষ্ট্য

জাতীয় জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self-Determination):

জাতীয় জনসমাজের বৈশিষ্ট্য বা জাতীয় ভাব বলিতে বুঝায় একীভূত হইবার ভাব—অর্থাৎ একত্র বাস করা, সম্মিলিতভাবে কাজ ও চিন্তা করার আকাঙ্ক্ষা। একীভূত হইবার ভাব হইতেই আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করে। আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ বুঝায়। আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসকের দাবীতে পরিণত হয়, এবং এই দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদ কার্য করিতে থাকে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ বুঝায়

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত। মিলের ভাষায়, 'জাতীয় জনসমাজের সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সহিত সমানুপাতিক হওয়া উচিত'। অর্থাৎ এক রাষ্ট্রে একাধিক জাতীয় জনসমাজ থাকিবে না; অথবা এক জাতীয় জনসমাজ বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাষ্ট্রে বাস করিবে না। ইহাই একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ। একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিলে সংখ্যালঘু সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে।

অনেকের মতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হয়

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় জনসমাজের ভিত্তিতে সংগঠিত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ বাস করে; আবার কখনও এক রাষ্ট্রের সীমার বাহিরে সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী যে জাতি তাহার অংশবিশেষ বসবাস করে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিলে ইউরোপের মানচিত্র নূতনভাবে অঙ্কন করিতে হইবে। ইউরোপে ৬৮টি জাতীয় জনসমাজের বাস, কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রের সংখ্যা ২৮টি। ইহাদের মধ্যে ৭টি হইল একজাতীয় রাষ্ট্র।

যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ পুনর্গঠন করিতে হয়, তবে ইউরোপ ৬৮টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু যে ইউরোপে মাত্র ২৮টি রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও শান্তি রক্ষা সম্ভব হয় নাই, সেখানে ৬৮টি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইলে শান্তি কি চিরদিনই সুদূরপরাহত থাকিবে না? যতই রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়িবে, ততই বিরোধের কারণ বাড়িবে। সুতরাং জাতীয় জনসমাজের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ ও বিপজ্জনক কার্য।

জাতীয় জনসমাজের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা দুরূহ ও বিপজ্জনক

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন সর্বপ্রথম আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি উত্থাপিত করেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে এই নীতি প্রয়োগের ফলে সকল জাতির দাবী পূর্ণ হইবে এবং যুদ্ধের বীজ পৃথিবী হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল; ফলে, কয়েকটি নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং পুরাতন কয়েকটি রাষ্ট্র পুনর্গঠিত হয়। অধিকাংশ নবগঠিত রাষ্ট্রেই কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয় নাই। আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্যা মিটে নাই। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট উইলসনের বিশ্বাস—আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগের ফলে সকল জাতীয় জনসমাজেরই দাবী পূর্ণ হইবে এবং পৃথিবী হইতে যুদ্ধের বীজ চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবে—কোনদিনই কার্যকর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করে না

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এমন একটি অস্ত্র যাহার দুই দিকে ধার। একদিকে ইহা যেমন একীভূত হইবার প্রেরণা দেয়, অপরদিকে তেমনি ইহা বিচ্ছিন্ন করার উন্মাদনা যোগায়। ইহা অনেক সময় রাষ্ট্রকে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতার দিকে লইয়া যায়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাক্টন বলেন, 'জাতীয় জনসমাজের (Nationality) মতবাদ (অর্থাৎ এক রাষ্ট্রে একটিমাত্র জাতি থাকিবে) ইতিহাসের পশ্চাৎগতির লক্ষণ।' বহু জাতীয় জনসমাজ দ্বারা সম্মিলিত ভাবে গঠিত রাষ্ট্রে জীবনীশক্তির এবং আত্মার বিকাশের প্রাচুর্য দেখা যায়। ধ্বংসোন্মুখ রাষ্ট্র নূতন জাতির সম্পর্কে আসিয়া পুনর্জীবন লাভ

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এমন একটি অস্ত্র যাহার দুই দিকে ধার

অনেকের মতে এই নীতি ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গতির লক্ষণ

করে। সুতরাং 'এক জাতি এক রাষ্ট্র'—এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সম্মিলনের ব্যবস্থা করা উচিত।

আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যতই যুক্তি থাকুক না কেন, আধুনিক কালে ইহা শুধু মতবাদ নয়; ইহার প্রভাব ও কার্যকরী শক্তিকে অস্বীকার করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ও রাষ্ট্রচালকগণ চরম ভ্রান্তির পথে চলিবেন। যখন এক রাষ্ট্রে এক বৃহৎ জাতীয় জনসমাজ অসন্তুষ্টির সহিত বাস করিতেছে, তখন তাহাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করার নৈতিক যুক্তি এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন আছে। সেই জাতীয় জনসমাজ যদি উক্ত অধিকার প্রয়োগ করিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে চায় তবে তাহা স্বীকার করা কর্তব্য।

এই মতবাদের প্রভাবকে কিন্তু অস্বীকার করা যায় না

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism):

জাতীয়তাবাদ আধুনিক কালে একটি সক্রিয় রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি। ইহা জাতীয় জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়াই মূর্ত হইয়া উঠে। জাতীয় জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ হইল বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার অধিকার। এই জন্যই জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতিকতার (Internationalism) বিরোধী বলিয়া সাধারণতঃ ধরা হয়। কিন্তু এই ধারণা সংকীর্ণ দৃষ্টির ফল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী হইতে পারে না। যখন জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে তখন জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জাতীয়তাবাদের পথ আন্তর্জাতিকতার দিকেই প্রসারিত; এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় তখনই, যখন জাতীয় স্বার্থ স্ফীতিলাভ করার ফলে জাতীয়তাবাদ উগ্রমূর্তি ধারণ করে। উগ্রমূর্তিপরিগ্রহকারী জাতীয়তাবাদ বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর হইয়া শান্তির পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং তখনই দেখা দেয় 'সভ্যতার সংকট'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীর সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে।" এই বিরোধের

প্রকৃত জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী নহে

জাতীয়তাবাদ বিকৃত হইলেই আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী হয়

পরিণতি হইল সাম্রাজ্যবাদ ও এ-যুগের সর্বগ্রাসী-রাষ্ট্রবাদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই সর্বগ্রাসী-রাষ্ট্রবাদেরই পরিণতি। অতএব, বিকৃত জাতীয়তাবাদ মানুষের চরম অকল্যাণ সাধন করিতে পারে।

বিকৃত না হইলে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সহায়তা করে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদী অপরের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মবোধ প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন এবং সেগুলি যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনুন্নত জাতিগুলিকে আর্থিক উন্নতির পথে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিবেন; এবং এই উদ্দেশ্যে অনুন্নত সমাজের লোকদের নূতন আবিষ্কার, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানের সুযোগ দিবেন।

প্রকৃত জাতীয়তাবাদীর কর্তব্য

জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা, ইতালীর স্বাধীনতা-যুদ্ধের পুরোহিত ম্যাট্‌সিনি মানবসমাজকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংঘের সমবায় হিসাবেই দেখিয়াছিলেন। এই সমবায়ের উদ্দেশ্য হইল শান্তি ও মৈত্রীর মধ্য দিয়া স্বাধীন ও সমমর্যাদাভোগী হিসাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে আপন আপন পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা। জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা মানবতা বড়—সে বিষয়ে অবহিত না হইলে জাতির সমস্ত শ্রমের লক্ষ্যই পণ্ড হইবে। অপর দিকে, যদি জাতীয়তাবাদকে নিশ্চিহ্ন করা হয় তবে বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ বন্ধ করা হইবে। অতএব, জাতীয়তাবাদ এবং প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা পরস্পরের পরিপূরক এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারে, সেইরূপ জাতিও বিশ্বজাতিসঙ্ঘের ভিতর দিয়া নিজেকে বিকাশ করিতে পারে। রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, জাতীয়তার সহিত আন্তর্জাতিকতার সেই সম্বন্ধ।

ম্যাট্‌সিনি ও জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা পরস্পরের পরিপূরক

আন্তর্জাতিকতার আদর্শ নূতন নয়। প্রাচীন গ্রীসের স্টোইক (Stoic) দার্শনিকদের সময় হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। তবে আধুনিক যুগে যানবাহনের উন্নতি এবং যাতায়াতের সুবিধার ফলে এই আদর্শ পূর্বাপেক্ষা আরও দৃঢ় এবং শক্তিশালী হইয়াছে। ইহা যে কেবল মতবাদের দিক হইতে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও ইহা কার্যকর করা হইতেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই ভাব ক্রমশঃ মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে।

জাতিসংঘ (League of Nations) ঃ

আন্তর্জাতিকতা প্রথম বাস্তব রূপ পাইয়াছিল জাতিসংঘের মধ্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে, ১৯২০ সালে, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য এক চুক্তিপত্রে (Covenant) লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সংঘের প্রধান লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ বিলুপ্তির ব্যবস্থা করা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা শান্তি ও রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য চুক্তিপত্রে অনেকগুলি বাধ্যতামূলক বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল,—যথা, দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের ফলে কোনরূপ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকিলে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র জাতিসংঘের বিচার বা সালিশী মানিয়া লইবে। কোন রাষ্ট্র যদি জাতিসংঘের বিধান অমান্য করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইত তবে তাহাকে শাস্তিদানের ব্যবস্থাও ছিল।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

এই সমস্ত বিধান সত্ত্বেও জাতিসংঘ কিন্তু রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষা ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। সংঘের ব্যর্থতার নানা কারণের মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : (১) অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সংঘে যোগদান করে নাই, (২) চুক্তিপত্রের (Covenant) বিধানগুলি কার্যকর করিবার ভার ছিল প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপর—কিন্তু অধিকাংশ সময় তাহারা দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছিল। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ব্যর্থ হইলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংঘ নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য করিয়া পৃথিবীর মঙ্গলসাধন করিয়াছিল।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations—সংক্ষেপে U. N.) সংগঠন হয়। জাতিসংঘ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল, আর এই নূতন প্রতিষ্ঠান হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল। ১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিধান (Charter) সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে গৃহীত হয়। এই বিধানে বর্ণিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান আদর্শগুলি হইল—(১) আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা; (২) শান্তিভঙ্গকারী এবং আক্রমণকারী দেশসমূহের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে কার্য করা, যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে না পারে; (৩) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করা; (৪) জাতিসমূহের

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য

মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করা ; (৫) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দ্বারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করা ; (৬) মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা ; এবং (৭) পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা।

যে সকল রাষ্ট্র জার্মাণী এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল তাহারাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সভ্য ছিল। ভারতবর্ষ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম মূল সভ্য। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এই মূল সভ্য পদে আসীন রহিল, পাকিস্থানকে নূতন সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইল। মূল সভ্যগণ ব্যতীত যে-কোনও শান্তিকামী রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য হইতে পারে। বিধানভঙ্গকারী সভ্যকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থাও আছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান প্রধান বিভাগগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

(১) সকল সভ্য-রাষ্ট্র লইয়া গঠিত সাধারণ সভা (General Assembly)। ইহা আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ বা কোন সদস্য-রাষ্ট্রকে সুপারিশ করিতে এবং বিধানের (Charter) অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে। এই বিভাগে জাতিপুঞ্জের অন্যান্য বিভাগের রিপোর্টের আলোচনা করা হয়।

(২) ১১ জন সভ্য লইয়া গঠিত নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ (Security Council)। কুওমিণ্টাঙ্-শাসিত চীন, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড এবং রাশিয়া—এই পাঁচটি রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সভ্য ; বাকী ছয়জন সভ্য সাধারণ সভা কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই পরিষদ প্রত্যেকটি সভ্য-রাষ্ট্রকে সামরিক ও অন্যান্য প্রকার সাহায্য দান করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রকৃত ভার স্বস্তি পরিষদের উপরই ন্যস্ত।

(৩) সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ১৮ জন সভ্য লইয়া গঠিত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা স্থাপন ইহার উদ্দেশ্য। এই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পরিষদের সহিত সংযুক্ত ১৩টি প্রতিষ্ঠান (Specialized Agencies) আছে,—যথা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানবকল্যাণের জন্য কয়েকটি কমিশন নিযুক্ত

করিয়াছে। কমিশনগুলির মধ্যে মানুষের অধিকার সংক্রান্ত কমিশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৪) অভিভাবক বা অছি পরিষদ (Trusteeship Council)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে-সকল অনুন্নত রাজ্য এই পরিষদের অধীনে স্থাপন করিবে তাহাদের শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান করা এই পরিষদের কার্য। তত্ত্বাবধান কার্যের দ্বারা এই পরিষদ অনুন্নত জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তুলিবে।

(৫) আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ (International Court of Justice)। ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিচার-বিভাগ। এই বিচার-বিভাগ ১৫জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। বিধানের (Charter) অন্তর্গত যে কোন বিষয় এই বিচারালয়ের এলাকাধীন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি কর্মদপ্তরও (Secretariat) আছে। দৈনন্দিন কার্য ও কর্মদপ্তর পরিচালিত হয় প্রধান কর্মসচিবের তত্ত্বাবধানে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিলেও, অনেক ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। যেমন, কাশ্মীর-সমস্যার সুমীমাংসা জাতিপুঞ্জের দ্বারা আজও সম্ভব হয় নাই। সুতরাং জাতিপুঞ্জ আংশিকভাবে ব্যর্থ হইয়াছে বলা চলে। এই আংশিক ব্যর্থতার কারণ এই যে ইহা কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার আদর্শ প্রধান রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ-সাধনের চেষ্টা দ্বারা কলুষিত হইয়াছে। জাতিপুঞ্জের পতন-সম্ভাবনা আসন্ন কিনা বলা যায় না, তবে ইহা যে মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে কোন আশার আলো জ্বালিতে পারে নাই—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জাতিসংঘের মতই ব্যর্থতার পথে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the rights of nationalities. Why is nationality the most dominating factor in modern politics? (C. U., 1943) (২৮-৩০ পৃষ্ঠা দেখ)

2. "The development of the principle of nationalism and of the idea of the nation-state has contributed to a material change in the essential character of the State." Elucidate. (C. U., 1940)

[অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) প্রবল হইয়া উঠে। ইহার ফলে "এক জাতি, এক রাজ্য" (One Nation, One State) এই দাবীর উৎপত্তি ও প্রসার

ঘটে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর মত বহু জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু বর্তমানে সোভিয়েট রুশিয়ায় বহু জাতির সম্মিলনের ফলে দেখা যাইতেছে যে এক রাজ্যে একাধিক জাতি স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে।]

3. Write short note on: The United Nations. (C. U., 1951)
(৩২-৩৪ পৃষ্ঠা দেখ)

4. What do you mean by the terms Nation and Nationality? Illustrate your answer. (C. U., 1952) (২৫-২৮ পৃষ্ঠা দেখ)

5. Briefly describe the composition and functions of the different organs of the United Nations. (৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা দেখ)

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদ

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(১) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ, (২) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি মতবাদ আছে; ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ। ইহাদের মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ এবং বলপ্রয়োগ মতবাদ রাষ্ট্রের ভিত্তি লইয়াও আলোচনা করে। শুধু রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ সংখ্যায় মাত্র একটি—জৈবিক মতবাদ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ (Theories of the Origin of the State):

কোনও বস্তু বা প্রতিষ্ঠানকে ভালভাবে জানিতে হইলে তাহার উৎপত্তির ইতিহাস জানা প্রয়োজন। বস্তুটি বা প্রতিষ্ঠানটি কি, শুধু তাহা জানাই পর্যাপ্ত

নয় ; উহা কি ভাবে বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহাও জানা আবশ্যক। এইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। রাষ্ট্র কি, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন রাষ্ট্র কি ভাবে বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা জানা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ নিম্নে বর্ণিত হইল।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ (Theory of Divine Origin):

এই মতবাদের মূল কথা—রাষ্ট্র ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট এবং পরিচালিত। যে রাষ্ট্র ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহার প্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত তাহাকে ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocracy) বলে। যথার্থ ধর্মীয় রাষ্ট্র না হইলেও পূর্বকালে রাজশাসিত রাষ্ট্রকে ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করা হইত। তখন মনে করা হইত—রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তিনি রাজ্য শাসন করেন। রাজার ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করিবার, অথবা রাজার কোন কার্য ন্যায়সঙ্গত কিনা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবার অধিকার কাহারও নাই। রাজার মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। রাজাকে অমান্য করিলে ঈশ্বরকে অমান্য করা হয় ; সুতরাং রাজদ্রোহের অর্থ ধর্মদ্রোহ। রাজার কোনও ভ্রান্তি অথবা অপরাধের জন্য তিনি কেবল ঈশ্বরের নিকট দায়ী ; প্রজাদের নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের মূল বক্তব্য

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের সমর্থন বাইবেলে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা এই মতবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেও মধ্যযুগে ইহার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। য়ুরোপে নবজাগরণ, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র প্রভৃতি ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে। বর্তমানে কেবলমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ও ঐতিহাসিকের কাছে ইহার মূল্য আছে।

সমালোচনা—বর্তমানে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদে কেহই বিশ্বাস করে না। বিখ্যাত ধর্মযাজক হুকার বলিয়াছেন যে কেবল ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারেই ঈশ্বরের ইচ্ছা কল্পনা করা যায় ; ধর্মের বাহিরের সমস্ত কিছু ব্যাপার রাষ্ট্রনৈতিক ও ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে ইহা স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করে

ঐশ্বরিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইল যে ইহা স্বেচ্ছাচারিতাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। স্বেচ্ছাচারিতা অনেক সময় আবার স্বৈরাচারে

পরিণত হয়। স্বৈরাচারীকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না। বস্তুতঃ স্বেচ্ছাচারী নৃপতিদের স্বেচ্ছাচারিতার সমর্থনের জন্যই এই মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক মূল্য—ইতিহাসের দিক দিয়া এই মতবাদের কিন্তু কিছু মূল্য আছে; ইহা রাষ্ট্রনৈতিক জীবন গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ঈশ্বরের নাম গ্রহণের এবং রাজাকে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত করার ফলে শান্তি, শৃঙ্খলা ও আনুগত্য স্বীকারের পথ সুগম হয়। রাজার বিরুদ্ধাচরণ ধর্মের প্রতিকূলাচরণ বলিয়া ধরা হইত। রাজাও অনেক সময় নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করিয়া প্রজাদের মঙ্গল সাধনের প্রকৃত চেষ্টা করিতেন।

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force):

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতবাদ 'জোর যার মুলুক তার' নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মুখ্য বক্তব্য হইল যে মানুষের ইতিহাস সংঘর্ষের ইতিহাস, বাঁচিয়া থাকার জন্য অবিচ্ছিন্ন প্রয়াসের ইতিহাস। মানুষ সমাজ-বিবর্তনের প্রথম অবস্থা হইতেই পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়া আসিতেছে। বিরোধ যে কেবল ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা নহে; জাতি, গোষ্ঠী, দল প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। সবল জাতি দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই ভাবে রাজ্য এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও সেই একই নীতি সর্বত্র চলিতেছে। বলপ্রয়োগের নীতির ফলেই রাজ্য এবং সাম্রাজ্যগুলি পরস্পরের সহিত যুদ্ধে এবং বিরোধে লিপ্ত হয় এবং স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী বাঁচিয়া থাকে অথবা বিনষ্ট হয়।

বলপ্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য

অতএব রাষ্ট্রের উৎপত্তির পরও বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়। এই মতবাদের সমর্থকগণ পৃথিবীকে একটি গভীর বন বলিয়া কল্পনা করেন। পৃথিবীর এই বন্য পরিবেশে একমাত্র বন্য আইন—'জোর যার মুলুক তার'—কার্য করে। বলপ্রয়োগ নীতির সমর্থকগণকে মানবঘৃণাকারী বলিয়া মনে হইলেও বিংশ শতাব্দীতে দুইটি মহাযুদ্ধ হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে মানুষ আজও সেই বন্য আইনের কবল হইতে

উৎপত্তির পরও বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়

নিজেকে মুক্ত করিতে পারে নাই। আমরা ন্যায়, নীতি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র সম্বন্ধে বহু উচ্চ আদর্শের কথা বলি ; আমরা যুদ্ধবিরতির ও শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করি। তবু পৃথিবী অল্প সময়ের মধ্যে দুইবার রক্তাক্ত, সভ্যতা-বিধ্বংসী মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল।

বর্তমানেও অনেকে বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্র শক্তি-প্রয়োগে সৃষ্ট হইয়াছে এবং শক্তির সাহায্যেই ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। বিরোধের সমাধান সংগ্রামের মধ্য দিয়াই হইতে পারে। কিছুকাল পূর্বে জার্মাণীতে এই মতবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। জনৈক জার্মাণ লেখক বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধ জীবনের পক্ষে প্রয়োজন।

সমালোচনা—এই কথা অনস্বীকার্য যে এই মতবাদে কিছু পরিমাণে সত্য নিহিত আছে। রাষ্ট্র গঠন ও সংরক্ষণ করিতে কিছু পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের চিরন্তন ভিত্তি হইতে পারে না। রাষ্ট্রের চিরন্তন ভিত্তি হইল নৈতিক বল বা জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা—আসুরিক বল নহে। ইংরাজ দার্শনিক টমাস হিল গ্রীন বলিয়াছেন যে জনগণের সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি।

বলপ্রয়োগ কখনও রাষ্ট্রের চিরন্তন ভিত্তি নহে, জনগণের সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি

বলপ্রয়োগ মতবাদ স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দেয় ; ইহা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী। যদি এই মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী বন্য রূপ ধারণ করিবে, রাজ্য এবং সাম্রাজ্যগুলি পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে এবং শক্তির তারতম্য অনুসারে তাহাদের উত্থান-পতন হইবে। শান্তি, সমৃদ্ধি, মৈত্রী প্রভৃতি যাহা নৈতিক দৃষ্টিতে আমাদের নিকট পরম কাম্য তাহা কোন দিনই উপলব্ধি করা যাইবে না।

ইহা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী

এই মতবাদের সমর্থকগণের মতে পৃথিবীতে একমাত্র যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। যোগ্যতম বলিতে যদি নীতির দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতম বুঝায়, তবে এই মতবাদ সমালোচনার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। কিন্তু যোগ্যতম বলিতে যদি বলের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতম বুঝায় তবে এই মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে।

ইহা অনেকাংশে অস্পষ্ট

বলপ্রয়োগ মতবাদের মধ্যে সত্যের সন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে

পাই যে আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। সুতরাং শক্তি বা বলকে রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু পাশবিক শক্তিকে কখনও রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইহার প্রয়োগকেও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

শক্তি বা বল রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি, কিন্তু একমাত্র ভিত্তি নহে

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory) :

সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা ছাড়াও শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে। সেইজন্য ইহাকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদও বলা যায়।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি লইয়াও আলোচনা করে

এই মতবাদ অনুসারে রাজা ও প্রজার মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতবাদ অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা আধুনিক রূপ ও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই দুই শতাব্দীর তিনজন দার্শনিক মতবাদটিকে আধুনিক রূপ দান করিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন হব্‌স্, লক্ এবং রুশো। এই তিনজন দার্শনিক মানুষের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভ হইবার পূর্বে এক প্রাকৃতিক অবস্থার (State of Nature) অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। প্রাক্-রাষ্ট্রীয় এই জীবনে মানুষের প্রণীত কোন আইন ছিল না, মানুষ তখন স্বাভাবিক বা প্রকৃতির আইনের দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রাকৃতিক অবস্থার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উক্ত দার্শনিকগণ একমত হইলেও প্রাকৃতিক অবস্থার রূপ সম্বন্ধে তাঁহারা একমত নহেন। মতের বিভিন্নতার কারণ হইল ঐতিহাসিক পটভূমিকার বিভিন্নতা।

এই মতবাদ অনুসারে রাজা ও প্রজার মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে

ইহা অতি প্রাচীন মতবাদ হইলেও ইহার আধুনিক রূপ দান করিয়াছেন হব্‌স্, লক্ ও রুশো

প্রাকৃতিক অবস্থা

হব্‌স্ (Hobbes) সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক। স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইংলণ্ডে যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে হব্‌স্ বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের উপাসক। তিনি

বিশ্বাস করিতেন যে রাজাকে চরম ক্ষমতার অধিকারী করিতে না পারিলে লোকের দুঃখ-কষ্টের অবসান হইবে না। তাই তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের নূতন রূপ দান করিয়া 'লেভায়াথান' (Leviathan) নামে জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

হব্‌স্ (Hobbes)

হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে চলিত। সেই অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই মানুষের একমাত্র প্রবৃত্তি ছিল; মানুষ অন্ধ ভাবে এবং চরম নির্মমতার সহিত ঐ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিত। নৈতিক বোধ বা সামাজিক চেতনা তখনও জাগ্রত হয় নাই। তখন মানুষের জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, ঘৃণ্য, পাশবিক্ এবং অনিশ্চিত"। দীর্ঘদিন এইরূপ জীবনযাপন অসহ্য হইয়া পড়ায় মানুষ এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। এই মুক্তি আসিল চুক্তির (Contract) মধ্য দিয়া। চুক্তির ফলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল, বিরোধ সংযত হইল, শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হইল।

হব্‌সের মতে চুক্তি হইয়াছিল প্রত্যেকের সহিত সকলের এবং সকলের সহিত প্রত্যেকের। চুক্তি দ্বারা প্রত্যেকেই অধিকারশূন্য হইয়া সমস্ত ক্ষমতা রাজার (বা ব্যক্তি-সংসদের) হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (বা ব্যক্তি-সংসদ) হইলেন সার্বভৌম। সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ব্যক্তি (বা ব্যক্তি-সংসদ) স্বয়ং চুক্তিতে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অসহ্য জীবন হইতে মুক্তিলাভের জন্য অপর সকলে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়াছে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তির অধিকারী চুক্তির ঊর্ধ্বে। তিনি স্বৈরাচারী হইলেও প্রজাদের বিদ্রোহ আইনসঙ্গত নয়। অতএব, স্টুয়ার্ট রাজাদের ন্যায় স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও আইনসঙ্গত নয়।

হব্‌সের মতে রাজা চুক্তির ঊর্ধ্বে এবং রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আইনসঙ্গত নয়

লক্ (Locke) সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন ইংরাজ দার্শনিক। তিনি দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজ্যচ্যুতি ও ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ (limited) করা বা নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা করা। প্রাকৃতিক অবস্থার তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সহিত হব্‌সের বর্ণনার কোন মিল নাই। লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় অবিচ্ছিন্ন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ত' ছিলই না, বরং এই

লক্ (Locke)

অবস্থায় শান্তি, সাম্য ও স্বাধীনতা বিরাজ করিত। মানুষের প্রণীত কোন আইন না থাকিলেও মানুষ তখন প্রাকৃতিক নিয়ম বা স্বাভাবিক আইন এবং যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হইত। এই স্বাভাবিক আইন প্রত্যেক মানুষকে জীবন ও সম্পত্তির উপর কয়েকটি অধিকার দিয়াছিল। অধিকার থাকিলেও সেই অবস্থায় নিরাপত্তার অভাব ছিল, কারণ তখন কোন চূড়ান্ত বিচারক ছিল না। নিরাপত্তার অভাব দূর করিবার জন্যই সামাজিক চুক্তি (Social Contract) সম্পাদিত হইল।

লকের উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ (Limited) করা

চুক্তির কারণ নিরাপত্তার অভাব

লকের মতে চুক্তি হইয়াছিল দুইটি। প্রথমে মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তির দ্বারা সমাজ-জীবনের প্রতিষ্ঠা করে, পরে রাজার সহিত চুক্তি করিয়া সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং রাজা চুক্তির ঊর্ধ্বে নহেন, চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী অন্যতম পক্ষ। জনগণ রাজার সহিত চুক্তি করিয়া কয়েকটি অধিকার রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, যাহাতে বাকি অধিকারগুলি সংরক্ষিত হয়। রাজার হস্তে প্রজার অধিকার সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন করা হয় নাই ; প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যতটুকু অধিকার বা ক্ষমতা প্রয়োজন, মাত্র ততটুকুই রাজাকে দেওয়া হইয়াছিল। আবার, রাজার সহিত প্রজার চুক্তির ফলে চুক্তির সর্ত অনুসারে কার্য করা রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। রাজার ক্ষমতা এই ভাবে দুই দিক হইতে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, রাজার অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, রাজা চুক্তিভঙ্গ করিলে তাঁহাকে অপসারণ করা যাইত। এখানেই হব্‌সের সহিত লকের পার্থক্য। হব্‌স্‌ চরম রাজতন্ত্র সমর্থন করিয়াছিলেন, লক্‌ সমর্থন করিয়াছিলেন জনমতের প্রাধান্য।

লকের মতে চুক্তি হইয়াছিল দুইটি

লকের মতে রাজা চুক্তিতে অংশ-গ্রহণকারী অন্যতম পক্ষ

হব্‌স্‌ চরম রাজতন্ত্র সমর্থন করিয়াছিলেন, লক্‌ সমর্থন করিয়াছিলেন জনমতের প্রাধান্য

রুশো হইলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক ; তিনি ছিলেন জাতিতে ফরাসী। ফরাসী বিপ্লব তাঁহার রচনা হইতে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। সংগঠিত বা সামাজিক জীবনের অনুভূতি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ তাঁহার সমানই তীব্র ছিল।

রুশো (Rousseau)

তাই তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের দ্বারা কর্তৃত্বের সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে তিনি হব্‌সের ধারণার সহিত লকের সিদ্ধান্তগুলি মিলাইয়াছেন।

রুশো কর্তৃত্বের সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন

প্রাকৃতিক অবস্থাকে (State of Nature) তিনি মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছিল পূর্ণ শান্তি ও অপার আনন্দের অবস্থা। এই অবস্থায় স্বাধীনতাই স্বাভাবিক। পূর্ণ সাম্যও এই অবস্থাতে বিরাজ করিত।

এই স্বর্গ হইতে মানুষের পতন হইল কেন? জনসংখ্যার বৃদ্ধি,—রুশো উত্তর দেন। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে ক্রমশঃ মানুষের সমাজে পাপ এবং অন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহার প্রতিকারের জন্য মানুষ তখন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠন করিতে সচেষ্ট হইল। মানুষ স্বাভাবিক জীবনের অবাধ স্বাধীনতা হইতে সামাজিক জীবনের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছিল সামাজিক চুক্তির (Social Contract) সাহায্যে। চুক্তি হইল আদিম মানুষদের নিজেদের মধ্যে। এই চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অধিকার সমাজের সর্বসাধারণের ইচ্ছার (General Will) উপর অর্পণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ায় আদিম মানুষ যৌথ ভাবে সমস্ত অধিকারই ফিরিয়া পাইল। সুতরাং সকল অধিকার সমর্পণ করিয়াও কেহ নিঃস্ব হইল না। রুশোর মতে সমাজে সর্বসাধারণের ইচ্ছাই সার্বভৌম শক্তি। রুশোর কল্পিত সমাজে রাজার কোন স্থান নাই; জনসাধারণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রে চরম কর্তৃত্ব পরিচালনা করিবে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য মানুষ চুক্তি করিতে বাধ্য হইল

রুশোর কল্পিত সমাজে রাজার কোন স্থান নাই

সমালোচনা—ঐতিহাসিকের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ভ্রান্ত। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশূন্য আদিম মানুষ হঠাৎ একদিন সমবেত হইয়া চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের পত্তন করিল, এরূপ দৃষ্টান্ত কোন দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। এই মতবাদের ঐতিহাসিক সত্যতায় বিশ্বাসীকে দুইটি ধারণার অন্ততঃ একটির উপর নির্ভর করিতে হইবে: (১) চুক্তিকারী কোন মনুষ্য-সম্প্রদায় অপর কোন দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়া

১। এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই

শিক্ষালাভ করিয়াছিল ; অথবা (২) আদিম মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়াছিল। কোন দেশের ইতিহাসেই যখন সামাজিক চুক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, তখন দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষালাভের কথা উঠে না। দ্বিতীয় ধারণা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে সরল, অজ্ঞ, আদিম মানুষের সম্বন্ধে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার কল্পনা করা সম্পূর্ণ ভুল। সুতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রুশো এবং লক্ প্রাকৃতিক অবস্থায় স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই বর্বর যুগে স্বাধীনতার অর্থই স্বৈরাচার। সামাজিক বন্ধন ও আইন ব্যতীত অধিকার রক্ষা করা যাইতে পারে না। আইন হইল স্বাধীনতার ভিত্তি। আইনের উৎপত্তির পূর্বে প্রকৃত স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

২। ইহা ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

এই মতবাদ যে ভ্রান্ত তাহার আরএকটি প্রমাণ এই—ইহাতে চুক্তিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু চুক্তির সমর্থক আইনের উল্লেখ করা হয় নাই। আইন অথবা প্রবল জনমত ব্যতীত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করা যায় না। এই কারণেই চুক্তি মতবাদ যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

৩। প্রাকৃতিক অবস্থায় আইন না থাকায় চুক্তির কল্পনা করা অযৌক্তিক

অনেকের মতে এই মতবাদ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্বের পক্ষে ঘোর ক্ষতিকর। শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার দরুণ শাসিতেরা সকল সময় শাসকের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায়। ফলে বিপ্লব ঘটে। প্রকৃতপক্ষে ফরাসী বিপ্লবীরা ও আমেরিকার ঔপনিবেশিক বিদ্রোহীরা সামাজিক চুক্তি মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

৪। ইহা বিপজ্জনক মতবাদ

উপরোক্ত ত্রুটির জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে; আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কেহই আজ এই মতবাদে বিশ্বাস করেন না। গার্নারের ভাষায়, ইহা মানুষের নিছক কল্পনাপ্রসূত একটি মতবাদ মাত্র।

কাল্পনিক মতবাদ বলিয়া বর্তমানে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে

সমালোচকের দৃষ্টির সম্মুখে এই মতবাদ দাঁড়াইতে না পারিলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। গণতন্ত্রের বিবর্তনে এই মতবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্র চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

এবং রাজা এই চুক্তির সর্ত অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করিবেন—এইরূপ ধারণা জনগণের রাজনৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান হইয়াছিল। রাষ্ট্র গঠনে প্রজার সম্মতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া এবং রাষ্ট্র শাসনে জনমতকে প্রাধান্য দিয়া এই মতবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রচারে এবং প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

ঐতিহাসিক মূল্য

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal and Matriarchal Theories) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে, রাষ্ট্রের বিবর্তনের প্রথম যুগে রক্তের সম্বন্ধ একতা এবং সংহতি আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে রক্তের সম্বন্ধ কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহা লইয়া দুইটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদ আছে—একটি পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) মতবাদ, অপরটি মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) মতবাদ।

(১) **পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ :** স্যার হেনরী মেইন পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের শ্রেষ্ঠ সমর্থক। তাঁহার মতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিতে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। পিতাই সমাজে প্রধান ; উত্তরাধিকার, বংশ—সব কিছুই পুরুষদের দিক হইতে নির্ধারিত হয়। গৃহে প্রবীণতম ব্যক্তিই কর্তা। পরিবারের মূল ভিত্তি হইল পিতার কর্তৃত্বাধীনে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ পরিবারের সভ্যগণ। কয়েকটি পরিবার একত্রিত হইয়া বংশের সৃষ্টি করে। কতকগুলি বংশ একত্রিত হইয়া উপজাতি বা দল গঠন করে। কতকগুলি উপজাতি একত্রিত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করে। ঐতিহাসিক নিদর্শন হইতে মেইন দেখাইয়াছেন যে পিতৃপ্রধান ব্যবস্থা আদিম যুগে প্রায় সর্বজনীন ভাবে বর্তমান ছিল। কিন্তু সমালোচকদের মতে পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মূল বক্তব্য হইল যে পিতার দিক দিয়া পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে

এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই

(২) **মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ :** মরগ্যান এবং জেঙ্কস্ বলেন যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আদিম যুগে কমই প্রচলিত ছিল ; পুরুষের দিক দিয়া বংশ নির্ণয় করার পদ্ধতি প্রাচীন সমাজে সর্বজনীনভাবে প্রচলিত ছিল না। যেখানে এক পুরুষের এক বা বহু স্ত্রী গ্রহণের

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে মাতার দিক হইতেই পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াছিল

রীতি প্রচলিত ছিল, সেইখানেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু প্রাচীন সমাজে বহু স্ত্রী গ্রহণের রীতির পরিবর্তে বহুপতি প্রথা প্রচলিত থাকিবার ফলে বংশ স্ত্রীর দিক হইতেই নির্ধারিত হইত। ফলে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ছিল। মাতৃপ্রধান মতবাদের সমর্থকগণের মতে সমাজে মাতার স্থানই প্রধান এবং মাতাকে কেন্দ্র করিয়াই রাষ্ট্র এবং সমাজ বিবর্তিত হইয়াছে। মালাবারে এবং প্রাচীন মারাঠা-সমাজে রাণী কর্তৃক রাজ্য শাসনের ঐতিহাসিক কাহিনী মাতৃপ্রধান রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়।

বর্তমানে এই মতবাদের বিশেষ গুরুত্ব নাই, কারণ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে রাষ্ট্রের বিবর্তনে রক্তের সম্বন্ধ ছাড়াও অন্যান্য কারণ সাহায্য করিয়াছে।

বর্তমানে এই মতবাদের গুরুত্ব নাই

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory):

রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নয়; পাশবিক শক্তির সাহায্যে গঠিত নয়; চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় নাই; পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রের গঠন হয় নাই। তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল কারণ কি? রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মতবাদে বা বিবর্তনবাদে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে—ইহা ইতিহাসের গতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। অলস কল্পনা এই মতবাদের ভিত্তি নয়। যে সমস্ত শক্তি প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়াই এই মতবাদ রচিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি কবে এবং কি ভাবে হইয়াছিল সে ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। তবে ইতিহাসের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহা নির্ধারিত করা যায় যে রাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবে বিবর্তিত সংগঠন; ইহা মানুষ বা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট সংগঠন নহে। মানুষের অপরিণত ও বিশৃঙ্খল সমাজ ক্রমশঃ সুসংবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। মানব-সমাজের ক্রমপরিণতির ইতিহাসই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস। রাষ্ট্রের উত্থান আকস্মিক নয়, ইহা দীর্ঘকালের বিবর্তনের ফল।

রাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবে বিবর্তিত সংগঠন; ইহা মানুষ বা ঈশ্বরের সৃষ্ট সংগঠন নহে

রাষ্ট্রের ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে চারিটি কারণের প্রত্যেকটি

রাষ্ট্রের বিবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। প্রথমটি হইল রক্তের সম্বন্ধ, দ্বিতীয়টি ধর্ম, তৃতীয়টি যুদ্ধ এবং চতুর্থটি রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। অবশ্য কোন কারণ কি ভাবে এবং কি পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে তাহা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, যেহেতু চারিটি কারণ অনেক সময় সমভাবে কার্যকর হইয়াছিল।

চারিটি কারণ রাষ্ট্রের বিবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে

আবার অনেক সময় একটি কারণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, অন্য কারণগুলি কতক পরিমাণে নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু মোটের উপর রাষ্ট্র-গঠনে চারিটি কারণই কার্যকর ছিল। সম্ভবতঃ প্রাথমিক অবস্থায় রক্তের সম্বন্ধই প্রধান শক্তি ছিল, মধ্যম অবস্থায় ধর্ম শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে এবং পরিণত অবস্থায় যুদ্ধ ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সমাজের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে।

রক্তের সম্বন্ধ : রক্তের সম্বন্ধই মানুষের মধ্যে প্রাচীনতম বন্ধন। আদিম সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার; পরিবারের ভিত্তি হইল রক্তের সম্বন্ধ। শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই দেখে, তাহার চারিদিকে সকল আত্মীয়স্বজন গৃহের প্রাচীন কর্তার আদেশ পালন করিয়া চলে। এখানেই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি—এবং এখানেই সর্বপ্রথম আদেশ দানের এবং আদেশ পালনের নীতি পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের সকলে পরস্পরের সহিত রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ।

পরিবার হইতেই রাষ্ট্রের বিবর্তন শুরু হইয়াছে

পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠী এবং উপজাতি বা দল গঠিত হইল এবং উপজাতি ক্রমশঃ বৃহত্তর ও সুসংবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রে পরিণত হইল। পরিবার যখন দলে পরিণত হইতেছে তখনও তাহার মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতে পারে। তখন দলপতিই ছিল দলের প্রধান শাসনকর্তা; দলের অন্যান্য সভ্যেরা উক্ত দলপতির বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিত। কালক্রমে দলের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে পরস্পরের মিশ্রণ এত জটিল হইয়া পড়িল যে রক্তের সম্বন্ধ নির্ণয় করা আর সম্ভব হইল না। ফলে রক্তের সম্বন্ধ অথবা বয়সের প্রাচীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনকর্তা নির্বাচন করাও আর সম্ভব হইল না।

পরিবারের পর আসিল গোষ্ঠী, গোষ্ঠীর পর দল বা উপজাতি

ধর্ম : যখন রক্তের সম্বন্ধের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল তখন অন্য কোন প্রকার বন্ধন না থাকিলে সমাজ ভাঙনের পথে চলিত। কিন্তু নূতন বন্ধন যোগাইল ধর্ম। রক্তের সম্বন্ধের পরিবর্তে মানুষের মধ্যে ধর্মের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ধর্ম তখনকার দিনে পূর্বপুরুষ-পূজা ও যৌথ ধর্মাচরণের রূপ গ্রহণ

করিয়াছিল। রক্তের বন্ধন শিথিল হইবার ফলে সমাজ যে বিচ্ছিন্নতার পথে চলিতেছিল, পূর্বপুরুষ-পূজা এবং যৌথ ধর্মাচরণের প্রথা তাহা রোধ করিল। পূর্বপুরুষ-পূজার প্রথা ধর্মের প্রধান অঙ্গ রূপে গণ্য হওয়ায় প্রবীণদেরই কেবল শাসন করিবার ক্ষমতা ছিল। সেকালে লোকের ধারণা ছিল যে প্রবীণদের সহিত মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার যোগাযোগ আছে। সুতরাং প্রবীণদের আজ্ঞা অমান্য করিবার অর্থ—পূর্বপুরুষদের আজ্ঞা অমান্য করা এবং তাঁহাদের অশরীরী আত্মার অভিশাপ কুড়ান। ফলে প্রবীণদের শাসন সমাজে শৃঙ্খলা এবং ঐক্য আনয়নে সমর্থ হইয়াছিল।

প্রবীণদের শাসন

তখনকার দিনে ধর্ম সম্বন্ধে কোনও পরিষ্কার ধারণা ছিল না। সেই জন্য যে কেহ কোন প্রকারের অলৌকিক কার্য করিতে পারিত তাহাকেই লোকে ঐশী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিত এবং তাহার আদেশ পালন করিত। ইহার ফলে বহু শঠ এবং অসৎ ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার সাহায্যে জনগণকে প্রতারিত করিয়া শাসন-ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করিত। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে প্রবীণদের শাসন-ক্ষমতা চলিয়া গেল এবং এই প্রবঞ্চক ঐন্দ্রজালিকের দল ক্ষমতার আসনে বসিল।

ঐন্দ্রজালিকের শাসন

যুদ্ধ: রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে যুদ্ধও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উৎপত্তিতে ও বিবর্তন-ধারার প্রথম স্তরে রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে ছিল এক সামাজিক সংগঠন—যাহা বিজেতা বিজিতের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়াছিল। বিজেতারা বিজিতের সম্পদ অপহরণের জন্যই এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিল। এইজন্য আদিম মনুষ্য-সমাজে দেশরক্ষার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছিল। দেশরক্ষা বা আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে আক্রমণের প্রয়োজনীয়তাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলে, আদিম মনুষ্য-সমাজে যুদ্ধ-নেতারা রাজপদ অধিকার করিয়া বসিল। বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজপদে বসিয়া নূতন দেশজয়ে মন দিল। ক্রমশঃ তাহার আধিপত্য বিশাল ভূখণ্ডের উপর বিস্তৃত হইল।

যুদ্ধ-নেতাদের রাজপদ অধিকার

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা: রাষ্ট্র-গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার দানও কোন অংশে কম নয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার অর্থ হইল—রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সাহায্যে কতকগুলি আদর্শ এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার ইচ্ছা। এই সমস্ত আদর্শ প্রাচীন কালেও ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে উপলব্ধি করিবার মত রাষ্ট্রনৈতিক

চেতনার অভাব ছিল। তখন রক্তের সম্বন্ধ এবং ধর্মই সমাজে প্রধান শক্তি ছিল, কারণ জনসাধারণ অনায়াসেই ইহাদের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিত। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির ফলে ধর্মের স্থলে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা প্রাধান্য লাভ করিতে থাকিল। রাজার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের পরিবর্তে মানুষ যুক্তিমূলক আনুগত্য গ্রহণ করিল, অর্থাৎ বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়া আদেশ পালনের প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া পরে আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইল। মানুষ এই অবস্থায় আইনের উপযোগিতা বুঝিতে পারিল এবং আইনের সাহায্যে ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য এবং সামাজিক ও নৈতিক অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট হইল। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষের চিহ্ন। কবে, কি ভাবে মানুষ এই চেতনার বশবর্তী হইয়া কাজ করিতে লাগিল তাহা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না। বোধ হয় সমাজের বিবর্তনের প্রথম অবস্থায় এই চেতনা স্থূল ভাবে বর্তমান ছিল। তখন ইহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা হয় নাই এবং বোধ হয় তাহা করা সম্ভবও ছিল না। ক্রমশঃ সভ্যতার অগ্রগতির ফলে এবং মানুষের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির ফলে এই চেতনা সুস্পষ্ট হইল এবং মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ইহা অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হইল।

অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিমূলক আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হইল

ইহাই হইল রাষ্ট্র-বিবর্তনের কাহিনী।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদের সার্থকতাঃ আধুনিক যুগে এই মতবাদই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ ইহা প্রত্যেক মতবাদের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়াছে। মানুষের সংগঠনের প্রবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বরের নির্দেশ নিহিত আছে। এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে স্বভাবতঃই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। এই উক্তির সামান্য পরিবর্তন করিয়া বলা যায় যে ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষ সমাজে বাস করুক। রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে রক্তের সম্বন্ধকেও গ্রহণ করিতে হয়। শক্তির ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না, কারণ কোনও রাষ্ট্রেই শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার বিকাশের মধ্যে চুক্তিবাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই কারণগুলির কোনটিই সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র-বিবর্তনের গতি নির্দেশ করিতে পারে না, অথচ প্রত্যেকটি কারণই মানবসমাজকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা হইতে মুক্ত করিয়া স্থায়ী রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সাহায্য করিয়াছে।

এই মতবাদ প্রত্যেক মতবাদের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়াছে বলিয়া ইহাই শ্রেষ্ঠ

রাষ্ট্রের প্রকৃতিঃ জৈব মতবাদ (The Organic Theory)ঃ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির কোন কারণ নির্দেশ করে না; ইহা ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করে। সুতরাং এই মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ, উৎপত্তি সম্বন্ধে নহে।

জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ, উৎপত্তি সম্বন্ধে নহে

জৈব মতবাদের বর্ণনাঃ এই মতবাদের সমর্থকগণ জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা করেন। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে উদ্ভিদ অথবা প্রাণীদেহের সহিত এবং ব্যক্তিকে দেহের কোষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কোষের সহিত জীবদেহের যে সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সেই সম্বন্ধ। জীবদেহের সহিত বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে সম্বন্ধ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সেই প্রকার সম্বন্ধ। জীবদেহের মত রাষ্ট্রেরও মস্তিষ্ক, স্নায়ু, হৃদয়, পেশী প্রভৃতি আছে। ব্লুনট্‌স্‌লি রাষ্ট্রকে নরদেহের প্রতিমূর্তি বলিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্‌সার এই মতবাদের একজন বিশিষ্ট সমর্থক। তাঁহার মতে জীবদেহের মত রাষ্ট্রেরও সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে। রাষ্ট্রের জীবনীশক্তি হইল উৎপাদন-ব্যবস্থা। পরিবহন বিভাগ হইল রাষ্ট্রের স্নায়ুমণ্ডলী। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-বিভাগ হইল সরকার এবং সামরিক বাহিনী। এইভাবে উপমার সাহায্যে জৈব মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রকে জীবদেহের অনুরূপ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন।

জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা

ব্লুনট্‌স্‌লি (Bluntschli) ও হার্বার্ট স্পেন্‌সারের মত

সমালোচনাঃ এই মতবাদ সাদৃশ্য-বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত; যুক্তির সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। রাষ্ট্রের কতকগুলি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের সহিত জীবদেহের বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা যায় সত্য, কিন্তু সাদৃশ্য বর্ণনা করার অর্থই অভিন্নতা প্রমাণ করা নয়। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যের সহিত জীবদেহের বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে তুলনীয় নহে।

কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য বর্ণনা করিলেই অভিন্নতা প্রমাণ করা হয় না

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এই মতবাদ আংশিক ভাবে সত্য, কারণ ইহা ইঙ্গিত করিতেছে যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের মধ্য দিয়াই ব্যক্তি আত্মোপলব্ধি করে এবং ব্যক্তির সাহায্যেই রাষ্ট্র-গঠন

সম্ভব। এই ইঙ্গিত ব্যতীত জৈবিক মতবাদের আর সমস্ত উপমাই অসিদ্ধ এবং ভ্রান্ত। জীবদেহের কোষগুলি (cells) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্য করে, তাহাদের কোনও স্বাধীন অস্তিত্ব অথবা ইচ্ছাশক্তি নাই; কিন্তু ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন ইচ্ছা এবং সচেতনতা আছে।

এই মতবাদ মাত্র আংশিক-ভাবে সত্য

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু জীবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন কোন কোষ বা অঙ্গ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। রাষ্ট্র ব্যতীতও ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়; দেহ ব্যতীত কোষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, কোন কোষের পক্ষে দুইটি জীবদেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভব নয়, ব্যক্তি রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না; তাই সে বিভিন্ন সংঘের সহিত জড়িত থাকে। প্রত্যেক কোষ কিন্তু নিজের বৃদ্ধির জন্য একমাত্র জীবদেহের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

প্রত্যেক জীবদেহ পূর্ববর্তী কোন জীবদেহ হইতে জন্মলাভ করে; রাষ্ট্রের পক্ষে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। রাষ্ট্র কোন পূর্ববর্তী সংগঠন হইতে উদ্ভূত হয় নাই।

বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু জীবদেহের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু না-ও হইতে পারে।

উপরন্তু, এই মতবাদ রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের উপরেও বিন্দুমাত্র আলোকসম্পাত করে না। ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে রাষ্ট্রের জনসমষ্টির প্রত্যক্ষভাবে করিবার কিছুই নাই। জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত রাষ্ট্রের সভ্যগণ স্নায়ুর নির্দেশের অপেক্ষা করিবে। ইহার ফলে সমষ্টিবাদে (Idealistic Theory) উপনীত হইতে হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির কোনই সত্তা নাই, সে সমষ্টির অংশ মাত্র। অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এইভাবে ব্যক্তিকে সমষ্টির নিকট বলি দিবার পক্ষপাতী নহেন। এই সকল কারণে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মতবাদটি রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের উপরেও বিন্দুমাত্র আলোক-সম্পাত করে না

ব্যক্তিকে সমাজের নিকট বলি দেওয়া অসঙ্গত

ঐতিহাসিক মূল্য: ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে জৈব মতবাদ একেবারে

মূল্যহীন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রবল ব্যক্তিস্বতিন্ত্র্যবাদের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া ইহা সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছিল। ফলে বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে সমাজে সহযোগিতার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল এবং সমাজের ভাঙ্গন রুদ্ধ হইয়াছিল।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss critically the social contract theory of the origin of the State. (C. U., 1939, 1942). (৩৯-৪৪ পৃষ্ঠা দেখ)

2. "The State is the result of brute force." Discuss the validity of this theory of the State. (C. U., 1941). (৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা দেখ)

3. "The State is neither a divine institution nor a deliberate human contrivance; it has come into existence as the result of natural evolution." Discuss this statement and indicate the process through which the State has come into existence. (C. U., 1944). (৪৫-৪৮ পৃষ্ঠা দেখ)

4. "The State is the result of the subjugation of the weaker by the stronger." Do you accept this theory of the origin of the State? Give reasons for your answer. (C. U., 1945). (৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা দেখ)

5. "The State is a living organised unit, not a lifeless instrument." Discuss the soundness or otherwise of this view. (C. U., 1940, 1946). (৪৯-৫১ পৃষ্ঠা দেখ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত নহেন। এই মতবিরোধের কারণ হইল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতবিরোধ। ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র, না রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি—রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সুরু হইতে আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের মীমাংসা হইল না।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতবিরোধই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মতবিরোধের কারণ

রাষ্ট্রকে অনেকে সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ বলিয়া মনে করেন। রাষ্ট্রের বাহিরে যে ব্যক্তির কল্যাণের কোন ক্ষেত্র থাকিতে পারে, একথা তাঁহারা

বিশ্বাস করেন না। একজন জার্মাণ দার্শনিক রাষ্ট্রকে 'মানুষের চিরন্তন সমাজের শ্রেষ্ঠ সংগঠন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ মত পোষণ করেন তাঁহারা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র কোন সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট করিতে চান না।

বিরুদ্ধপক্ষীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র যতদূর সম্ভব সংকুচিত করিতে চান। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরেই মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ সংখ্যায় দুইটি মাত্র—
(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ,
(২) সমাজতন্ত্রবাদ

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র লইয়া আলোচনা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিলেও এবং অনেক মতবাদের সৃষ্টি হইলেও অধিকাংশ মতবাদের কেবলমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য আছে; বর্তমান জগতে ঐ মতবাদগুলির প্রয়োগ-সম্ভাবনা নাই। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ সংখ্যায় মাত্র দুইটি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (The Individualistic Theory) ঃ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিবরণ ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্যবস্থায় ক্রমশঃ ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হইল এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল। এই মতবাদের মূল

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল নীতি ও ধারণা

আদর্শ হইল, রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংকীর্ণতম গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা। ফ্রান্সের ফিজিওক্র্যাট্‌গণ অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পছন্দ করিতেন না। ইংলণ্ডের ধনবিজ্ঞানী অ্যাডাম স্মিথ, দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল এবং হার্বার্ট স্পেন্সার এই মতবাদের উগ্র সমর্থক ছিলেন। নিজের উপর, দেহের উপর এবং চিত্তের উপর মানুষের পূর্ণ অধিকার আছে—ইহাই হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল নীতি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল ধারণা এই যে রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় অথচ অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অর্থ ব্যক্তিস্বাধীনতার বিনাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হইলে ব্যক্তি আর

নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের কার্যাবলী নির্দিষ্ট থাকা উচিত। রাষ্ট্র হইবে ন্যূনতম রাষ্ট্র; অর্থাৎ রাষ্ট্রের কার্য হইবে রক্ষামূলক মাত্র। এই রক্ষাকার্য দুই প্রকারের— আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা। এই প্রকার রাষ্ট্রকে পুলিশ-রাষ্ট্র (Police State) বলা হয়।

পুলিশ-রাষ্ট্রই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে কার্য করিবার পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার নীতি, তাই ইহাকে অবাধ স্বাধীনতার নীতি বা স্বাচ্ছন্দ্যনীতি বা Laissez Faireও বলা হয়।

স্বাচ্ছন্দ্য নীতি বা Laissez Faire

সমালোচনা: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কতকগুলি নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের ব্যক্তিত্ব তখনই পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে, যখন সে আপন ইচ্ছায়, কোনও প্রকার বিধি-নিষেধের বশীভূত না হইয়া, চিন্তা করিতে ও কার্য করিতে পারে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্রমশঃ সংকুচিত হইতে থাকে। বাহিরের শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে মানুষের উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। ফলে সে নিজের মঙ্গল সাধনের পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। সকলের মঙ্গল হইলে সমাজের মঙ্গল। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে যে বলিষ্ঠতা আছে, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে তাহা নাই।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে যথেষ্ট বলিষ্ঠতা আছে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার সহিত বিবর্তনবাদের সামঞ্জস্য আছে। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকে তবে প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে দেখা দিবে অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরামবিহীন সংগ্রাম। এই জীবনসংগ্রামে অযোগ্য অপসারিত হইয়া যাইবে এবং যোগ্য টিকিয়া থাকিবে। যোগ্যতমেরই পৃথিবীতে বাঁচিবার অধিকার আছে।

ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

অর্থবিদ্যার দিক দিয়া অ্যাডাম স্মিথ ইহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। জীবন সংগ্রামে মানুষের কর্মশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; ফলে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও স্বল্প হইবে।

অর্থবিদ্যার দিক দিয়া ইহা সমর্থিত হইয়াছে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কতকগুলি ত্রুটিও আছে। রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় অথচ অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান—এই ধারণার উপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস এই ধারণার সমর্থন করে না। আধুনিক সভ্যতা অনেকাংশে রাষ্ট্রের সুপরিকল্পিত কর্মপদ্ধতির ফল। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অনেক ভুল করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রকে অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে জটিলতার উদ্ভব হয়। এই জটিলতার সমাধানের জন্য অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। রাষ্ট্রকে পুলিশ-রাষ্ট্রে পরিণত করিলে সমাজের এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটিসমূহ

রাষ্ট্র অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান নয়

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট, কারণ এই মতবাদ অনুসারে আইন-মাত্রই স্বাধীনতার বিরোধী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সুফল অপেক্ষা কুফলের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেন। তাঁহাদের মতবাদ এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানুষই নিজের স্বার্থের শ্রেষ্ঠ বিচারক। যাঁহারা সুশিক্ষিত তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ধারণা প্রযোজ্য হইতে পারে; কিন্তু লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর লোক সম্বন্ধে এই ধারণার কোনই মূল্য নাই। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বার্থ এবং অধিকার সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করে; বিশেষতঃ যাহারা অশিক্ষিত, দরিদ্র ও দুর্বল, তাহাদের স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলসাধনের জন্য রাষ্ট্রের সতর্ক হস্তক্ষেপ বিশেষ প্রয়োজন। ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বাধীনতা যেমন আবশ্যক, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণও তেমনি আবশ্যক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা সমাজের পরিবর্তে ব্যক্তিকে অযৌক্তিক প্রাধান্য দিয়াছেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট

ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা উভয়ই আবশ্যক

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধের জটিলতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। দেশরক্ষা ছাড়াও রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অনেক কিছু করিতে হয়। শিল্প-সংরক্ষণ, বহির্বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং বর্তমানে রাষ্ট্রকে একটি পুলিশ-সংগঠন বলিয়া মনে করা সম্পূর্ণ ভুল।

কতকগুলি কার্য রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়

সমাজতন্ত্রবাদ (The Socialistic Theory) :

সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে দুইটি হইল—রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ এবং সমভোগবাদ বা কমিউনিজম্।

সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা : সমাজতন্ত্রবাদের মূল ধারণা এই যে, ব্যক্তির মঙ্গল এবং সামাজিক প্রগতির জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্র একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই বন্ধু ও পথপ্রদর্শকের কার্য করিবে। উগ্র সমাজতন্ত্রবাদীরা সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়করণের পক্ষপাতী। তাঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা করেন এবং অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুফলের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অসাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করে ; ফলে সমগ্র জনসাধারণকে অভাব ও দুঃখের মধ্যে রাখিয়া কতকগুলি সুবিধাবাদী শ্রেণী দেশের ধন শোষণ করে। এই অসাম্যের বিলোপসাধনই সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ। সমাজতন্ত্রবাদ এমন সমাজের স্বপ্ন দেখে—যেখানে মানুষে মানুষে ভেদ নাই, যেখানে শোষণ নাই, যেখানে সকল মানুষ সুখী এবং তৃপ্ত।

সমাজতন্ত্রবাদের মূল ধারণা

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। এই বিভিন্ন রূপের মধ্যে মাত্র রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism) ও সমভোগবাদ (Communism) বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হইলেও, অপর দুই প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এই দুই প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদ হইল—সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) এবং যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism)।

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ : রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করিতে চায়। ইহার মূল কথা এই যে উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আসিলেই আর শোষণ থাকিবে না এবং সামাজিক প্রয়োজনেই দ্রব্য উৎপাদিত হইবে।

সাম্যবাদ বা সমভোগবাদ : সমাজতন্ত্রবাদের আর একটি রূপ হইল সাম্যবাদ বা সমভোগবাদ। আধুনিক কালে ইহা একটি বিশেষ শক্তিশালী

মতবাদ। সাম্যবাদিগণের মতে সর্বহারার বিপ্লবই (Proletarian Revolution) সমাজতন্ত্রবাদের পথে সমাজকে লইয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদের ন্যায় ইহা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বাসী নহে। সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ এই যে, প্রত্যেকে ক্ষমতা অনুসারে কার্য করিবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভোগ্যবস্তু পাইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন সাম্যবাদের প্রধান লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রসার সাম্যবাদিগণের লক্ষ্য। এই মতবাদ কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত আকারে রাশিয়া, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে কার্যকর হইয়াছে।

সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ ঃ সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের নীতি এই যে রাষ্ট্র এবং শ্রমিকসংঘগুলি সহযোগী রূপে বর্তমান থাকিবে, তবে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে শ্রমিকসংঘগুলির সাহায্যে। শ্রমিকসংঘগুলি উৎপাদন-ব্যবস্থা নির্ধারণ করিবে, রাষ্ট্র ভোগ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবে। শ্রমিকসংঘগুলি উৎপাদনকারী বা শ্রমিকের প্রতিনিধি হইবে এবং রাষ্ট্র যাহারা উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করে তাহাদের (অর্থাৎ সাধারণের) প্রতিনিধিত্ব করিবে।

যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ ঃ সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের সহিত অনেকাংশে যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদের সাদৃশ্য আছে। এই শ্রেণীর সমাজতন্ত্রবাদিগণের মতে উৎপাদন শ্রমিকসংঘের সাহায্যে পরিচালিত হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা ঃ অসাম্য ও অত্যাচারের জগতে সমাজতন্ত্রবাদ ন্যায়, সুবিচার ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিণতি ধনতন্ত্রবাদে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মালিক ও শ্রমিক। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ ধনতান্ত্রিক সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলিয়া সবল মালিকের হস্তে নির্যাতিত ও শোষিত হয়। শ্রমিকের প্রতি শোষণের মাত্রা চরমে ওঠে, অথচ মালিকের অর্থ ক্রমশঃই পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। ধনতন্ত্রবাদের ইহাই বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা সর্বসাধারণের অধীনে আনয়ন করিবার ফলে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের অনেক উপাদান—ধনবিজ্ঞানে যাহাকে ভূমি (Land) বলে—প্রকৃতির দান মাত্র, মানুষের সৃষ্ট নহে; সুতরাং ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে সর্বসাধারণ ইহার মালিক হওয়া উচিত।

সাম্যের প্রতিষ্ঠাই সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান উদ্দেশ্য

প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুফল দূর করিবার আশায় সমাজতন্ত্রবাদ অর্থ-ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন করিতে চায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে অপচয়, অমিতব্যয়িতা এবং অন্যান্য কুফল উৎপন্ন হয়। আধুনিক কালে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ অনেক ক্ষেত্রে সুফল প্রসব করিয়াছে, এবং ক্রমশঃ মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন স্বীকৃত হইতেছে। উৎপাদন ব্যবস্থা সর্বসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক আদর্শকে উপলব্ধি করে।

সমাজতন্ত্রবাদ অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদের স্থান খুবই উঁচে, কিন্তু ইহা বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর করার পথে যথেষ্ট অসুবিধা ও বিঘ্ন আছে। উৎপাদন-ব্যবস্থার জাতীয়করণের পরিকল্পনা করা যতটা সহজ, তাহা কার্যে পরিণত করা ততটা সহজ নয়। তাহা ছাড়া জাতীয়করণের কুফলও আছে। জাতীয়করণের ফলে মানুষের ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণা সঙ্কুচিত হইয়া যায়; ফলে উৎপাদন বাধা পায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ হইলে মানুষের কর্মপ্রেরণা রুদ্ধ না হইলেও সংকুচিত হইয়া যাইবে। রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালে যখন রুশ দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান করা হয়, তখন শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদনের যন্ত্র অচল হইয়া পড়ে; ফলে উৎপাদন ভীষণ ভাবে হ্রাস পাইতে থাকে। এই কারণেই রাশিয়াকে উক্ত নীতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (যাহা New Economic Policy বা N. E. P. নামে সুপরিচিত) প্রবর্তন করিতে হয়। নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থান ছিল। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজতন্ত্রবাদের চরম আদর্শ গ্রহণ করিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কারণ মানুষ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসকগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে। ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হইলে মানুষের পক্ষে নিজেকে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। উপরন্তু, শাসকগণ আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, আমাদের মতই ভুল করিতে পারেন। তাঁহাদের আদর্শও বিকৃত হইতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধু ও পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে দেওয়া যায় না বলিয়াই অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।

সমাজতন্ত্রবাদের ত্রুটি

ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী—সমাজতন্ত্রবাদের দিকে গতি (Functions of the modern State—Tendency towards Socialism) :

পূর্বে রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মানুষ আজ সমাজতন্ত্র অভিমুখে চলিয়াছে। রাষ্ট্রের কার্য যে কেবল রক্ষামূলক, সে ধারণা আজ বিশেষ কাহারও নাই। রক্ষামূলক কার্য দ্বারা রাষ্ট্র কয়েকজনের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে না। সমগ্রভাবে সমাজের উন্নতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভব। ফলে সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি সর্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে।

সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি সর্বত্র গৃহীত হইলেও, পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যায় চার পাঁচটির বেশী নয়। ইহার সহজ অর্থ এই যে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র এখনও সমাজতন্ত্রবাদকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না; তাহারা সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যবর্তী পথ দিয়া অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দিন অনেক-কাল চলিয়া গিয়াছে, সমাজতন্ত্রবাদ এখনও একচ্ছত্র অধিপতি হইতে পারে নাই। তবে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে কোন ভুল নাই।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্য কেবল রক্ষামূলক নয়; সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়:—
(১) অপরিহার্য বা মুখ্য কর্তব্য; (২) ইচ্ছামূলক বা গৌণ কর্তব্য।

অপরিহার্য কর্তব্য হইল সেগুলি যেগুলি রাষ্ট্র পরিহার করিতে পারে না; সার্বভৌমিকতার অধিকারী হিসাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রকে এগুলি পালন করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ প্রভৃতি এই শ্রেণীর কার্যের অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে সৈন্য-বাহিনী, নৌ-বাহিনী প্রভৃতি রক্ষীবাহিনী পোষণ করিতে হয়। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য রক্ষীবাহিনীই যথেষ্ট নয়; পররাষ্ট্রনীতিও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়।

অপরিহার্য বা মুখ্য কর্তব্য

আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রকে পুলিশ বিভাগ পোষণ করা ছাড়াও আইন-প্রণয়ন ও বিচার-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিতে হয়। বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা ও দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা প্রকৃত পক্ষে পুলিশের কার্য। সমাজজীবন রক্ষার জন্য ইহা অপরিহার্য। এই সকল কর্তব্যকে এড়াইয়া গেলে রাষ্ট্র নামের যোগ্য হয় না।

রক্ষামূলক কার্য যদি রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হইত, তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নীতিই রাষ্ট্রের আদর্শ হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে রাষ্ট্রের কার্যাবলী এই সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। বর্তমানে রাষ্ট্রসমূহের দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যাবলী বা গৌণ কর্তব্যসমূহ সংখ্যায় মুখ্য বা অপরিহার্য কর্তব্যসমূহের অপেক্ষা অনেক অধিক এবং এগুলিই দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আভ্যন্তরীণ অত্যাচার ও অবিচার এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নাগরিককে রক্ষা করিলেই সমাজজীবন পূর্ণ হইয়া উঠে না। সমাজজীবনের পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন সমাজকে সমগ্রভাবে গঠন ও পরিচালনা করা। এই গঠন ও পরিচালনার প্রয়োজনে আধুনিক রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে ; যথা—

গৌণ কর্তব্য

বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য

(১) রাষ্ট্র শিক্ষা-বিভাগের জন্য সচেষ্ট হইবে, যাহাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি শিক্ষিত হইতে পারে। (২) মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত রাষ্ট্রকে জনস্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইজন্যই প্রত্যেক রাষ্ট্রে সরকারী হাসপাতাল, প্রসূতিকেন্দ্র, শিশুমঙ্গলকেন্দ্র প্রভৃতি আছে এবং এই জাতীয় বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য পায়। (৩) আধুনিক রাষ্ট্র দরিদ্র ও শ্রমিকদের মঙ্গল সাধনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। (৪) ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রভৃতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। (৫) ইহা ব্যতীত রাষ্ট্র ডাকবিভাগ, পূর্তবিভাগ, যানবাহন বিভাগ প্রভৃতি পরিচালনা করে। যুদ্ধকালে রাষ্ট্র অন্যান্য অনেক বিষয়ের কর্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করে।

বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা সমগ্র সমাজজীবন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উপরোক্ত সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী দ্বারা আধুনিক রাষ্ট্র সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করে। সমাজের কল্যাণই আধুনিক গণতান্ত্রিক

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

রাষ্ট্রসমূহের আদর্শ। এইজন্য এই সকল রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র (Social Welfare State) বলা হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. "Not command but service is the prominent characteristic of the State." Discuss in the light of this statement the functions of the State. (C. U., 1944). (৫৫-৫৯ পৃষ্ঠা দেখ)

2. What should, in your opinion, be the functions of a modern State? (C. U., 1951). (৫৫-৫৯ পৃষ্ঠা দেখ)

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিকতা

পৌরবিজ্ঞান নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করে। মানুষের নাগরিক জীবনের তিনটি দিক আছে—সে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য, সে রাষ্ট্রের সভ্য এবং সে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সভ্য। এই তিনটি দিক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে নাগরিক ও নাগরিকতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন।

নাগরিকের সংজ্ঞা (Definition of Citizen) :

আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীর অধিবাসী থাকে; যথা,—নাগরিক, প্রজা ও বিদেশী। নাগরিক হইল তাহারা যাহাদের আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি এবং যাহারা পূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে। প্রজারাও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, কিন্তু কোন না কোন গুণের অভাবে বা দোষের ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। বিদেশীর আনুগত্য কোন বহিঃরাষ্ট্রের প্রতি। সে এই রাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। তাহাকে সাধারণতঃ পূর্ণ সামাজিক অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগই নাগরিককে বিদেশী ও প্রজা হইতে পৃথক করে।

পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ নাগরিকের বৈশিষ্ট্য

নাগরিক সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। অ্যারিস্টটলের মতে,

যাহারা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিত কেবলমাত্র তাহারাই নাগরিকের মর্যাদা পাইত।) আধুনিক কালে বিশাল ভূখণ্ড ও বিপুল জনসমষ্টি সমন্বিত রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা অচল। সুতরাং পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগই নাগরিকের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকার কিন্তু কর্তব্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সুতরাং নাগরিক কেবল অধিকার ভোগ করিবে না, তাহাকে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনও করিতে হইবে। আনুগত্য হইল নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য। আনুগত্য ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে রাষ্ট্রের সেবা করা ও রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থ নিজেকে নিয়োজিত করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের রচনায় নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্বের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়।

নাগরিক কেবল অধিকার ভোগ করে না, কর্তব্যও পালন করে

কর্তব্য পালন করিতে হইলে, রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধন করিতে হইলে নাগরিককে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত হইতে হইবে। উপযুক্ত বা জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের প্রচেষ্টাকেই নাগরিকতা বলা যায়। (ল্যাস্কির ভাষায়, নাগরিকতা হইল সমাজের কল্যাণে আমাদের জ্ঞানসম্পন্ন বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ। সুতরাং, পূর্ণ অর্থে নাগরিক তাহাকেই বলা যায় যে রাষ্ট্রের সভ্য, যাহার বিচারবুদ্ধি অজ্ঞানতাপ্রসূত নহে এবং যে এই বিচারবুদ্ধিকে সাধারণের কল্যাণে সর্বদাই নিয়োজিত করে।)

নাগরিকতার সংজ্ঞা

বিদেশীর মর্যাদা (Status of Aliens):

এমন এক সময় ছিল যখন বিদেশীরা সামাজিক অধিকারও ভোগ করিতে পারিত না। অনেক রাষ্ট্রে বিদেশীরা স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত না। তাহাদের মৃত্যুর পর অধিকাংশ রাষ্ট্র তাহাদের সম্পত্তি অধিকার করিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ইহা না হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাহত হইত। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তির সাহায্যে বিদেশীদের অধিকার রক্ষা করা হইত। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত মানুষে মানুষে এইরূপ বিভেদমূলক আচরণ ন্যায় বিচারের নীতিতে পরিত্যক্ত হইল। ক্রমশঃ বিদেশী এবং নাগরিকের মধ্যে অধিকার-ভেদ হ্রাস পাইতে লাগিল। আধুনিক কালে বিদেশীরা রাষ্ট্রের

বিদেশীর অবস্থার পরিবর্তন

প্রত্যেকটি সামাজিক অধিকার (Civil Right) ভোগ করিতে পারে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political Right) হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। ফলে এখন বিদেশীর মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিদেশীর মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে

নাগরিক হইবার বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of Acquisition of Citizenship):

নাগরিক দুই শ্রেণীর হয়। প্রথম শ্রেণীর নাগরিককে বলা হয় জন্মসূত্রে নাগরিক (Natural-born); অর্থাৎ এই শ্রেণীর নাগরিকগণ জন্ম দ্বারা নাগরিক অধিকার পায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিককে বলা হয় গৃহীত বা অনুমোদনসিদ্ধ (Naturalized) নাগরিক; এই শ্রেণীর নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের সাহায্যে নাগরিক হিসাবে গৃহীত হয়।

জন্মসূত্রে ও গৃহীত নাগরিক

১। জন্মসূত্রে নাগরিক অধিকার প্রাপ্তি (Acquisition of Citizenship by Birth):

জন্ম দ্বারা নাগরিক অধিকার পাইবার দুইটি মূল নীতি আছে—(১) জন্ম নীতি (*Jus Sanguinis*); (২) জন্মস্থান নীতি (*Jus Soli* বা *Jus Loci*)। জন্ম নীতি অনুসারে শিশুর পিতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক শিশুও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে। শিশু অন্য রাষ্ট্রে জন্ম গ্রহণ করিলেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। একজন ব্রিটিশ নাগরিকের পুত্র আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিলেও সে ব্রিটিশ নাগরিক বলিয়াই গণ্য হইবে। জন্মস্থান নীতি অনুসারে জন্মস্থানই নাগরিকতা নির্ধারণ করিবে। এই নীতি অনুসারে, কোনও ব্রিটিশ নাগরিকের পুত্র যদি জাপানে জন্মগ্রহণ করে তবে সে জাপানের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। মোট কথা, রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেই সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার অধিকার পাওয়া যাইবে। রাষ্ট্রের পতাকা সমন্বিত জাহাজ রাষ্ট্রের অংশ রূপে গণ্য হয়। অর্থাৎ জন্মস্থান নীতি অনুসারে যদি কোনও আমেরিকান পিতামাতার সন্তান ব্রিটিশ জাহাজে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সেই শিশু ব্রিটিশ নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। জন্মস্থান নীতি পররাষ্ট্রদূতের সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা প্রাপ্তির দুইটি মূল নীতি—জন্ম নীতি এবং জন্মস্থান নীতি

জন্মনীতি এবং জন্মস্থান নীতির গুণাগুণ :

উক্ত দুই নীতির কোনটিই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় নয়। বিজ্ঞান ও যুক্তির দিক দিয়া দেখিলে জন্মনীতিই উভয়ের মধ্যে সমর্থনযোগ্য। পুত্র যে পিতার রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে ইহাই ত স্বাভাবিক। এই নীতির ত্রুটি হইল এই যে, অনেক ক্ষেত্রে পিতৃত্ব বা পিতার জাতিত্ব প্রমাণ করা কঠিন। এইরূপ ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণে অনেক অসুবিধা আছে; সুতরাং সেইস্থানে জন্মস্থান নীতিই গ্রহণীয়।

দুইটি নীতির কোনটিই সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণীয় নয়

এই নীতি অনুসারে নাগরিকতা অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই জন্ম-তালিকা রক্ষা করা হয়; সুতরাং কাহারও জন্মস্থান গোপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু জন্মস্থান নীতি অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক। জন্মস্থান অনেক ক্ষেত্রেই আকস্মিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক ব্রিটিশ দম্পতি জাপানে ভ্রমণোদ্দেশ্যে যাইতে পারে। তাহারা হয়ত নানা কারণে সে-স্থানে কিছুদিন বাস করিতে বাধ্য হইল এবং সেখানে তাহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। এই ক্ষেত্রে শিশুটি জাপানী নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কল্পনা করা যাইতে পারে যে জনৈক ব্রিটিশ দম্পতি পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে। তাহাদের জাপানে প্রথম, জার্মানীতে দ্বিতীয়, রাশিয়াতে তৃতীয়, পোল্যাণ্ডে চতুর্থ এবং আমেরিকায় পঞ্চম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। জন্মস্থান নীতি অনুসারে এই ব্রিটিশ দম্পতির পাঁচটি সন্তান পাঁচটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে। এইরূপ অবস্থা কল্পনাতীত এবং অবাস্তব।

উভয়ের মধ্যে জন্ম নীতিই সমর্থনযোগ্য

প্রাচীন কালে জন্মনীতিই সাধারণতঃ অনুসৃত হইত। আধুনিক কালে পৃথিবীর সর্বত্র কোনও নীতিই সমভাবে অনুসৃত হয় না। যদি বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র একই নীতি গ্রহণ করিত তাহা হইলে এত জটিলতার সৃষ্টি হইত না। কতকগুলি রাষ্ট্র জন্মনীতি গ্রহণ করিয়াছে; সেই সকল রাষ্ট্রের নাগরিকদের সন্তান অন্য রাষ্ট্রে ভূমিষ্ঠ হইলেও তাহাদিগকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। আবার অনেক রাষ্ট্র জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করে; যদি সেই সকল রাষ্ট্রে কোন বিদেশী ব্যক্তির সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে তাহাকে নাগরিক অধিকার প্রদান করা হয়। আবার অনেক রাষ্ট্র একসঙ্গে উভয় নীতিই অনুসরণ করে। ইটালী, জার্মানী, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডে প্রথম নীতি অনুসৃত হয়। আর্জেণ্টাইনা

এবং আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে দ্বিতীয় নীতি অনুসৃত হয়। ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকা উভয় নীতিই অনুসরণ করে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নীতি প্রচলিত থাকায় দ্বি-জাতি সমস্যার (Double Nationality) উদ্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জনৈক ব্রিটিশ নাগরিকের ফরাসী দেশে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। জন্মনীতি অনুসারে সে গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিক; জন্মস্থান নীতি অনুসারে সে ফরাসী দেশের নাগরিক।

দ্বি-জাতি সমস্যা

শান্তির সময়ে এ সমস্যা লইয়া বিশেষ বিরোধের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যুদ্ধকালে এই সমস্যা জটিলতা এবং বিরোধের সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উক্ত ব্যক্তি কোন্ দেশের সৈন্যদলে যোগ দিবে? সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ রাষ্ট্রই নাগরিক প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাহার কার্যে হস্তক্ষেপ করে না। যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তাহাকে যে-কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা বাছিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া হয়।

২। গৃহীত বা অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by Naturalisation):

অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করিতে হইলে সেই রাষ্ট্রের আইনানুমোদিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নাগরিক হিসাবে গৃহীত হইতে হয়। নানাবিধ কারণে ও উপায়ে এইরূপ নাগরিকতা লাভ করা সম্ভব; যেমন, বৈধতা (Legitimisation), বিবাহ, সামরিক বাহিনীতে যোগদান, স্থায়ী সম্পত্তি খরিদ করা, সরকারী চাকুরীতে যোগদান, ইত্যাদি। এই সকল উপায়ের যে-কোনটির সাহায্যে বিদেশী ব্যক্তি নাগরিক অধিকার পাইতে পারে। এইরূপ বিদেশীকে ব্যাপক অর্থে 'গৃহীত নাগরিক' বা 'অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক' বলা যায়।

গৃহীত নাগরিক হইবার বিভিন্ন পদ্ধতি

ব্যাপক অর্থে গৃহীত নাগরিক

সংকীর্ণ অর্থে, 'গৃহীত নাগরিক' বলিতে আমরা বুঝি সেই বৈদেশিককে—যে কতকগুলি আইনসঙ্গত সর্ত পূরণ করিয়া কোন আদালত বা শাসনবিভাগীয় কর্মচারীর নির্দেশে নাগরিকতা লাভ করিয়াছে; অর্থাৎ বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া গিয়া যে নাগরিকতা লাভ করে, তাহাকেই গৃহীত বা অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলা হয়।

সংকীর্ণ অর্থে গৃহীত নাগরিক

নাগরিকতা লাভের এই অনুষ্ঠানকে কয়েক অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, বৈদেশিককে নাগরিকতা লাভের জন্য আবেদন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আবেদন করিবার পূর্বে তাহাকে কতকগুলি সর্ত পূরণ করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন সর্ত প্রচলিত আছে।

নাগরিক হিসাবে গৃহীত হইতে হইলে বিদেশীকে কয়েকটি সর্ত পালন করিতে হয়

রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি প্রধান সর্ত। প্রত্যেক রাষ্ট্রই বসবাস করিবার সর্তে যথেষ্ট জোর দেয়, যদিও বসবাস করিবার মেয়াদ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে বসবাস করিবার মেয়াদ পাঁচ বৎসর। গ্রেট ব্রিটেনে এই বসবাসের সর্ত পালনের প্রয়োজন হয় না, যদি বিদেশী ব্যক্তি পাঁচ বৎসর রাজার অধীনে কার্য করে। বিদেশী ব্যক্তি যদি জাপানী স্ত্রী গ্রহণ করে তবে জাপানে বসবাসের সর্ত পালনের প্রয়োজন হয় না। আবার আমেরিকায় বিদেশী ব্যক্তি যদি আমেরিকার সৈন্য-বাহিনীতে কার্য করিয়া থাকে তবে তাহার বসবাসের মেয়াদ এক বৎসর হইলেই তাহাকে নাগরিক অধিকার প্রদান করা হয়। অনেক রাষ্ট্রে বসবাসের মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত ধরা হয়।

বসবাসের সর্ত

মেয়াদ অনুযায়ী বসবাসই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়; সারাজীবন বসবাস করিবার ইচ্ছাও আবেদনকারীকে প্রমাণ করিতে হয়। সারাজীবন বসবাস করিবার ইচ্ছা প্রমাণ করিলে তবে সে রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা রূপে পরিগণিত হয়। অধিকাংশ রাষ্ট্র সাধারণতঃ স্থায়ী বাসিন্দাকেই নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করে।

বসবাস ও স্থায়ী ভাবে বসবাসের ইচ্ছা

গৃহীত নাগরিকের রাষ্ট্রীয় অধিকার পূর্ণ বা আংশিক হইতে পারে। কোন কোন রাষ্ট্রে জন্ম নাগরিক এবং গৃহীত নাগরিকের মধ্যে কোনও প্রকার পার্থক্য করা হয় না। ইহাকে অনেক সময় Grand Naturalisation বা পূর্ণ নাগরিকতা বলা হয়। সাধারণতঃ খুব কঠোর আইন এবং নিয়মের অধীনে এই অধিকার প্রদান করা হয়। ইংলণ্ডে এইরূপ অধিকার প্রদান করা হয়। আবার কোন কোন রাষ্ট্রে গৃহীত নাগরিককে জন্ম নাগরিকের সমান অধিকার দেওয়া হয় না। ইহাকে Partial Naturalisation অর্থাৎ আংশিক নাগরিকতা বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কতকগুলি উচ্চ পদ হইতে গৃহীত নাগরিকদিগকে বঞ্চিত

পূর্ণ বা আংশিক ভাবে গৃহীত নাগরিক

করা হয়, যদিও অন্যান্য পদে তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার কোনও বাধা থাকে না। আমেরিকায় এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কোন গৃহীত নাগরিক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি অথবা সহ-সভাপতির পদে আসীন হইতে পারে না।

নাগরিকতা প্রাপ্তির পথে বাধা (Restrictions on Acquisition of Citizenship):

আমেরিকা, ক্যানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় বিদেশী ব্যক্তিদের প্রবেশ এবং বসবাস সম্পর্কে বহু বিধি-নিষেধ আছে। ইহার কারণ এই যে বৈদেশিকগণের সামাজিক রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি ঐ সকল দেশের স্বার্থ ও সংস্কৃতির পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। অবাঞ্ছনীয় জাতির সহিত স্থানীয় লোকের মিশ্রণ বন্ধ করিবার জন্য ঐ সকল দেশে কোন কোন জাতির—বিশেষতঃ এশিয়া-বাসীদের—বসবাস নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ নীতির কুফল হইল আন্তর্জাতিক বিরোধ এবং জাতিগত বিদ্বেষের বৃদ্ধি। জাপানের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার ফলে যখন জাপানীরা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন তাহারা দেখিল যে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রেরই দ্বার তাহাদের নিকট রুদ্ধ। ইহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া অনেকে অভিমত পোষণ করেন।

নাগরিকতার বিলোপ (Loss of Citizenship):

নানাকারণে নাগরিক তাহার নিজের রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারাইতে পারে। অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণের ফলে নাগরিক নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারায়, কারণ একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায় না। বিবাহের ফলে স্ত্রী স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার পায় কিন্তু নিজের রাষ্ট্রের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হয়। অনেক রাষ্ট্রে আইন আছে যে, যদি কেহ পর রাষ্ট্রের অধীনে কার্য গ্রহণ করে তবে সে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হইবে। অনেক রাষ্ট্রে এত কঠোর আইন আছে যে, কোন ব্যক্তি অন্য রাষ্ট্রের প্রদত্ত কোন উপাধি বা সম্মান গ্রহণ করিলেই তাহাকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে কোন নাগরিকের পক্ষে বহিঃরাষ্ট্রের প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিলে, অথবা

একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায় না

বিবাহের ফলে স্ত্রীলোকের নাগরিকতার পরিবর্তন হইতে পারে

বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, অনেক রাষ্ট্রে তাহার নাগরিক অধিকার খর্ব করা হয়। অনেক রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিলে তাহাকে নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করা হয়। সৈন্যদল হইতে পলায়ন, বহিঃরাষ্ট্রের উপাধি গ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা প্রকৃতই নাগরিকতার বিনাশ হয়; কিন্তু বিবাহ, আনুগত্যের পরিবর্তন বা অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ প্রভৃতি দ্বারা নাগরিকতার পরিবর্তন হয় মাত্র। পূর্বে নাগরিকগণকে আনুগত্যের পরিবর্তন করিয়া ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে দেওয়া হইত না; বর্তমানে কিন্তু অপরিবর্তনীয় আনুগত্যের নীতি অচল বলিয়া অধিকাংশ দেশই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ফলে নাগরিক গ্রহণের রীতি প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বর্তমান আছে।

পররাষ্ট্রের অধীনে কর্মগ্রহণ, সৈন্যদল হইতে পলায়ন, দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি প্রভৃতি নাগরিকতার বিনাশের কারণ হয়

প্রশ্নোত্তর

1. Define 'Citizenship.' (C .U., 1947). (৬০-৬১ পৃষ্ঠা দেখ)
2. How is citizenship acquired? (C. U., 1943). (৬২-৬৬ পৃষ্ঠা দেখ)

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

নাগরিকতার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ফলে নাগরিক কতকগুলি সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে। এই অধিকারগুলি ভোগ করার জন্যই তাহাকে সমাজের মঙ্গলার্থ কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয়। সুতরাং নাগরিকতার আলোচনার পরেই নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

অধিকার (Rights) কাহাকে বলে?

প্রচলিত অর্থে মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য করিবার ক্ষমতাকে অধিকার বলা হয়। পশুরও এই অর্থে অধিকার আছে। ক্ষমতা পাশবিক শক্তির বলে লাভ করা যায়, আবার সামাজিক চেতনা হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে।

পাশবিক শক্তির বলে উদ্ভূত যে ক্ষমতা বা অন্যায় দাবী তাহাকে সাধারণ ভাষায় অধিকার বলিয়াই বর্ণনা করিলেও, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহাকে অধিকারের মর্যাদা দেয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকার সকল সময় সুষ্ঠু সমাজ-জীবনের অনুকূল হইবে। এক সময় আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা আইনের দ্বারা সমর্থিত ছিল; অর্থাৎ মানুষকে ক্রীতদাস রূপে বন্দী রাখার দাবী ঐ দেশের আইন সমর্থন করিয়াছিল। আইনের সমর্থন পাইলেও মালিকদের ক্রীতদাস পোষণের দাবী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, কারণ এই প্রথা পাশবিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—সমাজবোধের উপর নহে।

প্রচলিত অর্থে অধিকার

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণায় অধিকার

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতেই অধিকার বোধের উৎপত্তি। যে মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে কোন সামাজিক সংগঠন নাই সেখানে অধিকারও থাকিতে পারে না। সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল মানুষকে তাহার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধিতে সহায়তা করা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সমাজের বাহিরে ব্যক্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়; সমাজের সুযোগ ও সুবিধার ভিতর দিয়াই ব্যক্তি আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে। এই সকল সুযোগ ও সুবিধাই হইল অধিকার। অধ্যাপক ল্যাস্কির কথায়, অধিকার হইল সমাজ-জীবনের সেই সকল অবস্থা যাহা ব্যতীত মানুষ তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। রাষ্ট্র হইল শ্রেষ্ঠতম সামাজিক সংগঠন। নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। এই আনুগত্যের পরিবর্তে রাষ্ট্রের কর্তব্য সুষ্ঠু জীবন-যাপনোপযোগী কতকগুলি অধিকার দেওয়া। যে রাষ্ট্র অধিকার দিতে অসম্মত হয়, সে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কোন আনুগত্য নাই। ইংরাজ দার্শনিক গ্রীন বলিয়াছেন যে অধিকার ক্ষমতা মাত্র, কিন্তু সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থই এই ক্ষমতার দাবী করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই এই ক্ষমতাকে অনুমোদন করা হয়। অতএব, দেখা গেল, মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য এবং সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলি মৌলিক সুযোগকেই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের নীতি অনুসারে অধিকার বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতেই অধিকারবোধের উৎপত্তি

আত্মোপলব্ধির জন্য সামাজিক সুযোগ ও সুবিধাকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে অধিকার বলা হয়

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rights) :

অধিকারগুলিকে প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—নৈতিক অধিকার এবং আইনসঙ্গত বা আইনানুমোদিত অধিকার। নৈতিক অধিকারের ভিত্তি হইল মানুষের ন্যায়বুদ্ধি এবং বিবেক। আইনসঙ্গত অধিকারের ভিত্তি হইল আইনের অনুমোদন, অর্থাৎ এই অধিকারের পশ্চাতে আইনের শক্তি থাকে। সকলেরই অপরের নিকট হইতে সৎ ব্যবহার পাইবার অধিকার আছে, সত্য কথা শুনিবার অধিকার আছে,—কিন্তু এই সকল অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে রাষ্ট্র তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারে না, কারণ এইগুলি নৈতিক অধিকার মাত্র। কিন্তু আইনসঙ্গত অধিকার যাহারা ভঙ্গ করে, তাহাদের জন্য রাষ্ট্র শাসন এবং শাস্তির ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কেবলমাত্র আইনসঙ্গত অধিকার লইয়াই বিশদ আলোচনা করা হয়।

নৈতিক এবং আইনসঙ্গত অধিকার (Moral & Legal Rights)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আইনসঙ্গত অধিকার লইয়াই আলোচনা করে

আইনসঙ্গত বা আইনানুমোদিত অধিকারগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়,—সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক। যে-সকল অধিকার ব্যতীত মানুষ সভ্য জীবন যাপন করিতে পারে না, তাহাই সামাজিক অধিকার (Civil Rights)। সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার, পারিবারিক জীবন যাপনের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সর্বদা জীবনহানি অথবা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকিলে সভ্য জীবন যাপন অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার, যে সকল অধিকার ব্যতীত মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করিতে এবং সামাজিক কল্যাণসাধনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাও সামাজিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে ; যথা, স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, ইত্যাদি।

আইনসঙ্গত অধিকার দুই প্রকারের, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক

সামাজিক অধিকার

রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনায় নাগরিকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়। রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই মানুষ এই অধিকার

পায়। ভোট দিবার অধিকার, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হওয়ার অধিকার, রাষ্ট্রের কর্মচারী হইবার অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ব্যক্তিকে তাহার সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে বৃহৎ মানব-সমাজে লইয়া আসে। মানুষ তাহার পরিবার লইয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহার সম্মুখে রাষ্ট্র ও বৃহৎ মানব-সমাজ রহিয়াছে। রাষ্ট্রের বৃহৎ জীবনে অংশ গ্রহণ করিয়া মানুষ তাহার সংকীর্ণ জীবন হইতে মুক্তিলাভ করে। জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হইবার ফলে দৃষ্টিশক্তির প্রসার বৃদ্ধি হয়। ইহাই রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের প্রকৃত মূল্য ও সার্থকতা।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার

সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ (Relations between Civil and Political Rights) :

সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করা হইলেও, পার্থক্যের সীমারেখা অতি অস্পষ্ট। অনেক সামাজিক অধিকার আছে যাহা রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে, আবার অনেক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার আছে যেগুলি সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। মিলিত হইবার অধিকার (Right of Association) এবং বাক্-স্বাধীনতা (Freedom of Speech) উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। এই দুইটি অধিকার সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক—উভয় প্রকার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। সামাজিক অধিকার ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার মূল্যহীন ; অপরদিকে আবার সামাজিক অধিকার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সাহায্যেই বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। সম্পত্তি ভোগ করিবার অব্যাহত অধিকার একটি সামাজিক অধিকার, কিন্তু এই অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে যদি ব্যবস্থা পরিষদে এই অধিকারের বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার না থাকে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকারকে সংরক্ষণ করে। আবার যদি জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য দুর্বৃত্তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয় তবে ভোট দিবার অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া আছে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল

কর্তব্য (Duties) কাহাকে বলে ?

অধিকারের সহিত কর্তব্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কর্তব্যকে একপ্রকার দায়িত্ব বলা যায়—কোন কিছু করা বা না করার দায়িত্ব,—যেমন রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন করা এবং রাষ্ট্রের আইন অমান্য না করা। নাগরিকদের এই দায়িত্বজ্ঞান আধুনিক কালে ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে।

আইনসঙ্গত এবং নৈতিক কর্তব্য (Legal & Moral Duties)

কর্তব্য দুই প্রকার,—আইনসঙ্গত এবং নৈতিক। যে কর্তব্য নীতি-বোধ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা নৈতিক কর্তব্য,—যেমন, দরিদ্রকে সাহায্য করা। রাষ্ট্রের আইনের সাহায্যে প্রণোদিত কর্তব্য আইনসঙ্গত কর্তব্য,—যেমন, রাষ্ট্রকে কর প্রদান করা। এই কর্তব্য অমান্য করিলে শাস্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে।

অধিকার এবং কর্তব্য (Rights and Duties) :

অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত আছে—ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সুপ্রচলিত উক্তি। অধিকার ও কর্তব্য যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতে কর্তব্যবোধ ও অধিকারবোধ—উভয়েরই জন্ম। সামাজিক মানুষ পরস্পরের উপর কতকগুলি দাবী করে। এই দাবীগুলিই হইল অধিকার ও কর্তব্যের ভিত্তি। একটি সহজ উদাহরণ লইয়া অধিকার ও কর্তব্যের পরস্পর নির্ভরশীলতা বুঝান যাইতে পারে : পথ দিয়া ধাক্কা না খাইয়া চলিবার অধিকার আমি পাইতে চাই ; এইজন্যই আমি দাবী করি যে অপরে আমার চলার সময় প্রয়োজনীয় পথ ছাড়িয়া দিবে। সুতরাং আমাকে চলিবার মত পথ ছাড়িয়া দেওয়া অপরের কর্তব্য। অপরে এই কর্তব্য পালন না করিলে আমার পথ চলার অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আবার অপরেও তাহাদের পথ চলার অধিকারের জন্য আমার নিকট প্রয়োজনমত পথ ছাড়িয়া দিবার দাবী করিবে।

অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল

সমাজবদ্ধ মানুষের পরস্পরের উপর দাবীই অধিকার ও কর্তব্যের ভিত্তি

নাগরিকের উপর রাষ্ট্রের কতকগুলি অধিকার আছে ; যেমন—নাগরিকের

ধনসম্পত্তি—এমন কি জীবনের উপরও রাষ্ট্রের অধিকার আছে। এই অধিকারগুলি আছে বলিয়া রাষ্ট্রকে কতকগুলি কর্তব্যও পালন করিতে হয়। নাগরিককে কতকগুলি অধিকার দেওয়া রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। অধিকার দেওয়াই যথেষ্ট নয়; এই অধিকারগুলি রক্ষা করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

নাগরিকের উপর রাষ্ট্রের অধিকার আছে বলিয়াই তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয়

অধিকার ব্যবহার করিতে হইবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য। ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধন বলিতে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ বুঝায়—নিছক ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগ বুঝায় না। ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগ বা খেয়াল চরিতার্থতার জন্য অধিকারের উৎপত্তি হয় নাই। ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনের চেষ্টা এইরূপভাবে করিতে হইবে যাহাতে সমাজের কোন ক্ষতি না হয়। অপরকে বঞ্চনা করিয়া অর্থোপার্জনে ব্যক্তিগত লাভ হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে সমাজের ক্ষতি হয়। মদ্য বিক্রয় করিয়া লাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে সমাজের ক্ষতি হয়। যদি দুগ্ধ বিক্রয়ে অর্থোপার্জন করা যায় তবে তাহাতে ব্যক্তিগত লাভের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও কল্যাণ হয়। নাগরিকের ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজের যেন কোন ক্ষতি না হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। অধিকারের ভিত্তিই হইল নৈতিক চেতনা ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্য বোধ। সুতরাং প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত সেই অধিকারের সাহায্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গল বৃদ্ধি করিবার দায়িত্ব সংযুক্ত আছে।

অধিকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করিবার জন্য ব্যবহার্য

দেখা যাইতেছে যে কর্তব্য ও অধিকার পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কর্তব্যবিহীন অধিকার বা অধিকারবিহীন কর্তব্যের কথা আমরা চিন্তাই করিতে পারি না। রাষ্ট্র আমাদের সকল অধিকারের উৎস; সুতরাং আমাদের কর্তব্য রাষ্ট্রকে সযত্নে রক্ষা করা। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আমাদের উপর রাষ্ট্রের বিভিন্ন অধিকার আছে এবং অধিকার থাকার জন্য আমাদের প্রতি রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্তব্যও রহিয়াছে। আমাদিগকে অধিকার না দিলে বা আমাদের প্রতি কর্তব্য পালন না করিলে রাষ্ট্রের আমাদের উপর কোন অধিকার থাকিবে না, আমাদেরও রাষ্ট্রের প্রতি কোন কর্তব্য থাকিবে না।

বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অধিকার (Different Kinds of Civil Rights) ঃ

প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নলিখিত সামাজিক অধিকারগুলি থাকা উচিত, কারণ এগুলি হইল মানুষের মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকার তাহাকেই বলে যাহা ব্যতিরেকে মানুষের সমাজ-জীবন অর্থহীন হইয়া পড়ে।

মৌলিক অধিকার

১। **জীবনের অধিকার ঃ** ইহা অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার। জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিতে হইলে সর্বাগ্রে জীবনধারণের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বৈদেশিক আক্রমণ রোধ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। আবার প্রত্যেক নাগরিকের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। যুক্তিসঙ্গত কারণে, আত্মরক্ষার জন্য, কাহাকেও হত্যা করা হইলে তাহা অপরাধ নয়।

প্রত্যেকের জীবনের অধিকার বা জীবনধারণের অধিকার যখন আছে, তখন কাহারও নিজের জীবন নষ্ট করার অধিকার নাই। জীবন রক্ষা করাই প্রত্যেকের কর্তব্য। অনেকে এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক মানুষের আত্মহত্যার অধিকার আছে ; মানুষ যখন নিজেই নিজের জীবনের কর্তা, তখন সেই জীবনের রক্ষা বা বিনাশ সম্বন্ধে সে নিজেই চূড়ান্ত বিচারক। কিন্তু ইহারা ভুলিয়া যান যে আত্মহত্যা করা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ, কারণ আত্মহত্যা অর্থ এমন এক ব্যক্তির বিনাশ যাহার রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য আছে। এই কারণেই আত্মহত্যা অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়।

আত্মহত্যার অধিকার

২। **গতিবিধির স্বাধীনতা ঃ** জীবনধারণই যথেষ্ট নয়, ধারণোপযোগী জীবনও হওয়া প্রয়োজন। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে বাঁচিয়া থাকাই চরম কাম্য বস্তু নয়, বাঁচার মত বাঁচিতে হইবে। এই বাঁচার মত বাঁচার জন্য গতিবিধির স্বাধীনতা প্রয়োজন। মানুষের গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকিলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে গতিবিধির পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত এবং কাহাকেও যাহাতে অন্যায়ভাবে আটক অথবা

ধারণোপযোগী জীবনের জন্য গতিবিধির স্বাধীনতার প্রয়োজন

বন্দী না করা হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। গতিবিধির পূর্ণ স্বাধীনতা হইল অন্যতম ব্যক্তিস্বাধীনতা (Civil Liberty)। এই ব্যক্তিস্বাধীনতা না থাকিলে মানুষ ক্রীতদাসের পর্যায়ভুক্ত হয়। বিনা বিচারে আটকের অর্থ এইরূপ ব্যক্তিস্বাধীনতার বিনাশ। যুদ্ধের সময়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিনাশ হয়ত সমর্থন করা যাইতে পারে, শান্তির সময়ে তাহাকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

৩। **সম্পত্তির অধিকার ঃ** সম্পত্তির অধিকার বলিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের ও আইনসঙ্গত উপায়ে সম্পত্তি অর্জনের অধিকার বুঝায়। সম্পত্তি অর্জনের ও ভোগের অধিকার প্রধান সামাজিক অধিকারগুলির অন্যতম। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং সমাজের কল্যাণের জন্য সম্পত্তি নিয়োজিত করা সম্পত্তি অর্জনের ও ভোগের অধিকার ব্যতীত সম্ভব নহে। এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, (ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজবন্ধনের অন্যতম মূল গ্রন্থি।) ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনাশ করিলে সমাজবন্ধনের গ্রন্থি শিথিল করিয়া দেওয়া হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু আইনসঙ্গত উপায়ে স্বোপার্জিত সম্পত্তি ভোগের অধিকার অন্যায় বা অযৌক্তিক নহে। এই প্রকার সম্পত্তির অধিকারের পশ্চাতে নৈতিক সমর্থন আছে।

সমাজের স্থায়িত্বের জন্য সম্পত্তির অধিকার প্রয়োজনীয়

স্বোপার্জিত সম্পত্তি ভোগের অধিকারও অব্যাহত অধিকার নয়। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য এই অধিকার অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত এবং সঙ্কুচিত করিতে হয়। শান্তির সময়েও রাষ্ট্রের আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি এক ব্যক্তির সঞ্চয়ের ফলে অন্যের অভাব ঘটে তবে সেই ক্ষেত্রে সম্পত্তি অর্জন এবং ভোগ করিবার অবাধ অধিকারের পক্ষে কোন প্রকার নৈতিক যুক্তি থাকে না।

সম্পত্তির অধিকারকে জনস্বার্থের অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে

৪। **চুক্তি করিবার অধিকার ঃ** সম্পত্তির অধিকার হইতেই চুক্তি করিবার অধিকার আসিয়া পড়ে। যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তির নির্দেশে পরিচালিত হয়, সেখানে চুক্তির অধিকার না থাকিলে চলে না। এইজন্যই এরূপ সমাজে চুক্তির স্বাধীনতা এবং মর্যাদা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই অধিকার ব্যতীত অর্থনৈতিক এবং

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় চুক্তির অধিকার অপরিহার্য

সামাজিক জীবন চলা অসম্ভব। কিন্তু এই অধিকারেরও সীমা আছে। যে চুক্তি বে-আইনী অথবা দুর্নীতিমূলক, যাহা রাষ্ট্রের বিরোধী অথবা রাষ্ট্রের আদর্শের সফলতার পরিপন্থী, তাহা কোনও ক্রমেই অনুমোদন করা যায় না। এইজন্য প্রত্যেক সুসভ্য রাষ্ট্রেই মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে চুক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নানাবিধ আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে।

চুক্তির অধিকারও অসীম নয়

৫। **মতপ্রকাশের স্বাধীনতা**ঃ মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বাক্-স্বাধীনতা ; (খ) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

(ক) বাক্-স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। মানুষ সামাজিক জীব। অন্যের সহিত ভাবের এবং চিন্তার আদান-প্রদান ব্যতীত সে বাস করিতে পারে না। ভাষা ভাবের বাহন। এই কারণে প্রত্যেক মানুষকে তাহার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাক্-স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত। মনের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা দুই প্রকারের—(ক) বাক্-স্বাধীনতা, (খ) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

বাক্-স্বাধীনতা না থাকিলে সরকারী ব্যবস্থা ও কার্যকলাপের সমালোচনা করা যায় না। সরকারী ব্যবস্থা ও কার্যকলাপের সমালোচনা না হইলে সরকার স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। সুতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষার জন্যই বাক্-স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক আদর্শের রক্ষক

বাক্-স্বাধীনতাও অবাধ হইতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই অধিকার প্রয়োগ করিতে হইবে। বাক্-স্বাধীনতা আছে বলিয়া মানহানিকর অথবা অপমানকর, দুর্নীতিপূর্ণ অথবা রাষ্ট্রদ্রোহিতা-মূলক কোনও কিছু বলিবার স্বাধীনতা কাহারও থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং সুনাম রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে বাক্-স্বাধীনতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

বাক্-স্বাধীনতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন

(খ) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা : মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় লিখিতভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। বাক্-স্বাধীনতার সহিত লিখিত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ পুস্তক, সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যে লিখিত মতামত প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংবাদপত্র প্রভৃতি মতামত সংগঠন ও প্রকাশ করিবার অন্যতম প্রধান

শক্তিশালী বাহন। সংবাদপত্র প্রভৃতির জন্য শাসকবর্গ জনমতের অনুকূলে রাষ্ট্র চালনা করিতে সচেষ্ট থাকেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকিলে রাষ্ট্রের আদর্শের বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য বাক্-স্বাধীনতার সীমার ন্যায় ইহারও একটা সীমা আছে। জনস্বার্থের অথবা রাষ্ট্রের মর্যাদার প্রতিকূল হইলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করিতে হয়।

জনস্বার্থের প্রতিকূল হইলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাও সংকুচিত করিতে হয়

৬। **সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার ঃ** মানুষ সামাজিক জীব। সঙ্গপ্রিয়তা তাহার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি ; প্রকৃতি বলেই সে সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চায়। মানুষের প্রকৃতি হইতে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের মধ্যে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ রূপায়িত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও মানুষের জীবনের আরও অনেক দিক আছে। এই সকল বিভিন্ন আদর্শের উপলব্ধির জন্য মানুষ নানা প্রকার সংঘ গঠন করে। বিভিন্ন আদর্শ যখন সে উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই জীবন পূর্ণ হয়। এইজন্যই আমরা নানা প্রকার ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি দেখিতে পাই। সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারে না। এইজন্য প্রত্যেক সুসভ্য রাষ্ট্রই সংঘবদ্ধ হইবার অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

জীবনের পূর্ণতার জন্য সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার প্রয়োজনীয়

৭। **পরিবার গঠনের অধিকার ঃ** সমাজ বন্ধনের অন্যতম মূল গ্রন্থি পরিবার। পরিবার গঠনের অধিকার না থাকিলে জীবনে সামাজিকতার আনন্দ থাকে না। পারিবারিক জীবনে এমন কতকগুলি আদর্শ ও ভাবের সৃষ্টি হয় যাহা সমাজের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। মানুষের পরিবার গঠনের অধিকার না থাকিলে সমাজ ঐ সকল আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িবে।

সমাজ-জীবনের জন্য পরিবার গঠনের অধিকার অপরিহার্য

৮। **আইনের চক্ষে সমানাধিকার ঃ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র অন্ততঃ রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের একটি দিক হইল আইনের চক্ষে সমানাধিকার। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদালত ধনী ও নির্ধনের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না। যদি করে, তবে সাম্য বিনষ্ট হয় এবং গণতন্ত্র ধনিকতন্ত্রে পরিণত হয়।

আইনের চক্ষে সমানাধিকার গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি

৯। ধর্মবিষয়ক অধিকার : ধর্মবিষয়ক অধিকার বলিতে বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা বুঝায়। এই স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রাচীন কালে শাসকবর্গ ধর্মের নামে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে চরম নিপীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যের জন্য বৃহৎ জনসমষ্টিকে বিনাশ করিবার উদাহরণও ইতিহাসে আছে। কিন্তু এখন মানুষ সভ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ধর্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ভারতের ন্যায় অধিকাংশ রাষ্ট্র আজ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

পূর্ণভাবে ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির জন্য ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতাও প্রয়োজনীয়

১০। সংস্কৃতি ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার : প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অল্পবিস্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় হইল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া। কিন্তু ইহা সকল সময় সম্ভব হয় না; সকল ক্ষেত্রে ইহা যুক্তিযুক্তও নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যেখানে দেওয়া যায় না সেখানে রাষ্ট্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার মানিয়া লয়।

এই অধিকার দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয়

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের সামাজিক অধিকারগুলির মধ্যে উপরোক্তগুলি প্রধান। ইহা ব্যতীত আরও বহু অধিকার আছে, যেমন—শিক্ষালাভের অধিকার, চিঠিপত্র গোপন রাখিবার অধিকার, গতিবিধির স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে।

অন্যান্য সামাজিক অধিকার

বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Different Kinds of Political Rights) :

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি প্রধান বা মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হয়।

১। বসবাস করিবার অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের যে কোনও অংশে বসবাস করিতে পারিবে, অবশ্য ইহাতে যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কোন হানি না হয়। প্রশ্ন হইতে পারে: এই অধিকার কেন রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নাগরিকেরা এমন

কতকগুলি অধিকার ভোগ করে যাহা হইতে বিদেশী ব্যক্তিদিগকে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রজাদিগকেও বঞ্চিত করা হয়। এই সমস্ত অধিকার হইল রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। বিদেশী ব্যক্তিরা সামাজিক অধিকার পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে। রাষ্ট্রে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিবার অধিকার আছে কেবল নাগরিক ও প্রজাদের।* সুতরাং বিদেশীর বসবাস অস্থায়ী, নাগরিকের বসবাস স্থায়ী। বিদেশীর বসবাস রাষ্ট্রের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে; নাগরিকের বসবাসের ভিত্তি হইল তাহার অধিকার। এই বসবাস করিবার অধিকারের ফলেই নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। যাহারা রাষ্ট্রের সভ্য নয় তাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া স্থায়ী বসবাসের উপর নির্ভর করে। এই কারণেই এই অধিকারকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়।

এই অধিকার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত কেন?

২। বিদেশে থাকাকালীন নিরাপত্তার অধিকার: প্রত্যেক নাগরিকই বিদেশে থাকাকালীন কোনরূপ অন্যায় অথবা অবিচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় সরকারের নিকট হইতে প্রতিকার না পাইলে নিজ রাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য পাইতে পারে। যদি কোনো ব্রিটিশ নাগরিকের আমেরিকায় বসবাস করিবার সময় তাহাকে আমেরিকার কোন নাগরিক বা আমেরিকার সরকার অন্যায় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং আমেরিকার রাষ্ট্র তাহাকে ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ না দেয়, তবে ব্রিটেন তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

৩। নির্বাচনাধিকার: নির্বাচনাধিকার বলিতে নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার উভয়ই বুঝায়।

(ক) নির্বাচন করিবার বা ভোট দিবার অধিকার: প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের বা সাধারণের শাসন। পূর্বে গণতন্ত্র বলিতে সাধারণের প্রত্যক্ষ শাসন বুঝাইত। এখন বিপুল জনসংখ্যাপূর্ণ বিশাল রাষ্ট্রে সাধারণের প্রত্যক্ষ শাসন সম্ভব নয়। বর্তমানে জনগণ তাহাদের ভোটাধিকার বলে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পরোক্ষভাবে শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই গণতন্ত্র

নির্বাচনাধিকার বলিতে নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার বুঝায়

* প্রজাদের আংশিকভাবে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার থাকে। বসবাস করিবার অধিকার হইল অন্যতম অধিকার যাহা হইতে প্রজারা বঞ্চিত নয়।

এখন প্রতিনিধিতন্ত্র। সাধারণের নির্বাচন করিবার অধিকার না থাকিলে শাসন-ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যায় না। বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক আদর্শ হইল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার দেওয়া।

সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

(খ) নির্বাচিত হইবার অধিকার: নির্বাচন করিবার অধিকারই যথেষ্ট নয়; গণতান্ত্রিক আদর্শকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে সকল নাগরিকের নির্বাচিত হইবার অধিকারও থাকা চাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যোগ্যতা থাকিলে (সাধারণতঃ বয়সকেই যোগ্যতার মাপকাঠি বলিয়া ধরা হয়) প্রত্যেক নাগরিককেই নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রদান করে।

৪। **সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার:** সরকারী চাকুরী করিয়াও নাগরিক শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এই কারণে প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। সরকারী পদে নিয়োগ ব্যাপারে এক যোগ্যতা ভিন্ন অন্য কোন কারণে নাগরিকগণের মধ্যে প্রভেদ করা উচিত নয়।

৫। **আবেদন করিবার অধিকার:** প্রত্যেক নাগরিকের শাসন কর্তৃপক্ষ ও ব্যবস্থাপক সভার নিকট আবেদন করিবার অধিকার আছে। আবেদন দ্বারা অভাব-অভিযোগ ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন বিভাগের গোচরীভূত করা এবং উহার প্রতিকার দাবী করা নাগরিকদের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। একক বা সমগ্রভাবে আবেদন পেশ করা যায়।

৬। **রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার অধিকার:** বাস্তবিকই রাষ্ট্রের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার অধিকার নাগরিকের আছে কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। আইনের দিক দিয়া বিচার করিলে এই অধিকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ প্রত্যেকেরই অধিকার বলবৎ করা হয় রাষ্ট্রের সাহায্যে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার প্রয়োগে রাষ্ট্রের সাহায্য প্রত্যাশা করা যায় না। এই স্বতঃবিরোধিতার জন্যই এই অধিকারকে অলীক ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই অধিকারকে আইনসঙ্গত অধিকার মনে না করিয়া নৈতিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করিলে আপত্তির কিছুই থাকে না। নীতির দিক দিয়া এই অধিকারকে যদি অধিকাংশ নাগরিক স্বীকার করিয়া লয় তবে শাসকবর্গ সহজে স্বৈরাচারী হইতে পারেন না।

ইহা রাষ্ট্রনৈতিক না নৈতিক অধিকার

অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) ঃ

প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ প্রধানতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এই দুইপ্রকার অধিকার লইয়া আলোচনা করিলেও বর্তমানে অর্থনৈতিক অধিকার বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার, যোগ্য ও যথেষ্ট মজুরী পাইবার অধিকার, বেকারত্ব হইতে মুক্তির অধিকার প্রভৃতি বুঝায়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে এগুলি ব্যতিরেকে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার মূল্যহীন। বস্তুতঃ, নাগরিক যদি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারে ; সর্বদা যদি তাহার বেকার হইবার ভয় থাকে—তবে সে বাক্-স্বাধীনতা বা ভোটাধিকার লইয়া কি করিবে ? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গণতান্ত্রিক আদর্শ উপলব্ধির জন্য নাগরিককে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার দেওয়া ও সংরক্ষণের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকার দিতে ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ (Duties of Citizens) ঃ

নাগরিকদের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, তেমনি তাহাদের কতকগুলি দায়িত্ব এবং কর্তব্যও আছে। বর্তমানে অধিকার ও কর্তব্যের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নাগরিকের কর্তব্যের মধ্যে কতকগুলি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, কতকগুলি আইনতঃ পালনীয়।

১। **আনুগত্য ঃ** আনুগত্য নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য। কর্তব্যের দিক দিয়া আনুগত্যই নাগরিককে বিদেশী হইতে পৃথক করে। আনুগত্যের অর্থ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত বা বশীভূত হইয়া থাকা। নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শের পরিপন্থী হইলে নাগরিকের পক্ষে এই কর্তব্য পালন করা সহজে সম্ভব হয় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রবিরোধী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কর্তব্যের দিক দিয়া আনুগত্যই নাগরিককে বিদেশী হইতে পৃথক করে

প্রকৃত বন্ধু যেমন আপদে-বিপদে বন্ধুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায় তেমনি অনুগত নাগরিকের কর্তব্য আপদে-বিপদে রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। এই কারণেই যুদ্ধ অথবা বৈদেশিক আক্রমণের সময় নাগরিকগণ সৈন্যবাহিনীতে

যোগদান করিয়া দেশকে রক্ষা করিবে; আবার রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সহিত সহযোগিতা করিয়া রাষ্ট্রের সুপরিচালনায় সাহায্য করিবে; আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সময় শান্তিস্থাপনে এবং অপরাধীদের শাস্তিপ্রদানে অংশ গ্রহণ করিয়া নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিবে।

২। **আইন মান্য করিয়া চলা**ঃ ইহা নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সমাজের মঙ্গলের জন্যই আইন প্রণয়ন করা হয়। সুতরাং সমাজহিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেরই আইন মান্য করিয়া চলা উচিত। আইনের সহিত যাহার স্বাভাবিক বিরোধিতা আছে সে ব্যক্তি সমাজ-বিরোধী, রাষ্ট্রের সভ্যপদের যোগ্য সে নয়।

নাগরিক নিজে আইন মান্য করিবে এবং দেখিবে যেন অপরে মান্য করে

নিজে আইন মান্য করিয়া চলাই যথেষ্ট নয়; অপরে যাহাতে আইন মান্য করিয়া চলে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অধিকাংশ লোক যদি আইন অমান্য করে, তবে মাত্র কয়েকজনের আইন মান্য করার ফলেই সমাজ-জীবন সুন্দর হইয়া উঠে না। সুতরাং নিজে আইন মান্য করার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে অপরেও যাহাতে ঐরূপ করে। অবশ্য আইন ন্যায়সঙ্গত না হইলে উহা মান্য করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক হইলেও নীতির দিক দিয়া বাধ্যতামূলক নহে। তখন ইহার প্রতিরোধ কল্পে জনমত গঠন করাই কর্তব্য।

অন্যায় আইন মান্য করা নীতির দিক দিয়া বাধ্যতা-মূলক নয়

৩। **কর প্রদান**ঃ প্রত্যেক নাগরিকের ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থ ব্যতীত রাষ্ট্রের কার্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকের ইহা বাধ্যতামূলক কর্তব্য যে সে তাহার উপর ধার্য সমুদয় কর নিয়মিত ভাবে প্রদান করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতা করিবে।

৪। **অন্যান্য কর্তব্য**ঃ এই তিনটি মূল কর্তব্য ব্যতীত রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আরও কর্তব্য আছে। নাগরিকগণের উপর কোনও দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার অর্পণ করা হইলে তাহা উপযুক্ত যত্ন এবং নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা কর্তব্য। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিলে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। যখন একজন বিশিষ্ট আইনজীবীকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে বলা হয়, তখন আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহার রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থ ঐ পদ গ্রহণ

করা উচিত। প্রবৃত্তি, আবেগ বা ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা পরিচালিত না হইয়া রাষ্ট্র ও সমাজের প্রচলিত রীতি মানিয়া চলা নাগরিকের কর্তব্য। শিশু সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা, সমাজের বৃহৎ স্বার্থের নিকট ব্যক্তি-স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে ত্যাগ করা ইত্যাদিও নাগরিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the rights and duties of a citizen in a modern State. (C. U., 1935, 1937, 1940, 1943, 1950). (৭৩-৮২ পৃষ্ঠা দেখ)

2. "Rights and duties are correlative." Explain and illustrate. (C. U., 1948). (৭১-৭২ পৃষ্ঠা দেখ)

3. What is meant by the term Rights? How far do you agree with the view that Rights and Duties are correlative. (C. U., 1952). (৬৭-৬৮, ৭১-৭২ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Distinguish between (*i*) Civil and political rights and (*ii*) Legal and moral rights, giving illustrations. (C. U., 1953). (৬৯-৭০ পৃষ্ঠা দেখ)

নবম অধ্যায়

সুনাগরিকতা

সার্থক, সুন্দর সমাজ-জীবনের জন্য প্রয়োজন সুনাগরিকের

সুন্দর সমাজ-জীবন সম্ভব করিবার জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব। সুনাগরিক না থাকিলে সমাজ-জীবন সুন্দর ও সার্থক হইতে পারে না, কেননা নাগরিকদের লইয়াই রাষ্ট্র। সুতরাং সার্থক রাষ্ট্র এবং সুন্দর সমাজের জন্য প্রয়োজন সুনাগরিকের।

সুনাগরিকের গুণাবলী (Qualities of a Good Citizen):

নাগরিক কিসে সু বা আদর্শ নাগরিক হয়? লর্ড ব্রাইসের মতে সেই নাগরিকই সুনাগরিক যে বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী ও বিবেকসম্পন্ন। ব্রাইসের

এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সুনাগরিক হইতে হইলে নাগরিকের পক্ষে দুইপ্রকার গুণ থাকা প্রয়োজন—প্রথম নৈতিক, দ্বিতীয় বুদ্ধিপ্রসূত। সুনাগরিক নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে। নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার অর্থ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিবার মত মনোভাবসম্পন্ন হওয়া। এই মনোভাবকেই লর্ড ব্রাইস বিবেক ও আত্মসংযম আখ্যা দিয়াছেন। বিবেকসম্পন্ন নাগরিক সমাজের প্রতি কর্তব্যকে নিজের স্বার্থ অপেক্ষা বড় করিয়া দেখে এবং ব্যক্তিগত ও সমাজ-স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে আত্মসংযম বলে সমাজ-স্বার্থকেই রক্ষা করে।

ব্রাইসের মতে সুনাগরিকের পক্ষে দুইপ্রকার গুণ থাকা প্রয়োজন

সে সমাজ-স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে স্থান দিবে

নাগরিক বিবেকসম্পন্ন ও আত্মসংযমী হইলেই আদর্শ নাগরিক হইল না। সামাজিক সমস্যাগুলি বুঝিবার ও বিশ্লেষণ করিবার এবং উহাদের সমাধান উদ্ভাবন করিবার মত ক্ষমতাও তাহার থাকা প্রয়োজন। সুতরাং নাগরিককে বুদ্ধিমান এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্নও হইতে হইবে।

সে বুদ্ধিমান ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন হইবে

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক (Hindrances to Good Citizenship) ঃ

সুনাগরিকের পক্ষে অপরিহার্য গুণগুলি দেখার পর, সুনাগরিকতার পথের বাধাবিঘ্নগুলিও আলোচনা করা প্রয়োজন। লর্ড ব্রাইসের মতে এই বাধাবিঘ্ন হইল নির্লিপ্ততা, স্বার্থপরতা এবং দলীয় মনোভাব।

১। **নির্লিপ্ততা ঃ** নির্লিপ্ততা সুনাগরিকতার পথে অন্যতম প্রধান বাধা। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ততা নাগরিকের পক্ষে নৈতিক অপরাধ। নীতিজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক কখনও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না। নির্লিপ্ততার ফলে উদাসীনতা ও উৎসাহহীনতার সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা কম থাকায় এবং "সকলেই কাজে ফাঁকি দিতেছে, অতএব আমিও দিতে পারি" এই ধারণার ফলে নির্লিপ্ততার সৃষ্টি হয়। আরও একটি কারণ আছে। নির্বাচন-সমুদ্রে একজন ভোটদাতা জলবিন্দু মাত্র—তাহার কোনও অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। সে

জাতীয় সমস্যার সমাধানে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই কারণেই সাধারণ ভোটদাতা রাষ্ট্রের এবং সর্বসাধারণের সমস্যা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। প্রত্যেকেই মনে করে যে সে নির্লিপ্ত থাকিলেও অপরে তাহার কর্তব্য সম্পন্ন করিবে। ইহার ফলে অলসতা এবং নির্লিপ্ততা সমগ্র সমাজে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য কেহই তেমন চেষ্টা করে না। ফলে অসৎ ব্যক্তিরা স্ব স্ব ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার অবকাশ পায় এবং দুর্নীতি ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে।

কর্মে অলসতার ফলে চিন্তার ক্ষেত্রেও অলসতার সৃষ্টি হয়

কর্মে অলসতার ফলে চিন্তার ক্ষেত্রেও অলসতার সৃষ্টি হয়। নাগরিকগণ কেবল কর্ম হইতেই বিমুখ হয় না; তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা লইয়া চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সতর্ক দৃষ্টির অভাবে স্বাধীনতা বিপন্ন হয় এবং শাসন-ব্যবস্থা ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে চলিতে থাকে।

এই প্রকার নির্জীব অলসতা আরও নানা কারণে বৃদ্ধি পায়। আজকাল অনেক নাগরিক রাজনীতি ব্যতীত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইতেছে। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি ব্যাপারে আধুনিক নাগরিকগণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী উৎসাহী। ইহার ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহাদের নির্লিপ্ততা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালনে তাহারা বিমুখ হইয়া পড়ে।

আধুনিক যুগে শিক্ষা এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে এই কর্মবিমুখতা ও চিন্তাবিমুখতা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

২। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা : ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার ফলে নাগরিকতার আদর্শ ব্যাহত হয়, ইহা সুবিদিত। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আদর্শ সমাজের স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া অথবা বাধা দিয়া সুনাগরিকতার পথে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে নানাবিধ বিকৃত অবস্থার উদ্ভব হয়; ভোট ক্রয়বিক্রয়, অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচন প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্য প্রশ্রয় পায়। ভোটদানের অধিকার একটি পবিত্র অধিকার ও কর্তব্য। অবহেলাভরে অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই অধিকার অন্যায় ভাবে ব্যবহার করা নাগরিকের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। যাহারা এই সকল অনুচিত কার্য করে তাহাদিগকে সমাজের শত্রু ব্যতীত কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না।

ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যাহারা রাষ্ট্রের স্বার্থের হানি করে তাহারাই সমাজের শত্রু

৩। **দলীয় মনোভাবঃ** সুনাগরিকতার পথে আর একটি প্রতিবন্ধক হইল দলীয় মনোভাব। গণতন্ত্রের পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক দল অপরিহার্য। জনমত সংগঠনে ও প্রকাশে, বিভিন্ন ভাব ও আদর্শের উদ্ভাবনে ও প্রচারে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। স্বল্প কথায় বলিতে গেলে, আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তিই হইল রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক দল ততদিনই গণতন্ত্রের সহায়ক যতদিন ইহা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যখন কোন দল বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হইয়া ছোট ছোট স্বার্থসিদ্ধির সংকীর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হয় তখন ইহা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়, এবং দলীয় স্বার্থের নিকট জাতীয় স্বার্থ অবহেলিত হয়। প্রত্যেক উপদলই আপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করে এবং এজন্য জাতীয় স্বার্থের হানি করিতে সঙ্কুচিত হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের স্থলে দলের প্রতি আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন দলের প্রতি আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যচ্যুতি ঘটায়। এইভাবে রাষ্ট্রনৈতিক দল অনেক সময় সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রনৈতিক দল আদর্শভ্রষ্ট হইলে সুনাগরিকতার পথে বাধার সৃষ্টি করে

সুনাগরিকতার পথের প্রতিবন্ধক দূর করিবার উপায় (How to Remove the Hindrances to Good Citizenship):

এখন প্রশ্ন হইল, কিভাবে এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করা যায়? ব্রাইস যে সকল প্রতিকারের নির্দেশ দিয়াছেন সেগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকার; (২) নৈতিক প্রতিকার।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারঃ নানাপ্রকার রাষ্ট্রনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিয়া শাসনযন্ত্রকে সুনাগরিকতার পক্ষে অনুকূল করা যায়। প্রথম পদ্ধতি হইতেছে—সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation)। এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় প্রত্যেক দল ভোট-সংখ্যার অনুপাতে আসন লাভ করিবে। ইহার ফলে জাতির বিভিন্ন অংশকে এবং বিভিন্ন দলের মতকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কার্য করিতে চেষ্টা করিবে, তখন অন্যান্য দল একত্রিত

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

হইয়া তাহা প্রতিরোধ করিবে। অবশ্য এই উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাফল্য লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভোট দান প্রথা প্রবর্তিত আছে। বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ও আর্জেন্টাইনে নির্বাচনে যোগদান বাধ্যতামূলক। মেক্সিকোয় নির্বাচনে যোগদান না করিলে ভোটাধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়। এই বাধ্যতামূলক ভোটদান পদ্ধতির ফলে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না। কিন্তু এই পদ্ধতির ত্রুটিও আছে। নির্লিপ্ত এবং উদাসীন নাগরিকগণ আইনসঙ্গত দায়িত্ব পালনের জন্যও যেমন তেমন ভাবে যে কোন প্রার্থীকে ভোট দান করিবে। ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হইবে।

বাধ্যতামূলক ভোটদান প্রথা

নাগরিকগণকে প্রারম্ভিকভাবে আইন প্রণয়নের অধিকার (Initiative) প্রদান করিয়া এবং গণভোটের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অনেক ক্ষেত্রে সুনাগরিকতার পথের বাধা দূর করিবার চেষ্টা করা হয়। এই সকল পদ্ধতিতে জাতীয় সমস্যাগুলি সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হয় এবং প্রত্যেকেই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পায়। ফলে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে নাগরিকগণের স্বাধীন চিন্তা এবং আলোচনা করিবার উৎসাহ জন্মে।

প্রারম্ভিক ভাবে আইন প্রণয়নের অধিকার, গণভোট প্রভৃতি

নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের কড়াকড়ি, দুর্নীতির বিলোপসাধন এবং সর্বসাধারণের স্বার্থহানিকর কার্যের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা সুনাগরিকতার পথের অনেক প্রতিবন্ধক দূর করে।

নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের কঠোরতা হ্রাস

নৈতিক প্রতিকার ঃ নাগরিকের নৈতিক চরিত্র উন্নত করাই সুনাগরিকতার পথের বিঘ্ন দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। নৈতিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার। মানুষের মনের মধ্যেই মূল অভাব এবং দৈন্য নিহিত থাকে। এই মূলের সংস্কার সাধন করিতে না পারিলে নাগরিক জীবনে শুভ আদর্শ উপলব্ধি করা যায় না। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এক আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পিত রাষ্ট্রে আইনের স্থলে আছে

নাগরিকের নৈতিক চরিত্র উন্নত করাই প্রধান প্রতিকার

শিক্ষা। শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ফলে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পাইয়া ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে। ফলে আইনের প্রয়োজনও থাকিবে না।

আমরা শিক্ষাকে আইনের স্থলাভিষিক্ত রূপে কল্পনা করিতে পারি না। তবে প্রকৃত শিক্ষা যে নির্লিপ্ততা, ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ প্রভৃতি সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলি অনেকটা দূর করে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the hindrances to good citizenship? (C. U., 1940, 1947).

(৮৩-৮৫ পৃষ্ঠা দেখ)

দশম অধ্যায়

সার্বভৌমিকতা

সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক করে। অতএব সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি ও ইহার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি না বুঝিলে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না।

সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক করে

সার্বভৌমিকতার (Sovereignty) সংজ্ঞা :

ল্যাটিন Superanus (সর্বশ্রেষ্ঠ, Supreme) শব্দ হইতে ইংরেজী Sovereignty (সার্বভৌমিকতা) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কর্মে এবং ইচ্ছায় চূড়ান্ত ক্ষমতাকে সার্বভৌমিকতা বলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই শব্দের প্রয়োগ আধুনিক হইলেও ইহার মর্ম এ্যারিস্টটলের যুগেও অজ্ঞাত ছিল না। এ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের যে চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই আধুনিক কালে সার্বভৌমিকতা নামে অভিহিত। রোমানগণ ক্ষমতার পূর্ণতা বলিতে যাহা বুঝিত, আমরা তাহাকেই সার্বভৌমিকতা বলি। সর্বপ্রথম আধুনিক অর্থে সার্বভৌমিকতা কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন ফরাসী দার্শনিক বোডিন। তিনি সার্বভৌমিকতা অর্থে বুঝিতেন প্রজা ও নাগরিকগণের উপর রাষ্ট্রের চরম

ক্ষমতা, যাহা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ নহে। বার্জেসের মতে সার্বভৌমিকতার অর্থ প্রজার উপর এবং প্রজাদের সর্বপ্রকার সংঘের উপর আদিম ও অসীম ক্ষমতা। অস্টিনের মতে, যদি কোন সমাজে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ অপর কাহারও আদেশ পালন না করে, অথচ জনসাধারণের অধিকাংশ তাহার বা তাহাদের আদেশ পালন করে, তাহা হইলে সেই বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইংলণ্ডের উদাহরণ দিয়া অস্টিন বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডে রাজা এবং লর্ডস্ ও কমন্স্ সভার সমন্বয়ের মধ্যেই সার্বভৌমিকতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেকটি সংজ্ঞাই চরম ক্ষমতার উপর সার্বভৌমিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। আদেশ দানের এবং আদেশ পালন করিতে বাধ্য করিবার চরম ক্ষমতাই সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌম শক্তির নিকট প্রত্যেকে অবনত থাকিবে। এই শক্তি সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে। সার্বভৌম শক্তির সহিত কোন ব্যক্তি বা সংঘের সংঘর্ষ বাধিলে সেই ব্যক্তি বা সংঘকে তাহার ইচ্ছার পরিবর্তন করিতে হইবে, সার্বভৌম শক্তিকে নয়। ব্যক্তি বা সংঘের কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিলে তাহা সার্বভৌম শক্তিরই অনুমোদিত। সার্বভৌমিকতার এই প্রকৃতি হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

অস্টিনের সংজ্ঞা

রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাই সার্বভৌমিকতা

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য

১। **পূর্ণতা বা চরমতা ঃ** রাষ্ট্রের মধ্যে আইনানুমোদিত আর কোন শক্তি থাকিতে পারে না যাহা সার্বভৌমিকতার উর্ধ্বে। রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা ব্যবহারের পথে কোন প্রকার বাধাই থাকিতে পারে না।

২। **সর্বজনীনতা ঃ** সার্বভৌম শক্তি সর্বজনীন। ইহার অর্থ হইল রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে বসবাসকারী সকলেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অধীন। পররাষ্ট্রের দূতেরা অবশ্য অধীন নন। তবে ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় সার্বভৌম শক্তি তাঁহাদিগকে অপসারিত করিতে পারে।

৩। **স্থায়িত্ব ঃ** স্থায়িত্ব সার্বভৌমিকতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্র স্থায়ী, সুতরাং রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমিকতাও স্থায়ী হইতে বাধ্য। সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকারীর পরিবর্তন হইতে পারে; কিন্তু তাহার দ্বারা সার্বভৌমিকতার লোপ হয় না।

সরকারের পরিবর্তনে সার্বভৌমিকতার লোপ হয় না

৪। **অবিভাজ্যতা ঃ** সার্বভৌম শক্তিকে বিভক্ত করা যায় না। বিভক্ত করিলেই সার্বভৌমিকতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্যবহারে সার্বভৌম শক্তি অনেক ব্যক্তি বা সংঘের মধ্যে বিভক্ত হয়, কিন্তু মূলতঃ ইহার বিভাগ সম্ভব নয়।

সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপ (Different forms of Sovereignty) ঃ

বর্তমানে সার্বভৌমিকতা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ; অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইহা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সার্বভৌমিকতার প্রত্যেকটি রূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

১। নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা (Titular Sovereignty) ঃ

প্রথমেই প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা হইতে নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতার পার্থক্য কি তাহা বিচার করা প্রয়োজন। যে রাজা অথবা সম্রাট্ কার্যতঃ কোনও ক্ষমতার অধিকারী নহেন তাঁহাকে নামসর্বস্ব সার্বভৌম বলা যায়। ইংলণ্ডের রাজা (Monarch) ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি কেবল নামে মাত্র ইংলণ্ডের সর্বময় কর্তা। যদিও শাসনকার্য তাঁহার নামেই চালিত হয় তথাপি তিনি রাজত্ব করেন, শাসনকার্য পরিচালনা করেন না। রাজার শক্তিহীনতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে পার্লামেণ্ট যদি রাজাকে তাঁহার নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিতে বলে তবে রাজা তাহা করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তথাপি সংস্কার বশে রাজাকে সার্বভৌম শাসক বলা হয়।

নামসর্বস্ব ও প্রকৃত সার্বভৌমিকতার পার্থক্য

২। আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা (Legal Sovereignty) ঃ

যে আইন অনুসারে চূড়ান্ত নির্দেশ দিতে পারে তাহাকে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার অধিকারী বলা যায়। আইন অনুসারে তাহার ক্ষমতা অসীম এবং তাহাকে কেহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। আইনানুগের মতে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাই প্রকৃত সার্বভৌমিকতা। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার অধিকারী। আইনতঃ ইহাই শাসনযন্ত্রের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী অংশ। পার্লামেণ্টের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহা স্ত্রীকে পুরুষ অথবা পুরুষকে স্ত্রী করা ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই

বিচারকগণ আইনসঙ্গত সার্বভৌমের প্রণীত আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য

করিতে পারে। আইনতঃ পার্লামেণ্ট যে কোনও আইন প্রণয়ন করিতে পারে; আদালত সেই আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য। ইহাই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য।

৩। রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা (Political Sovereignty):

সার্বভৌমিকতার অন্য এক রূপকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলা যায়। ইহা আইনতঃ স্বীকৃত হয় না, কিন্তু ইহার প্রভাব আইনসঙ্গত সার্বভৌমের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। পার্লামেণ্ট যে কোন আইন প্রণয়ন বা বাতিল করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কি পার্লামেণ্ট নাগরিকগণকে পরস্পরের সর্বস্ব অপহরণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া আইন প্রবর্তন করিতে পারে? এইরূপ আইন রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমের (অর্থাৎ জনমতের) বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইবে। সমগ্র জাতি এইরূপ আইনের বিরোধিতা করিয়া আইনসঙ্গত সার্বভৌমের (অর্থাৎ পার্লামেণ্টের) ক্ষমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে এবং ইহাকে ধ্বংস করিবে। রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা অর্থে আমরা বুঝি জনমত অথবা জাতির ইচ্ছা। কার্যতঃ এই জনমতই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই শক্তির নিকট আইনসঙ্গত সার্বভৌম অবনত থাকিতে বাধ্য হয়। আইনের পশ্চাতে এই শক্তিই মূলতঃ কার্য করে। আইনসঙ্গত সার্বভৌম সর্বদা জাতির রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করিতে চেষ্টা করে এবং সেই অনুসারে কার্য করিতে সচেষ্ট হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে আইনসঙ্গত সার্বভৌম শক্তি উপেক্ষা করিতে পারে না

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যুগে—যখন সমগ্র জনসাধারণ একত্রিত হইয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চালনা করিত সেই সময়—আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা একই হস্তে ন্যস্ত থাকিত। বর্তমান কালে, পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগে, জনমতের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার প্রকাশ হয় এবং তাহাকে সার্বভৌম শক্তি আইনে রূপদান করিয়া থাকে।

জনমতের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা প্রকাশ পায়

৪। জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty):

সার্বভৌমিকতাকে আবার কখনও কখনও জনগণের সার্বভৌমিকতা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। প্রাচীন রোমের ষ্টোইক দর্শনে জনগণের সার্বভৌমিকতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। চরম রাজতন্ত্রের বিরোধী লক্ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার

উপাসক রুশো সার্বভৌমিকতাকে জনগণেরই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জনগণের সার্বভৌমিকতা আমেরিকার ও ফরাসী দেশের বিপ্লবকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। গণতন্ত্রের ভিত্তিই জনগণের সার্বভৌমিকতা।

যখন চূড়ান্ত ক্ষমতা কোনও বিশেষ ব্যক্তি অথবা শ্রেণীর হস্তে না থাকিয়া সমগ্র জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে তখন তাহাকে জনগণের সার্বভৌমিকতা বলা যায়। কিন্তু "জনসাধারণ" (People) অর্থে কি বুঝি তাহা স্পষ্টভাবে না বলিলে "জনগণের সার্বভৌমিকতা" এই আখ্যা অর্থহীন হইয়া পড়ে। জনগণ বলিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণতঃ ভোটাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমষ্টিকেই বুঝায়। অর্থাৎ নাগরিকগণই সমষ্টিগত ভাবে জনসাধারণ। নাগরিকগণ তাহাদের ভোটাধিকার দ্বারা দেশের শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অনেক দেশে আবার গণভোট প্রভৃতির ব্যবস্থার দ্বারা নাগরিকগণ শাসন-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে। বর্তমানে ভোটাধিকার, গণভোট প্রভৃতিই জনসাধারণের সার্বভৌমিকতার ব্যবহারিক রূপ।

সার্বভৌমিকতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে তাহাকে জনগণের সার্বভৌমিকতা বলা হয়

গণভোট প্রভৃতি জনগণের সার্বভৌমিকতার ব্যবহারিক

৫। আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতা (De Jure and De Facto Sovereignty):

আরও দুইপ্রকার সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়—আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতা। আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা এবং আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা একই—ইহা আইন কর্তৃক স্বীকৃত চরম শক্তি। বাস্তব সার্বভৌমিকতা আইন কর্তৃক স্বীকৃত হউক বা না হউক তাহাতে যায় আসে না: জনসাধারণ কার্যতঃ ইহাকে মান্য করে এবং ইহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ফলে ইহা আইনের চক্ষে স্বীকৃত হয়। তখন আর বাস্তব ও আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতায় কোনই পার্থক্য থাকে না।

জনগণের আনুগত্যই বাস্তব সার্বভৌমিকতার লক্ষণ

সাধারণ সময়ে আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতা একই হস্তে ন্যস্ত থাকে; সুতরাং তাহাদের পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব হয় না। কিন্তু বিপ্লবের

সময় এই দুই প্রকার সার্বভৌমিকতার পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর বলশেভিকরা প্রথমে বাস্তব সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইয়াছিল; ক্রমশঃ রাশিয়ার জনগণের সমর্থনে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ফলে এই বাস্তব সার্বভৌমিকতা আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মহাচীনের কমিউনিষ্ট দল কুয়োমিন্টাং সরকারের হস্ত হইতে চরম ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া বাস্তব সার্বভৌমিকতার অধিকারী হয়; জনগণের আনুগত্য তাহারা পাইয়াছে এবং অনেক রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ফলে কমিউনিষ্ট চীন রাষ্ট্র আইনানুমোদিত ভাবে সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে বলা চলে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ সরকার কিছুকাল ব্রহ্মদেশে বাস্তব সার্বভৌম ছিল, কিন্তু আইনতঃ ব্রহ্মদেশ তখনও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধীন ছিল। যুদ্ধে মিত্রশক্তি সাফল্যলাভ করায় উক্ত সরকার রাশিয়ার বলশেভিক ও চীনদেশের কমিউনিষ্টদের মত আইনানুমোদিত সার্বভৌম হইতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে বাস্তব সার্বভৌমিকতা শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হইল আইনের স্বীকৃতি। বাস্তব সার্বভৌম কোন সেনানায়ক বা কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলও হইতে পারে।

বাস্তব সার্বভৌমিকতা শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হইল আইনের স্বীকৃতি

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between the different forms of sovereignty.

(৮৯-৯২ পৃষ্ঠা দেখ)

2. What is meant by the term sovereignty? (C. U., 1952).

(৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা দেখ)

একাদশ অধ্যায়

আইন (Law)

কোন সংগঠনই কতকগুলি নিয়ম ব্যতীত চলিতে পারে না। রাষ্ট্র হইল অন্যতম সংগঠন। সুতরাং নিয়ম ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রের আদর্শ হইল মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বৃদ্ধি করা। এ্যারিস্টটলের ভাষায়, মঙ্গলময় জীবনকে সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। এই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বৃদ্ধি বা মঙ্গলময় জীবনকে সম্ভব করিবার জন্য রাষ্ট্র কতকগুলি বিধি সৃষ্টি করে। এই বিধি বা নিয়মগুলিকেই আইন বলা হয়।

মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিধিবদ্ধ নিয়মই আইন

আইনের আওতায় বাস করিবার জন্য আদিম মানুষ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের কামনা করিয়াছিল। আদিম সমাজে হয়ত স্বাভাবিক স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ছিল না। এই নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্যই মানুষ আইনের, এবং আইনকে কার্যকরী করিবার জন্য রাষ্ট্রের, প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল। আইনের অস্তিত্বের জন্য রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ নিরাপত্তাবোধ ও অধিকার ভোগ করিতে লাগিল। আইনই স্বাধীনতা ও অধিকারের রক্ষক।

আইনই স্বাধীনতার রক্ষক

আইনের সংজ্ঞা (Definition of Law) :

অস্টিনের মতে আইন সার্বভৌম শক্তির অনুশাসন ছাড়া আর কিছুই নয়। অস্টিন আইনানুগ ছিলেন। আইনানুগের দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই তিনি আইনের প্রকৃতি বিচার করিয়া ঐরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন।

অস্টিনের সংজ্ঞা

অস্টিনের সংজ্ঞাকে স্যার হেনরী মেইন সমালোচনা করিয়াছেন। অস্টিন মাত্র সার্বভৌম শক্তির অনুশাসনকেই আইন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি নিয়ম ও ব্যবহারকে আইনের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে যাহাদের উৎপত্তি সার্বভৌম শক্তির আদেশে হয় নাই। এই সমালোচনার উত্তরে অস্টিন বলেন যে সার্বভৌম শক্তির অনুশাসনের অর্থ সম্মতি দেওয়া মাত্র। প্রত্যেক নিয়ম ও ব্যবহার সার্বভৌম শক্তির সম্মতিক্রমেই প্রচলিত থাকে ;

সার্বভৌম শক্তির অসম্মতিতে কোন রীতি বা নিয়মই প্রচলিত থাকিতে পারে না।

অস্টিনের সংজ্ঞার সমালোচনা ও অস্টিনের প্রদত্ত সেই সমালোচনার উত্তরের সমন্বয় সাধন করিয়া প্রেসিডেন্ট উইলসন আইনের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই সাধারণতঃ গ্রহণীয় :—

প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রদত্ত সংজ্ঞা

"আইন মানুষের সেই সমস্ত স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তা, যাহা সুস্পষ্ট ভাবে গৃহীত নিয়মাবলীতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও সমর্থন আছে।" সুতরাং আইনের ভিত্তি হইল প্রচলিত আচার-ব্যবহার। এইগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। অতএব আইন হইল রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত বা সমর্থিত কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, যাহাদের সাহায্যে নাগরিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অধ্যাপক হল্যাণ্ডের সংজ্ঞায় আইন হইল,—মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ; এই নিয়মগুলি প্রয়োগ করে সার্বভৌম শক্তি।

অধ্যাপক হল্যাণ্ডের প্রদত্ত সংজ্ঞা

দেখা গেল, আইন রাষ্ট্রের অধিবাসিগণের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে—ধ্যান-ধারণা বা ভাবনা-চিন্তা লইয়া আইনের কারবার নহে। সুসংবদ্ধ সমাজ-জীবন ব্যতীত আইনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আইনের সহিত অন্যান্য সংগঠনের নিয়মের পার্থক্য হইল যে আইন বাধ্যতামূলক ; অন্যান্য সংগঠনের নিয়ম পালন সভ্যগণের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

আইনের প্রকৃতি

আইনের উৎস (Sources of Law) :

আচার-ব্যবহার আইনের উৎপত্তির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস। প্রাচীন কালের আইন সাধারণতঃ আচারমূলক ছিল। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত আচারের সাহায্যে বিবাদ-বিসংবাদের বিচার ও মীমাংসা করা হইত। এই সকল আচার বা আইন বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং দলের প্রচলিত ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে ঐ সকল আচার-ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছিল।

১। আচার-ব্যবহার (Customs) আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস

প্রাচীন কালে ধর্ম আইনের আর একটি প্রধান উৎপত্তিস্থল ছিল। ধর্ম দুই ভাবে আইনের বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছিল। পরোক্ষভাবে ইহা আচারমূলক আইনকে স্বীকার করিয়া এবং তাহার সমর্থক শক্তি রূপে কার্য করিয়া তাহাকে স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছিল। প্রত্যক্ষ ভাবেও ধর্ম আইন সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছিল। সেই যুগে ঈশ্বরকেই আইনের স্রষ্টা এবং প্রয়োগকর্তা বলিয়া মনে করা হইত। ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন পুরোহিত এবং পুরোহিত-শাসক (Priest-King)। সুতরাং তাঁহাদের নির্দেশ ঈশ্বরের আদিষ্ট আইন রূপে সমাজে গৃহীত হইত।

২। ধর্ম

ক্রমশঃ সমাজ-জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে আচার এবং ধর্মের স্থান সংকুচিত হইতে লাগিল। গোষ্ঠী এবং দলের সম্প্রসারণের ফলে আচার এবং ধর্মের বিরোধ ক্রমশঃই তীব্র হইতে লাগিল। তখন বিরোধের বিচারভার দলপতির উপর ন্যস্ত করা হইত এবং সে প্রচলিত আচারের সাহায্যে বিরোধের মীমাংসা করিত। এইরূপে দলপতি বিচারপতির কার্য করিত এবং ভবিষ্যতে তাহার রায় আইন হিসাবে গৃহীত হইত। এইভাবে বিচারের রায় হইতে আইনের উৎপত্তি হইয়াছিল। এইরূপ বিচারের রায় হইতে উদ্ভূত আইন অনেক সময় আচার ও ধর্মের কঠোরতা হ্রাস করিত। বর্তমানেও বিচারের রায় হইতে অনেক আইনের সৃষ্টি হয়।

৩। বিচারের রায় (Judicial Precedents)

বর্তমান কালে আইনজ্ঞদের এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের আইন-সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং মতামত হইতে নূতন আইনের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। প্রত্যেক আইন হইল কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। এই শব্দসমষ্টি অনেক সময় দ্ব্যর্থবোধক হইতে পারে। আইন-প্রণয়নকালে আইন-প্রণেতারা যে উদ্দেশ্যে আইন-প্রণয়ন করেন, অনেক সময় পরে লোকে তাহা ভুলিয়া যায়। পণ্ডিত ব্যক্তিদের টীকা ও আলোচনা এই সমস্ত ক্ষেত্রে আইনের প্রকৃত মর্ম স্মরণ করাইয়া দেয়। বিচারপতিরা অনেক ক্ষেত্রে আইনজ্ঞদের মতামত সসম্মানে উল্লেখ এবং গ্রহণ করেন। এইভাবে আইনের বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতে নূতন আইনের উৎপত্তি হইয়াছে। ইংলণ্ডে কোক, ব্ল্যাক্‌ষ্টোন প্রভৃতি আইনজ্ঞগণ ব্রিটিশ আইনের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মনু প্রভৃতি

৪। পণ্ডিত ব্যক্তিদের আইন সম্বন্ধে আলোচনা (Scientific Commentaries)

স্মৃতিশাস্ত্রের টীকাকারগণ স্ব স্ব মতামত দ্বারা হিন্দু আইনের প্রভূত পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

৫। ন্যায়বোধ (Equity)

ন্যায়বোধ আইনের অন্যতম উৎপত্তিস্থল। সাধারণ বিচারবুদ্ধি এবং ন্যায়-পরায়ণতার সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে বিচার করা হয়। যখন প্রচলিত আইনের সাহায্যে সমাজের বিধি-নিষেধ নির্ধারণ করা যায় না, অথবা দেখা যায় যে প্রচলিত আইন যুগের উপযুক্ত নয়, সেইক্ষেত্রে ন্যায়বোধের সাহায্যে আইনের পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরিবর্তনশীল সমাজে প্রচলিত আইন অনুসারে সকল ক্ষেত্রে বিধান দেওয়া যায় না। এইক্ষেত্রে বিচারপতিগণ ন্যায়বোধ এবং সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে বিরোধের মীমাংসা করেন এবং তাঁহাদের রায় নূতন আইনের উৎস রূপে গণ্য হয়।

৬। ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক রচিত আইন (Legislation)

বর্তমান কালে ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক রচিত আইনই আইনের সর্বপ্রধান উৎপত্তিস্থল। আইন প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত জনমত। ওপেনহিম জনমতকেই আইনের একমাত্র উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে জনমতকে আইনে পরিণত করা হয়। ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন বতমানে সমাজে অন্যান্য আইনকে ক্রমশঃ অপ্রচলিত করিতেছে।

আইন এবং নীতি (Law and Morality):

আইন ও নীতির মধ্যে সম্পর্ক:

আইন ও নীতির মধ্যে সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ বলা যায়। উভয়েরই আলোচ্য বিষয় সমাজবদ্ধ জীব—মানুষ। আদিতে তাহারা অভিন্নই ছিল। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পর যখন আইনকে সার্বভৌম শক্তির অনুশাসন রূপে কল্পনা করা হইতে লাগিল, তখন আইন নৈতিক আচরণের সূত্রগুলি হইতে পৃথক হইল। পৃথক হইলেও উভয়ের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ছেদ পড়িল না।

উভয়ে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে

আইন ও নীতি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। ন্যায়, অন্যায় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা অনেক সময় আইনে রূপান্তরিত হয়। আইনও অনেক সময় নূতন নূতন নীতির পথ প্রস্তুত করে। কিন্তু আইন যদি জোর করিয়া কোন নূতন নৈতিক ধারণা লোকের উপর সহসা চাপাইয়া দিতে চায়, তবে সে আইনকে কার্যকর

করা বিশেষ কঠিন। ভারতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লোকের নীতিজ্ঞান ধীরে ধীরে জাগরিত হইতেছিল, এই নীতিজ্ঞানকে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র আইনে রূপ দিয়াছে। পূর্বে সতীদাহ ধর্মের বা নীতিশাস্ত্রের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল, আইন দ্বারা সতীদাহ রোধ করা হইল। এখন সতীদাহকে নীতির দিক দিয়া কেহই সমর্থন করে না। মদ্যপান নীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু মদ্যপান যদি জাতীয় স্বভাব হয়, তবে আইন দ্বারা সহসা তাহাকে বন্ধ করিতে গেলে সে চেষ্টা সফল হইবে না।

আইন ও নীতির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ ঘনিষ্ঠ হইলেও উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও কম নয়।. প্রথমতঃ, উভয়েই সমাজবদ্ধ জীব মানুষকে লইয়া আলোচনা করিলেও, উভয়ের আলোচনার পরিধি এক নয়। নীতি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে বিচার করে। মনের গোপন চিন্তা এবং বাহিরের ব্যবহার—উভয়ই নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য। নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধ হইলে মানুষ চিন্তায় ও আচরণে উন্নত হইবে, ফলে সমাজ-জীবনও উন্নত হইবে। আইনের আলোচ্য বিষয় মানুষের বাহ্যিক আচরণ, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে আইন বাহ্যিক আচরণের পশ্চাতে উদ্দেশ্যও খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া চাপা দিলে মোটর-চালকের চরম দণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে; অসাবধানতায় চাপা দিলে লঘু দণ্ডই হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নীতিশাস্ত্রের তুলনায় আইনের পরিধি সংকীর্ণ।

উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য:

১। নীতিশাস্ত্রের তুলনায় আইনের পরিধি সংকীর্ণ

আইনের পরিধি সংকীর্ণ হওয়ায় সকল নৈতিক অপরাধই আইনের চক্ষে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অসত্য দুর্নীতিমূলক, কিন্তু যতক্ষণ অসত্য কাহারও পক্ষে ক্ষতিকর না হয় ততক্ষণ উহা আইনেব আবেষ্টনীর মধ্যে আসিতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলিলেও আইন শাস্তি দিতে পারে না; কিন্তু অপরের নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিলে আইন শাস্তি দিতে পারে।

সাধারণের সুবিধার জন্য আইন এমন অনেক আচরণ অসমর্থন করে যাহা মোটেই দুর্নীতিমূলক নহে। রাস্তার বিশেষ কোন দিক দিয়া মোটর গাড়ী চালান দুর্নীতিমূলক নহে, কিন্তু বে-আইনী।

দ্বিতীয়তঃ, আইনের প্রয়োগ করে রাষ্ট্র, এবং আইনভঙ্গকারীকে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি পাইতে হয়। নীতির প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও সমাজের বিবেক। নীতিগত অপরাধের শাস্তি—নিজের বিবেকের দংশন ও লোকচক্ষে হেয় হইয়া থাকা।

২। আইনের প্রয়োগ করে রাষ্ট্র; নীতির প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও সমাজের বিবেক

তৃতীয়তঃ, নির্দিষ্টতা ও নিশ্চয়তার দিক হইতেও আইন এবং নীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন্‌টি সুনীতি, কোন্‌টি দুর্নীতি তাহা সকল সময়ে ঠিক করিয়া বলা যায় না। নীতি কতকটা ব্যক্তিগত এবং কতকটা সামাজিক ব্যাপার। সামাজিক রুচি, প্রকৃতি প্রভৃতি পরিবর্তনের ফলে নীতি পরিবর্তিত হয়। আবার অনেক সময় ব্যক্তি সমাজের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে না। বাল্যবিবাহ এক সময় নীতিমূলক বলিয়া মনে হইত। সামাজিক রুচির পরিবর্তন হওয়াতে আজ আর ইহা নীতিমূলক বলিয়া মনে করা হয় না; তবে অনেকে এখনও নীতির দিক দিয়াই বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী। ব্যক্তিও অনেক সময় নীতির পরিবর্তন সাধন করে; সমাজের পক্ষে কিন্তু এই পরিবর্তিত নীতি গ্রহণ করিতে সময় লাগে। গান্ধীজী যখন অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করেন তখন অধিকাংশ ভারতবাসী অস্পৃশ্যতাকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে করিত না; কিন্তু আজ অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই এই প্রথাকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে করে। সুতরাং সুনীতি ও দুর্নীতির মধ্যে সীমারেখা অনেক সময় অতি অস্পষ্ট। আইনের ক্ষেত্রে এরূপ অস্পষ্টতা থাকিতে পারে না; থাকিলে ব্যবস্থাপক সভা বা বিচার-বিভাগ তাহার সংশোধন করিয়া তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলে।

৩। নির্দিষ্টতা ও নিশ্চয়তার দিক হইতেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে

প্রশ্নোত্তর

1. What are the sources of law? (৯৪-৯৬ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Explain the relation between law and morality. (৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা দেখ)

3. "Law is generally defined as the command of the sovereign." Discuss. (C. U., 1953). (৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা দেখ)

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাধীনতা

সার্বভৌমিকতা এবং আইনের পরেই স্বাধীনতার প্রশ্ন আলোচনা করা প্রয়োজন। সার্বভৌমিকতার অর্থ—চরম, পরম, অসীম ক্ষমতা। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে আইন এবং সার্বভৌমিকতা স্বাধীনতার পরিপন্থী। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, আইন স্বাধীনতাকে খর্ব করে না, বরঞ্চ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ রূপে কার্য করে। এইজন্যই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতার স্বরূপ (Nature of Liberty) ঃ

স্বাধীনতার স্বরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা হয় না। স্বাধীনতা শব্দটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন চিন্তাবীর কর্তৃক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কারণেই ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্কু বলিয়াছেন যে 'স্বাধীনতা' শব্দটি ছাড়া এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত শব্দ আর নাই; মানুষের মনে এইরূপ বিভিন্ন ভাবে রেখাপাতও আর কোন শব্দ করে নাই।

শব্দগত অর্থ ধরিলে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় নিজের অধীনতা—অর্থাৎ মানুষের নিজস্ব সত্তার নির্দেশে চালিত হওয়া। অতএব অনেকে মনে করে যে স্বাধীনতার অর্থ মানুষের নিজের ইচ্ছামত যে কোনও কর্ম করিবার বা স্বেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ—অর্থাৎ স্বাধীন মানুষের বাহ্যিক আচরণের উপর কোনই নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। আইন এবং স্বাধীনতা এই অর্থে পরস্পরবিরোধী, কারণ আইন ব্যক্তির কার্যাবলীকে নির্দিষ্ট করিয়া দেয় এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-রহিত অবস্থা নয়। স্বাধীনতা বলিতে মাত্র আংশিক নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা বুঝায়। অর্থাৎ স্বাধীনতার অর্থ কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ অপসারিত থাকা। যে সকল অধিকার ব্যতীত ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না সেগুলি সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ না থাকাই হইল স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ

ল্যাস্কি (Laski) বলেন, "আমি স্বাধীনতা বলিতে বুঝি সেই সমস্ত অবস্থার উপর বিধি-নিষেধের অপসারণ, যাহা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য

বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য।" সুতরাং পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার অর্থ—কোন কোন ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধের অপসারণ। সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধের অপসারণের অর্থ হইল স্বেচ্ছাচারিতা। সে ক্ষেত্রে সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার এবং শোষণ করিবে; কতকগুলি শক্তিমান ব্যক্তি বৃহৎ জনসমাজকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না, কারণ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বাধীনতার পরিবর্তে বৃহৎ জনসমাজকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা অসঙ্গত।

স্বাধীনতার অর্থ বিধি-নিষেধের আংশিক অপসারণ—এই সংজ্ঞা স্বাধীনতার সম্পূর্ণ স্বরূপকে প্রকাশ করে না। সৌন্দর্য বলিতে যেমন কদর্য্যতার অভাব ব্যতীত আরও কিছু বুঝায়, সেইরূপ স্বাধীনতা বলিতে বিধি-নিষেধের অপসারণ ব্যতীত আরও কিছু বুঝায়। সৌন্দর্যের মত স্বাধীনতারও একটি প্রত্যক্ষ দিক ও কতকগুলি প্রত্যক্ষ গুণ বা লক্ষণ আছে। এই প্রত্যক্ষ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝি করণীয় কার্য করিবার এবং ভোগ্য বস্তু ভোগ করিবার অধিকার ও সুযোগ। ল্যাস্কি বলেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি সেই পরিবেশ রক্ষার কথা বলিতেছি, যেখানে মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ সত্তা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবে।" ল্যাস্কি যে পরিবেশের কথা বলিতেছেন তাহা সৃষ্ট হয় নাগরিকগণের কতকগুলি অধিকার থাকিলে এবং নাগরিকগণ তাহাদের কর্তব্য ঠিকমত পালন করিলে।

অধিকার ভোগের উপর স্বাধীনতা নির্ভর করে

তাহা হইলে অধিকার ভোগের উপর স্বাধীনতা নির্ভর করে। নাগরিকগণের অধিকারসমূহ সামাজিক প্রগতি এবং জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যখন ব্যবহৃত হয় তখনই নাগরিকগণ প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Forms of Liberty):

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার স্বাধীনতা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন—প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক, ব্যক্তিগত বা সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জাতীয়।

১। প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক স্বাধীনতা (Natural Liberty): অনেক সময় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক স্বাধীনতা বলিতে সেই স্বাধীনতা বুঝায় যাহা মানুষ রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে কাল্পনিক প্রাকৃতিক অবস্থায় ভোগ করিত। কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থায় সমাজ অথবা রাষ্ট্র কিছুই ছিল না, সুতরাং তখন প্রকৃত

স্বাধীনতার অস্তিত্ব ছিল অসম্ভব। তখন স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতা বিরাজমান ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা স্বাভাবিক স্বাধীনতা নয়—যে স্বাধীনতা দ্বারা সমাজের ও ব্যক্তির কল্যাণ হয় তাহাই স্বাভাবিক স্বাধীনতা।

যে স্বাধীনতা দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ হয় তাহাই স্বাভাবিক স্বাধীনতা

২। **ব্যক্তি-স্বাধীনতা (Civil Liberty)ঃ** ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অনেক সময় সামাজিক স্বাধীনতাও বলা হয়। সমাজ-জীবনে মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা হইল অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিজের অধিকার পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও ভোগ করিবার স্বাধীনতা। অধিকারগুলি হইল মৌলিক সামাজিক অধিকার। সুতরাং অব্যাহতভাবে সামাজিক অধিকার ভোগের স্বাধীনতাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা।

অব্যাহত ভাবে সামাজিক অধিকার ভোগের স্বাধীনতাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা

৩। **রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty)ঃ** ইহাকে অনেক সময় নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা (Constitutional Liberty) বলা হয়। এই স্বাধীনতার অর্থ রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার। শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার অর্থ নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার। যেখানে সকল প্রাপ্তবয়স্ককেই নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং যেখানে জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি নির্বাচন-প্রার্থীর যোগ্যতার মাপকাঠি নয়, প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব সেখানেই বর্তমান।

নির্বাচনাধিকারকেই রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলে

৪। **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty)ঃ** ইহার অর্থ—সর্বদা বেকার হইবার ভয় এবং অভাব ও অনটন হইতে মুক্তি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব করিতে হইলে মালিকের অবিচার ও অত্যাচার হইতে প্রত্যেককে মুক্তি দিতে হইবে এবং প্রত্যেক মানুষের জীবিকা নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সুযোগ থাকিবে। যদি মানুষ অন্নচিন্তায় নিপীড়িত এবং মালিকের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে বাধ্য হয় তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতির কোন মূল্য থাকে না। লেনিন সত্যই বলিয়াছেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।

অভাব, অনটন হইতে মুক্তিই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা

৫। জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty)ঃ ইহার অর্থ বৈদেশিক কর্তৃত্বের অবসান। সার্বভৌমিকতা এবং জাতীয় স্বাধীনতা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন কোনও দেশ স্বাধীন থাকে, তখন সেই দেশের নাগরিকগণ স্বাধীনতা ভোগ করে। পরাধীন রাষ্ট্রে জাতীয় স্বাধীনতা নাই; ফলে সেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকে না। সুতরাং জাতীয় স্বাধীনতাই অন্যান্য সর্বপ্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি।

জাতীয় স্বাধীনতা অন্যান্য স্বাধীনতার ভিত্তি

আইন এবং স্বাধীনতা (Law and Liberty) ঃ

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল মানুষের সমগ্র সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই পরিবেশকে স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া হয়। নাগরিককে অধিকার দান ও সেই অধিকার রক্ষা করিয়া রাষ্ট্র এই পরিবেশের সৃষ্টি করে। অধিকার রক্ষা করা হয় আইনের সাহায্যে এবং আইন কার্যকর হয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের জন্য। সুতরাং স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল।

স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল

পূর্বে আইন এবং স্বাধীনতাকে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করা হইত। তখন স্বাধীনতা অর্থে যথেচ্ছ কার্য করিবার অধিকার বুঝা যাইত। যেহেতু আইন এই অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে, অতএব আইন স্বাধীনতার বিরোধী। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে স্বাধীনতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে তাহা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। একজনের চরম স্বাধীনতার পরিবর্তে বৃহৎ জনসমাজের দাসত্ব কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। তাই স্বাধীনতার এই অর্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রহণ করে না। প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ—সর্বসাধারণের আত্মবিকাশের সুযোগ। স্বেচ্ছাচারিতার অস্তিত্ব থাকিলে আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। আইনই ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমষ্টির স্বাধীনতা রক্ষা করে। আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি।

আইন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমষ্টির স্বাধীনতা রক্ষা করে

স্বেচ্ছাচারিতাকে যাঁহারা স্বাধীনতা বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহারা প্রাকৃতিক অবস্থাকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক অবস্থায়, তাঁহাদের মতে, আইনও ছিল, অধিকারও ছিল। এই অধিকারই তাঁহাদের মতে স্বাভাবিক

অধিকার। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ফলে মানুষের এই স্বাভাবিক অধিকার লুপ্ত হইল; মানুষ স্বাভাবিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া মানুষের গড়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। সুতরাং এই প্রকার স্বাভাবিক স্বাধীনতার উপাসকগণ মনে করেন যে, ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

এইরূপ উগ্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপাসকগণ কিন্তু মানুষের প্রকৃতির সমাজ-বিরোধী দিকটার প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করেন না। মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর; সে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সংকোচ বোধ করে না; আইনের বাধা আছে বলিয়াই সে নিরস্ত থাকে। আইনের নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিত; সাধারণের নিকট ব্যক্তি-স্বাধীনতা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। ল্যাস্কি বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা যদি অপরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তবে তাহা কখনই প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে পারে না।

যাহাতে ব্যক্তির লোভে সমষ্টির অধিকার বিপন্ন না হয়, যাহাতে ব্যক্তি-স্বার্থ সমাজ-স্বার্থের হানি করিতে না পারে, সেইজন্য প্রয়োজন আইন ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের। রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে অন্যায়কারীকে সংযত রাখে; নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দুর্বলকে সবলের লোভের কবল হইতে বাঁচায়। ইহার ফলে স্বেচ্ছাচারিতা ব্যাহত হয় মাত্র, প্রকৃত স্বাধীনতা ব্যাহত হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আইন স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী, প্রকৃত স্বাধীনতার বিরোধী নহে।

আইন স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী, প্রকৃত স্বাধীনতার বিরোধী নহে

আইনের কার্য হইল ব্যক্তির অধিকারের ও আচরণের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। এই সীমা নির্দেশ করিয়াই আইন প্রত্যেককে তাহার আদর্শ অনুযায়ী আত্মোপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রদান করে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আইনের উদ্দেশ্য। আইন এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বাধীনতাকে হরণ না করিয়া রক্ষাই করে। আইন স্বাধীনতার ভিত্তি। প্রকৃত স্বাধীনতা আইন ব্যতীত বাঁচিতে পারে না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই আইনের উদ্দেশ্য

নাগরিকগণের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty of the Citizens):

আমরা দেখিয়াছি যে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় প্রত্যক্ষভাবে আইন ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারা। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কার্যকর হয় সরকারের দ্বারা।

কিন্তু সরকার অনেক সময় আদর্শভ্রষ্ট হইতে পারে। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থপর, অসাধু এবং দুর্নীতিপরায়ণ হন। ক্ষমতা প্রাপ্তিতে গর্বিত ও স্বার্থান্ধ হইয়া অনেক সময় তাঁহারা বিপথে চলেন। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে স্বজনপ্রীতি এবং অসাধুতার ফলে জনসাধারণের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। এই সকল কারণেই স্বাধীনতার রক্ষাকবচের (safeguards) প্রয়োজন।

সরকার আদর্শভ্রষ্ট হইতে পারে বলিয়াই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ প্রয়োজন

অন্যতম রক্ষাকবচ হইল—শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) লিখিতভাবে গৃহীত হওয়া। শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি লিখিত থাকিলে তাহাদের একটি বিশেষ মর্যাদা থাকে এবং অনায়াসে তাহাদিগকে অমান্য করা যায় না। এইজন্য বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত আছে। ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত আছে এবং ঐগুলি রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে প্রধান ধর্মাধিকরণ বা Supreme Courtএর উপর। সাধারণতঃ, যুদ্ধ অথবা জরুরী অবস্থা ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনসাধারণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না।

রক্ষাকবচ : ১। মৌলিক অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রে লিখিতভাবে গ্রহণ করা

দ্বিতীয় রক্ষাকবচ হইতেছে—ক্ষমতা বিভাজন (Separation of Powers) নীতি। এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যসমূহ শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগ—এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত করা উচিত। অনেকের মতে এই নীতি গৃহীত না হইলে জনসাধারণ অত্যাচারিত হইবে এবং তাহাদের স্বাধীনতা খর্ব হইবে। কিন্তু পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই চরম ভাবে বিভাগ-স্বাতন্ত্র্যের নীতি গ্রহণ করা হয় নাই। ইংলণ্ডে এই নীতি মোটেই গ্রহণ করা হয় নাই, তথাপি ব্রিটিশ জনসাধারণ সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। সুতরাং এই নীতি স্বাধীনতার অপরিহার্য রক্ষাকবচ নয়।

২। ক্ষমতা-বিভাজন নীতি

অবশ্য, ক্ষমতা-বিভাজন নীতির এক অংশ স্বাধীনতার পক্ষে অপরিহার্য। ইহা হইল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচারপতিগণের কর্মের স্থায়িত্ব এবং কার্যপদ্ধতি শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থাপক সভার কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। একবার নিযুক্ত হইলে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবেন, নতুবা তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত

ভাবে বিচার করিতে পারিবেন না। শাসন বিভাগ অন্যায়ভাবে এক ব্যক্তিকে আটক করিতে পারে; সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবে। বিচারপতিগণ স্বাধীন থাকিলে তাঁহারা শাসন বিভাগের অবিচার ও অত্যাচার হইতে জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি বিচারপতিদের কর্মের স্থায়িত্ব এবং উন্নতি শাসন বিভাগের উপর নির্ভর করে তবে তাঁহাদের ন্যায় বিচার হইতে বিচ্যুত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। স্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য (অর্থাৎ শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে স্বাধীনতা) অপরিহার্য।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইল আইনের শাসন বা Rule of Law। আইনের শাসন বলিতে আইনের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার বুঝায়। অর্থাৎ বে-আইনী ভাবে কাহারও অধিকার হরণ করা বা কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যাইবে না; আইন ধনী নির্ধন, সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য করিবে না; সমগ্র সমাজের জন্য একই আইন থাকিবে এবং মানুষে মানুষে কোন ভেদ করা হইবে না। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা ক্ষমতা-বিভাজন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্তু আইনের শাসন সেখানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এজন্যই ইংলণ্ডে নাগরিকের স্বাধীনতা অন্য যে-কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের স্বাধীনতা অপেক্ষা কম নয়।

৩। আইনের শাসন বা Rule of Law

স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইল দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি। যে রাষ্ট্রে দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি বা মন্ত্রি-পরিষৎ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে দেশে, অনেকের মতে, নাগরিকের স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত হয়। মন্ত্রি-পরিষৎ শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের বিরোধী এক বা একাধিক দল থাকে। এই বিরোধী দল সরকারের কার্যের সমালোচনা করিয়া তাহাকে জনসাধারণের অধিকার অব্যাহত রাখিতে বাধ্য করে।

৪। দায়িত্বমূলক শাসননীতি

বিরোধী দল

গণভোট, প্রারম্ভিক ভাবে আইন প্রণয়ন বা গণ উদ্যোগ, নির্বাচকদের নির্বাচিত সদস্যকে অন্যায় কার্যের জন্য পদচ্যুত করিবার অধিকার প্রভৃতিকেও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ রূপে গণ্য করিতে হইবে। তবে এই সকল ব্যবস্থা অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রচলিত নাই।

৫। গণভোট (Referendum), গণ উদ্যোগ (Initiative) প্রভৃতি

স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইল নাগরিকগণের স্বাধীনতার জন্য উগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং ইহা রক্ষা করিবার জন্য তীব্র আবেগ। বিনা মূল্যে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় না, সংরক্ষণের জন্য মূল্য দিতে হয়। নাগরিকের চিরন্তন সতর্কতাই হইল এই মূল্য। স্বাধীনতা সম্বন্ধে নাগরিককে যক্ষের মত সজাগ থাকিতে হইবে এবং স্বাধীনতা ব্যাহত হইলে বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সেই সংগ্রামে চরম ত্যাগ করিতে হইবে। এইজন্যই গ্রীক রাজনীতিজ্ঞ পেরিক্লিস বলিয়াছেন যে সাহসিকতাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি নাই, স্বাধীনতার রণক্ষেত্র কখনই নিস্তব্ধ থাকিতে পারে না।

৬। নাগরিকগণের স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং ইহা রক্ষা করিবার জন্য আবেগ

সাহসিকতাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র

প্রশ্নোত্তর

1. "The fundamental maxim of liberty is that law is the condition of liberty". Elucidate. (C. U., 1943). (১০২-১০৩ পৃষ্ঠা দেখ)

2. What are the safeguards of liberty in a modern democratic State? To what extent, if at all, do they exist in India? (C. U., 1944). (১০৩-১০৬ পৃষ্ঠা দেখ)

3. What is meant by the concept of liberty? How far is law consistent with liberty? (C. U., 1951). (৯৯-১০০, ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Explain the term liberty and distinguish between civil liberty and political liberty. (C. U., 1950). (৯৯-১০১ পৃষ্ঠা দেখ)

5. How far is sovereignty consistent with individual liberty? (C. U., 1952). (১০২-১০৩ পৃষ্ঠা দেখ)

6. Indicate the relation between law and liberty. (C. U., 1953). (১০২-১০৩ পৃষ্ঠা দেখ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাম্য

স্বাধীনতা হইল মানুষের আত্মবিকাশের সুযোগ। সাম্য ব্যতীত সকলে আত্মবিকাশের সুযোগ পাইতে পারে না। সুতরাং সাম্য ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাম্য ও স্বাধীনতা উভয়ই গণতন্ত্রের ভিত্তি।

সাম্য ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত

আইন ও স্বাধীনতাকে যেমন পরস্পরবিরোধী মনে করা হইত, তেমনি সাম্য ও স্বাধীনতাকে পরস্পরবিরোধী মনে করা হইত। এই ধারণার কারণ, পূর্বে দার্শনিকগণ উভয়েরই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

সাম্যের স্বরূপ (Nature of Equality) :

সাধারণ অর্থে সাম্য বলিতে সকলকেই এক প্রকারের সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া বুঝায়; সর্ববিষয়ে সমতা বা অভিন্নতাও বুঝাইতে পারে। অর্থাৎ সকলেই সকলের সমান, সকলের একই আয় থাকিবে, সকলে সমাজের নিকট হইতে একই প্রকারের ব্যবহার পাইবে, ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এইরূপ সমতাকে সাম্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। প্রকৃত সাম্য হইল মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং কর্মদক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেককে যথাযোগ্য সুযোগ প্রদান করা। এক অর্থে প্রত্যেক মানুষই সমান; আবার বিভিন্ন মানুষের মধ্যে প্রভেদও আছে। মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি এবং কর্মক্ষমতার বিভিন্নতার ফলে সকলের পক্ষে একই প্রকারের সুযোগ লাভ বা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মের জন্য একই প্রকারের মূল্য প্রদান করাকে সাম্য বলে না। এই অর্থে সাম্য অন্যায়ে পর্যবসিত হয়। মানুষের ক্ষমতা ও তাহার কর্মের উৎকর্ষ অনুযায়ী তাহাকে সুযোগ এবং মূল্য প্রদান করা উচিত।

সাম্য বলিতে সকলের সকল বিষয়ে একই প্রকারের সুযোগ-সুবিধা বুঝায় না

যথার্থ সাম্য মানুষের সকল বিভিন্নতাকে অস্বীকার না করিয়া বরঞ্চ গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রকৃতির এবং আদর্শের বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের সুযোগ থাকা উচিত। রাষ্ট্র এই সমস্ত বিভিন্নতা স্বীকার করিয়া সাম্যের আদর্শ সফল

করিতে সচেষ্ট হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতা অনুযায়ী সুযোগ দেওয়া হইবে; সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির সুযোগ বিভিন্ন হইবে। সাম্যের অর্থ ব্যক্তির ক্ষমতা অনুযায়ী সুযোগের পর্যাপ্ততা। সাম্যের ভিত্তিতে রাম, রবীন্দ্রনাথ অথবা রমণের মত একই প্রকারের সুযোগ দাবী করিতে পারে না। রামের সহিত রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য আছে; এইজন্য রামের সুযোগও সেই অনুপাতে পৃথক হইবে। রাম প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু রামেরও কিছু শক্তি ও বৈশিষ্ট্য আছে—যাহা উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাকে সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। রামের যদি চিকিৎসক হইবার ক্ষমতা থাকে তবে চিকিৎসক হইবার সুযোগ তাহাকে দিতে হইবে; দরিদ্র বলিয়া চিকিৎসা বিদ্যালয়ের দ্বার তাহার নিকট রুদ্ধ করা যাইবে না।

সাম্যের অর্থ ব্যক্তির ক্ষমতা অনুযায়ী সুযোগের পর্যাপ্ততা

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মানুষের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্যকে সাম্য স্বীকার করে, কতকগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। ক্ষমতা, প্রকৃতি বা শিক্ষাগত বৈষম্যকে সাম্য স্বীকার করে, কিন্তু জন্মগত বা সামাজিক রীতিগত বৈষম্যকে অস্বীকার করে।

সাম্য মানুষের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্যকে স্বীকার করে, কতকগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে

সাম্যকে এই অর্থে গ্রহণ করিলে ইহা কোন মতেই স্বাধীনতার বিরোধী হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তাহারা পরস্পরবিরোধী নহে, বরঞ্চ পরস্পরের উপর পূর্ণ মাত্রায় নির্ভরশীল। বিশেষ সুযোগ প্রদান করা সাম্যের আদর্শের বিরোধী। মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক সুযোগ প্রদান করার নাম বিশেষ সুযোগ দেওয়া। বিশেষ সুযোগ প্রদান করিলে সাম্যের আদর্শ ব্যাহত হয়।

বিশেষ সুযোগ প্রদান করা সাম্যের আদর্শের বিরোধী

সাম্যের বিভিন্ন রূপ (Forms of Equality) :

স্বাধীনতার ন্যায় সাম্যেরও বিভিন্ন রূপ আছে। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সাম্য চারি প্রকারের :—ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও স্বাভাবিক। এই চারিটির সহিত বর্তমানে অর্থনৈতিক সাম্য যোগ করিতে হইবে।

১। **ব্যক্তিগত সাম্য (Civil Equality) :** সামাজিক অধিকার (Civil Rights) সমভাবে ভোগ করিবার সুযোগকে ব্যক্তিগত সাম্য বলা

হয়। ব্যক্তিগত সাম্য থাকিতে হইলে প্রত্যেক নাগরিকের একই মৌলিক অধিকার থাকিবে। "আইনের শাসন" (Rule of Law) সাধারণতঃ ব্যক্তিগত সাম্যকে রক্ষা করে।

আইনের শাসন ব্যক্তিগত সাম্য রক্ষা করে

২। **সামাজিক সাম্য (Social Equality)**ঃ অর্থ, জাতি, ধর্ম অথবা গোষ্ঠীর ভেদে যেখানে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় না, সেইখানে সামাজিক সাম্য বিরাজমান। সামাজিক দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান। জাতিভেদ প্রথা সামাজিক সাম্যের বিরোধী। অর্থাৎ যদি জন্ম বা ধর্মের ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণীবিভাগ না থাকে তবে সেই সমাজ সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলা যায়।

৩। **রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য (Political Equality)**ঃ অপরাধী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির রাষ্ট্র পরিচালনায় সমান সুযোগ থাকিলে তাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বলে। যে রাষ্ট্রে সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থার প্রচলন আছে এবং যেখানে জন্ম, জাতি, দারিদ্র্য প্রভৃতি নির্বাচনপ্রার্থীর যোগ্যতার মাপকাঠি বলিয়া বিবেচিত হয় না সেইখানেই রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের অস্তিত্ব আছে। শিক্ষার অভাব, বয়সের অল্পতা, অপরাধের জন্য শাস্তিভোগ প্রভৃতি কারণে কোন নাগরিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে তাহা সাম্যের বিরোধী নয়। কিন্তু নরনারী ভেদে, অথবা জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভেদ করিলে তাহা সাম্যের আদর্শকে ক্ষুন্ন করে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় সমান সুযোগকেই রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বলা হয়

৪। **স্বাভাবিক সাম্য (Natural Equality)**ঃ জন্মকাল হইতে মানুষে মানুষে সমতা হইল স্বাভাবিক সাম্য। প্রত্যেক মানুষ একই ভাবে জন্মগ্রহণ করে। "জন্মকালে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন এবং সমান।" এই উক্তি সত্য, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, জন্মকালীন সাম্য বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বৈষম্যে পরিণত হয়। সুতরাং প্রত্যেকের জন্মকালীন সাম্য দ্বারা রাষ্ট্রের বা সমাজের নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না।

৫। **অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality)**ঃ অর্থনৈতিক সাম্য ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে ইহা দ্বারা উপার্জন ও

সম্পত্তি অর্জনের সমতা বুঝায়। সকলের আয় সমান হইবে এবং সকলেই সমপরিমাণে ধনের মালিক হইবে। ইহাই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ। এই চরম সাম্যবাদ রাশিয়াতেও সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই।

ব্যাপক অর্থে অর্থনৈতিক সাম্য

সংকীর্ণ অর্থে অর্থনৈতিক সাম্য বলিতে বুঝায় অর্থোপার্জন ও সম্পত্তি অর্জন বিষয়ে সকল প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবহারের বিলোপ। একই উৎকর্ষের কার্যের জন্য একই মজুরী দিতে হইবে; কোন পদ কাহারও জন্য সংরক্ষিত রাখা চলিবে না এবং অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশের জন্য আর্থিক ব্যাপারে যথোপযুক্ত সুযোগ দিতে হইবে।

সংকীর্ণ অর্থে অর্থনৈতিক সাম্য

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by equality? (১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা দেখ)
2. Describe the different forms of equality. (১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা দেখ)

চতুর্দশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষমতা-বিভাজন নীতি

সরকারের তিনটি বিভাগ (Three Organs of Government):

সরকারের কার্যাবলীকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়,—যথা, আইন-প্রণয়ন, শাসনকার্য-পরিচালন ও বিচার-ব্যবস্থা। এই তিন প্রকার কার্য করিবার জন্য প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই তিনটি বিভাগ রহিয়াছে—ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature), শাসন বিভাগ (Executive) এবং বিচার বিভাগ (Judiciary)। ব্যবস্থা বিভাগের কার্য আইন প্রণয়ন করা; শাসন বিভাগের কার্য প্রচলিত আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা; এবং বিচার বিভাগের কার্য প্রচলিত আইন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা—অর্থাৎ আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া।

সরকারের তিনটি বিভাগ—ব্যবস্থা, শাসন ও বিচার বিভাগ

ক্ষমতা-বিভাজন নীতি (Theory of Separation of Powers) ঃ

ক্ষমতা-বিভাজন নীতিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে—সরকারের তিন শ্রেণীর ক্ষমতা তিনটি বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হইবে; কোন বিভাগের ক্ষমতা নিজের গণ্ডি ছাড়াইয়া যাইবে না; এবং নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে প্রত্যেক বিভাগই সম্পূর্ণ স্বাধীন ও চরম ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

ক্ষমতা-বিভাজন নীতির মূল তত্ত্ব

আইন প্রণয়ন ব্যাপারে ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন ব্যাপারে শাসন বিভাগ এবং বিচার সম্পর্কিত ব্যাপারে বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রদানের নীতিকেই ক্ষমতা-বিভাজন নীতি বলা হয়।

ক্ষমতা-বিভাজন নীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ যদিও এই মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্কুর নামের সহিত বিশেষভাবে জড়িত, তথাপি ইহা প্রাচীন কালে অজ্ঞাত ছিল না। এ্যারিস্টটল, সিসেরো, পলিবিয়স প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণের রচনায় এই মতবাদের নির্দেশ পাওয়া যায়। এ্যারিস্টটল বিচার, ব্যবস্থা এবং শাসন—এই তিন ভাগে রাষ্ট্রের কার্য বিভক্ত করিয়াছিলেন। স্থূল ভাবে ইহাই ক্ষমতা-বিভাজনের আধুনিক নীতি। এ্যারিস্টটল কর্ম (Functions) বিভক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্মকর্তাদিগকে (Functionaries) বিভক্ত করিতে পারেন নাই। তিনি কর্মবিভাগকে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দিক হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মণ্টেস্কু ক্ষমতা-বিভাজনের নীতিকে স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হিসাবে দেখিয়াছিলেন। এ্যারিস্টটল শাসনকার্য সুপরিচালনার প্রতি বেশী দৃষ্টি দিয়াছিলেন, মণ্টেস্কু দৃষ্টি দিয়াছিলেন স্বাধীনতার প্রতি।

এ্যারিস্টটল ও মণ্টেস্কু

প্রাচীন রোমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি আলোচিত হইয়াছিল। পলিবিয়স এবং সিসেরোর রচনায় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার উপায় হিসাবে এ্যারিস্টটলের মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মধ্য যুগে এই মতবাদ বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে ফরাসী দার্শনিক বোডিন এই মতবাদ পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি বিশেষভাবে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে একই ব্যক্তির হস্তে আইন প্রণয়ন এবং বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিলে সেই ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার পাইবার আশা অত্যন্ত কম, কারণ একজন অত্যাচারী রাজা নিজের সুবিধার জন্য আইন

অন্যান্য চিন্তাবীরগণ

প্রণয়ন করিয়া অন্যায় ভাবে বিচার ক্ষেত্রে সেই আইন প্রয়োগ করিতে পারেন। ইংরেজ দার্শনিক লক্‌ও সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

মণ্টেস্কুর রচনায় ক্ষমতা-বিভাজন নীতি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ভাবে আলোচিত হইয়াছে। তিনি তৎকালীন রাজগণের স্বেচ্ছাচার এবং অত্যাচার বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই মতবাদ প্রণয়ন করেন। জনগণের স্বাধীনতা রক্ষাই তাঁহার মতবাদের প্রধান লক্ষ্য। মণ্টেস্কুর মতে, যদি সমস্ত ক্ষমতা একই ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে জনগণের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তির হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া স্বৈরাচারের নামান্তর। ব্যবস্থা বিভাগ এবং শাসন বিভাগ যদি একই ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কারণ স্বৈরাচারী রাজা বিনা বাধায় অন্যায় ও অত্যাচারমূলক আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। আবার যদি বিচার বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের ক্ষমতা একই ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় তাহা হইলেও জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে, কারণ তখন একই ব্যক্তি আইন প্রণয়ন করিয়া ঐ আইন অনুসারে লোককে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিতে পারে। আবার যদি বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগ একই ব্যক্তির হস্তে থাকে, তাহা হইলে বিচারক এবং কর্মকর্তা এক ব্যক্তি হইবার ফলে, বিচারক অন্যায়ভাবে বিচার করিতে পারে এবং শাসন বিভাগের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ কোনরূপ প্রতিকার পায় না। তিনটি বিভাগের ক্ষমতা যদি এক ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত করা হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রকারের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে, ফলে স্বৈরাচারের সৃষ্টি হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ আইনজ্ঞ ব্ল্যাক্‌ষ্টোন প্রায় উপরোক্ত ভাবেই ক্ষমতা-বিভাজন মতবাদের আলোচনা করিয়াছিলেন।

ক্ষমতা-বিভাজন নীতি মণ্টেস্কুর নামের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত

ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগঃ ক্ষমতা-বিভাজন নীতি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রণীত অনেক শাসনতন্ত্রে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গৃহীত হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের গণপরিষদ ঘোষণা করে যে, যে দেশ ক্ষমতা-বিভাজন নীতিকে গ্রহণ করে নাই সে দেশে শাসনতন্ত্রই নাই। স্বাধীনতা লাভের পর প্রণীত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এই নীতি সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করা হয়। মেক্সিকো, আর্জেন্‌টিনা, ব্রেজিল, চিলি প্রভৃতি দেশের

আমেরিকায় এই মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু য়ুরোপে পারে নাই

শাসনতন্ত্রেও এই নীতি গৃহীত হইয়াছিল। য়ুরোপে কিন্তু ফ্রান্স ছাড়া এই মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

সমালোচনা ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই মতবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমালোচনা করিয়াছেন। অনেকের মতে সরকারের কার্যাবলীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না; কিন্তু ঠিক কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় সে সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন দুই শ্রেণীতে, কেহ কেহ বলেন পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত। যাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করার পক্ষপাতী তাঁহাদের মতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের একটি অংশ।

অনেকের মতে সরকারের কার্যাবলীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না

যাঁহারা সরকারের কার্যাবলীকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চান তাঁহারা সরকারেরও তিনটির পরিবর্তে পাঁচটি বিভাগ নির্ধারণ করেন; যথা :—(১) নির্বাচক মণ্ডলী, (২) ব্যবস্থা বিভাগ, (৩) শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ, (৪) শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারিগণ, এবং (৫) বিচার বিভাগ। নির্বাচক মণ্ডলীকে নির্বাচন, গণভোট প্রভৃতির জন্য সরকারের অন্যতম অংশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারীদের সহিত একই শ্রেণীভুক্ত করা উচিত নয়।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ হইতে এই মতবাদকে এইরূপে সমালোচনা করা হইয়াছে : এই মতবাদ মূলতঃ সত্য, তথাপি ইহার পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং সম্ভব হইলেও কাম্য নয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ জীবদেহের বিভিন্ন অংশের ন্যায় পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই বিভাগগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরস্পর সম্পর্কহীন করা সম্ভব নয়। শাসন বিভাগ যে আইনানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহা প্রধানতঃ আইন সভা কর্তৃক প্রণীত; কিন্তু আইন প্রণয়ন ব্যাপারে প্রায় সকল দেশের ব্যবস্থা বিভাগই শাসন বিভাগের নির্দেশে অল্পবিস্তর পরিচালিত হয়। উপরন্তু, ব্যবস্থা বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে তাহাতে অনেক সময় অনেক ফাঁক থাকে; এই ফাঁকগুলিকে পূরণ না করিলে আইনকে কার্যকর করা সম্ভব হয় না। শাসন বিভাগই স্বতন্ত্রভাবে উপ-আইন (by-law) প্রণয়নের দ্বারা এই ফাঁকগুলি পূরণ করে। অনেক সময় আবার জরুরী আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়। জরুরী আইন প্রণয়ন আইন সভা দ্বারা সকল সময় সম্ভব নহে। আইন সভা

এই মতবাদ মূলতঃ সত্য, কিন্তু ইহার পূর্ণ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়; সম্ভব হইলেও কাম্য নয়

অধিবেশনে না থাকিতে পারে বা বিরোধী দল জরুরী আইনের বিরোধিতা করিয়া বিলম্ব ঘটাইতে পারে। সুতরাং জরুরী আইন প্রণয়নের ভার প্রায় সকল দেশেই শাসন বিভাগের উপর থাকে। এই সকল কারণে শাসন বিভাগকে কিছু আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা না দিলে চলে না। আবার বিচার বিভাগও অনেক সময় আইনের ব্যখ্যা করিতে গিয়া নূতন আইনের সৃষ্টি করে। আইন বিভাগও সমালোচনা, অনুমোদন ক্ষমতা প্রভৃতির দ্বারা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিভাজন সম্ভব নয়।

শাসন বিভাগকে কিছু আইন-প্রণয়নবিষয়ক ক্ষমতা না দিলে চলে না

বিচার বিভাগ অনেক সময় আইনের সৃষ্টি করে

যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব, তথাপি ইহা কাম্য নয়। পূর্ণ ক্ষমতা-বিভাজন নীতির উপর শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব ঘটে। শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত করিতে হইলে শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন। শাসন বিভাগের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; এই জন্যই শাসন বিভাগ জনসাধারণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বেশী সচেতন থাকে। ব্যবস্থা বিভাগের পক্ষে আইন প্রণয়ন কালে শাসন বিভাগের মতামত জানা প্রয়োজন। ব্যবস্থা বিভাগের সহিত শাসন বিভাগের সহযোগিতা না থাকিলে জনসাধারণের হিতকর আইন রচনায় বাধা উপস্থিত হইতে পারে। এই সকল কারণেই আমেরিকার আইনসভায় (Congress) রাষ্ট্রপতির বাণী (Message) প্রেরণের ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

ক্ষমতা-বিভাজন নীতি পূর্ণভাবে গৃহীত হইলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব ঘটে

ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগ প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি অনুযায়ী বিচারপতিগণ এবং কর্মকর্তারা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। ইহার ফলে বিভিন্ন প্রকারের দলাদলি এবং তোষামোদের উৎপাত্ত হইয়া থাকে। বিচারকগণ ও কর্মকর্তারা ইহার সহিত জড়িত হওয়ায় তাঁহাদের কর্মক্ষমতার অবনতি হইতে থাকে। সুতরাং নির্বাচন প্রথা স্বাধীনতা রক্ষা না করিয়া বরঞ্চ দুর্নীতি বৃদ্ধি করে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে কেবল মাত্র বিভাগগুলি স্বতন্ত্র করিলেই

নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। স্বাধীনতা নাগরিকদের স্থায়ী সতর্ক দৃষ্টি ব্যতীত রক্ষা করা যায় না। মানুষের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং ইহা রক্ষা করিবার মত মনের বল কোনও নীতি বা শাসনতান্ত্রিক কৌশল দ্বারা উৎপাদন করা যায় না।

কোন শাসনতান্ত্রিক কৌশল দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না

ভারতবর্ষে ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগ :

ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতবর্ষে ক্ষমতা-বিভাজনের নীতি মোটেই গ্রহণ করা হয় নাই। এমন কি, যে সকল বিষয় সম্বন্ধে এই নীতির প্রয়োগ স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য সেই সকল বিষয়েও ইহা প্রযুক্ত হয় নাই। প্রাদেশিক গভর্ণর ও গভর্ণর-জেনারেল প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন; তাঁহারা আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও ভোগ করিতেন। শাসন বিভাগকে বিচার করিবার ক্ষমতাও প্রদান করা হইয়াছিল। শাসন বিভাগ কোনও ব্যক্তিকে অপরাধী মনে করিলে তাহাকে দীর্ঘকাল বিনাবিচারে আটক রাখিতে পারিত। জেলা শাসকের হস্তে শাসন ও বিচার ক্ষমতা একত্রিত ভাবে প্রদান করা হইয়াছিল; ফলে অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহার হইত।

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে এই নীতি মোটেই গৃহীত হয় নাই

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে দায়িত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবেই। এখনও কয়েক ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ নাগরিককে বিনা বিচারে আটক রাখিতে পারে। জেলা শাসকের হস্ত হইতে এখনও বিচার ক্ষমতা অপসারণ করা হয় নাই। কিন্তু বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করার জন্য শাসনতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই নির্দেশ অনুসারে ইতিমধ্যেই বোম্বাই রাজ্যে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ হইতে পৃথক হইয়াছে। আশা করা যায় অন্যান্য রাজ্য শীঘ্রই বোম্বাইএর পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে।

স্বাধীন ভারতে এই নীতির আংশিক প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে

ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature) :

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগের স্থান সর্বপ্রধান। ক্ষমতা-বিভাজন নীতি অনুসারে তিনটি বিভাগই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন; কিন্তু এই ধারণা

ভ্রান্ত। ব্যবস্থা বিভাগের স্থান অন্য দুইটি বিভাগের উর্ধ্বে। আইন অনুসারে শাসন অথবা আইন ভঙ্গের শাস্তি প্রদান করিবার পূর্বে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। সুতরাং প্রথমেই ব্যবস্থা বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

তিনটি বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগের স্থান সর্বপ্রধান

ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Legislature) :

কার্যতঃ ব্যবস্থা বিভাগ বলিতে ব্যবস্থাপক সভা বুঝায়। ব্যবস্থাপক সভার কার্য বিভিন্ন প্রকারের। প্রধান বা প্রাথমিক কার্য হইল জনসাধারণের ইচ্ছা এবং আদর্শ অনুসারে আইন প্রণয়ন করা। সভা জনমতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে সচেষ্ট হয়।

১। আইন প্রণয়ন

কেবল আইন প্রণয়ন করাই ব্যবস্থাপক সভার কার্য নয়। ইহার আরও অন্যান্য কার্য আছে। পৃথিবীর প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়ন ব্যতীত রাজস্বের উপব কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপক সভার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভাই হইল জাতির প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের হস্তেই জাতীয় আয়-ব্যয় নির্ধারণের ভার থাকা বাঞ্ছনীয়। এইজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতি বৎসর আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ (Budget) ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং এই সভার অনুমোদন ব্যতীত কোনও প্রকার কর আদায় করা অথবা অর্থ ব্যয় করা হয় না।

২। রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব

মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত রাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে (Executive) নিয়ন্ত্রণ করা ব্যবস্থাপক সভার আর একটি প্রধান কার্য। ঐরূপ রাষ্ট্রে কর্মকর্তাগণ ব্যবস্থাপক সভা হইতে নিযুক্ত হন, এবং তাঁহাদের কর্মপন্থা এবং অনুসৃত নীতির জন্য ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকেন। তিরস্কার (Censure) প্রস্তাব বা অনাস্থা (No Confidence) প্রস্তাব দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কার্যকরী করা হয়। ব্যবস্থাপক সভায় ঐরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করেন এবং নূতন মন্ত্রিগণ কার্যভার গ্রহণ করেন। যদি মন্ত্রি-পরিষদ এমন কর্মপন্থা অনুসরণ করে যাহা জনমত এবং জাতীয় স্বার্থের বিরোধী, তবে ব্যবস্থাপক সভা তাহাকে

৩। মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারের মন্ত্রিগণকে নিয়ন্ত্রণ

ঐ নীতির পরিবর্তন করিতে অথবা পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে। এইভাবে ব্যবস্থাপক সভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্বাধীন নহে।

কোন কোন রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভার হস্তে বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগের কোন কোন কার্যের ভার অর্পণ করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের সন্ধি অনুমোদন এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা আছে। এই দুইটি প্রকৃতপক্ষে শাসন বিভাগের কার্য। আবার রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অভিযুক্ত করা হইলে সিনেট বা উচ্চতর পরিষদ তাহার বিচার করে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্ট বা সংসদকে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি প্রভৃতিকে অভিযুক্ত করিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগের কার্য। ইংলণ্ডে আবার লর্ড সভা বহু মোকদ্দমার শেষ বিচার করে। অতএব উহা ব্যবস্থা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও বিচার বিভাগের অঙ্গ রূপে কার্য করে।

৪। ব্যবস্থা বিভাগ কোন কোন ক্ষেত্রে শাসন ও বিচার বিভাগের কার্যও করে

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্যবস্থাপক সভার প্রধান কার্য আইন প্রণয়ন করা হইলেও, ইহার আরও অন্যান্য কতকগুলি কার্য আছে।

ব্যবস্থাপক সভার সংগঠন (Organisation of the Legislature):

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই ব্যবস্থাপক সভার দুইটি অংশ আছে—উচ্চ পরিষদ অথবা দ্বিতীয় পরিষদ, এবং নিম্ন পরিষদ অথবা প্রথম পরিষদ। এই ব্যবস্থাকে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা (**Bicameralism**) বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যবস্থাপক সভায় একটিমাত্র পরিষদ থাকে। এইরূপ ব্যবস্থাকে এক-পরিষদ ব্যবস্থা (**Unicameralism**) বলে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক-পরিষদ ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। তখন এই যুক্তি দেখান হইয়াছিল যে এক-পরিষদ ব্যবস্থায় একতা এবং সংহতি থাকিবে; দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা বিরোধ এবং ব্যয় বৃদ্ধি করিবে। আবে সিয়ে (Abbe Sieyes) বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় পরিষদ যদি প্রথম পরিষদের কার্য সমর্থন করে তবে ইহা অনাবশ্যক; আর যদি দ্বিতীয় পরিষদ

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা (Bicameralism) ও এক-পরিষদ ব্যবস্থা (Unicameralism)

প্রথম পরিষদের কার্যের বিরোধিতা করে তবে ইহা অনিষ্টকর। এই ধারণা সত্য হউক আর না হউক, বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Defects of Bicameralism) ঃ

দেখা গিয়াছে যে এক-পরিষদ ব্যবস্থায় সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় না। আইন প্রণয়ন কালে উভয় পরিষদ কর্তৃক প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইবার ফলে অবিবেচনাপ্রসূত বা আকস্মিক আইন রচিত হইয়া রাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন করিতে পারে না।) এক-পরিষদ ব্যবস্থায় মুহূর্তের আবেগে বা আকস্মিক উত্তেজনায় একটি আইন রচিত হইতে পারে; দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি আইন দুইবার করিয়া আলোচিত হয় বলিয়া শান্তভাবে চিন্তা করিবার সময় পাওয়া যায়। যখন বিলটি দ্বিতীয় পরিষদে আলোচিত হইতে থাকে তখন প্রথম পরিষদ বিলটি সম্বন্ধে পুনরায় চিন্তা করিতে পারে, এবং এই সময়ের মধ্যে ক্ষণিকের আবেগও অন্তর্হিত হইতে পারে। হঠাৎ জনমতের প্রাবল্যে প্রথম পরিষদে এমন আইন প্রণীত হইতে পারে যাহা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে পরম ক্ষতিকর। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিষদ বিলটি সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা করিয়া নূতন আলোকপাত করিতে পারে; ফলে প্রথম পরিষদও পরে ঐ বিল পরিত্যাগ করিতে পারে। এইভাবে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা হঠকারিতা বোধ করে এবং অবিবেচিত আইন প্রণয়নে বাধা প্রদান করে।)

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি ঃ ১। ইহা সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব করে

(দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার স্বপক্ষে আরও একটি প্রধান যুক্তি এই যে ইহা এক-পরিষদের স্বৈরাচার হইতে নাগরিকগণের স্বাধীনতা রক্ষা করে। লর্ড ব্রাইসের মতে আইন পরিষদের স্বৈরাচারী হইবার একটি অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি আছে। পরিষদ যদি একটি হয় তবে ইহার স্বৈরাচারী ও আদর্শভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। সমান ক্ষমতা সম্পন্ন আর একটি পরিষদ থাকিলে এই স্বৈরাচার-প্রবৃত্তিকে সংযত রাখিতে পারে। সুতরাং প্রয়োজন দুইটি পরিষদের। অবশ্য বর্তমান যুগে দ্বিতীয় পরিষদকে প্রথম পরিষদের সমান ক্ষমতা দিবার পক্ষপাতী প্রায় কেহই নহেন।)

২। ইহা এক-পরিষদের স্বৈরাচার হইতে নাগরিকগণের স্বাধীনতা রক্ষা করে

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় বিশেষ শ্রেণীর ও স্বার্থের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকে; ফলে ব্যবস্থাপক সভায় রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকে।

ইহাতে ব্যবস্থাপক সভার সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকে

দ্বিতীয় পরিষদ সাধারণতঃ বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্ এবং বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরিষদ। তাঁহারা প্রথম পরিষদের অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ অথচ অতিরিক্ত উৎসাহী সভ্যদিগকে সংযত রাখিতে এবং তাঁহাদের ভুল ও ত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন। এই দিক হইতে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। নিম্ন পরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধি থাকিবার ফলে তাঁহারা জনমত সংগঠন কবিতে পাবেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতার অভাব উচ্চ পরিষদের কর্মঠ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সংশোধন করিতে পারেন। উভয় পরিষদের সম্মিলিত বিবেচনার ফলে সুচিন্তিত আইন প্রণীত হইতে পারে।

৩। দ্বিতীয় পরিষদ বিজ্ঞদের পরিষদ; ইহা প্রথম পরিষদের বিজ্ঞতার অভাব পূরণ করিতে পারে

অনেকের মতে দ্বি-পবিষদ ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য। কেন্দ্র বা সমগ্র দেশের ব্যবস্থাপক সভাব নিম্ন পরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ থাকেন এবং উচ্চতর পরিষদে থাকেন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলির প্রতিনিধিরা। যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি মিলিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার সংগঠন করে, সুতরাং কেন্দ্রে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। এই প্রতিনিধিত্ব দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা ব্যতীত সম্ভব নয়।

অনেকের মতে ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার পক্ষে এই সকল যুক্তির মর্ম জনৈক লেখক সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন,—"গণতান্ত্রিক উৎসাহের আধিক্যের নিয়ন্ত্রণ, অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নে বাধা দান, আবেগে উচ্ছৃঙ্খল জনতা হইতে যুক্তিবাদী মানুষের নিকট আবেদন, এক-পরিষদের স্বৈরাচার হইতে নাগরিকগণকে রক্ষা করা।"

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার স্বপক্ষে যুক্তির সংক্ষিপ্তসার

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগের সংক্ষিপ্তসার আবে সিয়ের মন্তব্যের মধ্যে পাওয়া যাইবে। অনেকে অভিযোগ করেন যে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা অনাবশ্যক এবং ইহা অযথা জটিলতার সৃষ্টি করে। যদি উভয় পরিষদ একই কর্মধারা অনুসরণ করে তাহা হইলে একটি পরিষদ অপ্রয়োজনীয়; যদি পরস্পর

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ:

বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করে তাহা হইলে বিরোধ বৃদ্ধি পাইবে, ফলে জনমত উপেক্ষিত হইবে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। সুতরাং ইহা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর। অনেক সময় দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনার সহিত কাজ করে। অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ করিবার ছলে ইহা প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। বিরোধিতা করিতে করিতে ইহা অভ্যাসগত হইয়া দাঁড়ায়; ইহার ফলে অনেক সময় ইহা সুচিন্তিত এবং ভাল আইন প্রণয়নেও বাধার সৃষ্টি করে। সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ উপেক্ষা করে।

১। অনেকে মনে করেন ইহা অনাবশ্যক

ইহা অনিষ্টকরও হইতে পারে

ইহা ছাড়াও দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় অযথা অর্থব্যয় হয়; ফলে রাষ্ট্রের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায় এবং জনসাধারণকে অতিরিক্ত কর দিতে হয় বা জনমঙ্গলকর কার্য স্থগিত রাখিতে হয়।

২। ব্যয়বাহুল্য

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা শাসন-ব্যবস্থার ঐক্যও নষ্ট করে। দ্বিতীয় পরিষদের গঠনও অধিকাংশ সময় দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিপক্ষে এক প্রবল যুক্তি। সাধারণতঃ বিত্তশালী, রক্ষণশীল ও মনোনীত সদস্যদের লইয়া দ্বিতীয় পরিষদ গঠিত হয়। এই ভাবে গঠিত উচ্চতর পরিষদকে কোন গণতান্ত্রিক ব্যক্তিই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারে না। উপরন্তু, ব্যবস্থাপক সভায় এই ধরণের সদস্যদের অস্তিত্ব সাধারণ লোক ও শ্রমিকের স্বার্থের পরিপন্থী না হইয়া পারে না।

৩। ইহার গঠন-পদ্ধতি ইহার বিরুদ্ধে এক প্রধান যুক্তি

অধ্যাপক ল্যাস্কি দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী। তাঁহার মতে, একটি মাত্র পরিষদই আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা। তিনি বলেন যে বর্তমানে দীর্ঘ আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর আইন রচনা করা হয়। প্রথম পরিষদের পর দ্বিতীয় পরিষদ এই আলোচনারই পুনরাবৃত্তি করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করে মাত্র। সুতরাং, দ্বিতীয় পরিষদ অনাবশ্যক।

অধ্যাপক ল্যাস্কির অভিমত

এই সকল কারণে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। তবুও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় পরিষদের বিলোপসাধন অপেক্ষা সংস্কারের অধিক পক্ষপাতী। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা ইংলণ্ডে লর্ড সভার ক্ষমতা হ্রাস করা হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে উক্ত সভার

আরও সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে দ্বিতীয় পরিষদের সংস্কার করা হইলে উহার ত্রুটিসমূহ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

মন্তব্য

দ্বিতীয় পরিষদের উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না; সুতরাং ইহার বিলোপসাধন অদূরদর্শিতার কার্য। ইহাকে এমন ভাবে গঠন করিতে হইবে যেন গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে এবং যেন ইহা সর্বদাই জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে পারে।

উচ্চতর পরিষদ গঠন (Constitution of the Upper Chamber) :

উচ্চতর পরিষদ বিভিন্ন ভাবে গঠিত হয়। ইহার সভ্যগণ উত্তরাধিকার সূত্রে সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন। যেমন,—ইংলণ্ডের লর্ড সভা; এখানে এক সভ্যের (Peer) মৃত্যুর পর তাঁহার স্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অধিষ্ঠিত হন। আবার অনেক ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কয়েক বৎসরের জন্য অথবা জীবনকালের জন্য উচ্চ পরিষদের সভ্য মনোনয়ন করে। ক্যানাডার উচ্চ পরিষদে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আবার কোন কোন রাষ্ট্রে নিম্ন পরিষদের সভ্যদের ন্যায় উচ্চ পরিষদের সভ্যগণ প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন। ফ্রান্সে এবং ডেনমার্কে গণভোটের সাহায্যে পরোক্ষ ভাবে উচ্চ পরিষদের সভ্য নির্বাচিত করা হয়। স্থানীয় পরিষদের সভ্যগণের ভোট দ্বারাও অনেক সময় উচ্চ পরিষদের সভ্যগণ নির্বাচিত হন। ভারতে উচ্চতর পরিষদ গঠন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং মনোনয়ন প্রথা গ্রহণ করা হইয়াছে।

গঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি

নিম্নতর পরিষদ গঠন (Constitution of the Lower Chamber) :

গণতান্ত্রিক দেশে নিম্নতর পরিষদ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের লইয়াই গঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রথাব সহিত মনোনয়ন প্রথা জড়িত থাকিতে পারে।

পরিষদের ক্ষমতাসমূহ (Powers of the Chambers) :

যেখানে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সেখানে উভয় পরিষদে ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক। মতবাদের দিক হইতে উভয় পরিষদ

পরস্পরের সহযোগী। কার্যতঃ একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই উচ্চ পরিষদ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন। এই মতবাদ ক্রমশঃ গৃহীত হইতেছে যে, উচ্চ পরিষদকে কেবলমাত্র সমালোচনা এবং পুনরালোচনা করিবার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত; এবং আয়-ব্যয় সম্পর্কিত সকল বিষয় সর্বদা নিম্ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা উচিত। এই মতবাদ গৃহীত হওয়ার ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ নিম্ন পরিষদে উত্থাপিত এবং আলোচিত হয় এবং এ বিষয়ে নিম্ন পরিষদের মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া প্রত্যেক দেশেই উচ্চতর পরিষদ কম ক্ষমতাসম্পন্ন

শাসন বিভাগ (Executive) ঃ

সরকারের যে অংশ আইনানুসারে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে, তাহাই শাসন বিভাগ নামে পরিচিত। ব্যাপক অর্থে সাধারণ পুলিশ হইতে প্রধান কর্মকর্তা পর্যন্ত প্রত্যেককে লইয়া শাসন বিভাগ গঠিত। সংকীর্ণ অর্থে কেবলমাত্র প্রধান কর্মসচিবদিগকে শাসন বিভাগের সভ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে শাসন বিভাগ

১। প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি (Modes of choice of the Chief Executive) ঃ প্রধান কর্মকর্তা বিভিন্ন ভাবে মনোনীত করা যাইতে পাবে। অনেক ক্ষেত্রে প্রধান কর্মকর্তার পদ উত্তরাধিকার স্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত,—যেমন, ইংলণ্ডের রাজার পদ। আধুনিক কালে এই সমস্ত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিষ্ঠিত কর্মকর্তা নামে মাত্র কর্মকর্তা; আসল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী মন্ত্রিগণের হস্তে। আবার প্রধান কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ ভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতে পারেন; যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অংশসমূহের (States) শাসকগণ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে জনসাধারণের ভোটের সাহায্যে প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়; যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ও ভারতের রাষ্ট্রপতি। ব্যবস্থাপক সভাও অনেক সময় কর্মকর্তা নির্বাচন করে; যেমন, ফ্রান্সে এবং সুইজারল্যাণ্ডে। আবার কর্মকর্তারা মনোনীতও হইতে পারেন; যেমন, ডোমিনিয়নের গভর্ণর-জেনারেলসমূহ ও ভারতের রাজ্যপালগণ।

শাসন বিভাগের দপ্তরসমূহ (Departments of the Executive) ঃ শাসন বিভাগের মধ্যে নানা প্রকার দপ্তর আছে এবং প্রত্যেক দপ্তরে একজন করিয়া বিভাগীয় কর্তা আছেন। শাসন বিভাগের কার্যের পরিধি ব্যাপক হইবার ফলে ইহার কার্যাবলী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালনাধীন করা হইয়াছে। দপ্তরগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য : পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Affairs) পরিচালনা, দেশ রক্ষা (Defence), স্বরাষ্ট্র শাসন (Home, Interior), অর্থ (Finance), শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, সংসরণ (Communications), জনস্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি। অনেক সময় দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া দুই বা ততোধিক দপ্তরের কার্যভার একজনের উপর ন্যস্ত করা হয়। দপ্তরের কর্তারা কর্মকর্তা রূপে পরিগণিত মন্ত্রী বলিয়া অভিহিত হন। গণতান্ত্রিক যুগে এই সকল কর্মকর্তার পদ স্থায়ী নয়। তাঁহারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে যতক্ষণ তাঁহারা জনসাধারণের আস্থাভাজন থাকেন ততক্ষণই কর্মকর্তার পদে আসীন থাকেন।

দপ্তরসমূহ কর্মকর্তা বা মন্ত্রীদের পরিচালনাধীনে থাকে

জনপালন কৃত্যক বা রাষ্ট্রভৃত্য (Civil Service) ঃ মন্ত্রিগণ বা কর্মকর্তাদের নীচে একদল স্থায়ী কর্মচারী থাকেন। ইহাদিগকে সম্মিলিত ভাবে সাধারণতঃ সিভিল সার্ভিস (জনপালন কৃত্যক বা রাষ্ট্রভৃত্য) এবং ইহাদের শাসনকে আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) বলা হয়। সাধারণতঃ প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার ফল অনুসারে জনপালন কৃত্যকের কর্মচারীদিগকে নিয়োগ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিরা পদে আসীন থাকেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিসের সভ্যগণ অত্যধিক নিয়মানুবর্তী হইলেও শাসনকার্যে তাঁহাদের দক্ষতা অস্বীকার করা যায় না। নিরপেক্ষতা হইল সিভিল সার্ভিসের আর একটি বৈশিষ্ট্য। মন্ত্রিগণ জনগণের প্রতিনিধি রূপে রাষ্ট্রের কার্যভার গ্রহণ করেন। জনমতের উপর তাঁহাদের নির্ভর। জনমতের সমর্থন হারাইলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই পরিবর্তনের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা শাসন বিভাগের কার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে। সুতরাং আমলাতন্ত্রের সদস্যেরা সাধারণতঃ রক্ষণশীল এবং প্রগতি-

শাসনের দক্ষতা স্থায়ী রাষ্ট্রভৃত্যগণের বৈশিষ্ট্য ; তাঁহারা নিরপেক্ষও হন

বিরোধী হইলেও শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালনার জন্য তাঁহাদের সহযোগিতা অপরিহার্য। আমলাতান্ত্রিক শাসকদের রাষ্ট্রের নীতি ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। মন্ত্রী এবং জনগণের প্রতিনিধিবা কর্মপন্থা নির্ধারিত করেন; জনপালন কৃত্যক বা রাষ্ট্রভৃত্য তাহা প্রয়োগ করেন।

সরকারী কার্যে তাঁহারাই নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করেন

শাসন বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Executive)ঃ সাধারণভাবে বলিতে গেলে, শাসন বিভাগের কার্য আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা। 'শাসনকার্য পরিচালনা করা' বলিতে অনেক কিছু বুঝায়। এই অনেক কিছুর মধ্যে প্রথম হইল দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। দেশ রক্ষার জন্যও শাসন বিভাগ দায়ী। এই কারণে সৈন্যদল, নৌ-বাহিনী এবং আকাশবাহিনী শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনাও শাসন বিভাগের কর্তৃত্বাধীন। এই সমস্ত কার্য ব্যতীত, আইন প্রণয়ন এবং বিচার সংক্রান্ত নানাবিধ কাযভার শাসন বিভাগের উপর ন্যস্ত হইতে পারে। শাসন বিভাগ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আহ্বান করে এবং স্থগিত বাখে এবং প্রয়োজন অনুসারে ইহা ভঙ্গ করিয়া দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইন শাসন বিভাগ নাকচ করিতে পারে। আবার জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে শাসন বিভাগ ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদন ব্যতীত আইন প্রণয়ন করিতে পারে। বিচারপতিগণ শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন। শাসন বিভাগ অপরাধের দণ্ড মার্জনা করিতে বা কমাইয়া দিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে নাগরিকগণের অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ ও অভিযোগের মীমাংসা শাসন বিভাগ করিয়া থাকে। বর্তমান সময়ে ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে উপেক্ষা করিয়া অধিকাংশ রাষ্ট্রই শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়ন এবং বিচারকার্য সংক্রান্ত বিবিধ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

শাসন বিভাগ শাসন ব্যবস্থা ও বিচার সংক্রান্ত কার্য করিয়া থাকে

বিচার বিভাগ (Judiciary)ঃ

রাষ্ট্রের সুশাসন অনেকাংশে বিচার-ব্যবস্থার উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। লর্ড ব্রাইস (Bryce) বলিয়াছেন, "শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হইতেছে কিনা

তাহার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে বিচার বিভাগের দক্ষতা।" একজন আমেরিকান আইনজ্ঞের মতে,—"নাগরিকগণের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য, অপরাধের শাস্তি প্রদান করিবার জন্য, ন্যায় বিচারের জন্য, দুর্বল এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিচার বিভাগ অপরিহার্য।" বিচারবিভাগবিহীন সরকার কখনই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary) : বিচার বিভাগের কার্য হইল—আইন কি তাহা নির্ধারণ করা, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা এবং তাহার অর্থ বিশ্লেষণ করা। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, অথবা রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার বিচার করা এবং অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা বিচারপতির প্রধান কার্য। কিন্তু প্রকৃত বিচারকার্য ছাড়া বিচারপতিগণকে অন্যান্য কার্যও করিতে হয়। আইনের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিচারপতিগণ অনেক ক্ষেত্রে নূতন আইনের সৃষ্টি করেন। প্রচলিত আইন অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক থাকে। বিচারপতিগণ এরূপ ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া নির্দেশ করেন তাহাই আইন রূপে গৃহীত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ স্থানীয় কর্মচারী নিয়োগ এবং বিচারকার্যের সহিত সংস্রবহীন আরও নানাবিধ কার্য করেন।

আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ও নূতন আইন প্রণয়ন

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ অপরিহার্য। অনেক ক্ষেত্রে আবার শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের নিকট হইতে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করে। ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ বা সুপ্রীম কোর্টকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উত্থাপিত আইন বা ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে মতামত প্রদান করিতে হয়।

শাসন বিভাগকে আইন সংক্রান্ত উপদেশ দেওয়া

বিচার বিভাগের সংগঠন (Organisation of the Judiciary) : প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ ক্রমোচ্চভাবে বা পিরামিডের আকারে সংগঠিত হয়। এই পিরামিডের শীর্ষে থাকে সুপ্রীম কোর্ট বা অন্য নামে পরিচিত সর্বোচ্চ বিচারালয়। বিচারপতিগণ বিভিন্ন ভাবে নিযুক্ত হন। তাঁহারা শাসন-বিভাগ কর্তৃক মনোনীত হইতে পারেন, ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন, আবার জনসাধারণও তাঁহাদিগকে নির্বাচন করিতে পারে। ব্যবস্থাপক

বিচার বিভাগ পিরামিডের আকারে সংগঠিত হয়

সভার দ্বারা বিচারপতি নির্বাচন সঙ্গত নয়, কারণ ইহা সরকারের এক বিভাগকে অপর বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখে। বিচারপতিগণের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর বিচারের নিরপেক্ষতা নির্ভর করে, এবং যে রাষ্ট্রে নিরপেক্ষ বিচার হয় না তাহা সুশাসিত রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিচারপতি নির্বাচন রাষ্ট্রের সুশাসনের পরিপন্থী। আবার ব্যবস্থাপক সভা অনেক সময় বিচারপতি নির্বাচনে দক্ষতা অপেক্ষা দলীয় স্বার্থের প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখিবে; ফলে অনুপযুক্ত ব্যক্তি বিচারপতির পদ লাভ করিবে। আমেরিকায় কোন কোন স্থলে বিচারপতিগণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। এই ব্যবস্থা সঙ্গত নয়। যে সকল বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ ব্যক্তি বিচারক হইবার উপযুক্ত তাঁহারা সাধারণতঃ জনসাধারণের ভাবাবেগের সহিত সংযোগ রাখেন না, ফলে জনসাধারণ তাঁহাদের পরিবর্তে অযোগ্য ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত করে।

শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারপতি নিয়োগের প্রথাই শ্রেষ্ঠ

শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। একবার নিযুক্ত হইলে বিচারপতিগণ শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবেন। ফলে তাঁহাদের দুইটি অপরিহার্য গুণ—যোগ্যতা এবং স্বাধীনতা—সংরক্ষিত হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the functions of the different organs of a modern Government Is it desirable in the interest of political liberty to have an absolute separation of powers? (C. U., 1941). (১১০-১১৫ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Discuss the reasons for the existence of the bicameral system of legislature. (C. U., 1941). (১১৭-১২১ পৃষ্ঠা দেখ)

3. "The function of the Legislature is not merely the making of laws". What other functions does the Legislature in a democratic country discharge? (C. U., 1942, 1947). (১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Explain the doctrine of separation of powers. What are its limitations? (C. U., 1946, 1948). (১১০, ১১২-১১৫ পৃষ্ঠা দেখ)

5. State the theory of separation of powers. Is an absolute separation of powers desirable? (C. U., 1951). (১১০, ১১২-১১৫ পৃষ্ঠা দেখ)

পঞ্চদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ

সরকার বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে। অন্য ভাবে বলিতে গেলে বিভিন্ন নীতি অনুসারে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শ্রেণীবিভাগ হইল প্লেটোর। প্লেটোর শ্রেণীবিভাগ কিন্তু কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; পারিয়াছে তাঁহার শিষ্য এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ।

এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগঃ

সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে এ্যারিস্টটল দুইটি নীতির অনুসরণ করিয়াছেন: (১) সংখ্যা, (২) উদ্দেশ্যবাদ। প্রথমে তিনি সংখ্যাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছেন যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাহাদের হস্তে। যদি ক্ষমতা একজনের হস্তে থাকে তবে তাহাকে রাজতন্ত্র বলা হইবে; ক্ষমতা কয়েকজনের হস্তে থাকিলে তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হইবে; ক্ষমতা জনগণের হস্তে থাকিলে তাহাকে আখ্যা দেওয়া হইবে গণতন্ত্র।

এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ
—সংখ্যা ও উদ্দেশ্যবাদ

এ্যারিস্টটল উদ্দেশ্যবাদী দার্শনিক ছিলেন—তিনি সকল কিছুর মধ্যেই উদ্দেশ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল মানুষের সুন্দর জীবন সম্ভব করা। সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্য রাষ্ট্রকে সকলের কল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে হইবে। যদি সকলেরই কল্যাণে রাষ্ট্র নিয়োজিত থাকে, তবে শাসনভার যাহার হস্তেই থাকুক না কেন রাষ্ট্র স্বাভাবিক অবস্থায় আছে বুঝিতে হইবে। সকলের কল্যাণে নিয়োজিত না থাকিলে রাষ্ট্র বিকৃত রূপ ধারণ করে। বিকৃত অবস্থায় রাষ্ট্র মাত্র শাসকশ্রেণীরই স্বার্থের অনুকূলে কার্য করে, শাসিতের স্বার্থ ব্যাহত হয়। রাজতন্ত্র বিকৃত হইলে স্বৈরাচার তন্ত্রে পরিণত হয়; অভিজাততন্ত্রের বিকৃত রূপ হইল ধনিকতন্ত্র; গণতন্ত্র বিকৃত হইলে তাহাকে জনতাতন্ত্র বা জনতার শাসন বলা হয়।

এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে সাজান যাইতে পারে :

	স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র (Monarchy)	স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny)
কয়েকজনের শাসন	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)
বহু ব্যক্তির শাসন	গণতন্ত্র (Polity)	জনতাতন্ত্র (Democracy)

এ্যারিস্টটল যাহাকে Polity বলিয়াছেন, তাহাকেই বর্তমানে গণতন্ত্র বলে। Democracy শব্দটি এ্যারিস্টটল জনতার শাসন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সকলেরই যদি শাসনাধিকার থাকে তবে সে শাসন উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসনে (Mob Rule) পরিণত হয়। এ্যারিস্টটল সকলের শাসনকে বিকৃত রূপে কল্পনা করিয়াছেন, কারণ তাঁহার সময়ে শাসন বলিতে প্রত্যক্ষ শাসন বা আইন প্রণয়ন, আইন প্রচলন ও বিচার ব্যবস্থায় পূর্ণভাবে যোগদান বুঝাইত। সকলের প্রত্যক্ষ শাসনকে জনতার শাসন ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দেওয়া যায় না।

সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ (Modern Classification of Government) :

এ্যারিস্টটলীয় শ্রেণীবিভাগ আধুনিক কালে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। এ্যারিস্টটলের মতে গণতন্ত্র সরকারের এক বিকৃত রূপ, কিন্তু বর্তমান কালে গণতন্ত্র সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া গৃহীত। ইহা ব্যতীত আধুনিক সরকার মিশ্রভাবেও সংগঠিত হইতে পারে—রাজতন্ত্রের সহিত গণতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র মিশিয়া থাকিতে পারে। উপরন্তু, এ্যারিস্টটল যে অর্থে রাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা অতীতের বস্তু। কোন সুসভ্য দেশেই আজ সার্বভৌম শক্তি রাজার হস্তে নাই। রাজা যেখানে আছেন সেখানে তিনি প্রকৃত পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক রাজা। প্রকৃত ক্ষমতা থাকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের হস্তে। সুতরাং বর্তমানে রাজতন্ত্র গণতন্ত্রেরই নামান্তর এবং গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যায়। গণতন্ত্র প্রতিনিধিতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ায় উচ্ছৃঙ্খল জনতার

এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগের বর্তমান মূল্য

শাসনের ভয় আর নাই। সুতরাং গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা রূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে। এ্যারিস্টটলের অভিজাততন্ত্রও বর্তমানে অস্তিত্বহীন, যদিও অভিজাততন্ত্রের নীতির আংশিক প্রয়োগ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

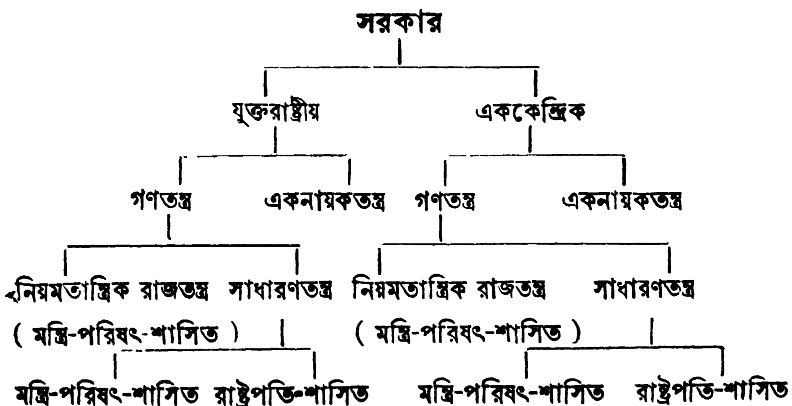
আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক কালে সরকারকে প্রথমতঃ গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রে ভাগ করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজা থাকিলে তাহাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং রাজা না থাকিলে তাহাকে সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র বলা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আবার মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত বা রাষ্ট্রপতি-শাসিত হইতে পারে। শাসনের প্রকৃত ভার মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তে থাকিলে তাহাকে মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত এবং রাষ্ট্রপতির হস্তে থাকিলে তাহাকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বলে।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

সরকার আবার এককেন্দ্রিক (Unitary) বা যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) হইতে পারে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্র বিভিন্ন অংশ বা প্রদেশে বিভক্ত হইতে পারে। কিন্তু এই অংশগুলির বা প্রদেশগুলির সরকার কেন্দ্রের প্রতিনিধি রূপে কার্য করে। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অংশ বা প্রদেশ অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু এই অংশ বা প্রদেশগুলির সরকার কোন অর্থেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি নয়। আপন আপন সীমার মধ্যে তাহারা স্বতন্ত্র।

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ এইভাবে দেখান যাইতে পারে।



রাজতন্ত্র (Monarchy) :

যে সরকারের চরম কর্তৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে তাহাকে রাজতন্ত্র বলে। পূর্বে অনেক সময় রাজারা নির্বাচিত হইতেন। তাহা হইলেও উত্তরাধিকার প্রথাই রাজতন্ত্রের প্রধান বিশেষত্ব।

রাজতন্ত্রকে সসীম অথবা নিয়মতান্ত্রিক (Limited or Constitutional) এবং স্বেচ্ছাচারী অথবা চরম বা অসীম (Absolute or Unlimited)—এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। চরম বা অসীম রাজতন্ত্রই প্রকৃত অর্থে রাজতন্ত্র এবং সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সংকীর্ণ অর্থে রাজতন্ত্র। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গণতন্ত্রেরই অপর নাম। সেখানে একজন কেবলমাত্র নামে অধিপতি আছেন। গণতন্ত্রের গুণাবলী ও এই ধরণের রাজতন্ত্রের গুণাবলী একই।

চরম ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Absolute and Constitutional Monarchy)

চরম রাজতন্ত্রের সাক্ষাৎ আজকাল পাওয়া না গেলেও ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই শাসন-ব্যবস্থার স্বপক্ষে অনেক কিছু বলিবার আছে। প্রাচীন কালে এই প্রকার সরকারই প্রচলিত ছিল। সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে মানুষকে ইহা আনুগত্যের শিক্ষা দিয়া রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা করিয়াছিল। অনেক সময় রাজাও আদর্শ। তাঁহার ব্রত ছিল প্রজারঞ্জন। চরম রাজতন্ত্রের দোষগুলিও উপেক্ষা করা যায় না। ইহার অন্তর্নিহিত গতি ছিল স্বেচ্ছাতন্ত্রের দিকে। উপরন্তু, রাজাকে আদর্শ বলিয়া কল্পনা করিলেও চরম রাজতন্ত্র কখনই অনুমোদন করা যায় না। সুশাসনই মানুষের পরম কাম্যবস্তু নয়; মানুষ স্বায়ত্তশাসনও চায়। চরম রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া ইহাকে কখনই সমর্থন করা যায় না।

চরম রাজতন্ত্র

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) :

অভিজাততন্ত্র বলিতে বুঝায় কয়েকজন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত সরকার, এবং এই কয়েকজন ব্যক্তি সাধারণতঃ অন্যান্য নাগরিক অপেক্ষা শিক্ষায়, অভিজ্ঞতায়, নৈতিক চরিত্রে এবং পারদর্শিতায় শ্রেষ্ঠ।

অভিজাততন্ত্রের সহজেই ধনিকতন্ত্রে বিকৃত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। ইহার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ এই যে, এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ শাসন পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত থাকে; ফলে তাহারা কোনরকম

রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। তারপর শাসনভার গ্রহণের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পাওয়া বা নির্বাচন করা অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক।

অভিজাততন্ত্রের কতকগুলি প্রকৃত গুণও আছে। ইহা পরিমাণ অপেক্ষা গুণকে, সংখ্যা অপেক্ষা চরিত্রকে অধিক প্রাধান্য দেয়। অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাকে ইহা উচিত মূল্য দেয়। ইহাতে গণতন্ত্রের আবেগ নাই, রাজতন্ত্রের চরম স্বেচ্ছাচারও নাই—কোনদিকেই অতিরিক্ততা নাই। অনতিরিক্ততাই অভিজাত-তন্ত্রের প্রাণ।

গণতন্ত্র (Democracy) ঃ

গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন এবং ইহার সংজ্ঞাও বিভিন্ন। গ্রীকদের নিকট ইহা ছিল বহু-ব্যক্তি-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে সিলী বলেন, যে শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই অংশ গ্রহণ করে তাহাই গণতন্ত্র। ডাইসীর মতে গণতন্ত্র এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা যেখানে সমগ্র জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ রাষ্ট্র পরিচালনা করে। লর্ড ব্রাইসের মতে ইহা এমন শাসন-ব্যবস্থা যেখানে শাসন-ক্ষমতা কোনও শ্রেণী-বিশেষ অথবা শ্রেণীসমূহের হস্তে ন্যস্ত না হইয়া সমগ্র দেশের নাগরিকদের উপর ন্যস্ত থাকে। গণতন্ত্রের শব্দগত অর্থ সর্বসাধারণের সাহায্যে শাসন পরিচালনা, কারণ "গণ" অর্থ সর্বসাধারণ। সেইজন্যই গণতন্ত্রকে জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। ইহা জনগণের কল্যাণার্থ জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন ("Government of the people, by the people, and for the people.")।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা

গণতন্ত্রকে জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা (Popular form of Government) বলা হয়

উক্ত সংজ্ঞাগুলির প্রত্যেকটি হইল রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা। গণতন্ত্র সামাজিক বা অর্থনৈতিকও হইতে পারে।* রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র বলিতে বর্তমানে সেই শাসন-ব্যবস্থাই বুঝায় যেখানে জনমতই চূড়ান্ত। এই জনমতের প্রকাশ হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। অতএব জনমত হইল কার্যক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর মত। নির্বাচক-

গণতন্ত্রে জনমতই চূড়ান্ত

* গণতন্ত্র শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। গণতন্ত্র বলিতে একপ্রকার সমাজ-ব্যবস্থা অথবা অর্থ-ব্যবস্থা অথবা শাসন-ব্যবস্থা বুঝাইতে পারে। গণতন্ত্রের যে রূপ দ্বারা সমাজ-ব্যবস্থা বুঝায় তাহাকে সামাজিক গণতন্ত্র এবং এরূপ সমাজকে গণতান্ত্রিক সমাজ বলা হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ

মণ্ডলী সর্বসাধারণকে লইয়া কখনও গঠিত হয় না। বয়স ভেদে, স্ত্রী-পুরুষ ভেদে, সম্পত্তি, শিক্ষা প্রভৃতির পার্থক্যের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারেও পার্থক্য থাকে। কার্যক্ষেত্রে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই গণতান্ত্রিক আদর্শ, কারণ গণতন্ত্র সকলের সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বা রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গণতান্ত্রিক আদর্শ

গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (Forms of Democracy):

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গণতন্ত্র (Direct and Indirect Democracy)

গণতন্ত্র দুই শ্রেণীর হইতে পারে: বিশুদ্ধ অথবা প্রত্যক্ষ (Pure or Direct Democracy) এবং প্রতিনিধিমূলক অথবা পরোক্ষ (Indirect or Representative Democracy)।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ সভায় জনমতের প্রকাশ এবং সংগঠন হয়। প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্রসমূহে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সপ্তাহান্তর বা পক্ষান্তর নাগরিক সম্প্রদায় কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন এবং কোন কোন সময় শাসন ও বিচারের ব্যবস্থাও করিত। কোন প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভা ছিল না। নাগরিকেরা সংখ্যায় অল্প হওয়ায় এবং রাষ্ট্রের সীমা ক্ষুদ্র নগরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার ফলে প্রাচীন গ্রীসে এই শাসন-পদ্ধতির প্রচলন সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমরা কোটি কোটি অধিবাসীতে পূর্ণ এবং সুবৃহৎ ভূখণ্ডে বিস্তৃত রাষ্ট্রে বাস করি। ফলে নাগরিকগণের পক্ষে কোনও বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া নিজ নিজ ভোটের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করা কার্যতঃ অসম্ভব, শাসন-কার্য পরিচালনা ও বিচারকার্যের ত কথাই উঠে না। সেই কারণেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমান যুগে অচল। একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডে ইহা আংশিকভাবে প্রচলিত আছে। আধুনিক

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিতন্ত্র

পূর্ণ সামাজিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'গণতন্ত্র' বলিতে গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক সাম্য বুঝাইলে ইহাকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বলা হয়। 'গণতন্ত্র' দ্বারা একপ্রকার শাসন-ব্যবস্থা বুঝাইলে ইহাকে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র এবং এইরূপ শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। গণতন্ত্র এইরূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, শুধু 'গণতন্ত্র' বলিতে রাষ্ট্রনৈতিক বা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই বুঝায়।

রাষ্ট্রসমূহে পরোক্ষ অথবা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রই দেখা যায়। আইন প্রণয়নের জন্য নাগরিকদের পক্ষে যে কেবল সমবেত হওয়া অসম্ভব তাহাই নহে, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে বিশাল জনতার পক্ষে রাষ্ট্রের জটিল সমস্যা লইয়া আলোচনা করাও সম্ভব নয়। সেইজন্যই কিছুদিন পর পর নাগরিকগণ নিজেদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করে, এবং এই প্রতিনিধিগণ তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় কার্য করে। প্রতিনিধিরা নাগরিকগণের ইচ্ছা ও প্রয়োজন জানেন এবং সেইজন্যই জনমতের অনুকূলে আইন পাশ করিতে চেষ্টা করেন। আবার এই প্রতিনিধিরা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এইভাবে নাগরিকগণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। সেইজন্যই এই শাসন-পদ্ধতিকে পরোক্ষ অথবা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বলে। নাগরিকগণ যদি প্রতিনিধিগণের কার্য অনুমোদনীয় মনে না করে তাহা হইলে পুনর্নির্বাচনে সেই প্রতিনিধিগণের নির্বাচিত হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে নাগরিকগণ প্রতিনিধিদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

যদিও আধুনিক কালে পরোক্ষ গণতন্ত্রেরই প্রচলন, তথাপি গণভোট (Referendum), প্রারম্ভিক ভাবে আইন প্রণয়ন বা গণ-উদ্যোগে আইন প্রণয়ন (Initiative) এবং পদচ্যুতি (Recall)—এই তিনটি ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নীতি পরিলক্ষিত হয়। প্রতিনিধিদের উপর নির্বাচকদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা এখনও অবলম্বন করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনমতই শাসন করে। কিন্তু একবার প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া গেলে জনমতের বিরুদ্ধেও সে কার্য করিতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে গণতন্ত্র অবাস্তব এবং অকার্যকর হইয়া পড়ে। পুনর্নির্বাচনে বাধা দান করাই নিরাপত্তার একমাত্র উপায় নয়, কারণ একবার নির্বাচিত হইলে প্রতিনিধি অনেক কিছু অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। সেইজন্যই উপরোক্ত পন্থাগুলির সাহায্যে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ

পদচ্যুতি এমন একটি পদ্ধতি যাহার প্রয়োগে জনমতের চাপে প্রতিনিধিকে পদত্যাগ করিতে হয়, অথবা পুনরায় নির্বাচকগণের ভোটপ্রার্থী হইতে হয়। ভোটদাতারা এই পদ্ধতির সাহায্যে যে প্রতিনিধিকে তাহারা চায় না তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। গণভোটের আক্ষরিক অর্থ জনগণের নিকট কোন কিছু পেশ করা। জনস্বার্থ

পদচ্যুতি (Recall)

সংরক্ষণের খাতিরে অনেক সময় শাসনসংক্রান্ত গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে গণভোট গৃহীত হইবে বলিয়া শাসনতন্ত্রে নির্দেশ থাকে। গণভোটের মূলনীতি হইল এই যে জনমত চূড়ান্ত ভাবে আইন-প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ করে। গণভোট দুই প্রকার হইতে পারে। কয়েকজন ভোটদাতার দরখাস্ত অনুসারে কোন বিষয় জনসমীপে উপস্থিত করা হইতে পারে; আবার ইহা বাধ্যতামূলক হইতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক আইনই গণভোটের সাহায্যে পাশ করাইতে হইবে, শাসনতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে। প্রারম্ভিক ভাবে আইন প্রণয়ন বা গণ উদ্যোগ এমন একটি পদ্ধতি যাহার প্রয়োগে কয়েকজন ভোটদাতা আবেদন করিয়া ব্যবস্থাপক সভাকে কোন বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ বা বাধ্য করিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকজন লোক আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদনের জন্য পেশ করে; ঐ অনুমোদন প্রাপ্তির পর পুনরায় ঐ খসড়া জনসমীপে উপস্থিত করা হয়।

গণভোট (Referendum)

প্রারম্ভিকভাবে আইন প্রণয়ন বা গণ উদ্যোগ (Initiative)

গণতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Democracy):

গুণ: তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। কোনও শাসন-ব্যবস্থার উপযোগিতা বিচার করিবার সময় দেখিতে হয় যে সেই শাসন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে কিরূপ অনুকূল। গণতন্ত্রকে এই দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলা যায়। গণতন্ত্রে শাসকগণ জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত ও জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল বলিয়া জনকল্যাণে যেরূপভাবে নিজদিগকে নিয়োজিত করেন, তাহা আর কোন শাসন-ব্যবস্থাতেই সম্ভব নহে। এই জন্যই অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে গণতন্ত্র ব্যতীত কোন শাসন-ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের আদর্শ উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহে।

১। তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ

জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা, কারণ ব্যক্তির অধিকার এবং স্বার্থ তখনই শ্রেষ্ঠভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে, যখন সে নিজের অধিকার রক্ষাকল্পে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম। স্বীয় অধিকার রক্ষার ভার

২। ইহা স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত

একমাত্র গণতন্ত্রই ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে। স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংগঠিত গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা।

গণতন্ত্র সাম্যের নীতিকেও সমর্থন করে, কারণ গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণের উপরই সাধারণের উন্নতি নির্ভরশীল। গণতন্ত্র এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং জাতিতে (Race) জাতিতে কোন ভেদ নাই। রাষ্ট্র কোন শ্রেণীর বা কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। রাষ্ট্রের সহিত সর্বসাধারণের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আত্মোপলব্ধির সুযোগ প্রদানের জন্য প্রত্যেককেই শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে দিতে হইবে—ইহাই গণতান্ত্রিক আদর্শ।

৩। ইহা সাম্যের নীতিকেও সমর্থন করে

গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার করা। ইহা বলিষ্ঠ এবং কর্মঠ নাগরিকদের শিক্ষাস্থল। প্রত্যেক মানুষকে ইহা আত্মশাসন শিক্ষা দেয় এবং সমাজকে স্বাবলম্বী এবং আত্মবিশ্বাসী করে। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রদান করিয়া গণতন্ত্র নাগরিকগণের গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান করে, তাহাদিগকে সামাজিক কার্যে যোগদানের জন্য উৎসাহ দেয় এবং তাহাদিগকে রাষ্ট্রের কার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়া তাহাদের দেশপ্রীতি আরও গভীর করে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির পর হইতেই মানুষের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ গৌরব উপলব্ধি করে এবং তাহার উপর কর্তব্য ন্যস্ত হইবার ফলেই তাহার মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যায়। জাতির বৃহত্তর জীবনে অংশ গ্রহণ না করিলে মানুষের রাজনৈতিক জীবন সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সমাজের বৃহত্তর জীবনে অংশ গ্রহণের ফলে তাহার দায়িত্বজ্ঞানও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সমাজ-জীবনও সুন্দর হইয়া উঠে।

৪। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার করে

৫। ইহা নাগরিকের দেশপ্রীতি গভীর করে; নাগরিককে দায়িত্বশীল করিয়া তোলে

পরিশেষে, গণতন্ত্র বিপ্লবের আক্রমণ হইতে অনেকাংশে মুক্ত। গণতন্ত্রের অধীনে জনগণ বুঝে যে সরকার এবং শাসন-ব্যবস্থা তাহাদেরই সৃষ্ট এবং কর্তৃত্বাধীন, মন্ত্রিমণ্ডলী ও কর্মচারীরা তাহাদেরই আজ্ঞাধীন। সেই কারণেই

৬। ইহা বিপ্লবের আক্রমণ হইতে অনেকাংশে মুক্ত

আইনসমূহ স্বেচ্ছায় পালন করা হয়। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করে যে রাষ্ট্র তাহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। এইজন্যই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় থাকে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সহজে বিপ্লব ঘটে না।

দোষ : তথাপি গণতন্ত্রের সমর্থনকারীদের মতের বিরুদ্ধ-সমালোচকেরও কখন অভাব হয় নাই। প্রাচীন কালের লেখকগণ অনেক সময় হয় রাজতন্ত্র না হয় অভিজাততন্ত্রের পক্ষ গ্রহণ করিয়া গণতন্ত্রকে উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসন বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন।

১। গণতন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে

আধুনিক সমালোচকেরা গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে মন্দ বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু ইহার কতকগুলি মূল ভিত্তির সমালোচনা করেন। গণতন্ত্র গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিক নির্ভরশীল—ইহাই প্রধান অভিযোগ। গণতন্ত্রে ভ্রান্ত ও মূর্খ সংখ্যাগরিষ্ঠ বুদ্ধি, কৃষ্টি ও নৈতিক চরিত্রে শ্রেষ্ঠ সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর কর্তৃত্ব করে।

২। ইহা গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিক নির্ভরশীল ; ইহা অকর্মণ্যের শাসন

প্রত্যেক নাগরিকের রাজনৈতিক কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সমান ক্ষমতা আছে, এই বিশ্বাসের উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আধুনিক সমাজের সমস্যাসমূহ অত্যন্ত জটিল। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু গণতন্ত্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপযুক্ত মর্যাদা এবং প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এইজন্যই সমালোচকেরা গণতন্ত্রের মধ্যে অকর্মণ্যতার বীজ লক্ষ্য করিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা অশিক্ষিত, অজ্ঞ এবং অকর্মণ্যের শাসন মাত্র। গণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ ও সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য লোকের শাসন-ব্যবস্থা, কারণ ঐ শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় সর্বাধিক।

গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। মেইন বলেন যে গণতন্ত্র "অত্যন্ত ভঙ্গুর" এবং গণতন্ত্রের স্থিতি কেবলমাত্র ক্ষণিকের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবী সেনাদল অথবা জনতা কর্তৃক তথাকথিত জনপ্রিয় সরকারের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক সরকার সুদৃঢ় নয় এইজন্য যে ইহা অজ্ঞ, মূর্খ জনসাধারণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩। ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান

✓আরও বলা হইয়াছে যে গণতন্ত্রে না হয় সুশাসন, না আছে অবাধ স্বাতন্ত্র্য। গণতন্ত্রের অধীনে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে অজ্ঞ জনসাধারণের হস্তে। সুশাসন অপেক্ষা দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার প্রতি তাহারা অধিকতর মনোযোগী।

৪। অনেকের মতে গণতন্ত্রে যে স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহা মিথ্যা

✓গণতন্ত্রে শাসিতের নিকট শাসকের দায়িত্ব থাকে বলিয়া ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। অনেকে মনে করেন যে এই দায়িত্ব অলীক কল্পনা মাত্র। যেখানে শাসক প্রত্যেকের নিকট দায়িত্বশীল সেখানে সে কার্যতঃ দায়িত্বহীন। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রত্যেকের নিকট দায়িত্ব অবশেষে দায়িত্বহীনতায় পরিণত হয়। শাসকের দায়িত্ব কার্যকর করিবার উপযুক্ত পদ্ধতি গণতন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

৫। অনেকের মতে গণতন্ত্রে শাসনের দায়িত্বশীলতা অলীক কল্পনা মাত্র

গণতন্ত্র অমিতব্যয় এবং অপচয়ের প্রশ্রয় দেয়। মিতব্যয়িতার দিকে গণতন্ত্রের মোটেই দৃষ্টি নাই। জনসাধারণের অর্থ সতর্ক ভাবে ব্যয় করিবার দিকে কাহারও দৃষ্টি থাকে না, মিতব্যয়িতা অপেক্ষা ব্যয়বাহুল্য দ্বারা জনপ্রিয়তা অর্জন করাই শাসকবর্গের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে বিরাট অর্থব্যয় হয়; অনেকে এই ব্যয়কেও অপব্যয় বলিয়া মনে করেন।

৬। ইহা অপচয়ের প্রশ্রয় দেয়

✓গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ এই যে ইহা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতির সহায়ক নয়। এই সকল বিষয়ে উন্নতির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না করিলেও গণতন্ত্র এগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতার জন্যই গণতন্ত্র মানুষের মানসিক উন্নতির পরিপন্থী। যে জনসাধারণ গণতন্ত্রকে পরিচালনা করে তাহাদের নিকট সাংস্কৃতিক প্রগতির কোনই মূল্য নাই। এই কারণেই বলা হয় যে গণতন্ত্রে জনসাধারণের দোষাবলী সামাজিক জীবনে সংক্রামিত হয় এবং প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আত্মবিকাশের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। গণতান্ত্রিক সভ্যতা বন্য, সাধারণ এবং স্থূল ("banal, mediocre and dull")। সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে প্রতিভার অপমৃত্যু গণতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম প্রধান কুফল।

৭। ইহা মানসিক উন্নতির পরিপন্থী

✓ অনেক সমাজতান্ত্রিক লেখকের মতে গণতন্ত্র পুঁজিবাদেরই প্রশ্রয় দেয়। তত্ত্ব অনুসারে গণতন্ত্র সর্বসাধারণের সরকার; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় পুঁজিপতিদের স্বার্থের অনুকূলে। গণতন্ত্রে থাকে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য; কিন্তু যতক্ষণ অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা না হয় ততক্ষণ রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য মূল্যহীন।

৮। অনেকের মতে ইহা পুঁজিবাদেরই প্রশ্রয় দেয়

✓ সর্বশেষে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলা যায় যে বিপৎকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনে ইহার কার্যক্ষমতা অন্যান্য শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা কম। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিচালকের সংখ্যা বহু। সুতরাং প্রতি পদে আলোচনা ও আপোষের প্রয়োজন হয়। এই আলোচনা ও আপোষ শাসনযন্ত্রকে মন্থরগতি করিয়া তুলে।

৯। গণতন্ত্রে শাসনতন্ত্র মন্থরগতি হয়

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে? (Conditions of Success of Democracy):

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, গণতন্ত্র পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ। ইহার সাফল্য কতকগুলি অবস্থার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। মিলের মতে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়:—(১) গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা জনসাধারণের থাকা বিশেষ প্রয়োজন। (২) ইহা রক্ষার জন্য জনসাধারণকে সংগ্রাম করিতে হইবে। (৩) প্রত্যেকে তাহার কর্তব্য পালন করিতে ইচ্ছুক এবং সমর্থ হইবে এবং স্বীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ হইলে উহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। মিল কর্তব্য পালনের ও অধিকার রক্ষার ক্ষমতার উপর বেশী জোর দিয়াছেন।

গণতন্ত্রের সাফল্য কতকগুলি অবস্থার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে

মিলের মত

যাহার উচ্চ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা এবং অভিজ্ঞতা আছে কেবল মাত্র সে-ই এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে। মিল যে তিনটি গুণের নির্দেশ দিয়াছেন তাহা থাকিলে নাগরিককে গণতান্ত্রিক নাগরিক বলা যায়। সুতরাং এক কথায় গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক নাগরিকের।

১। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক নাগরিকের

আমরা আরও কয়েকটি অবস্থার উল্লেখ করিতে পারি। গণতন্ত্র এমন এক শাসন-ব্যবস্থা যেখানে জনমতই প্রকৃত শাসক। সেই কারণেই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত জনমতের বিশেষ প্রয়োজন। সুষ্ঠু ভাবে জনমতের প্রকাশের ব্যবস্থা চাই এবং শাসন এমন ভাবে পরিকল্পিত হইবে যেন তাহার সাহায্যে এই জনমত শাসক শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

২। সুষ্ঠুভাবে জনমত প্রকাশের ব্যবস্থাও চাই

সংজ্ঞা অনুসারে গণতন্ত্র সর্বসাধারণের সরকার হইলেও কার্যতঃ ইহা পরিচালিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনা করে সর্বসাধারণের স্বার্থের অনুকূলে। সুতরাং সকলেরই পক্ষে প্রয়োজন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকা। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে বিরামবিহীন সংঘর্ষ থাকিলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠও যদি সংখ্যালঘিষ্ঠের ন্যায্য অধিকার রক্ষা না করে তাহা হইলেও গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না।

৩। সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে আপোষ ও সহযোগিতাও প্রয়োজন

গণতন্ত্রকে যদি স্থায়ী করিতে হয় তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা অপরিহার্য। লোকে যদি দৈনন্দিন অভাবের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত থাকে তবে তাহার পক্ষে রাষ্ট্রীয় সমস্যা লইয়া চিন্তা করাও সম্ভব হয় না এবং তাহার নিকট রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারও অর্থহীন। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে এমনি সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে যেখানে অর্থনৈতিক অসাম্য থাকিবে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে শুধু রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না; সফলতার জন্য ইহাকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৪। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান অপরিহার্য

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) ঃ

একনায়কতন্ত্রের অর্থ এক ব্যক্তির শাসন। একনায়কই রাষ্ট্রের চরম কর্তা এবং সর্ববিষয়ে চরম ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। ইতিহাসে এই শ্রেণীর শাসন-ব্যবস্থা নূতন নহে। চরম রাজতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের প্রাচীন উদাহরণ।

একনায়কতন্ত্রের অর্থ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া, ইটালী, জার্মাণী, স্পেন এবং কয়েকটি

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্রের* আবির্ভাব হয়। অবশ্য এই একনায়কতন্ত্র চরম রাজতন্ত্রের অবিকল প্রতিফলিত রূপ নয়। প্রাচীন কালে চরম রাজতন্ত্রে কোনও প্রকার জনমতের সমর্থন ছিল না, কিন্তু আধুনিক একনায়কদের পশ্চাতে এক শ্রেণীর বহু লোকের যথেষ্ট সমর্থন আছে। প্রাচীন রাজারা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য সম্মানিত হইতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা ভগবৎসৃষ্ট শাসক বলিয়া অভিহিত হইতেন। প্রাচীন রাজগণেব কোন দল ছিল না। আধুনিক একনায়কগণের প্রত্যেকের নিজস্ব দল আছে। এই কারণেই একনায়কত্বের মধ্যে গণতান্ত্রিকতার কিঞ্চিৎ আভাস আছে। আধুনিক একনায়কগণ বিপ্লবের সাহায্যে অথবা নির্বাচনের ফলে রাষ্ট্রশাসনেব ক্ষমতা করায়ত্ত করেন।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের অনেকাংশে পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী এবং রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থান স্বীকার করে, ইহাতে কাল্পনিক রাষ্ট্রীয় আদর্শেব নিকট ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হয় না। একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় আদর্শের নিকট বলি দেওয়ারই পক্ষপাতী। জার্মাণীর নাৎসীবাদ (Nazism) এবং ইটালীর ফ্যাসিবাদ (Fascism) জাতিকে রাষ্ট্রেব সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিত। নাৎসীগণ ও ফ্যাসিবাদীগণ সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের (Totalitarian State) প্রবর্তক, তাহাদের নিকট রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব অবাস্তব।

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার এবং অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে দমন করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে বিরোধী দলের এত মূল্য ও গুরুত্ব, একনায়কতন্ত্রে তাহা প্রগতির পরিপন্থী, অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়।

তৃতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্র হিংসায় বিশ্বাস করে। গণতন্ত্রে আভ্যন্তরীণ বিবাদ আছে; দলীয় বিরোধ কিন্তু পরিচালিত হয় যুক্তির সাহায্যে, ভোটের সাহায্যে, গুলির সাহায্যে নয়। একনায়কতন্ত্রে কিন্তু গুলির গর্জন সর্বত্র; বিরোধের অর্থই অপরাধ এবং অপরাধীর সমূলে বিনাশসাধনই রাষ্ট্রনায়কের নীতি। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া একনায়কতন্ত্রের স্বপক্ষে মিথ্যা জনমত সৃষ্টি করা হয়, বিরোধী দলকে মত প্রকাশের কোন সুযোগই দেওয়া হয় না। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায়, গণতন্ত্রের গুণাবলীই হইল একনায়কতন্ত্রের দোষ এবং গণতন্ত্রের দোষাবলীই হইল একনায়কতন্ত্রের উৎকর্ষের লক্ষণ।

মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত গণতান্ত্রিক সরকার (Cabinet form of Democratic Government) :

ইহা Parliamentary অথবা দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) নামেও পরিচিত হইয়া থাকে। ইহা এমন একটি সরকার যেখানে শাসনকার্য মন্ত্রি-পরিষৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। মন্ত্রি-পরিষৎই এখানে আসল শাসন বিভাগ। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ মনোনীত হন। প্রত্যেকটি কর্ম এবং নীতির জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী ব্যবস্থাপক সভার নিকট প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী থাকেন।

মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত সরকারে মন্ত্রি-পরিষৎই আসল শাসন বিভাগ

প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপক সভার নিকট শাসন বিভাগের দায়িত্বশীলতাই এই সরকারের বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই ইহাকে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা বলে। অনাস্থা প্রস্তাব (Vote of no confidence), প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (Interpellation), নিন্দা প্রস্তাব (Vote of Censure), বিল অনুমোদনে বিরুদ্ধাচরণ (Refusal to pass bill) প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে ব্যবস্থাপক সভা মন্ত্রিসভার দায়িত্ব কার্যকর করে, অর্থাৎ এই পদ্ধতিসমূহের সাহায্যে শাসন বিভাগকে ব্যবস্থা বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। পার্লামেণ্টের প্রাধান্য এইভাবেই রক্ষিত হয়। এই কারণেই ইহাকে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থাও বলে।

ব্যবস্থা বিভাগের নিকট মন্ত্রি-পরিষদের দায়িত্বশীলতা এই সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য

ইহাকে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থাও বলে

পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় নামসর্বস্ব শাসনকর্তা ও প্রকৃত শাসনকর্তার মধ্যে পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ শাসনকার্য যাঁহার নামে পরিচালিত হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে শাসন করেন না, শাসনভার থাকে মন্ত্রিবর্গের উপর। মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুসারেই নামসর্বস্ব শাসনকর্তা শাসনকার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই নামসর্বস্ব শাসনকর্তাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা (Constitutional Head) বলা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি, ইংলণ্ডের রাজা (বা রাণী) হইলেন এই ধরণের নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তাঁহাদের পদের মর্যাদা আছে; কিন্তু তাঁহাদের কোন কর্তৃত্ব নাই, সুতরাং দায়িত্বও নাই।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য :
১। নামসর্বস্ব শাসনকর্তা ও প্রকৃত শাসনকর্তার পার্থক্য

মন্ত্রিগণ সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে মনোনীত হন। মন্ত্রি-পরিষদে একজন করিয়া প্রধান মন্ত্রী থাকেন। সাধারণতঃ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত হন। ইংলণ্ড, ভারত ছাড়াও ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, পাকিস্থান প্রভৃতি দেশে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

২। মন্ত্রিগণ সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে মনোনীত হন
৩। মন্ত্রিপরিষদে একজন প্রধান মন্ত্রী থাকেন

মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত সরকারের গুণাগুণ (Merits and Defects of Cabinet Government) ঃ

গুণ ঃ মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত সরকারে শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে গভীর যোগাযোগ থাকে। এই যোগাযোগের ফলে শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হয়। শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হওয়ার অর্থ উৎকৃষ্ট এবং সুচিন্তিত আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালিত হওয়া। শাসন বিভাগের নির্দেশ অনুসারে রচিত আইনই শ্রেষ্ঠ আইন হইতে পারে, কারণ শাসন পরিচালনা উপলক্ষে শাসন বিভাগের নায়কগণ জনসাধারণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত থাকেন। শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ এবং সহযোগিতা না থাকিলে জনহিতকর আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

১। মন্ত্রি-পরিষৎ শাসিত সরকারে শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হয়

শাসন বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবার ফলে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। মন্ত্রিমণ্ডলীর স্বেচ্ছাচার বা অত্যাচারের আভাস পাওয়ামাত্রই ব্যবস্থাপক সভা উহার অপসারণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। বিরোধী দল সরকারী কার্যের সমালোচনা করিয়া মন্ত্রিগণকে সংযত রাখে। এই বিরোধী দলকে স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ রূপে গণ্য করা হয়।

২। শাসন বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবর্গ মন্ত্রিগণকে শাসন-সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে নিয়মিত প্রশ্ন করিয়া থাকেন। মন্ত্রিগণকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এই প্রশ্নোত্তর হইতে জনসাধারণ শাসন সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে।

৩। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার করে

মন্ত্রি-পরিষৎ-পরিচালিত সরকারের শাসনকর্তাদের সহজেই পরিবর্তন করা যায় বলিয়া সংকটকালে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়। যুদ্ধের সময় মন্ত্রিগণের সংখ্যা কমাইয়া শাসনতন্ত্রকে জরুরী অবস্থায় অধিকতর কার্যকর করিয়া তোলা যায়।

৪। ইহা সহজে পরিবর্তন-যোগ্য

ত্রুটি ঃ মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত সরকারের সমালোচকদের মতে এই শাসন-ব্যবস্থা ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে অস্বীকার করে বলিয়া ইহাকে কোনক্রমেই অনুমোদন করা যায় না। এই যুক্তির সারবত্তা পূর্বে হয়তো কিছু ছিল, কিন্তু আজ আর নাই। আমরা দেখিয়াছি যে জন-কল্যাণের নিমিত্ত শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত আধুনিক কালে ক্ষমতা বিভাজন নীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না।

১। ইহা ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে অস্বীকার করে

কিন্তু মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত সরকারের আরও অনেক ত্রুটি আছে। এই শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় নয়। ব্যবস্থাপক সভার অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে মন্ত্রিমণ্ডলী অপসারিত হয় এবং অন্য একটি মন্ত্রিমণ্ডলী সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি ও কার্যপদ্ধতি লইয়া উহার স্থান অধিকার করে। এইজন্য মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত রাষ্ট্রে স্বরাষ্ট্র সংক্রান্ত বা বৈদেশিক, কোন ব্যাপারেই একটি দীর্ঘকাল অনুসৃত নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না।

২। ইহাতে দীর্ঘকাল অনুসৃত নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না

এই শাসন-ব্যবস্থা দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাজনৈতিক ক্ষমতা একচেটিয়া ভাবে অধিকার করিতে পারে। আধুনিক কালে দলীয় শৃঙ্খলা কঠোরভাবে অনুসৃত হয়; দলের সভ্যগণ নেতার নির্দেশ এবং দলীয় নীতি অন্ধভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকে। এই কারণে যখনই কোনও মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়, তখন ব্যবস্থাপক সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীদের অনুসৃত কার্যাবলীর সংশোধন করা অপেক্ষা মন্ত্রিসভাকে পতন হইতে রক্ষা করা অধিকতর প্রয়োজন মনে করে। ইহারই ফলস্বরূপ স্বৈরাচারী মন্ত্রিসভার উদ্ভব হয়। লর্ড হিউয়ার্ট ইহাকে নব্য স্বৈরাচার (New Despotism) বলিয়াছেন।

৩। ইহা দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হইতে পারে

৪। নব্য স্বৈরাচার

মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থা ও জাতীয় সংকটের সময় অবিলম্বে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন হয়। মন্ত্রিসভায় অনেকগুলি সদস্য থাকার ফলে তাঁহাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনায় সময় নষ্ট হয় এবং কার্যে অযথা বিলম্ব হয়। জাতীয় জীবনে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে সাহস ও ক্ষিপ্রতাই সাফল্যের ভিত্তি। বহু ব্যক্তির সহযোগিতায় ও বহু মনের সংযোগে সংগঠিত মন্ত্রিসভা ধীরে ধীরে, সতর্কভাবে কার্য করিতে বাধ্য হয়; ফলে সাহস ও ক্ষিপ্রতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই অভিযোগের গুরুত্ব এখন অনেক হ্রাস পাইয়াছে, কারণ দুইবার বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের যুদ্ধ-মন্ত্রি-পরিষৎ (War Cabinet) দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

৫। এই শাসন-ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়

রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতান্ত্রিক সরকার (Presidential form of Democratic Government) ঃ

ইহা এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা যেখানে শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট (President) আখ্যাধারী এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা থাকেন না। রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের পতি, শাসন বিভাগেরও কর্তা। তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য একদল মন্ত্রী থাকেন; কিন্তু মন্ত্রিগণ তাঁহার সাহায্যকারী এবং অধীন কর্মচারী মাত্র। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিবর্গের উপদেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য নহেন। মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারেন না; ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়িত্বশীলও তাঁহারা নহেন। তাঁহাদের দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট। রাষ্ট্রপতি যে কোন মুহূর্তে তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন। সাধারণতঃ রাষ্ট্রপতি নিজ দল হইতেই মন্ত্রিগণকে মনোনীত করেন।

বৈশিষ্ট্য ঃ নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা থাকে না

মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির অধীন কর্মচারী মাত্র

রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী নহেন। ব্যবস্থা বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের এই দায়িত্বহীনতাই রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকারকে মন্ত্রি-পরিষৎ-পরিচালিত সরকার হইতে পৃথক করে। রাষ্ট্রপতি কয়েক বৎসরের জন্য

রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী নহেন

নির্বাচিত হন এবং শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত বা দুর্নীতিমূলক কোন কার্য না করিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় না।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে অনুসরণ করা হয়

স্মরণ রাখিতে হইবে যে শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদ থাকিলেই সরকার রাষ্ট্রপতি-শাসিত হয় না। যেমন, ভারত ও ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায় সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের গুণাগুণ (Merits and Defects of Presidential form of Government) :

গুণ : মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত সরকারের ত্রুটির মধ্যেই নিহিত আছে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের গুণাবলী। কর্মকর্তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপসারণ করা যায় না বলিয়া ইহার স্থায়িত্ব অনেক বেশী। অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের পতন ও সঙ্গে সঙ্গে শাসননীতির পরিবর্তন হয় না। মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত সরকারে যে স্থায়িত্বের অভাব তাহা রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় থাকে না।

১। এই শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব অনেক বেশী

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের অনুসৃত কার্যধারা ও নীতির মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা থাকে। নিন্দা-প্রস্তাব, অনাস্থা-প্রস্তাব প্রভৃতির ফলে শাসননীতির আকস্মিক পরিবর্তন সম্ভব নয় বলিয়া শাসন বিভাগ নিজের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সঙ্গত, অবিচ্ছিন্ন কার্যধারা অনুসরণ করিতে পারে। ইহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বাড়ে এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পরিকল্পনা অনুসারে উন্নতি সম্ভব হয়।

২। সরকারের অনুসৃত কার্যধারা ও নীতির মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা থাকে

জরুরী অবস্থার পক্ষে রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার বিশেষ কার্যকর। সমস্ত শাসন-ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে থাকে; তিনি ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কাহারও সহিত আলোচনা করিতে তিনি বাধ্য নহেন। সুতরাং তিনি সহজেই ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য করিতে

৩। জরুরী অবস্থায় বিশেষ কার্যকর ও শান্তিপূর্ণ

পারেন। আমেরিকানদের নিকট এই ব্যবস্থা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ মনে হয়, কারণ ইহার ফলে শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই।

ত্রুটি : য়ুরোপীয়দের নিকট কিন্তু এই ব্যবস্থা স্বৈরাচারী, দায়িত্বহীন এবং বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী হইতে, এমন কি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন। পদে আসীন থাকিবার কালে রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পদচ্যুত করা যায় না; ইহার ফলে তিনি খুসীমত কাজ করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভা ও জনসাধারণের নিকট রাষ্ট্রপতির কার্যাবলী অসঙ্গত মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা সংশোধনের কোনও পন্থা নাই। এই কারণেই এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়, ফলে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা বানচাল হইবার উপক্রম হয়। ইহাই এই ব্যবস্থার বিপদ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা বহুদিন পূর্বেই অচল হইয়া যাইত, যদি না বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভবের ফলে শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে পরোক্ষ সংযোগ স্থাপিত হইত।

১। য়ুরোপীয়গণ এই শাসন-ব্যবস্থা স্বৈরাচারী, দায়িত্বহীন ও বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে

এই শাসন-ব্যবস্থা এক অর্থে দায়িত্বহীন, কারণ শাসন বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত। নীতির দিক হইতে প্রধান কর্মকর্তা (Executive Head) জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল, কিন্তু কার্যতঃ এই দায়িত্ব পালন না করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় না। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে পুনর্নির্বাচনে অসম্মতি জ্ঞাপন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভোটদাতাগণ তাঁহার কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ক্ষমতা বিভাজন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ না হইয়া স্বাধীনতার পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে।

২। এই শাসন-ব্যবস্থা এক অর্থে দায়িত্বহীন

৩। ক্ষমতা বিভাজন স্বাধীনতার পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Unitary form of Government) :

যে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত থাকে তাহাকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলে। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ব্রিটিশ

ভারত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ছিল। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাও এইরূপ। এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় বা সমগ্র দেশের সরকারের হস্তে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিতে পারে এবং অংশগুলির হস্তে কিছু কিছু স্বায়ত্তশাসনের ভার তুলিয়া দিতে পারে। এই অংশগুলির সরকারকে স্থানীয় সরকার বলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছামত স্থানীয় সরকারের এলাকা ও ক্ষমতা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই ধরণের ক্ষমতা বণ্টনকে বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization) বলা হয়। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রের অনুগ্রহেই প্রাপ্ত। কেন্দ্র ইচ্ছা করিলে সমস্ত ক্ষমতাই স্থানীয় সরকারের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে পারে।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের হস্তে থাকিলে তাহাকে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলে

স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি মাত্র

গুণ : এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ এই যে ইহার আইন, সরকারী নীতি এবং শাসন পরিচালনা সমগ্র দেশব্যাপী অখণ্ড ভাবে অনুসৃত হইতে পারে। ইহাতে একই আইন দুইবার করিয়া প্রণয়ন করিবার এবং একই কার্য দুইবার করিবার প্রয়োজন হয় না। ফলে শাসন-ব্যবস্থায় সারল্য থাকে এবং ব্যয় হ্রাস করা যায়।

১। শাসন-ব্যবস্থায় সারল্য,
২। ব্যয় হ্রাস, এবং
৩। শাসন পরিচালনায় দৃঢ়তা

ইহা ব্যতীত এই ব্যবস্থায় শাসন পরিচালনায় দৃঢ়তা থাকে এবং তাহা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রে সংরক্ষিত হইবার ফলে আইনের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকে না এবং এমন কোন নীতি গৃহীত হয় না যাহা দেশে বিভেদের সৃষ্টি করিতে পারে।

ত্রুটি : এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার বিশেষ ত্রুটি এই যে ইহা স্থানীয় অংশগুলিকে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখে। যে স্বায়ত্তশাসনের ভার স্থানীয় সরকারের উপব থাকে তাহা তাহারা মৌলিক অধিকার বলে পায় না, কেন্দ্রের অনুগ্রহেই পায় এবং শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয় কেন্দ্রেরই তত্ত্বাবধানে। এই কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানের জন্য স্থানীয় লোকের কার্যে উৎসাহ থাকে না ; ফলে জাতীয় জীবনও সমৃদ্ধ হইতে পারে না।

১। স্থানীয় লোকের শাসন-কার্যে উৎসাহের অভাব

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের এক অংশে রাজধানীতে অবস্থিত থাকে। ইহার পক্ষে সুদূর অংশসমূহের স্থানীয় সমস্যা ও ইচ্ছা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও ঐ অংশগুলির সমুদয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করা কার্যতঃ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আরও বলা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এত জটিল জাতীয় সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব থাকে যে ইহার পক্ষে অংশসমূহের স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও তাহাদের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। এই কারণে স্থানীয় অংশগুলিকে ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। অংশগুলির ক্ষতির ফলে জাতীয় জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ অংশগুলি লইয়াই জাতীয় জীবন।

২। স্থানীয় সমস্যার সমাধানে ত্রুটি

স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে অপরের উপর নির্ভরশীল না হওয়া মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি। এককেন্দ্রিক সরকার এই প্রবৃত্তিকে দমন করে। ফলে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না।

৩। ইহা স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিকে দমন করে

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Federal form of Government) :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র দ্বারা সমগ্র দেশের সরকার বা কেন্দ্র এবং অংশসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত করিয়া দেওয়া হয়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে। স্থানীয় অংশগুলি কেন্দ্রের দয়ার উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র এবং অংশ (Unit)—উভয়ই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট ও পৃথক্ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অংশগুলিকে যে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় তাহা কেন্দ্রের ইচ্ছায় কোন মতেই সংকুচিত বা অপসারিত করা যায় না। কেন্দ্র এবং অংশগুলি—উভয়েই শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট সীমা ও ক্ষমতার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। ইহাই যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে মূল পার্থক্য।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত আছে। বর্তমানে ভারতের শাসন-ব্যবস্থাও যুক্তরাষ্ট্রীয় হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অংশসমূহ সাধারণতঃ রাজ্য (State) নামে অভিহিত হয়। কোন কোন সময় তাহাদিগকে প্রদেশও (Province) বলে। কানাডার অংশগুলিকে প্রদেশ বলে।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কিরূপে ? (How does a Federation come into being ?)

ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য দুইটি অবস্থার অস্তিত্বের প্রয়োজন :— (১) পাশাপাশি এমন কতকগুলি স্বাধীন এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থাকিবে যাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে একটা জাতীয় ভাবের অস্তিত্ব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। (২) এই রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সহিত মিলিতে চাহিবে, কিন্তু মিলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিবে না। এই দুইটি অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা।

ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান

কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) ও কেন্দ্রাভিগামী (centripetal)—উভয় প্রকার শক্তিই যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে। যখন কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একীভূত হয়, তখন কেন্দ্রাভিগামী (centripetal) শক্তি কার্য করে। এই সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্র মিলিত হইয়া একটি কেন্দ্রীয় বা সমগ্র দেশের সরকারের প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহার হস্তে কতকগুলি সাধারণ কার্য অর্পণ করে। কিন্তু ঐ সকল সাধারণ কার্যের সীমা-রেখার বাহিরে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে। আমেরিকা, কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় এই ভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছিল। অন্যভাবে একটি রাষ্ট্র বিখণ্ডিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হইতে পারে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র অনেকাংশে বর্তমান যুগের অনুপযোগী হইবার ফলে কেন্দ্র এবং অংশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া উহাকে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) শক্তি কার্য করে। ১৯৩৫ সাল হইতে ভারতের জন্য পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রে উভয় শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। দেশীয় রাজ্যসমূহের একত্রীকরণে কেন্দ্রাভিগামী শক্তি কার্য করিয়াছে এবং ব্রিটিশ ভারতকে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ বা রাজ্যসমূহে বিভক্ত করার ব্যাপারে কেন্দ্রাতিগ শক্তি কার্য করিয়াছে।

কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগামী—উভয় প্রকার শক্তিই যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Federation) ঃ

প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র দেশের সরকার বা কেন্দ্র এবং অংশসমূহের মধ্যে শাসন-ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা বণ্টিত থাকে। ক্ষমতা এইরূপ ভাবে বণ্টিত না হইলে শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক আখ্যা দিতে হইবে। ক্ষমতা বণ্টনের মূলনীতি এই যে, যে সমস্ত বিষয় জাতীয় স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং যেগুলির পরিচালনার ব্যাপারে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন তাহা কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত থাকে ; স্থানীয় স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অংশের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

১। শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতার বণ্টন

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রই চরম আইন। অর্থাৎ কেন্দ্র বা অংশের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন করা যায় না। এইরূপ শাসনতন্ত্রকে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Rigid Constitution) বলে। শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে হইলে লিখিত হওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু, অলিখিত শাসনতন্ত্রে অস্পষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা থাকে। ইহাতে কেন্দ্র ও অংশের বিরোধের সম্ভাবনা বেশী থাকে। সেই জন্যও সুস্পষ্ট এবং লিখিত শাসনতন্ত্র প্রয়োজন।

২। শাসনতন্ত্রের চরমতা—দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুস্পষ্ট লিখিত শাসনতন্ত্র

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের তত্ত্বাবধান ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য সাধারণতঃ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে দুই ধরণের সরকার থাকে—কেন্দ্রীয় সরকার এবং অংশগুলির সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার ও কোন অংশের সরকারের মধ্যে বা দুই বা ততোধিক অংশের সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। এই বিরোধের মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। যাহাতে কেন্দ্র ও অংশ উভয়ই শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কার্য করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে, এবং এই সীমা অতিক্রম করিলে তাহা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে। এই ভাবে শাসনতন্ত্রকে পবিত্র এবং সযত্নে রক্ষণীয় ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ইহার ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক (Interpreter and Guardian) হিসাবে কাজ করে।

৩। সাধারণতঃ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করে

যুক্তরাষ্ট্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Federation) ঃ

গুণ ঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সহিত জাতীয় ঐক্যের সঙ্গতি রক্ষা আর কোন শাসন-ব্যবস্থা এরূপ সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না। ইহা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে এবং তাহাদের বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দান করে। সেই জন্যই এই ব্যবস্থা বিশাল দেশসমূহ শাসনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী—বিশেষতঃ যে দেশে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজমান।

১। স্বায়ত্তশাসনের সহিত জাতীয় ঐক্যের সমন্বয় সাধনে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা

ভারতবর্ষকে উদাহরণস্বরূপ লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার উপরোক্ত গুণ বিচার করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ স্থানীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি বিশাল দেশ। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ধর্মের দিক হইতে ভারতবর্ষ পরস্পর-বিরোধী বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ভাষার দিক হইতেও ভারতবর্ষ বহুধা বিভক্ত। যদিও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ঐক্য আছে তথাপি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের আথিক স্বার্থে পার্থক্য আছে। আবার ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যও অস্বীকার করা যায় না। এই অবস্থায় ভারতের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। তাই ১৯৩৫ সাল হইতে শাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কর্মবিভাগ (division of functions) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হয়। সুদূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় অংশের সমস্যা সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি জটিল জাতীয় সমস্যার প্রতি নিবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহা স্থানীয় অভাব অভিযোগের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে পারে না। কর্মবিভাগের ফলে কেন্দ্রে কাজের চাপ কমিয়া যায় এবং শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হয়।

২। কর্মবিভাগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হয়

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ একত্রিত হইয়া শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিতে

পারে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ভয়ে আধুনিক কালে প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রই শঙ্কিত। যদি এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সম্মিলিত হইয়া বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তবেই তাহাদের স্বাধীনতা, সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষিত হইতে পারে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ফলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে নিজের সার্বভৌমিকতা অনেকাংশে বিসর্জন দিতে হইবে, কিন্তু নূতন শক্তি লাভ এবং মর্যাদা বৃদ্ধি এই ক্ষতি পূরণ করিবে।

৩। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ একত্রিত হইয়া শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে

দ্বিতীয় মহাসমরই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস প্রভৃতি ক্ষুদ্র এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলি যদি প্রতিবেশীদেব সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করিয়া কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত হইত, তবে হয়ত তাহারা জার্মানী ও ইটালীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিত। এইজন্যই যুক্তরাষ্ট্র গঠন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির আত্মবক্ষার একমাত্র পথ।

দ্বিতীয় মহাসমর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করিয়াছে

গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে মতবাদ ধীরে ধীরে স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে। মধ্য যুগের লক্ষ্য যেমন ছিল সামন্ততন্ত্রের দিকে, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর লক্ষ্য যেমন ছিল চরম রাজতন্ত্রের দিকে, তেমনি আধুনিক কালের লক্ষ্য হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ এতই বেশী যে অনেকে বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনাও করিয়া থাকেন। অনেক দার্শনিকের মতে বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনয়ন করিবে।

বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

ত্রুটি ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি আছে। কেন্দ্র এবং অংশসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বিভক্ত হইবার ফলে জাতীয় শক্তি হ্রাস পায়। একই সমস্যা সম্বন্ধে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আইন থাকিতে পারে। ইহার ফল বিরোধ। সমুদয় সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে একই রকম আইন প্রযুক্ত না হইলে প্রভূত অসুবিধা এবং বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। আইনের বিভিন্নতা শাসন-ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নানাবিধ জটিলতার উৎস।

১। ইহাতে জাতীয় শক্তি হ্রাস পায়। ২। ইহা নানাবিধ বিরোধ ও জটিলতার উৎস

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে কেন্দ্র ও অংশের

মধ্যে অধিকার সম্পর্কিত বিরোধ প্রায়ই ঘনীভূত হয়। পৃথক হইবার অধিকার (right of secession) সম্পর্কিত দাবীও ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ রাষ্ট্রসমূহের পৃথক হইবার দাবী আমেরিকার গৃহযুদ্ধে পরিণতি লাভ করে।

তৃতীয়তঃ, পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় দুর্বলতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম ত্রুটি। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে কেন্দ্র, কিন্তু সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অধিকাংশ সময় প্রয়োজন অংশগুলির সহযোগিতার।

৩। ইহা পররাষ্ট্রনীতি-পরিচালনা ব্যাপারে দুর্বল

ধরা যাউক, কেন্দ্র অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল, কিন্তু অংশগুলির বিরোধিতার জন্য চুক্তি পালন করিতে পারিল না। পরবর্তী সময়ে এইরূপ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার পূর্বে কেন্দ্র বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য করিবে। ফলে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

৪। ইহা ব্যয়বহুল

পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনের জন্য ব্যয় অনেক কম।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the main features of a Federal Government? Discuss its merits and demerits. (C. U., 1939) (১৪৮, ১৫০-১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ)

2. "The greatest lesson of this war is that Federation is the only means of saving the sovereignty of small nations, and this principle applies to India with redoubled force." Discuss this statement. Indicate the merits of the federal form of Government. (C. U., 1942) (১৫১-১৫২ পৃষ্ঠা দেখ)

3. "Many political thinkers look upon Federation as the key to the organisation of a world State." (C. U., 1943) (১৫২ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Compare the advantages and disadvantages of a Unitary State with those of a Federal State. (C. U., 1945) (১৪৬-১৪৮,১৫১-১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ)

5. How will you distinguish Unitary Government from Federal Government? Illustrate your answer. (C. U., 1952) (১৪৬-১৪৮ পৃষ্ঠা দেখ)

6. Distinguish between Direct and Indirect Democracy. What are the conditions for the success of modern Democracy? (C. U., 1945) (১৩২-১৩৪, ১৩৮-১৩৯ পৃষ্ঠা দেখ)

7. Discuss the merits and defects of the democratic form of Government. (C. U., 1937, 1947) (১৩৪-১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ).

8. Indicate the merits and demerits of the democratic form of Government. In the light of modern political developments do you think Democracy will survive? (C. U., 1941) (১৩৪-১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ)

9. Discuss the advantages and disadvantages of representative Government: (C. U., 1950)

10. Distinguish between Cabinet form of Government and Presidential form of Government. Discuss their respective merits and demerits. (C. U., 1944, 1946) (১৪১-১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ)

11. "It is one of the problems of the modern State to keep the executive under proper control." Illustrate the statement with reference to the working of the executive in (*a*) Great Britain and (*b*) the U.S.A. (C. U., 1953).

[**উত্তরের কাঠামো :** শাসন বিভাগকে যথোচিত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম সমস্যা। এই উদ্দেশ্যে শাসকবর্গকে জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল করিয়া রাখা হয়। এই দায়িত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের ইহা প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এবং ইংলণ্ডের ন্যায় মন্ত্রি-পরিষৎ-শাসিত সরকারের ইহা পরোক্ষ দায়িত্ব। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কার্যতঃ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং জনসাধারণের নিকটই দায়িত্বশীল থাকেন। অবশ্য এই দায়িত্ব কার্যকর করার কোন উপায় নাই। অপর দিকে ইংলণ্ডের প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণ জনসাধারণের নিকট পরোক্ষভাবে দায়িত্বশীল, কারণ এই দায়িত্ব কার্যকর করা হয় কমন্স সভার মাধ্যমে। কমন্স সভাই অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব প্রভৃতির দ্বারা মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের এই ক্ষমতা নাই।]

ষোড়শ অধ্যায়

গণতন্ত্রের সংগঠন এবং সমস্যাসমূহ

কার্যতঃ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তোলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, কারণ সংগঠনের ক্ষেত্রে ইহা অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। গণতন্ত্র অর্থ জনগণের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত জনগণের নিজস্ব সরকার। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে গণতন্ত্র এখন প্রতিনিধিতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। বর্তমানে প্রকৃত সমস্যা হইতেছে যে কিভাবে জনগণ বা নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিতন্ত্রকে সফল ও সম্পূর্ণভাবে তাহাদের নিজস্ব করিতে পারে। এই মূল সমস্যা গণতন্ত্রের সংগঠন সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট। গণতন্ত্রের সংগঠন সংক্রান্ত সমস্যা বলিতে এগুলিই বুঝায়:—নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate) সংগঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় কি? নির্বাচকগণ এবং প্রতিনিধিদের মধ্যে উপযুক্ত সম্বন্ধ কি হইতে পারে? প্রতিনিধিরা কি প্রকারে নির্বাচিত হইবে? জনগণ কি প্রকারে ব্যবস্থাপক সভাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে? জনমত এবং রাজনৈতিক দলের স্বরূপ কি হইবে?—ইত্যাদি।

কিভাবে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে—ইহাই প্রধান সমস্যা

নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্যা (Problems of Electorate):

চারিটি দিক হইতে নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে আলোচনা করা যাইতে পারে:—(১) নির্বাচকমণ্ডলীর সংজ্ঞা ও আয়তন,—অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলী বলিতে কি বুঝায়? নির্বাচকমণ্ডলী কাহাদের লইয়া গঠিত হইবে? সকল প্রাপ্তবয়স্ককেই ভোটাধিকার দেওয়া হইবে কিনা?—ইত্যাদি; (২) নির্বাচন পদ্ধতি; (৩) সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধি নির্বাচন সমস্যা; (৪) প্রতিনিধিদের উপর নির্বাচকদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate):

নির্বাচকমণ্ডলীর সংজ্ঞা (Meaning of Electorate): আমরা দেখিয়াছি যে প্রত্যেক নাগরিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার শ্রেষ্ঠ অধিকার। ভোটাধিকার অর্থ প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার। পরোক্ষ গণতন্ত্রেই প্রতিনিধি মনোনয়ন অথবা নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে। নাগরিকগণ একত্রিত হইয়া এই অধিকার প্রয়োগ করিলে তাহাকে নির্বাচন (Election) বলে। ব্যক্তিবিশেষকে প্রতিনিধি রূপে মনোনয়ন করাকে ভোটদান করা (Voting) বলা হয়। যে সকল নাগরিক ভোট দান করে তাহাদিগকে ভোটদাতা (Voter) বলে এবং ভোটদাতাদিগকে সংঘবদ্ধভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলে। সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলী বলিতে সেই সকল ব্যক্তিকে বুঝায় যাহারা ভোটাধিকার ভোগ করে, অর্থাৎ যাহারা আইন অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে অধিকারী।

ভোটদাতাগণকে সংঘবদ্ধভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলে

নির্বাচকমণ্ডলীর আয়তন (Size of Electorate): প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভোটাধিকার প্রদানই গণতান্ত্রিক আদর্শ। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই আদর্শের উপলব্ধি হওয়া কঠিন। প্রত্যেক দেশেই নির্বাচকমণ্ডলীর আয়তন নানারকম বিধি-নিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ। কোন রাষ্ট্রেই প্রত্যেক ব্যক্তির ভোটাধিকার নাই। উন্মাদ, অপরাধী, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বিদেশী ব্যক্তি প্রত্যেক রাষ্ট্রেই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। আবার অনেক রাষ্ট্রে যাহাদের সম্পত্তি নাই এবং যাহারা কোনও প্রকার কর প্রদান করে না তাহারা, এবং নারীরা, ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। যখন ভোটাধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী অথবা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকে না তখন সেই ব্যবস্থাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage) বলে। এইরূপ ভোটাধিকার প্রবর্তন করাই বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের আদর্শ। ভোটাধিকার যতই বিস্তৃত হয় গণতন্ত্র ততই বাস্তবভাবে কার্যকর হয়। সেইজন্যই ভোটাধিকারের ভিত্তি সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনা করা প্রয়োজন।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বা Universal Adult Suffrage

ভোটাধিকারের ভিত্তি (Basis of Franchise): পূর্বে এই সমস্যা লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সমর্থক তাঁহাদের মতে ভোটাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। প্রত্যেক নাগরিকের এই অধিকার না থাকিলে গণতন্ত্র অসার ও অবাস্তব হইয়া যায়।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি:
১। ভোটাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের শাসননীতির ফলাফল প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমভাবে ভোগ করিতে হয়; অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শাসননীতি নির্ধারণের অধিকার দিতে হইবে। জনগণের যদি শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে জনগণের শাসন ("Rule of the People") অসার কল্পনাতে পরিণত হয়। ভোটাধিকারের দ্বারাই জনগণ শাসনকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

২। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ফলেই গণতন্ত্র বাস্তব হইয়া উঠে

যাহার প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার নাই তাহার দাবী এবং অভিযোগ সম্বন্ধে কেহই কর্ণপাত করে না। গণতন্ত্রের ভিত্তিই হইল সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার।

৩। যাহাব ভোটাধিকার নাই তাহার অভিযোগে কেহই কর্ণপাত করে না

কিন্তু সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের যাঁহারা সমর্থক, যাঁহাদের মতে ভোট দিবার ক্ষমতা নাগরিকের জন্মগত অধিকার, তাঁহারা নাগরিক (Citizen) বলিতে স্পষ্টতঃ কি বোঝেন তাহা বলা কঠিন। যদি নাগরিক বলিতে বুদ্ধিমান, সুস্থ এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝায়, তবে এই মতবাদের বিরোধিতা সম্ভব নহে। কিন্তু যদি নাগরিক বলিতে শিশু এবং বিদেশী ছাড়া রাষ্ট্রের যে কোনও অধিবাসী (উন্মাদ, দেউলিয়া, অপরাধী ইত্যাদি সহ) বুঝায় তবে এই মতবাদ গ্রহণীয় নয়। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সঙ্গত অর্থ—উপরোক্ত ব্যক্তিসমূহ ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির ভোটাধিকার। এই অর্থে মতবাদটি সমালোচনার উর্ধ্বে।

উপরোক্ত মতবাদের যাঁহারা বিরোধিতা করেন তাঁহাদের মধ্যে লেকী (Lecky) এবং মিলই প্রধান। তাঁহাদের মতে ভোটাধিকার কখনই জন্মগত অধিকার নয়; যাহাদের এই অধিকার উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আছে, এই সুবিধা এবং অধিকার একমাত্র তাহাদেরই প্রাপ্য। তাঁহারা কেবলমাত্র পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগকে (অর্থাৎ উন্মাদ, দেউলিয়া প্রভৃতিকে) ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সন্তুষ্ট নন; তাঁহারা বলেন যে ভোট দিবার জন্য বিশেষ যোগ্যতারও প্রয়োজন।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি: ভোটাধিকার জন্মগত নয়; ভোটাধিকারের জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন

মিলের মতে শিক্ষাই ভোটদানের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড; যে ব্যক্তি

প্রাথমিক শিক্ষাতেও শিক্ষিত হয় নাই সে অবশ্যই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু শিক্ষাই কি বুদ্ধির এবং রাজনৈতিক সমস্যা উপলব্ধি করিবার একমাত্র মানদণ্ড? একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিও বুদ্ধিমান হইতে পারে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন থাকিতে পারে। শিক্ষাকে যোগ্যতার একমাত্র নির্ধারক করিলে কার্যতঃ মিথ্যা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। সংসারে পণ্ডিত-মূর্খের অভাব নাই। মিল বলিয়াছেন যে সার্বিক ভোটাধিকারেব পূর্বে সার্বিক শিক্ষাব একান্ত প্রয়োজন ("Universal education should precede universal enfranchisement")। সার্বিক শিক্ষা বলিতে প্রাথমিক শিক্ষাই বুঝায়, উচ্চ শিক্ষায ত' সকলে শিক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা মানুষের অজ্ঞতা কতটা দূর করিতে পারে? উহা মানুষকে বাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা উপলব্ধি কবিবাব কতটা যোগ্য করিয়া তুলিতে পারে? সুতবাং মিলের মতবাদ অভ্রান্ত বলিয়া মনে করা হয় না। তবে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি যে অধিকাংশ অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতবাং সার্বিক শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকাব করা যায় না। এইজন্যই যে সমস্ত বাষ্ট্রে সার্বিক ভোটাধিকাবের নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে (যেমন, ভারতবর্ষ) সেখানে সার্বিক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মিলের মতে শিক্ষাই যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড, কিন্তু ইহা ঠিক নহে

তবে সার্বিক শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না

অনেকের মতে সম্পত্তির অধিকারী হওয়াই ভোটদানেব যোগ্যতার মানদণ্ড, অর্থাৎ কেবলমাত্র সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যেই ভোটাধিকার আবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। এইভাবে তাঁহাবা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দাবীকে সঙ্কুচিত করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে যাহার সম্পত্তি নাই তাহাকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত, কারণ যাহাবা সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও রূপ কর প্রদান করে না তাহাদের অপচয়ী এবং অমিতব্যয়ী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি করিবার নীতি ক্রমশঃই বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে, কারণ দারিদ্র্য মানুষের অক্ষমতা অথবা অপরাধের সূচক নহে।

অনেকের মতে সম্পত্তি যোগ্যতার মানদণ্ড—ইহাও ভুল

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আধুনিক গণতন্ত্রের লক্ষ্য সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দিকে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভোটাধিকারের মূল ভিত্তি হইবে পূর্ণবিকশিত নাগরিকতা। যখন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা নিজেদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে সততা এবং গভীরতার সহিত চিন্তা করিবে তখনই তাহাদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। এইভাবেই গণতন্ত্র প্রকৃত জনগণের শাসনে পরিণত হইবে।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের লক্ষ্য

নারীর ভোটাধিকার (Woman Suffrage): নারীর ভোটাধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সমস্যারই একটি অংশ। ভোট দিবার অধিকার যদি জন্মগত হয় তবে স্ত্রীলোকদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। এই সহজ যুক্তি সেদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপরিচালকগণ স্বীকার করেন নাই। ১৮৬১ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম নারীর ভোটাধিকার লইয়া আন্দোলন সুরু হয়। ক্রমশঃ এই আন্দোলন অন্যান্য দেশেও প্রসার লাভ করে। ফলে বিভিন্ন দেশে নারীকে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। ইংলণ্ডে ১৯১৮ সালে এক আইন দ্বারা ত্রিশ বৎসরের উর্ধ্ববয়স্ক প্রত্যেক নারীকে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। দশ বৎসর পরে বয়সের সীমা কমাইয়া একুশ করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও ফ্রান্স ও ইতালীতে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার ছিল না; অবশ্য নূতন শাসনতন্ত্র তাহাদের নির্বাচকমণ্ডলীভুক্ত করিয়াছে। জাপানে ১৯৪৭ সালে আমেরিকার কর্তৃত্বাধীনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। য়ুরোপে এখনও সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়মে নারীর ভোটাধিকার নাই। অনেক দেশে আবার স্ত্রীলোকেরা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচনে ভোট দিতে পারে, কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারে না।

ভোটাধিকার জন্মগত হইলে স্ত্রীলোকদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা অযৌক্তিক

নারীকে ভোটাধিকার প্রদান অনেক সমালোচক ভীতির চক্ষে দেখেন। ভোটাধিকার প্রদানের অর্থ হইল নারীকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের মধ্যে টানিয়া আনা। বলা হয় যে রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নারীর নারীত্বকে বিনষ্ট করে; ফলে

নারীর স্বভাবজ গুণাবলী বিকশিত হইতে পারে না। নারীর উপযুক্ত স্থান গৃহ। একবার যদি তাহাদিগকে গৃহ হইতে বিচ্যুত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ঘূর্ণাবর্তে টানিয়া আনা হয় তাহা হইলে সমগ্র সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের বনিয়াদ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আরও বলা হয় যে নারী রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামে যোগদান করিলে একই পরিবারে বিরোধী মতবাদের উদ্ভব হইবে; ফলে পারিবারিক কলহ এবং বিরোধ বৃদ্ধি পাইবে। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের বিরোধী মত পোষণ করিতে পারে; ইহাতে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যেহেতু নারীরা শারীরিক কারণে কতকগুলি কর্তব্য (যেমন, সৈন্যবাহিনীতে যোগদান) সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারে না, সেই কারণে তাহারা পুরুষের সমান ভোটাধিকার দাবী করিতে পারে না।

নারীর ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যুক্তি :
১। নারীকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে টানিয়া আনা অনুচিত
২। নারীর ভোটাধিকার পারিবারিক কলহের সৃষ্টি করিবে
৩। নারী পুরুষের সমান কর্তব্য পালন করিতে পারে না, তাই সমানাধিকারও দাবী করিতে পারে না

এই সকল যুক্তিকে বড় একটা মানিয়া লওয়া হয় না। অন্যান্য দিক হইতে সম্পূর্ণ যোগ্য ও গুণসম্পন্ন হইয়াও কেবলমাত্র নারীত্বের অজুহাতে একজন ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইহা প্রমাণিত হইযাছে যে নারী সৈন্যবাহিনীতে কার্যের অনুপযুক্ত নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের লইয়া গঠিত বাহিনীর সহিত নারী রক্ষিবাহিনীব সমকক্ষতা প্রমাণিত হইয়াছে। শিক্ষা, বুদ্ধি. নীতি প্রভৃতি দিক হইতেও তাহারা পুরুষের সমকক্ষ—ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। পুরুষ অপেক্ষা নারী যখন কোন অংশে ন্যূন নহে তখন তাহাদের সমানাধিকার হইতে বঞ্চিত করা অযৌক্তিক।

এই সকল যুক্তি বর্তমানে ভিত্তিহীন

উপরন্তু, আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে, অবৈধ আইনের কবল হইতে নিজের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য নারীরও পুরুষের মত ভোটাধিকার প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার না থাকিলে তাহাদের সামাজিক অধিকার সংরক্ষিত হওয়া কঠিন। নারীর সামাজিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি। পরিশেষে বলা যায়, নারীর ভোটাধিকার রাষ্ট্রনৈতিক

নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্যও নারীর পুরুষের মত ভোটাধিকার প্রয়োজন

ক্ষেত্রে শুচিতা ও শালীনতা আনয়ন করিয়া সর্বসাধারণের মঙ্গল বৃদ্ধি করিতে পারে।

নির্বাচন-পদ্ধতিসমূহ (Modes of Election) :

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন (Direct and Indirect Election) : গণতন্ত্রের সার্থকতা কেবলমাত্র নির্বাচকমণ্ডলীর আয়তনের উপর নির্ভর করে না, নির্বাচন-পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে। নির্বাচন প্রত্যক্ষ (Direct) অথবা পরোক্ষ (Indirect), গোপন অথবা প্রকাশ্য হইতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতির খানিকটা প্রচলন ছিল। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকটি দেশের শাসনতন্ত্রে অন্ততঃ ব্যবস্থাপক সভার নিম্নকক্ষের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

পূর্বে পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ; এখন প্রত্যক্ষ নির্বাচনই রীতি

প্রত্যক্ষ নির্বাচন এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ভোটদাতারা প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের ভোটের সাহায্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। প্রতিনিধি নির্বাচনে এবং মনোনয়নে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটই চূড়ান্ত। পরোক্ষ নির্বাচন-ব্যবস্থায় ভোটদাতারা প্রথমে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচকমণ্ডলী মনোনয়ন করে এবং এই নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণ চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সুতরাং পরোক্ষ নির্বাচন কার্যতঃ দ্বৈত নির্বাচন। প্রাথমিক ভোটদাতারা মধ্যবর্তী ভোটদাতাদিগকে নির্বাচন করে ; এবং মধ্যবর্তী ভোটদাতাগণ পরে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সুতরাং প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিনিধিগণ এবং ভোটদাতাদের মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ এবং নিকট ; পরোক্ষ নির্বাচনে মধ্যবর্তী ভোটদাতাদের অস্তিত্বের ফলে প্রতিনিধিগণ এবং ভোটদাতাদের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ এবং দূর।

পরোক্ষ নির্বাচনের গুণাগুণ (Merits and Defects of Indirect Election) : অনেকে বলেন যে পরোক্ষ নির্বাচনের ফলে সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ত্রুটিগুলি দূরীভূত হয়। জনসাধারণের হাতে নির্বাচনের চরম ক্ষমতা থাকিলে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় না, কারণ জনসাধারণ সাধারণতঃ অজ্ঞ। তাহারা দলীয় নেতাদের নির্দেশেই পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক দলের নেতারা অনেক সময় জনসাধারণকে ভুল পথে চালিত করেন। পরোক্ষ নির্বাচনে এইরূপ

পরোক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে যুক্তি : পরোক্ষ নির্বাচনে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ত্রুটিগুলি দূর হয়

পথচ্যুতির সম্ভাবনা কম। মধ্যবর্তী ভোটদাতারা শিক্ষিত হইবার ফলে তাহারা প্রাথমিক ভোটদাতাগণ অপেক্ষা ভাল প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সক্ষম হইবে। এই মধ্যবর্তী নির্বাচকমণ্ডলী জনমতকে পরিশোধিত করে। আবার দুইবার নির্বাচন সময়সাপেক্ষ; ফলে সুস্থভাবে এবং ধীরভাবে চরম প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অবকাশ থাকে।

পরোক্ষ নির্বাচনে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়

পরোক্ষ নির্বাচনের দোষও আছে। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রবিরোধী। গণতন্ত্রের অধীনে প্রতিনিধিগণ এবং নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকা প্রয়োজন, যাহাতে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। নির্বাচক ও প্রতিনিধির মধ্যে দূরত্ব যতই বেশী হইবে গণতন্ত্রের বিকৃতির ততই সম্ভাবনা থাকিবে। পরোক্ষ নির্বাচন এই দূরত্বের ক্রমশঃ প্রসার করে। প্রাথমিক ভোটদাতাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে চরম ক্ষমতা না থাকায় তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিরাসক্ত এবং নিরুৎসাহী হইয়া পড়ে। ইহাই এই ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদ। নাগরিকগণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা এবং উৎসাহকে স্তিমিত করিয়া ইহা গণতন্ত্রের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। পরোক্ষ নির্বাচন রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রসারেরও পরিপন্থী। যদি ভোটদাতা এবং নির্বাচনেচ্ছু প্রতিনিধির মধ্যে আরও একটি মধ্যবর্তী ব্যক্তিকে আনয়ন করা হয় তবে ভোটদাতাগণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহা ছাড়াও পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধ, দুর্নীতি, ঘুষ এবং গূঢ় অভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপের যথেষ্ট সুযোগ আছে। মধ্যবর্তী ভোটদাতাদের সংখ্যা অল্প হইবার ফলে দুর্নীতির সাহায্যে অল্পায়াসেই যে কোনও নির্বাচনেচ্ছু প্রতিনিধি তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে। আবার যেখানে রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় বহিরঙ্গ মাত্র, কারণ মধ্যবর্তী ভোটদাতারা প্রাথমিক ভোটদাতাগণের দলীয় প্রার্থীদিগকে নির্বাচন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে সুযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচনের সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। পরিশেষে বলা হয়, যুক্তির দিক হইতে

বিপক্ষে যুক্তি : এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রবিরোধী

ইহা নাগরিকগণকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত ও নিরুৎসাহী করে; ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রসারের পরিপন্থী; ইহা রাষ্ট্রনৈতিক জীবন কলুষিত করিয়া তোলে

যুক্তির দিক দিয়াও ইহা সমর্থন করা যায় না

পরোক্ষ নির্বাচন অনুমোদন করা যায় না। এই ব্যবস্থা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রাথমিক ভোটদাতারা মধ্যবর্তী নির্বাচক মনোনয়ন করিতে যোগ্য, কিন্তু চরম প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে যোগ্য নহে। এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যে নির্বাচক মনোনয়ন করিতে পারে, সে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে অযোগ্য হইবে কেন?

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণাগুণ (Merits and Defects of Direct Election): প্রত্যক্ষ নির্বাচনের শ্রেষ্ঠ গুণ এই যে ইহা ভোটদাতাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা এবং উৎসাহের সম্প্রসারণ করে। প্রত্যেকটি ভোটদাতাই জানে যে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাহার মতামতের বিশেষ মূল্য আছে। ইহাই তাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং দায়িত্ববোধযুক্ত করিয়া তোলে।

গুণ: ইহা নাগরিককে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও দায়িত্ববোধযুক্ত করিয়া তোলে

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থা জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করে। যেহেতু জনসাধারণই চূড়ান্ত নির্বাচন করিবে সেজন্য তাহারা বিভিন্ন দল ও প্রার্থীর নীতি এবং কার্যপদ্ধতি আলোচনা করে। বিভিন্ন কার্যনীতির আলোচনা এবং অনুধাবনের ফলে নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করে

তৃতীয়তঃ, নির্বাচকের সংখ্যা বহু হইবার ফলে দুর্নীতিমূলক প্রভাবের সম্ভাবনা কম থাকে—কোন নির্বাচনেচ্ছু ব্যক্তি অল্পায়াসে বৃহৎ জনসমষ্টিকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। বৃহৎ জলাশয় অপেক্ষা ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল যেরূপ সহজেই দূষিত হইতে পারে, তেমনি বহুসংখ্যক নির্বাচক অপেক্ষা স্বল্পসংখ্যক নির্বাচককে সহজেই প্রভাবান্বিত করা যায়।

ইহাতে দুর্নীতিমূলক প্রভাবের সম্ভাবনা কম

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের আবার বহু ত্রুটিও আছে। এই ব্যবস্থায় চূড়ান্ত নির্বাচন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে নির্বাচকমণ্ডলীর হস্তে। কিন্তু সাধারণতঃ নির্বাচকমণ্ডলী সংগঠিত হয় অজ্ঞ জনসাধারণ দ্বারা; এই কারণেই এই ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনে সতর্কতা এবং বুদ্ধির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে চূড়ান্ত নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ হয়। আবার প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ক্ষণিকের আবেগে জনগণের পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। ভণ্ড গণতন্ত্রী এবং চতুর

ত্রুটি: অজ্ঞ নির্বাচকমণ্ডলী উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না

দলীয় নেতারা আবেগময়ী বক্তৃতার সাহায্যে অনায়াসে জনগণের হৃদয় জয় করিতে পারে।

এই সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পরোক্ষ নির্বাচন-ব্যবস্থা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ নির্বাচন-ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ। এই কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই এই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

ভোটদান-পদ্ধতি (Methods of Voting) ঃ

ভোটাধিকারের মূল্য ভোট দিবার পদ্ধতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ভোট দিবার পদ্ধতি দুই প্রকার; প্রকাশ্য ভোটদান এবং গোপনে ভোটদান। ইহা এখন সর্ববাদি-সম্মতভাবে স্বীকৃত যে স্বাধীন ভোটাধিকার নির্ভর করে গোপন ভোটদান করিবার ব্যবস্থার উপর।

স্বাধীন ভোটাধিকার নির্ভর করে গোপনভাবে ভোট-দানের ব্যবস্থার উপর

গোপন ভোটদান করিবার অর্থ "ব্যালট" পত্রের সাহায্যে ভোটদান করা। ব্যালটপত্র দ্বারা ভোটদানের পদ্ধতি দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচন স্থলে প্রত্যেক ভোটদাতাকে একটি করিয়া "ব্যালট" পত্র প্রদান করা হয়। "ব্যালট" পত্রে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম লিখিত থাকে। ভোটদাতার কার্য হইল তাহার মনোনীত ব্যক্তির নাম গোপন ভাবে চিহ্নিত করিয়া "ব্যালট" পত্রটি সীল মোহরাঙ্কিত "ব্যালট" বাক্সে রাখা। এই পদ্ধতিতে একটিমাত্র ব্যালট বাক্স থাকে। অপর পদ্ধতিতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম ব্যালট পত্রে লিখিত থাকে না। প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতীক সমন্বিত এক একটি ব্যালট বাক্স থাকে। ভোটদাতাকে তাহার মনোনীত প্রার্থীর বাক্সে গোপনভাবে ব্যালট পত্রটি ফেলিয়া দিতে হয়।

ভোটদান সমাপ্ত হইলে কোন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে ব্যালট বাক্সটি বা বাক্সগুলি খুলিয়া ভোট গণনা করা হয়।

প্রকাশ্যে ভোটদান করা এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ভোটদাতারা সর্বসাধারণের সমক্ষে স্ব স্ব মনোনীত ব্যক্তিকে ভোটদান করে। প্রাচীন কালে এই পদ্ধতির বহু সমর্থক ছিলেন। মণ্টেস্ক্যুর যুক্তি অনুসারে প্রকাশ্য ভোটদানের ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে অজ্ঞ জনসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পরামর্শে পরিচালিত হইতে পারে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে যাহা

প্রকাশ্য বনাম গোপন ভোটদান

জনসাধারণের কর্তব্য তাহা জনসাধারণের দৃষ্টি এবং সমালোচনার সম্মুখেই পালন করা উচিত।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে বহু রাষ্ট্রে প্রকাশ্য ভোটদানের রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহার ফলে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নির্দেশে এবং জুলুমে দরিদ্র ও অজ্ঞ ভোটদাতারা তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তিকে ভোট দিতে বাধ্য হইত। সরকার, জমিদার এবং ধনী ব্যক্তিরা তাহাদের অধস্তন ভোটদাতাদের উপর বিভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রমিক মালিকের বিরুদ্ধে ভোট দিলে কর্মচ্যুত হইত; কৃষক জমিদারের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তুচ্ছ অছিলায় জমি হইতে উৎখাত হইত। ফলে ভোটদানের সময় বহু লোক অনুপস্থিত থাকিত। কিন্তু যেখানে গোপন ভোটদানের ব্যবস্থা ছিল সেখানে ভোটদাতাদের ভোটদানে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাইত। গোপন ভোটদানের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে ইহা সর্বপ্রকার প্রভাব এবং জুলুমের ঊর্ধ্বে। ভোটদাতা স্বয়ং ভিন্ন তাহার মনোনীত ব্যক্তির নাম আর কেহ জানে না, কারণ ভোট গোপনে প্রদান করা হয়; সুতরাং সে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে। বস্তুতঃ স্বাধীন ভাবে নির্বাচন করিবার সুযোগ একমাত্র গোপন ভোটদানের ব্যবস্থাতেই সম্ভব; তাই ইহা এখন সর্বজনীন ভাবে গৃহীত পদ্ধতি।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব (Representation of Minorities):

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইল—কি ভাবে সকল শ্রেণীর নাগরিক ব্যবস্থাপক সভায় উপযুক্ত ভাবে প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এই সমস্যারই অন্তর্ভুক্ত। মিল সমগ্র জনসাধারণের সরকারের মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকারে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও অন্যায়; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের সুবন্দোবস্ত করিবে।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদীও আছেন। তাঁহারা বলেন, এই ব্যবস্থা নির্বাচকমণ্ডলীতে অযথা বিভেদ সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি

সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তাহার সংকীর্ণ দৃষ্টি হইতে সমস্যাসমূহ আলোচনা করে; ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি : ১। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়

দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং ইহার প্রবর্তনের ফলে নির্বাচকমণ্ডলীর গঠনে ও নির্বাচন-পদ্ধতিতে আরও জটিলতার উদ্ভব হইবে। আবার যদি কোনও রাষ্ট্রে অনেকগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকে এবং প্রত্যেকেই পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্ব চায়, তবে সেই ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভা কতকগুলি বিরোধী দলের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবে। প্রত্যেক দলই ক্ষমতা ও সুবিধা লাভের চেষ্টা করিবে; ফলে মন্ত্রিসভা অল্পকালস্থায়ী এবং শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে।

২। ইহা জটিলতার সৃষ্টি করে
৩। ইহা শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্বল করে

এই সকল ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের সমস্যার গুরুত্ব অবহেলা করা যায় না। দেখা গিয়াছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের অন্যতম মূল কারণই হইল অসন্তুষ্ট জাতীয় সংখ্যালঘিষ্ঠের দল। সংখ্যালঘিষ্ঠেরা অসন্তুষ্ট থাকিলে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাও বজায় রাখা কঠিন। ইহা সত্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন পরিচালনা করিবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ তাহাদের মতানুসারে চলিবে। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠকে সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব দিতে হইবে; তাহা না হইলে সাম্য ও স্বাতন্ত্র্যের গণতান্ত্রিক আদর্শও ক্ষুণ্ণ হইবে। এই সমস্ত কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

১। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation): সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি। ইহার উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন দলের বা সম্প্রদায়ের নির্বাচকের সংখ্যা এবং মোট প্রতিনিধি সংখ্যার মধ্যে অনুপাত রাখিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্ধারণ করা। যেমন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্বাচক-সংখ্যা যদি মোট নির্বাচক-সংখ্যার সমষ্টির এক-চতুর্থাংশ হয় তবে তাহারা এক-চতুর্থাংশ আসনও পাইবে।

সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অনুসারে ভোটের সংখ্যাকে যতজন সভ্য নির্বাচন করা প্রয়োজন সেই সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহার সহিত ১ যোগ করা হয়। ১ যোগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সংখ্যক ভোট নির্বাচনের জন্য আবশ্যক বলিয়া গণ্য করা হয়।

প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীর নামের পার্শ্বে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা তাহার প্রথম মনোনয়ন, দ্বিতীয় মনোনয়ন ইত্যাদি প্রকাশ করে। যে প্রার্থী নির্দিষ্ট-সংখ্যক প্রথম মনোনয়ন পায় সে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হয়। নির্বাচিত ব্যক্তির পক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত প্রথম মনোনয়নগুলি যে যে প্রার্থীরা দ্বিতীয় মনোনয়ন পাইয়াছে, তাহাদের হিসাবে জমা দেওয়া হয়। এইরূপে নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট পাইয়া আরও কয়েকজন নির্বাচিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সমুদয় আসন পূর্ণ না হয় ততক্ষণ এইভাবে গণনা চলিতে থাকে।

যুক্তির দিক হইতে এই ব্যবস্থার সার্থকতা আছে, তবুও ইহা সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ এই ব্যবস্থার জটিলতা। যেখানে নির্বাচকগণ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান এবং সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি ভালভাবে বুঝিতে পারে সেখানে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে। কিন্তু নির্বাচকগণ যদি অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত হয় তবে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

ইহা অতি জটিল পদ্ধতি। এই জন্যই ইহা সর্বজনীন ভাবে গৃহীত হয় নাই

২। স্তূপীকৃত ভাবে ভোট দেওয়া (Cumulative Vote System): এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোটদাতা যতগুলি আসন আছে ততগুলি ভোট দিবার অধিকার পায় এবং কোন্ প্রার্থীকে কয়টি ভোট দিবে তাহাও তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি চারিটি আসন থাকে তবে সে একজন প্রার্থীকে চারিটি ভোটই প্রদান করিতে পারে, অথবা নিজের ইচ্ছানুসারে প্রার্থীদের মধ্যে ভোট বণ্টন করিয়াও দিতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠগণ যদি সমগ্র জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হয় তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটদাতাগণ চারিটি ভোটই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রার্থীর পক্ষে প্রদান করিয়া তাহাকে নির্বাচিত করিতে পারে। যদি সমস্ত ভোটই একজন প্রার্থীর পক্ষে প্রদান করা হয় তবে তাহাকে Plumping বলে।

Plumping

৩। সীমাবদ্ধ ভোট-ব্যবস্থা (Limited Vote System): এই পদ্ধতিতে যতগুলি আসন থাকে প্রত্যেক ভোটদাতাকে তাহার অপেক্ষা কম ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা কার্যকর করিতে হইলে এমন নির্বাচনকেন্দ্র প্রয়োজন যেখান হইতে অন্ততঃ তিনজন সদস্য নির্বাচিত হয়। যদি তিনজন সদস্য নির্বাচন

সীমাবদ্ধ ভোট ব্যবস্থা

করিতে হয় তবে ভোটদাতাগণকে দুইটি ভোট দান করিবার অধিকার দেওয়া হইবে, এবং একটির অধিক ভোট একজন প্রতিনিধিকে দেওয়া যাইবে না। এই ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় অন্ততঃ একটি আসন অধিকার করিতে পারে।

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব (Communal Representation in India) ঃ

ভারতবর্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি নির্বাচন সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কোনও রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তির উপর গঠিত হয় নাই, ইহা ধর্মের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়াছিল। মুসলমান, শিখ, ইঙ্গ-ভারতীয়, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন-ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মিণ্টো-মর্লে শাসন-সংস্কার অনুসারে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচন-ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হয়। ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন এই প্রথা গ্রহণ এবং প্রসারিত করিয়াছিল। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নির্বাচন-ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রবর্তন করা হইয়াছে। যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হইলেও দশবৎসরের জন্য হিন্দু ও শিখ তপশীলী বর্ণ ও কয়েকটি তপশীলী উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

নূতন শাসনতন্ত্রে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী তুলিয়া দিয়া যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব যদিও গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও অনেকের মতে ইহা অবাঞ্ছনীয়, কারণ ইহা রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের অন্তরায়। যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ দল রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে বিভেদ দূর করা হয়ত সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু উহা ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হইলে বিভেদ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে।

বস্তুতঃ, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের প্রবেশ সমাজ-জীবনের পশ্চাৎগতির লক্ষণ। একবার যদি ধর্মসংক্রান্ত বিরোধ ও স্বার্থ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রবেশ করে তবে মানুষ আর বুদ্ধি দ্বারা, যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিবে না; অন্ধভাবে ধর্মের অনুসরণ করিবে।

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের প্রবেশ সমাজ-জীবনের পশ্চাৎগতিরই লক্ষণ

ভারতবর্ষে দলগুলি সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত হইল। ইহার ফলে রাষ্ট্রনীতির জগতে ধর্মের আমদানী হইল, বিভেদ ও বিরোধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। অবশেষে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া এই বিরোধের মীমাংসা করা হইল। ভারতকে বিভক্ত করার ফলে অনেক নূতন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইল। এই সমস্যাগুলি ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রকেই বিব্রত করিতেছে।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব (Communal Representation) ঃ

যুক্ত নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণ (Joint Electorate with Reservation of Seats) এবং পৃথক নির্বাচন (Separate Electorate)—এই দুইটি পদ্ধতি দ্বারা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

১। **যুক্ত নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণ ঃ** যদি ব্যবস্থাপক সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত করা থাকে, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় যুক্ত ভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তবে সেই ব্যবস্থাকে যুক্ত নির্বাচন-ব্যবস্থা বলে। এই ব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে এবং ইহাদের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। নির্বাচনের সময় একই রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা লইয়া ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদানের ফলে বিভেদ ও বিরোধ অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া একতা বৃদ্ধি পায়। হিন্দু মুসলমান প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবে এবং মুসলমান হিন্দু প্রতিনিধির পক্ষে ভোট দান করিবে—এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও বিরোধ বিদূরিত হইয়া সহানুভূতির ও সহযোগিতার সৃষ্টি হয়। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে হিন্দু ও শিখ তপশীলী জাতিদের জন্য এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

যুক্তনির্বাচন-ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে

এই ব্যবস্থার আবার বহু ত্রুটিও আছে। হিন্দুরা হয়ত তাহাদের ভোটের সাহায্যে এমন মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচন করিল যাঁহার মনোবৃত্তি হিন্দুঘেঁষা। এই ক্ষেত্রে সেই প্রতিনিধি মুসলমান সম্প্রদায়ের সত্য প্রতিনিধি হইতে পারেন না। এই কারণেই মুসলমানগণ পৃথক নির্বাচনের দাবী করিয়াছিল।

২। **পৃথক নির্বাচন ঃ** এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সেই সম্প্রদায়ের নির্বাচকগণ দ্বারা নির্বাচিত হন ; যথা, মুসলমান প্রতিনিধিদের

নির্বাচনে মাত্র মুসলমান নির্বাচকগণই ভোট দেয় এবং হিন্দু প্রতিনিধির নির্বাচনে মাত্র হিন্দুরাই ভোট দেয়। এই ব্যবস্থায় যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমানেরা এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে যে মুসলমানের স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই দেখিবে না।

পৃথক নির্বাচন প্রথার দোষ বহুবিদিত এবং কোন যুক্তিশীল মানুষই ইহাকে সমর্থন করিতে পারে না। স্পষ্টতঃ ইহা জাতীয়তাবিরোধী। পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আইন পরিষদ হিসাবে কার্য করিতে পারে না। ইহা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অচিরেই স্বার্থান্ধ, বিরোধী সাম্প্রদায়িক দলগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ দেশের জনসমষ্টিও কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ায় দেশ ক্রমশঃ অবনতির পথে চলিতে থাকে।

পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী

নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (Control of the Electorate):

রুশো বলিয়াছেন যে মাত্র নির্বাচনের দিনে ব্রিটিশ জনসাধারণ স্বাধীন। অর্থাৎ ব্রিটিশ নির্বাচকগণের যাহাকে ইচ্ছা নির্বাচন করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু নির্বাচন উত্তীর্ণ হইয়া গেলে প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ক্ষমতাই তাহাদের নাই। রুশো এই কথা বলিলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের উপর নির্বাচকমণ্ডলীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

প্রতিনিধিবর্গকে যদি নির্বাচকমণ্ডলী নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে তবে সেই শাসন-ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যায় না। সেইজন্য এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

প্রথম পদ্ধতি হইল নির্দেশিত প্রতিনিধিত্ব (Instructed Representation)। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রতিনিধিরা নির্বাচকমণ্ডলীর নির্দেশ অনুসারে কাজ করিবে। প্রতিনিধি কেবলমাত্র প্রতিভূ (Delegate) এবং তাহার কার্য হইবে জনমত অনুসারে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। কিন্তু জনগণের ইচ্ছা সকল সময় সঠিক ভাবে জানা যায় না; সে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি তাহাদের নির্দেশে কাজ করিতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে সকল ব্যাপারে নহে,

নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ঃ
১। নির্দেশিত প্রতিনিধিত্ব

মাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও মূল ব্যাপারে প্রতিনিধিরা নির্বাচকমণ্ডলীর নির্দেশে চালিত হইবে, অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহারা স্বীয় ইচ্ছানুসারে কার্য করিবে। এই পদ্ধতির সমর্থকগণের মতে প্রতিনিধির কার্য হইল জনমত নির্ধারণ করা, এবং তাহা স্বীয় মতের অনুকূল হউক বা না হউক, তাহা কার্যকর করা।

এই ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদিগকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, কিন্তু ইহা সকল সময় প্রযোজ্য নয়। আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে।

২। জনমত এবং দলমতের প্রয়োগ দ্বারা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়

পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির অর্থ জনমত এবং দলমতের প্রযোগ। ইহা পরোক্ষ হইলেও কার্যকর। বর্তমানে জনমতের ক্ষমতা প্রবল, সুসংগঠিত জনমত কোনও কর্তৃপক্ষই অবহেলা করিতে পারে না। জনমতের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক দল সরকারকেও নিয়ন্ত্রণাধীন রাখে।

৩। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ : পদচ্যুতি, গণভোট ইত্যাদি

পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ নিযন্ত্রণ-ব্যবস্থা যুক্ত করা উচিত। যে ক্ষেত্রে জনমত দুর্বল এবং অসতর্ক, রাজনৈতিক দল অসংগঠিত, সেই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা আছে। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নানাপ্রকারের হইতে পারে; যথা: অল্প সময় পর পর নির্বাচন (Frequent Election), পদচ্যুতি (Recall), গণভোট (Referendum), প্রারম্ভিকভাবে আইন প্রণয়ন বা গণ উদ্যোগ (Initiative), ইত্যাদি। এইগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্মৃতিচিহ্ন। শেষের তিনটি পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। যখন নির্বাচন অল্প সময় পর পর হয়, তখন প্রতিনিধিরা কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকে। ব্যবস্থাপক সভা এই ক্ষেত্রে জনমতকে কোনও ক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারে না। যাহারা জনমতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে না, পরবর্তী নির্বাচনে তাহাদের স্থান নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থা সতর্কতার সহিত সীমার মধ্যে ব্যবহার করা উচিত। নির্বাচন অতি শীঘ্র শীঘ্র হওয়া উচিত নয়; তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভার সাধারণ কার্যাবলী ব্যাহত হইবে এবং কর্মধারায় অখণ্ডতার অভাব ঘটিবে। ইহা ব্যতীত শীঘ্র নির্বাচনের অর্থ জনগণের উত্তেজনার আধিক্য; ইহা রাষ্ট্রের দৃঢ়তা এবং স্বাভাবিক শাসন-পরিচালনাকে ব্যাহত করিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. What, in your opinion, should be the true basis of franchise? (C. U., 1950) (১৫৬-১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Discuss, with special reference to India, the main arguments for and against adult suffrage. (C. U., 1952) (১৫৬-১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Examine the arguments for and against universal adult suffrage. (C. U., 1947) (১৫৬-১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Discuss the merits and demerits of direct and indirect elections respectively. (C. U, 1936, 1942, 1946) (১৬১-১৬৪ পৃষ্ঠা দেখ)

5. Describe the methods that have been suggested for the representation of minorities in the legislatures. (C. U, 1939, 1944).

(১৬৫-১৬৮ পৃষ্ঠা দেখ)

6. Write a short note on Joint Electorate. (C. U., 1948)

(১৬৯ পৃষ্ঠা দেখ)

7 Write short notes on: Vote by Ballot, Universal Suffrage, Communal Representation (C. U, 1951) (১৬৪, ১৫৬, ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠা দেখ)

সপ্তদশ অধ্যায়

জনমত

গণতন্ত্র হইল জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা। জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব নির্ধারণ করা নিষ্প্রয়োজন। গণতন্ত্র তখনই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে যখন ইহার পশ্চাতে থাকে সুগঠিত জনমত। গণতন্ত্রের নূতন সংজ্ঞাই হইল জনমত-শাসিত শাসন-ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকগণকে জনমতের সহিত সমান তালে চলিতে হয়।

জনমত কি? (What is Public Opinion?)

জনমতের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া যায় না, কারণ জনমতের কোন সুপ্রচলিত সহজ সংজ্ঞা নাই। অল্প কথায় বলিতে গেলে, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে জনসাধারণের অধিকাংশের মতকে

জনমত বলা যায়। জনসাধারণের অধিকাংশ বলিতে মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ বুঝায় না। লাওয়েল বলিয়াছেন যে জনমতের জন্য সকলের মতের প্রয়োজন হয় না, আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হইলেই চলে না। সংখ্যালঘিষ্ঠের মত জনমতের বহিভূ্ত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত তখনই জনমতে পরিণত হয় যখন সংখ্যালঘিষ্ঠ উহা স্বেচ্ছায় মানিয়া লয়—ভয়ে অথবা নিপীড়নে নয়।

জনমতের স্বরূপ

জনমত বলিতে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য বুঝায় না। জনমতের জন্য সকলের একই ভাবে চিন্তা করিবার, সকল বিষয়ে একই মত পোষণ করিবার প্রয়োজন নাই। মৌলিক ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের ঐক্য থাকিলেই তাহা জনমতে পরিণত হয়।

মৌলিক ব্যাপারে মতের ঐক্য তখনই থাকিতে পারে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করে। অতএব প্রকৃত জনমতের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে:—জনমত হইল সর্বসাধারণেব কল্যাণেব আদর্শে অনুপ্রাণিত সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিপূর্ণ, সচেতন মত। জনকল্যাণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের আদর্শ সংখ্যালঘিষ্ঠ কর্তৃক গৃহীত হইলে তাহাকে যথার্থ জনমত রূপে গণ্য করা যায়।

জনমতের সংজ্ঞা

জনমত প্রকাশের বাহন (Organs or Agencies of Public Opinion):

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্বের জন্য বর্তমানে জনমত গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত বাহনগুলির দ্বারা জনমত সংগঠিত ও প্রকাশিত হয়।

১। **সংবাদপত্র (Press):** জনমত প্রকাশের বাহন হিসাবে সংবাদপত্র বিশিষ্টতম স্থান অধিকার করে। সংবাদপত্রের কাজ হইল জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে সংবাদ মতামত সহ বিতরণ করা। এইভাবে ইহা রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে এবং জনসাধারণের মতামতকে প্রভাবান্বিত করে। সংবাদপত্র জনসাধারণকে মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগও দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সংবাদপত্র দ্বারা জনমতের সংগঠন ছাড়াও সংবাদপত্রে জনমতের প্রতিফলন হয়।

শিক্ষার প্রসারের ফলে সংবাদপত্রের প্রাধান্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

জনমতের বাহক এবং সংগঠক হিসাবে সংবাদপত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সরকারের ভুল অথবা ত্রুটি সংবাদপত্রে ক্ষিপ্রতার সহিত সমালোচনা করা হয়। এই ভাবে কর্তৃপক্ষ জনমতের শক্তি অনুভব করেন ও তাহাদের কর্মপন্থা যথাসম্ভব জনমতের অনুকূলে চালিত করিতে চেষ্টা করেন।

সংবাদপত্রে জনমতের প্রতিফলন হয়

সংবাদপত্রকে যদি উপযুক্ত ভাবে কার্য করিতে হয় তবে ইহাকে সত্য, ন্যায় এবং প্রগতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সংবাদপত্রের দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতে হইলে ইহার স্বাধীনতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সরকারী শাসনের কর্তৃত্ব হইতে ইহা সর্বদা মুক্ত থাকিবে। তাহা না হইলে ইহা আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সরকারের পক্ষে প্রচারকার্য করিবে। ইহা কোনও দলীয় স্বার্থ অথবা ধনীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে না, কারণ তাহা হইলে ইহার সত্য এবং কর্তব্যনিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্র নির্মমভাবে শোষণ রোধ করিবে, দুর্নীতির প্রতিবাদ করিবে এবং শাসন বিভাগের স্বৈরাচার তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জনচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া সংবাদপত্র জনসেবার আদর্শ অনুসরণ করিবে।

২। **বক্তৃতামঞ্চ (Platform)**ঃ জনমত সংগঠনের ক্ষেত্রে বক্তৃতা-মঞ্চের অর্থাৎ জনসভার যথেষ্ট মূল্য আছে। সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে ইহা অধিক কার্যকর। সংবাদপত্রের আবেদন ও প্রভাব শিক্ষিত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ,—কিন্তু জনসভায় বক্তৃতার সাহায্যে অশিক্ষিত ব্যক্তিকেও জনসাধারণের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত করা যায়। সুতরাং যে দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী সেখানে ইহার গুরুত্ব সংবাদপত্র অপেক্ষাও অধিক। সভায় সমস্যা উত্থাপিত এবং আলোচিত হয়; ফলে ইহার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জনসাধারণ সচেতন হয় এবং নিজস্ব মতামত গঠন করে। বক্তৃতামঞ্চ রাজনৈতিক শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র। বক্তার ব্যক্তিত্ব এবং আবেগময়ী ভাষা জনতার হৃদয়ে এমন ভাবের সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা পরিশেষে জনমত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং বক্তৃতামঞ্চ জনমত সৃষ্টির অন্যতম বাহন।

৩। **বেতার ও চলচ্চিত্র (Radio and Cinema)**ঃ সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চের কার্যে যে ফাঁক থাকিয়া যায় তাহার পূরণ হয় বেতার ও চলচ্চিত্রের

দ্বারা। সংবাদপত্র শিক্ষিত লোকের জন্য, এবং সকল সময় সভাও সংগঠন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত লোককে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার ভার গ্রহণ করে বেতার এবং চলচ্চিত্র। বেতারের মারফৎ নেতারা তাঁহাদের বাণী দেশের সুদূরতম অংশে প্রেরণ করিতে পারেন। যদি জনসাধারণ এবং নেতাদের মধ্যে বেতারের সংযোগ স্থাপন করা হয তবে সমগ্র দেশ রাজনৈতিক শিক্ষা পায়। চলচ্চিত্র এই উদ্দেশ্যে সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার সাহায্যে আমোদবিলাসীদিগকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সাম্প্রতিক সংবাদ পরিবেশনের কার্যেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং উপযুক্ত ভাবে সংগঠন করিলে বেতার ও সিনেমার সাহায্যে জনমত সংগঠিত করা যায়।

রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাদানে বেতাব ও চলচ্চিত্রের গুরুত্ব

৪। **রাষ্ট্রনৈতিক দল (Political Parties):** ইহার পর আছে রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ। গণতন্ত্রের প্রাণই হইল রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ। বিভিন্ন দল জনগণের সম্মুখে বিভিন্ন কর্মপন্থা উত্থাপিত করে এবং তাহার মূল্য এবং কার্যকারিতা বুঝাইয়া দেয়। এইভাবে জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা এবং শিক্ষা বৃদ্ধি পায়, তাহারা নিজস্ব অভিমত প্রদান করিতে পারে।

৫। **ব্যবস্থাপক সভা (Legislature):** বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে ব্যবস্থাপক সভা জনমত প্রতিফলনের ও প্রকাশের অন্যতম কেন্দ্র। জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি লইয়া ইহা সংগঠিত হয়। ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা এবং তর্কবিতর্ক দেশে তুমুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। পূর্বে তর্কবিতর্কের সাহায্যেই জনমত সংগঠিত হইত। ইংলণ্ডে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন এবং ডিজ্‌রেলীর আমলে তাঁহাদের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার প্রভাবে জনমত গঠিত ও পরিবর্তিত হইত। আধুনিক কালে ব্যবস্থাপক সভায় জনমতের সংগঠন অপেক্ষা প্রতিফলন অধিক হয়। ব্যবস্থাপক সভার বিবরণীকে ভিত্তি করিয়া জনসাধারণ তাহাদের স্বাধীন মতামত সৃষ্টি করিতে পারে।

ব্যবস্থাপক সভা জনমত প্রকাশের ও প্রতিফলনের অন্যতম কেন্দ্র

৬। **শিক্ষালয় (Educational Institutions):** জনমতের সংগঠনে শিক্ষালয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার ছাপ পরবর্তী জীবনেও থাকিয়া যায়। আজ যে ছাত্র সে-ই আগামী দিনের রাজনৈতিক ও চিন্তা জগতের নায়ক। বিদ্যালয়ে পাঠকালে সে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় তাহাই

অনেক ক্ষেত্রে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে রূপায়িত হয়। অতএব শিক্ষালয়গুলিই জনমত সংগঠনের আদি কেন্দ্রস্থল।

শিক্ষালয় ও পাঠ্য বিষয়ের সাহায্যে জনমত সংগঠিত ও প্রভাবান্বিত করা যায়

শিক্ষালয়ের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে পাঠ্য বিষয়। শিক্ষালয় ও পাঠ্য বিষয়ের সাহায্যে কি ভাবে জনমত সংগঠিত ও প্রভাবান্বিত করা যায় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাশিয়া, চীন, যুদ্ধপূর্ব জার্মাণী প্রভৃতি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হইতে পাওয়া যায়।

৭। **প্রাচীরপত্র, পুস্তিকা, রাজপথের উপর বক্তৃতা** প্রভৃতির সাহায্যেও জনমত গঠন করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by Public Opinion? Discuss its importance in a Democracy. (C. U., 1942) (১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠা দেখ)

2. "Successful administration in a modern State depends largely upon the way in which public opinion is formed and expressed". Explain. (C. U., 1938) (১৭৩-১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ)

3. What is meant by Public Opinion? Describe the agencies that mould Public Opinion in modern times. (C. U., 1948)

(১৭১-১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Explain clearly what is meant by Public Opinion. What part does Public Opinion play in a modern State? (C. U., 1950)

(১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠা দেখ)

5. "No perfect method has as yet been discovered by which public opinion may be ascertained with absolute precision." Discuss. Indicate very briefly the nature of the service rendered by the following agencies in the formation of public opinion in West Bengal : Radio, Talkie, Press, Platform, Party. (C. U., 1953)

[**উত্তরের কাঠামো :** জনমত কি তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করিবার কোন পদ্ধতি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। জনমত বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা কার্যতঃ কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের বা কোন সংবাদপত্রের মত হইতে পারে। সে যাহাই হউক নিম্নলিখিত বাহনগুলি দ্বারা জনমত সংগঠিত ও প্রকাশিত হয় : সংবাদপত্র, বক্তৃতামঞ্চ, বেতার ও চলচ্চিত্র, রাষ্ট্রনৈতিক দল, ব্যবস্থাপক সভা ও শিক্ষালয়।]

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক দল

রাষ্ট্রনৈতিক দলের স্বরূপ (Nature of Political Parties):

শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র সর্বসাধারণের শাসন হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা রাষ্ট্রনৈতিক দলের শাসন। তাই গণতন্ত্রেব পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনৈতিক দল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কবা প্রযোজন। গণতন্ত্রে তুই বা ততোধিক দল থাকে। একদলীয় রাষ্ট্র সাধারণতঃ একনায়কতন্ত্রেই পরিণত হয়। একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

যদি কয়েকজন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্বন্ধে একই মত পোষণ করে তবে তাহারা সম্মিলিত হইলে এই সম্মেলন বা সংঘকে ব্যাপক অর্থে দল বলা হয়। এই অর্থে দল সর্বত্রই থাকিতে পারে। যেখানেই কয়েকজন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্বন্ধে সমভাবে চিন্তা করিবার ফলে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, সেখানেই আমরা দলের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। রাষ্ট্রনৈতিক দল ঐ একই প্রকারে সংগঠিত হয়।

দল কাহাকে বলে ?

এক কথায় রাষ্ট্রনৈতিক দলকে নাগরিকসংঘ বলিয়া অভিহিত করা যায়। নাগরিকগণের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে একই মত পোষণ করে বলিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। এই মিলন বা সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইল তাহাদের নীতি ও কার্যপদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা। সুতবাং রাষ্ট্রনৈতিক দলকে কোন বিশেষ নীতি বা কার্যপদ্ধতির সমর্থনে সংগঠিত নাগরিকসংঘ বলা যায়।

রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে ?

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনৈতিক দল গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার জন্য কোনরূপ অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করিবে না। সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের মত প্রচার করিবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতার আসনে বসিয়া তাহাদের স্বপ্নকে বাস্তব-রূপ দিতে চেষ্টা করিবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনৈতিক দল

প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দলেরই লক্ষ্য হইল সর্বসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি করা। লক্ষ্যে বিভিন্ন দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য আছে অনুসৃত পন্থায়। অর্থাৎ কোন পথ অবলম্বন করিলে সর্বসাধারণের কল্যাণ সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায় তাহা লইয়াই বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ থাকে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ও দলগত বিভিন্নতা

মানুষে মানুষে মতের অনৈক্য থাকিবেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের পার্থক্য থাকিলেও যদি কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে মতের ঐক্য থাকে তবে সেই সমস্ত নাগরিক মিলিত হইয়া দল সংগঠন করিতে পারে। মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে সকল নাগরিক একমত হয় না বলিয়া গণতন্ত্রে বিভিন্ন দল থাকে।

দলকে উপদল (Faction) হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে হইবে। রাষ্ট্রনৈতিক দলের সভ্যগণ তাহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা জাতীয় কল্যাণের পথ প্রসারিত করিতে চেষ্টা করে। উপদল একটি বিচ্ছিন্ন ভাবে সংগঠিত জনসংঘ, যাহার সভ্যগণ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য একত্র কাজ করে। জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাহাদের মোটেই দৃষ্টি থাকে না; কোন উচ্চ আদর্শও তাহাদের নাই। উপদলকে চক্রীদলও (clique, coterie) বলা হয়। যখন রাষ্ট্রনৈতিক দল জাতীয় সংকীর্ণ স্বার্থের উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে কার্য করে তখন সেই বিকৃত দলকে উপদল বলা যায়।

দল এবং উপদল

রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের কার্যাবলী (Functions of Political Parties):

কোন বিশেষ নীতি এবং কর্মপন্থা অনুসারে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে চালিত সংঘকেই দল বলা হয়। সুতরাং দলের প্রধান কার্য হইল সুচিন্তিত নীতির নির্ধারণ করা এবং একটি সুচিন্তিত কার্যতালিকা প্রণয়ন করা বা কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। বিভিন্ন দলের কর্মপন্থা ও নীতির অবলম্বনেই জনসাধারণ ভোট দেয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি জটিল সমস্যায় পূর্ণ। এই অসংখ্য সমস্যার মধ্য হইতে অতি প্রয়োজনীয় সমস্যা নির্বাচন ও তাহার সমাধানের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক দলই এই নির্বাচন ও নির্ধারণ কার্য সম্পাদন করে। নির্বাচিত সমস্যা ও নির্ধারিত

১। সুচিন্তিত নীতির নির্ধারণ

২। কর্মপন্থা নির্ধারণ

কর্মপন্থা সম্বন্ধে সাধারণ লোককে শিক্ষিত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক দল তাহাদের সমর্থন পাইতে চেষ্টা করে। এইভাবে জনমত সংগঠিত হয়। জনমতের সংগঠন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

৩। জনমতের সংগঠন

এই ভাবে জনমত সংগঠনের কার্য দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করা হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দল নির্ধারিত নীতি ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সাধারণ লোককে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের সমর্থন পাইবার জন্য অন্যান্য দলের নীতির ও কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করে। বিভিন্ন দলের এইরূপ মতামত প্রচার ও সমালোচনার ফলে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করিতে থাকে।

৪। রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার

নীতি ও পন্থার নির্ধারণের কোনই অর্থ হয় না যদি না নীতিকে কার্যকর করিবার কোন সম্ভাবনা থাকে। নীতিকে কার্যকর করা হয় শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে। এইজন্য রাষ্ট্রনৈতিক দল শাসন-ব্যবস্থার কর্তৃত্ব লাভের জন্য চেষ্টা করে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রার্থী মনোনয়ন করে। সমস্যা নির্ধারণ করা দুরূহ, কিন্তু প্রার্থী মনোনয়ন করাও কম দুরূহ নহে। উপযুক্ত প্রার্থী মনোনীত হইলে দলের আদর্শ ও কর্মপন্থা নিষ্ঠা ও সততার সহিত অনুসৃত হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রার্থী মনোনয়নের পর দল নিজের প্রার্থী ও নীতির সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারকার্য চালায়। নির্বাচন শেষ হইয়া গেলে যে দল ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাধিক্য লাভ করে সেই দল শাসন-কর্তৃত্ব পায় এবং নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য করিতে সচেষ্ট হয়।

৫। শাসন-ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা

সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের কার্যাবলী (Functions of the Minority Parties):

যে দল ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্যক আসন অধিকার করিতে পারে তাহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলে, আর যে দল কমসংখ্যক আসন অধিকার করে তাহাকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বলে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘিষ্ঠ দল থাকে। নির্বাচন শেষ হইবার পূর্ব পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক দলই একপ্রকার কার্য

সরকারী দল এবং বিরোধী দল

করে। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনভার গ্রহণ করে এবং সরকারী দল বলিয়া পরিচিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল নামে অভিহিত হয়।

গণতন্ত্রে বিরোধী দলের কার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

গণতন্ত্রে বিরোধী দলের কার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহার কার্য হইল প্রধানতঃ সরকারের দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন ও প্রচার করা, সরকারী কার্যের সমালোচনা করা। এই সকল কার্যকে সরকারী কার্যে বাধাপ্রদানের কার্য (opposition) বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। বিবোধী দলের নিকট হইতে এইরূপ বাধা পায় বলিয়াই দলীয় সরকার স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে না। বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কর্তব্যচ্যুতি, স্বার্থপরতা, ভ্রান্তি, দুর্নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তাহাদিগকে সরকারী দলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান করে। এই রূপে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল জনসাধারণের অধিকার ও জন-স্বার্থের রক্ষক হিসাবে কার্য করে। বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ।

বিরোধী দল সরকারী দলের স্বৈরাচারী হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করে

বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ

দলপ্রথার গুণাগুণ (Merits and Defects of Party System) ঃ

গুণ ঃ আধুনিক গণতন্ত্রে দলপ্রথা অপরিহার্য। অগণিত বিশৃঙ্খল ভোট-দাতাদের মধ্যে ইহা শৃঙ্খলা আনয়ন করে। দল ব্যতীত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি বিরাট গণতান্ত্রিক দেশে কোন মতেই জনমত প্রতিফলিত হইতে পারে না। ভোটদাতাগণ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে ভোট দিলে সরকার কখনও দৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ সংগঠিত জনমত ব্যতীত দৃঢ় ও স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি দেশের বিভিন্ন সমস্যার সরল ও সুশৃঙ্খল আলোচনা করিয়া জনমত সংগঠন করে।

১। দলপ্রথা অগণিত বিশৃঙ্খল ভোটদাতাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করে
২। শাসন-ব্যবস্থাকে দৃঢ় ও স্থায়ী করে

দলপ্রথা না থাকিলে মন্ত্রি-পরিষৎ কর্তৃক শাসনের ব্যবস্থা কোনও দিনই সাফল্যলাভ করিতে পারে না এবং ব্যবস্থাপক সভার কার্যে বহু ত্রুটি ঘটিতে পারে। পুনঃপুনঃ মন্ত্রিসভা পরিবর্তিত হইলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া

পড়ে। এমন কি, রাষ্ট্রপতি-শাসিত (Presidential) রাষ্ট্রেও দলপ্রথা না থাকিলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়—ব্যবস্থাপক সভা বিরোধ এবং দলাদলির ক্ষেত্রে পরিণত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে অধ্যক্ষও সাধারণতঃ সেই দল হইতে নির্বাচিত হন। ফলে শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে বিরোধ হয় না, অচল অবস্থার উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। আধুনিক রাষ্ট্রে দলবিহীন অবস্থা চিন্তা করাই যায় না।

দলপ্রথা মন্ত্রি-পরিষৎ পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় অপরিহার্য

ইহা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারেরও প্রয়োজনীয়

স্বৈরাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার একটি প্রধান অস্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল। কিভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সরকারী নীতির সমালোচনা ও সরকারী কার্যের বিরোধিতা করিয়া জনস্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষা করে তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

৩। ইহা স্বৈরাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করে

দলপ্রথা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে জনসাধারণের ঔদাসীন্য দূর করে। উদাসীন ব্যক্তিকেও ইহা রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিতে এবং ভোট প্রদান করিতে বাধ্য করে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভোটদান করিতে এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে চেতনাসম্পন্ন করিতে দলের উপকারিতা যথেষ্ট।

৪। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে নাগরিককে চেতনাসম্পন্ন করিয়া তোলে

দলীয় সংগ্রাম জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্র। দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জনসাধারণ রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয়। নির্বাচনী প্রচার শিক্ষামূলক প্রচারে পরিণত হয়। বিভিন্ন দল না থাকিলে জনসাধারণ কোন রাজনৈতিক শিক্ষা পায় না। প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দল ভোটদাতাকে বুঝায় যে তাহাদের নির্ধারিত কর্মপন্থাই দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধন করিবে। দলপ্রথা এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অস্ত্রের বিরোধ অপেক্ষা আদর্শের বিরোধ অধিক সৃজনশীল। এইজন্যই রাজনৈতিক দলগুলি আদর্শগত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং এই সংগ্রামে ব্যবহৃত চিন্তাগুলি প্রচারমূলক এবং দলীয় সাহিত্যে পরিণত হয়। এই ভাবে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ব্যাপারে জনসাধারণকে শিক্ষা দেয়, তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং ঔদাসীন্য দূর করে।

৫। ইহা রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করে

ত্রুটি ঃ বর্তমান কালে দলপ্রথা অপরিহার্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়াই ইহা ত্রুটিবিহীন নয়। দলীয় সংগ্রামের ফলে সাধারণতঃ দলীয় মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন সমস্যা বিকৃতভাবে ভোটদাতাদের কাছে উপস্থিত করা হয়। ইহার ফলে জনসাধারণ প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষা বা ভুল শিক্ষা পায়। এইভাবে জনসাধারণকে ভুল পথে পরিচালিত করায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়।

১। ইহা কুশিক্ষার বিস্তার করিতে পারে

অনেকের মতে দলপ্রথাই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। দলপ্রথার ফলে দলীয় মনোভাবের সৃষ্টি হয়। দলীয় মনোভাবের ফলে লোকে দলকে জাতির ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। দলীয় স্বার্থের সহিত জাতীয় স্বার্থের সংঘর্ষ হইলে লোকে জাতীয় স্বার্থকে সহজেই পরিত্যাগ করে। তখন কোন কিছুরই প্রকৃত গুণাগুণ বিচার করা হয় না, সকল বিষয়ই দলীয় স্বার্থের দিক হইতে দেখা হয়।

২। ইহা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে

অনেক সময় দলপ্রথা এতটা বিকৃত হইয়া যায় যে রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান দপ্তরে অনুপযুক্ত দলীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় এবং অন্যান্য দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়োগের লোভ দেখাইয়া নিজেদের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে প্রণোদিত করা হয়। ইহার ফলে যোগ্য ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের প্রধান পদ হইতে বঞ্চিত হয়। যেহেতু কোন যোগ্য ব্যক্তি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সভ্য, অথবা স্বাধীনচেতা, সেই কারণে তাহাকে দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে বঞ্চিত করা দলীয় ব্যবস্থার কুফল।

অনেকের মতে, এক দলকে শাসন-ক্ষমতা প্রদান করিয়া অপর এক দলকে তাহাদের কার্যে বাধাদান করিতে নিযুক্ত করার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই, বরং ইহা ক্ষতিকর। ইহার ফলে ব্যবস্থাপক সভা দলীয় সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং জাতীয় স্বার্থ অনেকাংশে ব্যাহত হয়।

৩। বিরোধী দলের উপযোগিতা অনেকে অস্বীকার করেন

দলপ্রথার বিরুদ্ধে আর একটি প্রধান অভিযোগ এই যে ইহা ব্যক্তিত্বের বিনাশ করে। দলপ্রথা থাকিবার ফলে রাজনৈতিক জীবন যান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত হয়। দলের প্রত্যেক সভ্য দলের নির্দেশ মানিতে বাধ্য ; ব্যক্তিগত মতামতের কোনও প্রকার স্থান থাকে না। দলীয় আদর্শের উপর প্রত্যেককে নির্ভর করিতে হয় ; স্বাধীন চিন্তার অবকাশ থাকে না। দলের নির্দেশই আইনে

৪। ইহা ব্যক্তিত্বের বিনাশ করে

পরিণত হয়; যে ব্যক্তি দলবহির্ভূত, তাহার মতামতের কোনও প্রকার মূল্য দেওয়া হয় না।

অনেক ক্ষেত্রে দলের নেতৃত্ব উপদলীয় চক্রান্তকারীদের হস্তে পতিত হয়। তাহাদের নিকট জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থের মূল্য অধিক। অনেক ক্ষেত্রে ভোট পাইবার জন্য জনসাধারণের প্রীতিকর রাষ্ট্রের স্বার্থহানিকর আইন প্রণয়ন করা হয়; ফলে উপযুক্ত আইন প্রণীত হইতে পারে না। নির্বাচনের সময় দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে নানাপ্রকার বিরোধ এবং কুৎসা রটনা হইয়া থাকে, ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। দলের সভ্য-সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ধনী ব্যক্তিদিগকে রাষ্ট্র হইতে সম্মান, উপাধি প্রভৃতি প্রদান করে। দলপ্রথা সত্যকে বিকৃত করিয়া মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়। দলের সভ্যগণ সত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দলের কর্মসূচীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করে। এইরূপ প্রচারকার্য জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার যথাযথ আলোচনা অসম্ভব করিয়া তুলে।

৫। দল উপদলে পরিণত হইতে পারে

দলপ্রথার ত্রুটিগুলি দূর করা যায়। দূর করার জন্য প্রয়োজন সতর্ক, বুদ্ধিমান ও উৎসাহী নাগরিকের। সুনাগরিকের সংখ্যা অধিক হইলে দলপ্রথার ভিত্তিতে গণতন্ত্র সফল হইয়া উঠিবে।

বহুদল ব্যবস্থা বনাম দ্বি-দল ব্যবস্থা (Multiple vs. Two-Party System):

যখন কোন রাষ্ট্রে কেবলমাত্র দুইটি দল থাকে তাহাকে দ্বি-দল ব্যবস্থা বলে; যখন অনেক দল থাকে তাহাকে বহুদল ব্যবস্থা বলা হয়। ফ্রান্সে বহুদল ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে তিনটি দল থাকিলেও কার্যতঃ দ্বি-দল ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। উদারনৈতিক দলের সভ্য ও সমর্থক সংখ্যায় এতই স্বল্প যে তাহাদের পক্ষে কখনও সরকার গঠন করা সম্ভব হয় না। শ্রমিক এবং রক্ষণশীল দল সরকারী ও বিরোধী দলের স্থানাধিকার করেই।

বহুদল ব্যবস্থার প্রধান গুণ এই যে ইহা ভোটদাতাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার কর্মধারা ও আদর্শ উত্থাপিত করে। বহুদল ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহা নাগরিকদিগকে বিভিন্ন আদর্শ এবং কর্মপন্থা অনুসরণ করিবার সুযোগ প্রদান

বহুদল ব্যবস্থার গুণ

করে। দ্বি-দল ব্যবস্থায় এই সুযোগ সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। তখন ভোটদাতা-দিগকে দুইটির মধ্যে একটি মত অনুসরণ করিতে হইবে—তাহাদিগকে একটি দল অবলম্বন করিয়া আর একটি দলকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মানুষের স্বভাব, আদর্শ এবং প্রকৃতি এত বহুধা বিভক্ত যে তাহাকে কেবল দুই ভাগে বিভক্ত করা অসম্ভব। মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। দ্বি-দল ব্যবস্থা এই বিভিন্নতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে। যদি প্রত্যেক ভারতীয়কে হয় কংগ্রেস না হয় হিন্দু মহাসভার সভ্য হইতে হয় তবে এই অবস্থাকে অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইবে। আমার মতের সহিত কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভা কাহারও মতের মিল না থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে আমি উপায়ান্তরবিহীন।

দ্বি-দল ব্যবস্থার দোষ

বহুদল ব্যবস্থার আবার বহু ত্রুটি আছে। ইহা নাগরিকদের সম্মুখে পরস্পরবিরোধী বহুসংখ্যক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহাদিগকে হতবুদ্ধি করে। অজ্ঞ জনসাধারণ বিভিন্ন দলের মতের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে না, এবং এই কারণেই তাহারা কখনও চিন্তা করিয়া ভোট প্রদান করে না। আবার বহুদল ব্যবস্থায় কোনও দলই চূড়ান্ত ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে না। ইহার ফলে বিভিন্ন দলের, অথবা সকল দলের, সম্মিলনে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয়। এইরূপ মন্ত্রিসভায় না থাকে মতের ঐক্য, না থাকে দলের শৃঙ্খলা। ফলে শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কর্মপন্থার নিরবচ্ছিন্নতা থাকে না। নাটকীয় গতিতে মন্ত্রিসভার এবং শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। ক্ষণস্থায়িত্ব, দুর্বলতা, অক্ষমতা, রাষ্ট্রনৈতিক দুর্নীতি ইত্যাদি দোষ বহুদল ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বদলীয় শাসনের বৈশিষ্ট্য।

বহুদল ব্যবস্থার দোষ : ক্ষণস্থায়িত্ব, দুর্বলতা, দুর্নীতি প্রভৃতি

এই সমস্ত ত্রুটি বহুদল ব্যবস্থায় মূলগত ভাবে বিরাজ করে। এই কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিশেষ করিয়া মন্ত্রিপরিষৎ-শাসিত সরকারে দ্বি-দল ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। রাষ্ট্রনৈতিক দল যত সুসংবদ্ধ এবং সক্রিয় হইবে ততই দলের সংখ্যা কমিবে এবং দুইটি মাত্র দলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হইবে।

দ্বি-দল ব্যবস্থা অনুমোদনীয়

দলীয় সরকার (Party Government) ঃ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, যে দল ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্যক সদস্য প্রেরণ করিতে পারে, সেই দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে কার্য করে। এই ব্যবস্থাকে দলীয় সরকার কর্তৃক শাসন-ব্যবস্থা (Party Government) বলে।

যে রাষ্ট্রে বহুদল ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেখানে দলীয় সরকার অন্য রূপ গ্রহণ করে। সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কোনও দলই চূড়ান্তভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে না। এই কারণে কোনও দলই একা সরকার গঠন করিতে পারে না। দুই বা ততোধিক দল চুক্তি করিয়া, একই কর্মপন্থা অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দ্বারা একতাবদ্ধ হইয়া, সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করে। অন্যান্য দল বিরোধী দল হিসাবে কার্য করে।

যে রাষ্ট্রে দ্বি-দল ব্যবস্থা আছে সেখানেও অস্বাভাবিক অবস্থায় সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইংলণ্ডে গত দুই মহাযুদ্ধের সময় এইরূপ সরকার গঠিত হইয়াছিল।

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল (Political Parties in India) ঃ

স্বাধীনতার পর ভারতে দলীয় ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দুইটি প্রধান সাম্প্রদায়িক দল মুস্‌লিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা কোনক্রমে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ভারতে মুস্‌লিম লীগের অধিকাংশ সভ্য কংগ্রেস এবং অপরাপর দলে যোগদান করিয়াছে। আকালী দল মধ্যে কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হইলেও বিগত নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া পৃথক দল হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনের ফল আকালীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয় নাই।

মুস্‌লিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা

আকালী দল

বিগত নির্বাচনে ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত কয়েকটি নূতন রাষ্ট্রনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাহাদের কেহই নির্বাচনে প্রভাবের পরিচয় দিতে পারে নাই। এই সকল হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে

রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেই দল গঠন করিতে হইবে। ক্রমশঃ এই ভাবেই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি গঠিত হইতেছে।

ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে দল গঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে

পূর্বে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল ছিল। জাতীয় স্বাধীনতার পর জাতীয়তাবাদী দলের প্রয়োজন বিশেষ থাকে না। এইজন্য কংগ্রেস সংগঠনেরও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। বর্তমানে কংগ্রেসের আদর্শ এইরূপ : কংগ্রেস চায় ভারতীয় জনগণের মঙ্গল ও উত্তরোত্তর উন্নতি এবং ন্যায় ও শান্তির পথে, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমবায়ী সমাজ-ব্যবস্থা।

কংগ্রেস

কংগ্রেসের বর্তমান আদর্শ

সমাজতন্ত্রী দল সমাজতান্ত্রিকতার পথে ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে চায়।

সমাজতন্ত্রী দল

কৃষক-প্রজা-মজদুর দলের উদ্দেশ্য শিল্প, কৃষি ও শাসন-ব্যবস্থার ধীরে ধীরে সংস্কার সাধন করিয়া গান্ধীজি-পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। নির্বাচনের কিছুদিন পরে সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক-প্রজাদল মিলিয়া একটি দল হইয়াছে। ইহা এখন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল নামে অভিহিত।

কৃষক-প্রজা-মজদুর দল

কমিউনিষ্ট দলের উদ্দেশ্য ভারতে শ্রেণীহীন জাতিহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন।

কমিউনিষ্ট দল

তপশীলী ফেডারেশন অস্বীকার করে যে তাহারা সাম্প্রদায়িক দল। তপশীলী নেতারা চান আইনের চক্ষে সমস্ত ভারতীয়ের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা; ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ; অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা; জগতে স্বাধীনতা ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। এক কথায় ফেডারেশন চায় দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বশান্তি।

তপশীলী ফেডারেশন

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the merits and demerits of government by parties. (C. U., 1940) (পৃষ্ঠা দেখ ১৮৫, ১৮০-১৮৩)

2. What are the merits and demerits of party government? Discuss the soundness of forming political parties on the basis of religion. Illustrate your answer from the present political condition of India. (C. U., 1942) (১৮০-১৮৩, ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা দেখ)

3 What is meant by a political party? Are political parties inevitable in a Democracy? Give reasons for your answer. (C. U., 1951)

(১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠা দেখ)

4. What are the functions discharged by political parties in governmental system? Name at least three political parties in India and indicate briefly their objectives. (C. U., 1953)

(১৭৮-১৮০, ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা দেখ)

ঊনবিংশ অধ্যায়

শাসনতন্ত্র

প্রত্যেক রাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থা কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি ও আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই নীতি ও আইনগুলিকে সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্র বা গঠনতন্ত্র বলা হয়।

এ্যারিস্টটলের মতে শাসনতন্ত্র একটি যন্ত্র মাত্র—যে যন্ত্র রাষ্ট্রের আদর্শ নির্ধারণ করে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সংগঠন করে। বর্তমানে আমরা শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝি এমন কতকগুলি নীতির সমষ্টি যাহা সরকারের রূপ কি, তাহা নির্ধারণ করে, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করে। সুতরাং শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা এই ভাবে দেওয়া যায়: শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি নীতির সমষ্টি,—যে নীতিগুলি শাসকের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণ করে।

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions):

শাসনতন্ত্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নের চারিটি শ্রেণীবিভাগই প্রধান: (১) গণতান্ত্রিক এবং অভিজাততান্ত্রিক, (২)

একককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়; (৩) লিখিত (written) এবং অলিখিত (unwritten); (৪) সুপরিবর্তনীয় (flexible) এবং দুষ্পরিবর্তনীয় (rigid)।

চারি শ্রেণী

প্রথম শ্রেণীবিভাগের গুরুত্ব আর বর্তমানে নাই, কারণ অভিজাততন্ত্রের সাক্ষাৎ আজকাল আর মিলে না। দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই অধ্যায়ে তৃতীয় ও চতুর্থটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্র (Written and Unwritten Constitutions) :

লিখিত শাসনতন্ত্রে সাধাবণতঃ মৌলিক আইনগুলি লিখিত হইয়া থাকে। লিখিত শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রনীতিবিদ ও নেতারা প্রণয়ন করেন। এই প্রকার শাসনতন্ত্রে কি ভাবে সবকারী ব্যবস্থা পরিচালনা করা হইবে তাহার সম্পূর্ণ নির্দেশ লিখিত থাকে। অলিখিত শাসনতন্ত্রে এই সমস্ত আইন এবং অনুশাসন লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায় না; এগুলি আচার, প্রচলিত বিধি এবং বিচারপতিগণের দেওয়া আইনের ব্যাখ্যা হইতে পাওয়া যায়। ভারতেব শাসনতন্ত্র, আমেরিকার শাসনতন্ত্র প্রভৃতি লিখিত শাসনতন্ত্রেব উদাহরণ। ইংলণ্ডেব শাসনতন্ত্র অলিখিত।

লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য

উদাহরণ

এই শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নয়। প্রত্যেক লিখিত শাসনতন্ত্রে অলিখিত অংশ এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকে। আমেরিকার শাসনতন্ত্র লিখিত, কিন্তু সেখানে শাসনব্যবস্থায় অনেক আচারগত অলিখিত রীতি প্রচলিত আছে। ভারতে ক্রমশঃ অলিখিত রীতির উৎপত্তি হইতেছে। অপবদিকে ইংলণ্ডে আবার বহু প্রচলিত বিধি লিখিতভাবে বর্তমান আছে।

এই শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে

আইনের ব্যাখ্যা, প্রচলিত আচার-ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা লিখিত শাসনতন্ত্রের অর্থ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে থাকে। অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এবং জনমতের সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য লিখিত শাসনতন্ত্রে অলিখিত বিধি গ্রহণ করিতে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই শ্রেণীবিভাগ স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণ নয়; ইহা জটিল এবং অনির্দিষ্ট। এই কারণেই ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible and Rigid Constitutions) :

লর্ড ব্রাইস্ শাসনতন্ত্রের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি শাসনতন্ত্রকে সুপরিবর্তনীয়. এবং দুষ্পরিবর্তনীয়—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিযাছেন। এই শ্রেণীবিভাগের মূলনীতি সাধারণ আইন-কানুনের সহিত শাসনতন্ত্রের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে শাসনতন্ত্র সাধারণ আইনের ন্যায় অনায়াসে পরিবর্তন করা যায়, সেই শাসনতন্ত্রকে সুপরিবর্তনীয় (flexible) বলা হয়। যে শাসনতন্ত্র সাধাবণ আইন-কানুনেব ঊর্ধ্বে এবং যাহা অনায়াসে পরিবর্তন করা যায না তাহাকে দুষ্পবিবর্তনীয় (rigid) শাসনতন্ত্র বলা হয়। সুতরাং যখন শাসনতন্ত্র ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন প্রকাবেব বিভেদ থাকে না, এবং একই কর্তৃপক্ষ একই ভাবে তাহাদের পরিবর্তন করিতে পারে, তখন তাহাকে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। যখন বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে শাসনতন্ত্র সংশোধন অথবা পবিবর্তন করা হয়, এবং চবম আইন রূপে শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ মর্যাদা থাকে, তখন তাহাকে দুষ্পরিবর্তনীয শাসনতন্ত্র বলা হয়।

সুপবিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্য

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয়। পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা সংশোধনেব জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই পদ্ধতি অনুসাবেই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারে। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের পবিবর্তন সাধারণ আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তনের ন্যায় অনায়াসসাধ্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয়। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা কংগ্রেস একা সাধারণ আইন প্রণয়নের ন্যায় শাসনতন্ত্রেব পরিবর্তন করিতে পারে না। অত্যন্ত জটিল ব্যবস্থার সাহায্যে তাহা করিতে হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রও দুষ্পরিবর্তনীয়, যদিও পরিবর্তনপদ্ধতি আমেরিকার মত অতটা জটিলতাপূর্ণ নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হইবেই।

উদাহরণ

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Flexible Constitutions) :

গুণ : সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ এই যে ইহা সহজে পরিবর্তিত করা যায়। এই কারণে নূতন পরিবেশে ইহা শীঘ্র কার্যকর করা যাইতে পারে।

প্রগতিশীল সমাজের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। জনমতের পরিবর্তন এবং সমাজের প্রগতির সহিত শাসনতন্ত্রও পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ পরিবর্তন বৈপ্লবিক অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে পারে। জরুরী এবং বিপজ্জনক অবস্থায় শাসনতন্ত্রের দুষ্পরিবর্তনশীলতা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব করে। তখন জনগণ হয়ত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন দাবি করিতে পারে। সেই পরিবর্তন সহজসাধ্য না হইলে তাহারা বলপ্রয়োগ করিয়া তাহার পরিবর্তন করিবে। সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রকে অনায়াসে পরিবর্তন করিয়া জনমতের অনুকূলে কার্য করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে জনতার আবেগ স্তিমিত হইয়া যায় এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে। এই কারণেই জরুরী অবস্থায় সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অনায়াসে কার্যকর হইতে পারে, কারণ ইহাতে শাসনতন্ত্রের মূল ব্যবস্থার পরিবর্তন না করিয়া বহিরঙ্গের পরিবর্তন সাধন করা যায়। লর্ড ব্রাইস্ একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, জরুরী অবস্থায় সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রগুলিকে প্রসারিত করা যায় অথবা বাঁকান যায়, এবং যখন জরুরী অবস্থা থাকে না তখন তাহারা পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া যায়, যেমন বৃহৎ বৃক্ষের নীচ দিয়া কোনও প্রকার যানবাহন যাইবার সময় শাখা-প্রশাখাকে টানিয়া রাখা হয় এবং ছাড়িয়া দিলে ঐগুলি পূর্ব অবস্থায় উপনীত হয়।

প্রগতিশীল সমাজের পক্ষে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অপরিহার্য

ইহা বৈপ্লবিক অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করে

লর্ড ব্রাইসের উপমা

ত্রুটি ঃ সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের অনেক ত্রুটিও আছে। পরিবর্তনশীলতা যেমন দৃঢ়তা আনে, তেমনি ইহার বিপদও আছে। সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সুদৃঢ় হয় না, কারণ ইহা সাধারণ আইন পরিবর্তন ও সংশোধনের ন্যায় সহজে পরিবর্তন ও সংশোধন করা যায়। প্রত্যেকবার জনমতের পরিবর্তনে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হয়; ইহার ফলে দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্বের অভাব দেখা যায়। লর্ড ব্রাইসের মতে এই প্রকার শাসনতন্ত্র "হেরাক্লিটাসের নদী—যেখানে এক ব্যক্তি দুই বার নামিতে পারে না—তাহারই মত সদা পরিবর্তনশীল"।

পরিবর্তনশীলতায় বিপদও আছে

অনেক ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র বিচার বিভাগের হস্তস্থিত ক্রীড়নকে পরিণত হয়, কারণ শাসনতন্ত্রের অর্থ বিশ্লেষণে বিচারপতিদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে।

ইহা বিচার বিভাগের হস্তের ক্রীড়নকে পরিণত হয়

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Rigid Constitutions) :

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ত্রুটিগুলি হইল দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ এবং সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ হইল দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ত্রুটি।

গুণ : দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ লিখিত থাকে। এই জন্যই অর্থের নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব প্রভৃতি গুণাবলী ইহাতে বিদ্যমান থাকে। সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ আচার, প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এই কারণে ইহা নির্দিষ্ট এবং সঠিক ভাবে জানা যায় না।

নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব প্রভৃতি ইহার গুণ

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র লিখিত হইবার ফলে সঠিক এবং নির্দিষ্ট ভাবে ইহার মর্ম জানা যায়, এবং ইহার মধ্যে কোনও প্রকারের অস্পষ্টতা থাকে না। ইহা ব্যতীত দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সংশোধন অথবা পরিবর্তন করিবার জটিল এবং কঠোর বিধি-ব্যবস্থা আছে। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার খেয়াল মত ইহা পরিবর্তন করা যায় না, এবং জনতার হঠকারিতার ফলে ইহাকে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। ইহা স্থায়ী; ইহা জনসাধারণের ক্ষণস্থায়ী আবেগের উর্ধ্বে। এই কারণেই জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করিতে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অধিক সক্ষম হয়।

ত্রুটি : দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের অনেক ত্রুটিও আছে। দুষ্পরিবর্তনশীলতা এবং স্থায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে দুর্বলতার সৃষ্টি করে। যদি দুষ্পরিবর্তনশীলতা এবং স্থায়িত্বের অনুরোধে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দাবিকে উপেক্ষা করা হয়, সেই ক্ষেত্রে জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে পারে। এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রকে বিপ্লবের কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। মেকলে বলিয়াছেন, "বিপ্লবের প্রধান কারণ হইল,—জাতির অগ্রগতির সহিত শাসনতন্ত্রের তাল রাখিবার অক্ষমতা।" দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত পরিবেশের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে না।

ইহাতে বিপ্লবের সম্ভাবনা অধিক

অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনৈতিক জীবন কি রূপ গ্রহণ করিবে সেই সম্বন্ধে কোনও রূপ চিন্তা না করিয়া দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়। ইহা কোনও ব্যক্তির দেহের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাহার পোষাক তৈয়ারী করানোর মত ব্যবস্থা।

উভয় প্রকার শাসনতন্ত্রেরই গুণাগুণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

দুষ্পরিবর্তনীয়তার প্রকৃত অর্থ

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রকে অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত-ভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হইলেও দেখা গিয়াছে যে পরিবর্তিত অবস্থায় ইহা পরিবর্তন করা কঠিন হইলেও মোটেই অসম্ভব নহে। দুষ্পরিবর্তনীয়ের অর্থ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিবর্তনশীলতা—অচল, অনড় অবস্থা নয়।

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রই নাগরিকের অধিকার রক্ষা করিতে অধিকতর সমর্থ হয়

ইহা দেখা গিয়াছে যে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অপেক্ষা নাগরিক অধিকার রক্ষা করিতে অধিকতর সমর্থ হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই প্রকার শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রই সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের একমাত্র উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by the Constitution of a State? How far is the distinction between a "written" and an "unwritten" Constitution a sound one? (C. U., 1952) (১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠা দেখ)

2. What is meant by the Constitution of a State? Distinguish between Rigid and Flexible Constitutions and compare their merits and demerits. (C. U., 1945) (১৮৭, ১৮৯-১৯২ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Distinguish between a Rigid and a Flexible Constitution. Give examples. (C. U, 1953) (১৮৯ পৃষ্ঠা দেখ)

বিংশ অধ্যায়

স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকার কাহাকে বলে? (What is Local Government ?)

আধুনিক বিশাল রাষ্ট্রসমূহে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সুদূর অঞ্চলসমূহ দক্ষতার সহিত শাসন করা সম্ভব নয়। এইজন্য সমগ্র রাষ্ট্রকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এই সমস্ত অংশের শাসন-ব্যবস্থা স্থানীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ইহাকে ভারতবর্ষে "স্বায়ত্ত শাসন" (Local Self-Government) এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে "স্থানীয় সরকার" (Local Government) বলা হয়।

দুই নামে পরিচিত—স্বায়ত্ত শাসন ও স্থানীয় সরকার

"স্থানীয় সরকার"—এই আখ্যাটি অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি করে। ইহা বলিতে মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়; আবার অনেক সময় ইহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারকেও বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রের অংশকেও অনেক সময় "স্থানীয় সরকার" আখ্যা দেওয়া হয়। শেষোক্ত দুইটি ক্ষেত্রে "স্থানীয় সরকার" আখ্যা বিজ্ঞানসম্মত নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রথম অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে "স্থানীয় সরকার" প্রথম দুই অর্থে ব্যবহৃত হইবার ফলে অনেক জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে। এই কারণে "স্থানীয় সরকার" বলিতে প্রাদেশিক সরকার এবং "স্বায়ত্ত শাসন" বলিতে স্থানীয় অংশের শাসন-ব্যবস্থা বুঝা যাইত। আমরা এখানে "স্থানীয় সরকার" বলিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা বুঝিব।

স্থানীয় সরকার কথাটির বিভিন্ন অর্থ

স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা বলিতে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান বুঝি, যাহা একটি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে স্থানীয় কার্যগুলি পরিচালনা করে। ক্ষুদ্র স্থানীয় অংশে জনসাধারণের কতকগুলি সাধারণ কার্য (যেমন, আলোক প্রদান, রাস্তা নির্মাণ, স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি) সম্পাদনের ব্যবস্থাই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন।

স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা কাহাকে বলে?

এই সমস্ত কার্যের ভার স্থানীয় লোক দ্বারা সংগঠিত কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রদান করা হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলী (Functions of Local Government) :

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য হইল—জন-নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা, পানীয় জল, প্রাথমিক শিক্ষাদান প্রভৃতি ব্যবস্থা কার্যকর করা। নগরে ও গ্রামে স্থানীয় সরকারের কার্য ভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। নগর এলাকায় রাস্তায় আলোক দান করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, বস্তি সংস্কার, পাঠাগার স্থাপন, ক্রীড়াকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি কার্য স্থানীয় সরকারের অধীনে থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা (Utility of Local Government) :

শাসনকার্য সুপরিচালনার জন্য স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে। সুদূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত দক্ষতার সহিত স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারে না, কারণ কেন্দ্রের সহিত স্থানীয় অংশের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ নহে। স্থানীয় জনসাধারণ স্থানীয় সমস্যা এবং জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন থাকে। উপরন্তু, কেন্দ্রের উপর স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ভার থাকিলে অযথা সময়ক্ষেপ হয় ; ইহার ফলে সমস্যা গুরুতর রূপ ধারণ করিতে পারে। সুতরাং কেন্দ্রীয় শাসন অপেক্ষা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন অধিকতর জনহিতকর হইতে পারে।

শাসনের দক্ষতার জন্য স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রয়োজন

মিতব্যয়িতা এবং ন্যায়পরায়ণতার দিক হইতে স্থানীয় জনসাধারণকে শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার ও তাহাদের ভাগ্য নির্ধারণ করিবার সুযোগ প্রদান করা উচিত। স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় আছে। এই অর্থ স্থানীয় জনসাধারণের প্রদত্ত। স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থসাধনের জন্য তাহাদের প্রদত্ত অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হ্রাস হয়, স্থানীয় করদাতাগণ স্থানীয় অংশের শাসনের ব্যয়ভার

মিতব্যয়িতা ও ন্যায়পরায়ণতার দিক্ হইতে এই ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য

নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এই ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার স্থানীয় জনসাধারণের উপর থাকার দরুণ ব্যয় হ্রাস হয়, কারণ জনসাধারণ যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে নিজেদের কার্য করিতে উৎসাহী হয়। অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলে, কোন অঞ্চল যদি বিশেষ কোন স্নবিধা ভোগ করে তবে তাহার ব্যয়ভার সেই অঞ্চলের অধিবাসীদেরই বহন করা উচিত। কলিকাতার নাগরিক জীবনের স্নখ-স্নবিধার জন্য পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কর ধার্য করা উচিত নয়; কলিকাতার অধিবাসীরাই তাহাদের স্নযোগ-স্নবিধার ব্যয়ভার বহন করিবে।

রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসারের বাহন হিসাবে স্বায়ত্ত শাসনের মূল্য কম নয়। স্বায়ত্ত শাসন না থাকিলে জনসাধারণ কয়েক বৎসর পরে একবার মাত্র জাতীয় নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করিতে পাবে। যখন গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই জন-সাধারণ আত্ম-শাসনেব স্নযোগ পায়। তাহাদের জড়ত্ব দূর হইয়া যায়; ক্রমশঃ নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপাবে উৎসাহশীল হয়। এইভাবে স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা নাগরিকগণের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়। স্বাধীন জাতির সংহতি নির্ভর করে স্থানীয় সংগঠনের উপর। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার যে মূল্য, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নগর-সমিতির মূল্যও ঠিক সেই শ্রেণীর। স্থানীয় সংগঠন জনসাধারণকে সর্বসাধারণের জন্য, সর্বসাধারণের সহিত সহযোগিতায়, কার্য করিতে শিক্ষা দেয়। ইহার ফলে সাধারণ বুদ্ধি, কর্মকৌশল, বিচারবোধ এবং সামাজিকতা বৃদ্ধি পায়।

ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করে

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্র দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে পারে না। স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যভারেরও লাঘব হয়। যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থানীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইত তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মদক্ষতার অভাব ঘটিত। স্থানীয় শাসনের ভার স্থানীয় জনসাধারণ গ্রহণ করিবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে অধিকতর চিন্তা প্রয়োগ এবং শক্তি ব্যয় করিতে পারে।

এই সমস্ত যুক্তি হইতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। এই ব্যবস্থা এখন সর্বত্রই স্নপ্রচলিত। স্থানীয় অংশ স্বাধীন ভাবে কার্য পরিচালনা করে, এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার ইহাতে হস্তক্ষেপ করে না। ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার, কুপরিচালনা,

অত্যাচার এবং দুর্নীতির প্রাবল্য হইলে স্থানীয় ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

অনেক সময় বলা হয়, স্থানীয় শাসনের ফলে সংকীর্ণতা এবং স্থানীয় স্বার্থের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এই অপবাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, কিন্তু স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণাবলী এবং প্রয়োজনীয়তার জন্য এই সকল ত্রুটিকে অগ্রাহ্য করা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by Local Self-Government? What are its advantages? (C. U., 1951) (১৯৩-১৯৫ পৃষ্ঠা দেখ)।

একবিংশ অধ্যায়

নাগরিক আদর্শ

নাগরিক আদর্শ কাহাকে বলা হয়? (What are Civic Ideals ?):

পৌরবিজ্ঞান স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নাগরিকতা সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা করে। কতকগুলি আদর্শ ব্যতীত নাগরিকতা কোনও দিনই সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না। আমরা সুনাগরিকতা এবং ইহার পক্ষে কি কি বাধা আছে তাহার আলোচনা করিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে কতকগুলি আদর্শ নাগরিক জীবনে প্রেরণা ও উৎসাহ আনে। এই প্রেরণা ও উৎসাহ বলে নাগরিক সুনাগরিকতার পথে অগ্রসর হয় এবং পথের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিলে লক্ষ্যে পৌঁছায়।

নাগরিক আদর্শ বলিতে বুঝি এমন কতকগুলি আদর্শ যাহা নাগরিকগণের পালন করা উচিত। তাহা পালন না করিলে সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

নাগরিক আদর্শের সম্প্রসারণ (Expansion of Civic Ideals):

অতীতে দার্শনিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ থাকিবার ফলে নাগরিক আদর্শও সংকীর্ণ ছিল। দুই এক ক্ষেত্র ছাড়া দার্শনিকগণ বিশ্বব্যাপী সভ্যতা ও বিভিন্ন

জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের আদর্শ কল্পনাও করেন নাই। সুতরাং তখন সামরিক বল এবং জাতীয় সংস্কৃতির প্রগতি—ইহার মধ্যেই নাগরিক আদর্শ সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা সেই যুগ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এখন আমাদের চিন্তা ও কার্যপদ্ধতি আন্তর্জাতিকতার দিকে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইতেছে। বর্তমানে নাগরিকের কর্তব্য শুধু নিজ নিজ রাষ্ট্র ও জাতির প্রতি নহে, মানবতার প্রতিও তাহাদের কর্তব্য আছে। এইজন্য প্রাচীন কালের "সুন্দর নগরের" (City Beautiful) আদর্শের স্থলে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্বীকৃত হইয়াছে। আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিকতা যে কেবলমাত্র সর্বজনগৃহীত আদর্শ তাহা নহে, ইহাকে সফল করিবার প্রচেষ্টা সমগ্র পৃথিবীতেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অসংখ্য নাগরিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সম্মিলিত বিশ্ব সংগঠনের দাবী করিতেছে। তাহারা শুধু নিজ রাষ্ট্র ও জাতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্ট নহে; আজ তাহাদের আনুগত্য সমগ্র মানবতার নিকট।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব বর্তমান নাগরিক আদর্শ

দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং চিন্তার জগতে এই পরিবর্তনের ফলে সমগ্র নাগরিক আদর্শের ভিত্তি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদ নাগরিকতার আদর্শ, অপরদিকে আন্তর্জাতিকতা ইহার আদর্শ। জীবনের কোনও বিশিষ্ট অংশে (যেমন, রাষ্ট্রনৈতিক, নৈতিক অথবা অর্থনৈতিক) অথবা কোন বিশেষ সীমায় ইহা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের কল্যাণের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহার ব্যাপ্তি। ইহাই নাগরিকতার আদর্শের বর্তমান পরিধি।

নাগরিক আদর্শের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Civic Ideals):

আধুনিক নাগরিকতার আদর্শ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক।

তিন শ্রেণীর নাগরিক আদর্শ:

রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নাগরিকতার আদর্শ হইল—সৎ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে নাগরিক অধিকার প্রয়োগ এবং ভোগ করা। এই সমস্ত অধিকারের উপর সামাজিক কল্যাণ নির্ভর করে। প্রত্যেক নাগরিকই সামাজিক কল্যাণে নিজ কর্মের কিছু অংশ নিয়োজিত করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবে। জাতির স্বাস্থ্য

রক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয় আদর্শ। দুর্বল স্নায়ু এবং ভঙ্গুর শরীর লইয়া কোনও প্রকারের উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করা যায় না। প্রত্যেক নাগরিকের এই আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন যে স্বদেশপ্রেমই মানুষের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। ইহার অর্থ,—মানুষ জাতীয়তাবাদী হইবে এবং তাহার দেশের প্রতি অনুরক্তি থাকিবে। দেশের জন্য জীবন ও সম্পত্তি ত্যাগ করিবার জন্য প্রত্যেকেরই প্রস্তুত থাকা উচিত। এইরূপ স্বদেশপ্রেমকে সামরিকতাবাদ (Militarism) অথবা সংকীর্ণ জাতিবাদ (Racialism) বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। জাতিবাদ জাতীয়তাবাদের বিকৃতি। জাতিবাদের লক্ষ্য হইল অত্যাচার এবং শোষণের সাহায্যে স্বার্থসিদ্ধি করা। সুস্থ জাতীয়তাবাদের সহিত আন্তর্জাতিকতার কোনও বিরোধ নাই; বরঞ্চ জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়াই আন্তর্জাতিকতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে। সুস্থ জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রত্যেকটি নাগরিকের প্রণোদিত হওয়া উচিত।

১। রাষ্ট্রনৈতিক

স্বদেশপ্রেম বা সংকীর্ণ জাতিবাদ বা সামরিকতাবাদ নয়

প্রত্যেক নাগরিকের সতর্ক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত। ঔদাসীন্য এবং অকর্মণ্যতাকে পাপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলী সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা পবিত্র কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র সতর্ক দৃষ্টি স্বাধীনতাকে রক্ষা এবং দুর্নীতির অপসারণ করিতে পারে।

নৈতিক দৃষ্টি হইতে নাগরিক আদর্শ হইবে সমাজের প্রতি গভীর ও অকৃত্রিম কর্তব্যবোধ। প্রত্যেক মানুষ সমাজের স্বার্থের নিকট ব্যক্তি-স্বার্থ বলি দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। নৈতিক দৃষ্টিতে নাগরিকতা হইল সমাজের জন্য আত্মত্যাগ করিবার ক্ষমতা, এবং সমাজ-স্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বার্থের মধ্যে বিরোধ হইলে সমাজ-স্বার্থকে রক্ষা করা। প্রত্যেক নাগরিকের অন্যান্য নাগরিকদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন। সকলের কল্যাণসাধনের জন্য কেবলমাত্র অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ হইতে ক্ষান্ত থাকাই যথেষ্ট নয়; সক্রিয়ভাবে অন্যের অধিকার রক্ষার্থ সাহায্য করা নাগরিকতার প্রকৃত আদর্শ। অধিকার অপেক্ষা কর্তব্যের উপর বেশী জোর দিতে হইবে।

২। নৈতিক

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে নাগরিক আদর্শ হইল প্রগতিশীল দৃষ্টির সাহায্যে জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তাহার উন্নতিসাধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া।

জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। প্রত্যেকের সৌন্দর্যবোধ এবং রুচিজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাহা হইলে দেশের শিল্প, কলা ও সাহিত্য ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

৩। সাংস্কৃতিক

সুন্দর নগর, সুন্দর পৃথিবীর আদর্শ ভুলিলে চলিবে না। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইল,—সর্বসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করা। এই মতামত এমনভাবে প্রদান করিতে হইবে যাহাতে সকলে তাহা বুঝিতে পারে। দেশের এবং পৃথিবীর সর্বসাধারণের জীবনে শিক্ষার প্রসার করাও নাগরিক আদর্শের অন্যতম।

সর্বশেষে নাগরিকদের দৃষ্টি হইবে প্রগতিশীল এবং উদার। অতীতকে সংকীর্ণভাবে গ্রহণ করা নাগরিকদের কর্তব্য নহে। অতীতের ঔজ্জ্বল্য এবং মহত্ত্ব থাকিতে পারে এবং তাহা হইতে অনেক কিছু আমরা শিক্ষা লাভ করিতে পারি। কিন্তু অতীতের আবার অনেক অন্ধ সংস্কার, ধারণা, বিধি-নিষেধ আছে—যাহার বর্তমানে কোনও মূল্য নাই। নাগরিকগণকে অতীতের কুসংস্কার, আচার, বিধি-নিষেধের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন হইতে হইবে। গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা এবং অতীতের অন্ধ অনুসরণ প্রগতিকে রুদ্ধ করে। আদর্শ নাগরিকতা হইল এই বিধি-নিষেধকে ছিন্ন করিয়া সমাজের বৃহত্তর কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করা।

নাগরিক আদর্শ উপলব্ধির সর্তসমূহ (Conditions for Realisation of Civic Ideals) :

স্বাধীনতা ও সাম্য

স্বাধীনতা এবং সাম্য না থাকিলে নাগরিকতার উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব নয়। এই অবস্থা সুস্থ গণতন্ত্রে বিরাজমান। সুতরাং নাগরিক আদর্শ উপলব্ধির জন্য গণতন্ত্র অপরিহার্য।

শিক্ষা

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় সর্ত হইল শিক্ষা। শিক্ষাই নাগরিকদিগকে আদর্শ এবং তাহাদের সুপ্ত ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করিতে পারে। এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সুমহান্ নাগরিক জীবনের প্রধান বন্ধনসূত্র হইল শিক্ষা। শিক্ষা অন্ধ কুসংস্কার হইতে মানুষের মনকে মুক্ত করিয়া উদার দৃষ্টি প্রদান করে; সুতরাং গণতন্ত্র,

স্বাধীনতা, সাম্য এবং শিক্ষা পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া সম্মিলিত ভাবে নাগরিক আদর্শ উপলব্ধির সহায়তা করিতে পারে। সেই আদর্শের প্রকৃত উপলব্ধি স্বর্ণযুগের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে—যাহার জন্য বিরোধ এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে।

ভারতের
শাসন-পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা :

ভারতে ইংরেজ শাসন স্থাপনের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বর্ণনা করিলে বলিতে হয়, "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে।" ১৮৩৩ সালে যে ইংরেজ কোম্পানীর নাম দেওয়া হয় "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটি ইংরেজ বণিক সংগঠনকে ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ "ইষ্ট ইণ্ডিজ" অঞ্চলে একচেটিয়াভাবে বাণিজ্য করিবার জন্য একটি সনন্দ দেন। এই সনন্দেই বণিকদলকে যে সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা হইতে বুঝা যায় যে প্রথম হইতেই ইংরেজরা বাণিজ্যের ছদ্মবেশে ঐ অঞ্চলে বা পূর্বদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজিতেছিল। পরবর্তী সনন্দগুলির মধ্যে ইংরেজদের এই অভিসন্ধি সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীকে সৈন্য সংগ্রহ করিবার, জমি দখল করিবার, ভারতের মধ্যে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিবার, ভারতীয় রাজগণের সহিত চুক্তি অথবা যুদ্ধবিগ্রহ এবং সন্ধি করিবার, আদালত স্থাপন করিয়া নিজেদের রচিত আইন অনুযায়ী বিচারকার্য চালাইবার—এক কথায়, ভারতে কোম্পানীর প্রভাবাধীন স্থানসমূহে রাজত্ব চালাইবার—অধিকার দেওয়া হয়। ইংরেজদের প্রথম স্থায়ী কুঠি স্থাপিত হয় ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সুরাট নগরে। ১৬৪০ সালে মাদ্রাজে দুর্গ ও কুঠির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৬৬৮ সালে ইংরেজ বণিকদল বোম্বাই সহরের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন।

কোম্পানীর সনন্দ

ছলে, বলে, কৌশলে যেভাবে হউক এই স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষে সামাজ্য প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ ইংরেজরা খুঁজিতেছিল তাহা শীঘ্রই মিলিল। সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল। ভারতের ছোট ছোট রাজারা স্বাধীন হইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হইল।

তাঁহাদের আত্মকলহের সুযোগে বিদেশী ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ বণিকগণ ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ভারতীয় এবং বৈদেশিক এই বিভিন্ন শক্তিনিচয়ের দ্বন্দ্বমৈত্রীর আবর্তনে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বণিকগণই ভারতের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ (১৭৪২-১৭৬৩) এবং পলাশীর (১৭৫৭) ও বক্সারের (১৭৬৪) যুদ্ধের পর আর ইংরেজের বিজয় অভিযান রুদ্ধ করিবার মত শক্তি কাহারও রহিল না। ছল চাতুরী এবং যুদ্ধ ইত্যাদির সাহায্যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ইংরেজগণ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

কোম্পানীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

কোম্পানীর আমলে শাসন-ব্যবস্থা :

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে নাই। ইংলণ্ডের রাজার সনন্দের (Royal Charters) বলে ভারতে অধিকৃত স্থানসমূহে আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা, এবং বিচারকার্য প্রভৃতি সকল ব্যাপারে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সর্বেসর্বা ছিল, কোম্পানীর উপর পার্লামেণ্টের কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দ্বারা ভারত শাসন নিয়ন্ত্রিত করার প্রথম প্রচেষ্টার ফলে রেগুলেটিং আইন (Regúlating Act of 1773) পাশ হয়। এই সময় হইতে কোম্পানী পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত শাসন করে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসনের দায়িত্ব কোম্পানীর নিকট হইতে সোজাসুজি ইংলণ্ডের রাণীর হাতে চলিয়া যায়। ১৭৭৩ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত পার্লামেণ্ট কয়েকটি আইন পাশ করিয়া শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে। এই আইনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আইন, ১৭৭৩ (Regulating Act) :

এই আইনের প্রধান ধারাগুলি এইরূপ : (১) বাংলার শাসনভার একজন গভর্ণর-জেনারেল (অর্থাৎ বড়লাট) ও চারিজন সভ্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদের (Council) উপর ন্যস্ত হইল। ইঁহাদের প্রত্যেকের কার্যকাল পাঁচ বৎসর

নির্দিষ্ট হইল। (২) মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং ভারতের কোম্পানী-শাসিত সমগ্র অঞ্চলকে কোন কোন বিষয়ে বাংলার গভর্ণর-জেনারেল এবং তাঁহার পরিষদের অধীনে আনা হইল। (৩) কলিকাতায় বিচারকার্যের জন্য একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইল এবং এই উচ্চতম আদালতকে স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল প্রণীত 'রেগুলেশান' (Regulation) অর্থাৎ আইন বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। (৪) গভর্ণর-জেনারেলকে তাঁহার পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহা মানিয়া চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

রেগুলেটিং আইনের মর্ম

নর্থের রেগুলেটিং আইন ব্রিটিশ-শাসিত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু শীঘ্রই রেগুলেটিং আইনের অনেকগুলি ত্রুটি ধরা পড়ায় ১৭৮৪ সালে পার্লামেণ্ট আর একটি আইন পাশ করে। এই আইন পিটের ভারত আইন (ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট) নামে খ্যাত।

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (ভারত আইন), ১৭৮৪ (Pitt's India Act):

এই আইন ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পিটের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়। এই আইনের দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-শাসন সংক্রান্ত সকল কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ছয় জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল' (Board of Control) অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ-সমিতি স্থাপিত হইল। ইহাই এই আইনটির প্রধান বিশেষত্ব। কালক্রমে এই বোর্ডের সকল ক্ষমতা বোর্ডের সভাপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ইনি ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হইতেন। ক্রমে ক্রমে ইনিই হইয়া উঠিলেন ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলে ইনিই ছিলেন ১৮৫৮ সালের পরবর্তী প্রবলপ্রতাপান্বিত ভারত-সচিবের পূর্বপুরুষ।

'বোর্ড অফ কন্ট্রোলের' প্রতিষ্ঠা।

পিটের ভারত আইন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে পার্লামেণ্টের অধীন করিল। ইহা পাশ হওয়ার কিছু পরে বাংলার গভর্ণর-জেনারেলকে পরিষদের সভ্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ইচ্ছামত ভারত শাসন কবার অধিকার দেওয়া হইল এবং সুপ্রীম কোর্টের অধিকার সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইল।

সনন্দ আইন, ১৭৯৩ (Charter Act, 1793) ঃ

এই সনন্দ আইন দ্বারা শাসন ব্যবস্থায় তেমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

সনন্দ আইন, ১৮১৩ (Charter Act, 1813) ঃ

১৮১৩ সালে পার্লামেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনন্দ দেয় তাহার দ্বারা কোম্পানীর ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রায় বিলোপ করা হয়। ইহার ফলে বহু ইংরেজ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করার জন্য ভারতে আসিতে লাগিল। এই সনন্দ আইনে ভারত-শাসন ব্যাপারে ইংলণ্ডের রাজার সার্বভৌমিকতাও ঘোষিত হয়।

সনন্দ আইন, ১৮৩৩ (Charter Act, 1833) ঃ

এই আইনের দ্বারা ভারতে কোম্পানীর বাণিজ্যের অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। কোম্পানী এখন হইতে শুধুমাত্র রাজ্যশাসনের কার্যে লিপ্ত রহিল। বাংলার গভর্ণর-জেনারেলকে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল আখ্যা দেওয়া হইল এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের আইন প্রণয়ন ও শাসন স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলের কর্তৃত্বে আসিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রদ করা হইল। ভারতে পুরাপুরি এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Unitary Government) প্রবর্তিত হইল। গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদে একজন আইন-সচিব (Law Member) নিযুক্ত হইলেন। এই সনন্দে নির্দেশ দেওয়া হইল যে যোগ্য বিবেচিত হইলে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতবাসীরা সকল সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

কোম্পানীর বাণিজ্য অধিকারের বিলোপ

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন

সনন্দ আইন, ১৮৫৩ (Charter Act, 1853) ঃ

এই আইনের দ্বারা ভারতে আইন প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম একটি ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) প্রতিষ্ঠিত হইল। গভর্ণর-জেনারেল এবং তাঁহার পরিষদের সদস্যগণ ও ছয়জন সরকারী কর্মচারীকে লইয়া এই ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইল। এই আইনে বাংলা দেশ শাসনের ভার একজন লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্ণর অর্থাৎ ছোটলাটের উপর ন্যস্ত হইল।

সিপাহী বিদ্রোহ ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সূচনা—

জাল-জুয়াচুরি ও জোর-জবরদস্তির সাহায্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। ভারতের জনগণ ও রাজগণ সকলেই ইংরেজের অত্যাচারে অবিচারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ভারতবাসী অনেকেই বুঝিতে পারিল যে তাহাদের অন্তর্বিবাদের সুযোগেই বিদেশী ইংরেজ ভারতভূমি পদানত করিয়াছে। ১৮৫৭ সালে এই অন্তর্বিবাদ ভুলিয়া গিয়া একত্রিত ভাবে বিদেশীর বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের জন্য একটি প্রবল প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। ইতিহাসে ইহাই সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) নামে পরিচিত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের দেশেরই কিছুসংখ্যক লোকের (বিশেষ করিয়া, শিখ ও গুর্খাগণের) সাহায্যে এবং অধিকতর শক্তির ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিয়া অমানুষিক শাস্তির ব্যবস্থা করিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের জয় হইল—কিছুদিন ধরিয়া পাশবিক অত্যাচার চলিল।

কোম্পানীর অস্তিত্বের বিলোপ

কোম্পানী এতদিন দিল্লীর মসনদে একজন মুঘল বংশধরকে টিকাইয়া রাখিয়াছিল। নামেমাত্র সম্রাট হিসাবে হইলেও তাঁহার অস্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর এই প্রহসনের অবসান ঘটিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের সার্বভৌমিকতা সোজাসুজি ইংলণ্ডের রাণীর হস্তে ন্যস্ত হইল। একই সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও মুঘল সম্রাটের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল।

১৮৫৮ সালের ভারত-শাসন আইন (Government of India Act, 1858) ঃ

ভারতের উপর ব্রিটিশরাজের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব স্থাপন

সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার পর ইংরেজরা এই সিদ্ধান্ত করিল যে কোম্পানীর শাসন আর চলিবে না এবং ভারতকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রত্যক্ষ শাসনে রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট ১৮৫৮ সালে একটি ভারত-শাসন আইন (Government of India Act, 1858) প্রণয়ন করিল। এই আইনের দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য শাসনের অধিকার সম্পূর্ণ বিলোপ করা হইল। বিলাতে একজন স-পরিষদ্

ভারত-সচিব (Secretary of State) সৃষ্টি করা হইল। ইনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারত শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিলেন ও ব্রিটেনের রাণীর নামে বড়লাটের মারফৎ ভারত শাসন করিতে লাগিলেন।

নূতন শাসন-ব্যবস্থা ও ভারত-সচিব

ভারতে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে একজন গভর্ণর-জেনারেল ভারত শাসনের ভার পাইলেন। ভারত-সচিবের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

ভারতীয় আইন সভার ক্রমবিকাশ ঃ

ভারতীয় অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আইন-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদে ১৮৩৩ সালেই একজন সদস্য (কেবলমাত্র আইন তৈয়ারীর জন্য) নিযুক্ত করা হয়। ১৮৫৩ সালে একটি ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ক্রমান্বয়ে কতকগুলি আইন পাশ করিয়া এই ব্যবস্থাপক সভার গঠন ও কার্যাবলীর পরিবর্তন করিতে থাকে।

ইংলণ্ডের রাণী স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার পর ভারতীয় আইন সভা সম্পর্কিত প্রথম আইন হইল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১।

এই আইনে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা (Indian Legislative Council) নূতন ভাবে গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। এই ব্যবস্থাপক সভায় গভর্ণর-জেনারেলের শাসন-পরিষদের (Executive Council) সভ্যগণ ব্যতীত আরও ছয় হইতে ১২জন 'অতিরিক্ত' সভ্য মনোনীত হইতেন। নিয়ম করা হইল যে 'অতিরিক্ত' সভ্যদের অন্যূন অর্ধেক হইবেন বে-সরকারী ব্যক্তি। কয়েকটি প্রধান প্রদেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইল।

ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১

জাতীয় আন্দোলনের দাবিকে নামমাত্র মিটাইবার জন্য পরবর্তী আইন বা ১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইন দ্বারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সভ্য-সংখ্যা বাড়াইয়া ১২ জনের স্থলে ১৬ জন করা হইল। নিয়ম করা হইল যে বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বণিক-সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যাঁহাদের নাম সুপারিশ করিবেন, তাঁহাদিগকেই সরকার পক্ষ মনোনীত করিবেন।

ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৯২

স্বদেশী আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতশাসন-ব্যবস্থার সামান্য কিছু সংস্কার সাধন করিয়া নরমপন্থীদের তুষ্ট করার চেষ্টা করিলেন। এইজন্য প্রবর্তিত হইল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন (Indian Councils Act, 1909)। এই আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত সংস্কার সাধিত হইল :—

মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার বা ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৯০৯

(১) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া মনোনীত ও নির্বাচিত সভ্যদের সংখ্যা ৬০ জন করা হইল। সরকারী সভ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষিত হইল।

(২) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির আয়তন বাড়ানো হইল এবং বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত ও নির্বাচিত বে-সরকারী সভ্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেন।

(৩) পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা আইনের দ্বারা প্রবর্তিত হইল।

(৪) ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন হইল। এইভাবে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বুকে বিভেদ নীতির শলাকা শাসন-সংস্কারের নামে প্রবিষ্ট করানো হইল।

জাতীয় আন্দোলনের প্রসার : কংগ্রেস :

সিপাহী বিদ্রোহের পর মাঝে মাঝে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় যে সব রদবদল হইয়াছিল সেগুলি জাতীয় আন্দোলনের বিকাশের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। ১৮৭০ হইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে একদিকে দৈন্য ও দুর্ভিক্ষ এবং অন্যদিকে শাসক ইংরেজ জাতির ঔদ্ধত্য, অত্যাচার ও বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ প্রবল হইয়া উঠে। শিক্ষিত ভারতবাসীরা ইতিমধ্যে নানাবিষয়ে অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছিলেন। এই সকল কারণে জাতীয় অসন্তোষ এই সময় প্রবল আকার ধারণ করে। এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ যাহাতে সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হইয়া ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার একটি বশম্বদ নরমপন্থী জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিল। হিউম নামে একজন ইংরেজ সিভিলিয়ানের উদ্যোগে এবং বড়লাট লর্ড ডাফরিনের গোপন পরামর্শে একটি জাতীয় সম্মেলন আহূত হইল। হিউম বলিয়াছেন যে

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

সে সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের মত আর একটা বিদ্রোহ ঘটার আশঙ্কা দেখা যাইতেছিল বলিয়া শিক্ষিত ভারতবাসীদের লইয়া একটি আইনানুগ সরকার-বিরোধী দল গঠন করার জন্য লর্ড ডাফরিন তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের লইয়া জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ইংরেজ সরকারের আশা কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হইল না, কারণ, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই ভাবত সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা হইয়াছিল। পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে কংগ্রেস ক্রমান্বয়ে অধিকতর বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠিল। কংগ্রেস সম্পূর্ণ রাজভক্ত ও আইনানুগ হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা অনেকেই ভারত সরকারের সমালোচনা করিতেন এবং দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থার পত্তন দাবি করিতেন। ইহাতে লর্ড ডাফরিন ক্ষেপিয়া উঠিয়া কংগ্রেসকে রাজদ্রোহাত্মক প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিলেন এবং কংগ্রেসে যোগ দিতে সরকারী কর্মচারিগণকে নিষেধ করিলেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে কংগ্রেস সরকারের সন্দেহভাজন হইয়া উঠিলেও উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতির দিক হইতে বিচার করিলে তখনকার কংগ্রেসকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান বা দল বলা যায় না। ইংলণ্ডের উপনিবেশসমূহে যে ধরণের দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইতেছিল ভারতবর্ষের জন্য কংগ্রেস তাহাই দাবি করিয়াছিল। আর দাবি করিয়াছিল আমলাতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির সংস্কার। ইহার কার্যপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নিরুপদ্রবভাবে আইনসম্মতভাবে প্রস্তাব পাশ করা এবং ঐ প্রস্তাব সরকারের গোচরীভূত করা।

কয়েক বৎসর পরে জাতীয় আন্দোলন অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া ওঠে। ১৯০৫ সালে দাদাভাই নওরোজী কংগ্রেস মঞ্চ হইতে 'স্বরাজ' দাবি কবিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল তাহার প্রভাবে সমগ্র ভারতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা আবেদন-নিবেদনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সক্রিয় ও সশস্ত্র প্রতিরোধের দ্বারা দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য 'অনুশীলন সমিতি' প্রভৃতি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিক্ষিত বিপ্লবীদের মধ্যে ফাঁসী ও জেলের মহড়া আরম্ভ হইল। কংগ্রেস নরমপন্থী ও গরমপন্থী—এই দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেল। গোখলে, ফিরোজ শাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী

জাতীয় আন্দোলনে নরম-পন্থী ও গরমপন্থীর সংঘাত

ঘোষ প্রমুখ নেতারা হইলেন নরমপন্থী ; তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ নেতারা হইলেন গরমপন্থী।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দেশের শিল্পোন্নতি হইল এবং ভারতের ধনিক শ্রেণী শক্তিশালী হইল। অন্য দিকে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্য বৃদ্ধি, করভার বৃদ্ধি, সৈন্য সংগ্রহ ইত্যাদির দ্বারা যুদ্ধকালীন নির্মম শোষণের ফলে ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশার অবধি রহিল না। বড়লাট নিজেই স্বীকার করিলেন যে রক্ত শোষণ করিয়া ভারতকে একেবারে সাদা করিয়া ফেলা হইয়াছে। অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। ব্রিটিশ সরকার বলিতেছিলেন যে গণতন্ত্রের ও বেলজিয়ামের স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতের লোক এই উক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষে ইংরেজের স্বৈরাচারী শাসনের তুলনা করিয়া এই উক্তির অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই বুঝিতে পারিতেছিল। কংগ্রেসের দুই দল মিলিয়া গেল। তাহা ছাড়া, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটি চুক্তি হইল (Lucknow Pact, 1916)। এই ভাবে সমগ্র ভারতবাসীর সম্মিলিত জাতীয় দাবি উত্থাপিত হইল।

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতের অংশ গ্রহণ

ভারতের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে প্রশমিত করার জন্য ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট পার্লামেণ্টে একটি ঘোষণা করিলেন। ঘোষণায় বলা হইল যে সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট, ভারতের সরকারের সহিত একমত হইয়া, এই নীতি গ্রহণ করিতেছেন যে, (১) ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে রাখা হইবে ; (২) ক্রমে ক্রমে, কিস্তিতে কিস্তিতে ভারতের জন্য দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে অবলম্বিত হইবে ; (৩) দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার এই সকল কিস্তি কখন, কতটা এবং কিভাবে অবলম্বিত হইবে, তাহার একমাত্র বিচারক হইবেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ; এবং (৪) ভারত শাসনের প্রত্যেক বিভাগে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হইবে।

পার্লামেণ্টে মণ্টেগুর ঘোষণা (১৯১৭)

এই ঘোষণা অনুযায়ী মিঃ মণ্টেগু ভারতে সফর করিয়া বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌-ফোর্ডের সহিত একযোগে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন (Government of India Act, 1919) প্রণীত হয়। বড়লাট ভারত-সচিবের নাম অনুসারে এই নূতন ব্যবস্থা "মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার" নামে পরিচিত।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা :

১। কেন্দ্রীয় শাসন : শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে (১) কেন্দ্রীয় এবং (২) প্রাদেশিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিষয়

কেন্দ্রীয় বিষয়ে আইন প্রণয়নের ও শাসনের ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে দুই কক্ষে গঠিত করা হইল। বিল পাশ করার ক্ষমতা, সরকারী ব্যয় মঞ্জুর করার ক্ষমতা, প্রস্তাব আনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভাকে দেওয়া হইল। কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল যাহাতে ভারত-সচিবের অধীনে ইচ্ছামত ভারত শাসন করিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহাকে বহুবিধ ক্ষমতা দেওয়া হইল। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত সভ্যদের কেবল কথা বলিবার অধিকার রহিল। কার্যতঃ গভর্ণর-জেনারেল রহিলেন ভারতের একচ্ছত্র শাসনকর্তা।

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

২। প্রাদেশিক দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা (Dyarchy) : প্রাদেশিক সরকারকে প্রাদেশিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হইল। কিন্তু যে কোন প্রাদেশিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিল। ভারতের এককেন্দ্রিক ও কেন্দ্রীভূত (Unitary and Centralised) শাসন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না। প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল : (১) সংরক্ষিত বিষয় (Reserved Subjects) এবং (২) হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred Subjects)। পুলিশ, জেলখানা, বিচার-ব্যবস্থা, রাজস্ব, জলসেচ, সরকারী আয় ও ব্যয় প্রভৃতি হইল সংরক্ষিত বিষয়। এই সকল বিষয়ের পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে গভর্ণর ও তাঁহার শাসন-পরিষদের (Executive Council) সভ্যগণের হাতে রহিল। এ সকল বিষয়ে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার প্রতি তাঁহাদের কোন দায়িত্ব রহিল না। কৃষি, জমি, শিল্প, সমবায়, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি হইল হস্তান্তরিত বিষয়। এই সকল বিষয়ে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য গভর্ণরের সহিত একটি মন্ত্রিসভা যুক্ত হইল। গভর্ণর মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিতেন। মন্ত্রিগণ নিজেদের কাজের জন্য ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী

কেন্দ্রের সহিত প্রদেশের সম্বন্ধ

দ্বৈত শাসনের স্বরূপ

থাকিতেন। ঐ সভার অনাস্থাভাজন হইলে মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করিতে হইত। গভর্ণরকে ক্ষমতা দেওয়া হইল যে তিনি প্রয়োজন বোধ করিলে মন্ত্রীদের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপক সভার ভোট অগ্রাহ্য করিয়া হস্তান্তরিত বিষয়ে নিজের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। আইন প্রণয়নের উপরও গভর্ণরের অবাধ ক্ষমতা ছিল।

দ্বৈত শাসনের ব্যর্থতা

প্রদেশে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা সফল হইল না। বিরোধী পক্ষ কেবলই মন্ত্রীদের মাহিনা কাটিয়া অথবা তাঁহাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেন এবং এইভাবে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইত। মন্ত্রীদের হাতে ছিল জনসাধারণের উন্নতির ভার, কিন্তু টাকা খরচ করার ব্যাপারটি ছিল সংরক্ষিত বিষয়। চাবি-কাঠিটি সংরক্ষিত করিয়া কুলুপটিকে যদি হস্তান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে ঘরের দরজা খোলার দায়িত্বটা নিষ্ঠুর প্রহসন হইয়া উঠে। মন্ত্রীদের অবস্থা এইরকম হইয়াছিল। গভর্ণরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসন-পরিষদের সভ্যদের পাশে মন্ত্রিগণকে নিতান্ত বামন দেখাইত। হাস্য-রসিক প্রমথ চৌধুরী এইজন্য "ডায়ার্কিকে" অর্থাৎ দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন 'দু-ইয়ার্কি'।

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের পতন

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের দ্বারা ভারতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial Autonomy) প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাসন-ব্যবস্থাটি ছিল কেন্দ্র হইতে পরিচালিত এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেল ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে দেওয়া হইয়াছিল।

নির্বাচন প্রথার প্রসার

১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে বলা হইয়াছিল যে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা অন্ততঃ ৭০ জন সভ্য নির্বাচিত হইবেন এবং সরকারী সভ্যের সংখ্যা শতকরা ২০ জনের অধিক হইবে না।

কেন্দ্রে ও প্রদেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা পূর্বের মত প্রচলিত রহিল।

৩। **মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কারের বৈশিষ্ট্যঃ** মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কারের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি (Responsible Government) প্রবর্তনের

নীতি সর্বপ্রথম সরকারী ভাবে স্বীকৃত হইল। দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থার বহু ত্রুটি এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার পূর্বে ব্রিটিশ সরকার কখনও ভারতীয়দিগকে শাসনকার্যের উপর আংশিক অধিকার দানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইনে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে ভবিষ্যতে শাসনকার্যে ভারতীয়দের অভিজ্ঞতা লাভ ও যোগ্যতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ক্রমশঃ প্রসারিত করা হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারেই কয়েক বৎসর পরে সাইমন কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছিল।

জাতীয় আন্দোলনে নূতন ধারা (১৯১৯-৩৫):

প্রথম মহাযুদ্ধের ও ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কারের পর ভারতের জাতীয় আন্দোলন নূতন পর্যায়ে ওঠে এবং বিরাট গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। যুদ্ধের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে এবং ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে বহু লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। 'রৌলাট কমিটি'র সুপারিশে যুদ্ধকালীন ভারত-রক্ষা আইনকে স্থায়ী করার জন্য ১৯১৯ সালে জনমত অগ্রাহ্য করিয়া ভারত সরকার তথাকথিত "রৌলাট আইন" (Rowlatt Act) নামক একটি কালাকানুন বিধিবদ্ধ করেন। এই সময়ে ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব ঘটে। 'রৌলাট আইনে'র বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ইহার পরিণতি ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে (১৯১৯)। এই ঘটনার পরে ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও জাতীয় বিক্ষোভের সঙ্গে মিলিত হইল মিত্রশক্তিগণ কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত তুর্কী সাম্রাজ্যকে দাসত্বমূলক সন্ধিতে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের বিক্ষোভ। মৌলানা মহম্মদ আলী ও মৌলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন সুরু হইল। গান্ধীজি আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে হাত মিলাইলেন। ফলে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২১) আরম্ভ হইল। ভারতে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখা দিল।

রৌলাট আইন ও জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

অসহযোগ আন্দোলন

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজি কর্তৃক বার্দোলীতে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের পর অসহযোগ আন্দোলন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই আন্দোলনে কাউন্সিল বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষ

সংগ্রামের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হওয়ায় চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া পার্লামেণ্টারী কায়দায় বিরোধী আন্দোলন চালাইবার জন্য কংগ্রেস স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং গান্ধীজিও অবশেষে ইহাতে মত দেন। স্বরাজ্য দলই ভারতের প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক দল। এই দলের তীব্র সমালোচনা মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের মুখোস খুলিয়া দেয় এবং নূতন শাসন-ব্যবস্থাকে প্রায় অচল করিয়া ফেলে।

স্বরাজ্য দল

ক্রমশঃ দেশে বিক্ষোভ বাড়িতে লাগিল এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উঠিতে থাকিল। তখন ব্রিটিশ সরকার মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য পার্লামেণ্টের কয়েকজন সভ্য দ্বারা গঠিত একটি রয়েল কমিশন নিয়োগ করিল (১৯২৭)। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন সাইমন। সাইমন কমিশনকে ভারতের সকল দলের লোক নিন্দা করে এবং ইহার প্রত্যাহার দাবী করে। কিন্তু কমিশন ভারতের জননেতৃগণের অসহযোগিতা সত্ত্বেও অনুসন্ধান কার্য সমাপ্ত করিয়া কিছুকাল পরে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিল।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী বিক্ষোভ

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে বড়লাট লর্ড আরউইন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে ডোমিনিয়ন মর্যাদাই (Dominion Status) হইল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির স্বাভাবিক লক্ষ্য এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর সকল পক্ষ যাহাতে একমত হইয়া পার্লামেণ্টের নিকট শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারে সেইজন্য একটি গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) ডাকা হইবে। গোল টেবিল বৈঠককে ভারতের জন্য ডোমিনিয়ন শাসনতন্ত্র রচনা করার ভার দেওয়া হয় নাই—এই কারণে কংগ্রেস-নেতারা এই বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হইলেন না। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল এবং প্রত্যেক বৎসর ২৬শে জানুয়ারী "স্বাধীনতা দিবস" হিসাবে পালন করার সঙ্কল্প করা হইল। ১৯৩০ সালে, গান্ধীজি লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন এবং দেশময় এক ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়।

ডোমিনিয়ন মর্যাদার প্রশ্ন

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি

আইন অমান্য আন্দোলন

১৯৩০ সালের শেষের দিকে লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইল। কংগ্রেস ইহাতে যোগদান করে নাই। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড আরউইন ও গান্ধীজির মধ্যে এক চুক্তি হয়। এই চুক্তির ফলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ রাখা হয় এবং মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি রূপে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হন। কিন্তু গান্ধীজি ভারতের তরফে গোল টেবিল বৈঠকে যে সকল রাষ্ট্রনৈতিক দাবী উপস্থিত করিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সেগুলি মোটেই মানিয়া লইল না। গোল টেবিল বৈঠকে মাতামাতি হইল শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা সম্বন্ধে সকল দলের ও ব্যক্তির মতৈক্য সাধন লইয়া। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বাছিয়া লইতেন এমন ভাবে যে তাঁহাদের মধ্যে কিছুতেই মতৈক্য হইতে পারিত না। সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা সম্বন্ধে কোন সর্বসম্মত চুক্তি সম্পন্ন হইল না। গোল টেবিল বৈঠক একটা বিরাট প্রহসনে পর্যবসিত হইল।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজির উপস্থিতি

এদিকে ভারতে নূতন জবরদস্ত বড়লাট লর্ড উইলিংডন গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ভারতবাসীকে উপযুক্ত 'শিক্ষা' দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। গান্ধীজি দেশে ফিরিয়াই পুনরায় গ্রেপ্তার হইলেন। ভারত সরকার অর্ডিনান্স-রাজ সুরু করিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইল। ১৯৩২ সালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ড ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সংখ্যালঘুদের আসন-সংখ্যা এবং নির্বাচন-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া এক সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত (Communal Decision) প্রকাশ করিলেন। ইহাতে উচ্চ বর্ণের এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বলিয়া গান্ধীজি উপবাস আরম্ভ করিলেন। এই উপবাসের ফলে তাঁহার সহিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অন্যতম নেতা ডাঃ আম্বেদকরের এক চুক্তি পুণায় স্বাক্ষরিত হইল। পুণা চুক্তির ফলে মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সামান্য একটু পরিবর্তন হইল।

গান্ধী-আরউইন চুক্তিভঙ্গ ও পুনরায় সত্যাগ্রহ সুরু

ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নূতন ভারত-শাসন আইনের খসড়া রচনা করিবার জন্য পার্লামেণ্টের একটি যুক্ত কমিটি নিয়োগ করিল। এই যুক্ত কমিটির রিপোর্ট

অনুযায়ী ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর পার্লামেণ্টে একটি ভারত-শাসন বিল উপস্থিত করেন। এই বিলটি ১৯৩৫ সালে পাশ হইয়া আইনে পরিণত হয়। তখন ইহার নাম হয় ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন।

নূতন ভারত-শাসন আইন পাশ

ভারত-শাসন আইন পাশ করিবার কিছু পূর্বে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার ফলে কংগ্রেস নেতারা পুনরায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যঃ

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের দ্বারা ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবর্তন প্রস্তাবিত কিংবা সাধিত হইল। প্রথমতঃ, প্রদেশগুলিকে ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি নিখিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হইল। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পরিকল্পনা হইল। দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার ও উপজাতির শাসন—এই চারিটি বিভাগ হইবে সংরক্ষিত। এইগুলি গভর্ণর-জেনারেল তিনজন উপদেষ্টার সাহায্যে নিজের ইচ্ছামত স্বয়ং পরিচালনা করিবেন। অন্যান্য বিষয়ে গভর্ণর-জেনারেল এক মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া শাসনকার্য নির্বাহ করিবেন। তৃতীয়তঃ, প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial Autonomy) দেওয়া হইল এবং প্রদেশে পূর্বতন দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থাব বলোপ করিয়া মোটামুটিভাবে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রসারিত করা হইল। এই বিষয়ে ১৯৩৫ সালের আইন দ্বারা ভারতবাসীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার অনেকটা প্রসারিত হইল। চতুর্থতঃ, কেন্দ্রে এবং প্রদেশে যে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাকে নানাভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইল। অর্থাৎ গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা মন্ত্রি-সভার ও ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইল। ফলে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা অঙ্গহীন রহিল। পঞ্চমতঃ, ভারতে একটি

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব

কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রসার

শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ

ফেডারেল কোর্ট

ফেডারেল কোর্ট (Federal Court) অর্থাৎ যুক্তবাষ্ট্রীয় বিচাবালয় স্থাপিত হইল। ইহা যুক্তবাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাব অপবিহার্য অংশ।

ভারত-সচিব (Secretary of State for India) ঃ

বলা হইযাছে যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেব ভাবত-শাসন আইন দ্বাবা ব্রিটিশবাজেব নামে ভাবত শাসনেব ভাব ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাব একজন সভ্যেব উপব ন্যস্ত হয। তাঁহাব আখ্যা হইল ভাবত-সচিব। এই সময হইতে ভাবত-সচিব ইংলণ্ডেব বাজা বা বাণী (British Monarch) ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেব প্রতিভূ হিসাবে ভাবত শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহাব কার্য ও নীতিব জন্য তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেব নিকট দাযী বহিলেন। ভাবতেব গভর্ণব-জেনাবেল সর্ববিষয়ে ভাবত-সচিবেব আদেশ মানিযা চলিতেন। এই ব্যবস্থা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

১৯৩৫ সালেব ভাবত-শাসন আইনেব দ্বাবা ভাবত-সচিবেব পবিষদকে তুলিয়া দিয়া তাহাব পবিবর্তে একটি উপদেষ্টা (Advisers) সংঘ স্থাপন কবা হয়।

১৯৪৭ সালে ভাবতেব উপব ভাবত-সচিবেব শাসনেব অবসান হয, কাবণ ভারতেব স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act) দ্বাবা পার্লামেণ্টেব ভাবতসংক্রান্ত ক্ষমতাব অবসান হয এবং ভাবত-সচিবেব পদ বিলুপ্ত হয।

লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার ঃ

১৯১৯ সাল হইতে লণ্ডনে একজন ভাবতীয় হাই কমিশনাব ছিলেন। ইনি ছিলেন লণ্ডনে ভাবতেব গভর্ণব-জেনাবেলেব প্রতিনিধি ও ভাবপ্রাপ্ত কর্মচাবী। ভাবত সবকাবেব তবফে জিনিসপত্র কেনা, লণ্ডনস্থ ভাবতীয ছাত্রদেব ও ভাবতীয় নাগবিকদেব তত্ত্বাবধান কবা ইত্যাদি কযেকটি গৌণ ব্যাপাব তাঁহাব কর্তৃত্বাধীনে ছিল।

ভাবতেব স্বাধীনতা লাভেব পব লণ্ডনেব ভাবতীয় হাই কমিশনাবেব ক্ষমতা ও পদমর্যাদা অনেক বাডিযাছে। এখনও হাই কমিশনাব নামে অভিহিত হইলেও ইনি এখন কার্যতঃ লণ্ডনে ভাবতেব বাষ্ট্রদূত (Ambassador)।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় শাসন-পদ্ধতি ঃ

গভর্ণর-জেনারেল ঃ ১৯৩৫ সালেব ভাবত-শাসন আইনে কেন্দ্রীয় শাসন সম্বন্ধে একটি যুক্তবাষ্ট্রীয় পবিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-

ব্যবস্থায় কেন্দ্রে দ্বৈতশাসনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির মধ্যে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার ও উপজাতি এলাকার শাসন, এই চারিটি বিষয়কে সংরক্ষিত করিয়া গভর্ণর-জেনারেলের নিজস্ব বিবেচনার (discretion) অধীন রাখা হইয়াছিল। তিন জন উপদেষ্টার (Counsellors) সাহায্যে গভর্ণর-জেনারেল এইগুলি পরিচালনা করিবেন। অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে আংশিক ভাবে দায়িত্বশীল শাসন প্রস্তাবিত হইয়াছিল। এই সকল বিষয়ে গভর্ণর-জেনারেল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার (Council of Ministers) সাহায্যে শাসন পরিচালনা করিবেন। গভর্ণর-জেনারেলকে নানা ব্যাপারে নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে কাজ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল ; যথা—মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করা ; ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করা ; ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নামঞ্জুর দাবী মঞ্জুর করা, ইত্যাদি। নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে কাজ করার সময়ে গভর্ণর-জেনারেল মন্ত্রীদের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করিবেন না। ইহা ব্যতীতও গভর্ণর-জেনারেলকে ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি (individual judgment) অনুসারে কোন কোন বিষয়ে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি অনুসারেই তিনি তাঁহার বিশেষ দায়িত্বগুলি পালন করিবেন বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কয়েকটি বিশেষ দায়িত্ব (Special Responsibilities) ছিল এইরূপ :—ভারতের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ; ভারতের আর্থিক স্থায়িত্ব ও সুনাম রক্ষা ; সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার রক্ষা ; সরকারী কর্মচারীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা ; দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের অধিকার রক্ষা ইত্যাদি ; এই সকল ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেল মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের পরামর্শ নাকচ করিয়া তিনি নিজের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি (individual judgment) অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন।

দ্বৈত শাসন

উপদেষ্টা

মন্ত্রিসভা

বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা

বড়লাটের বিশেষ দায়িত্ব

গভর্ণর-জেনারেলকে আইন প্রণয়ন সম্বন্ধেও প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা : গভর্ণর-জেনারেল অনধিক দশ জন মন্ত্রী নিয়োগ

করিবেন। ব্যবস্থাপক সভার নিম্নতর কক্ষের অনাস্থাভাজন হইলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার দুইটি কক্ষ প্রস্তাবিত হইয়াছিল। উচ্চ কক্ষকে নিম্ন কক্ষের সহিত প্রায় সমান ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল; এমন কি, ব্যয় মঞ্জুর করার ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছিল। এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন দেশে অবলম্বিত হয় নাই। আইন প্রণয়নের উপর গভর্ণর-জেনারেলের নানারূপ ক্ষমতার দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার গঠন ও ক্ষমতা

বিষয় বিভাগঃ

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে শাসন-সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা কেন্দ্রীয় বিষয়ঃ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণযন কবার ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। বিষযগুলি এইরূপ :—(১) দেশরক্ষা (অর্থাৎ জল, স্থল, নৌ ও বিমানচারী সৈন্যবাহিনী গঠন ও পবিচালনা); (২) বৈদেশিক বিভাগ, (৩) মুদ্রা নির্মাণ ও মুদ্রা প্রচলন; (৪) ডাক ও তাব বিভাগ; (৫) রেলপথ ইত্যাদি।

২। প্রাদেশিক বিষয়ঃ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ভার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার উপর ন্যস্ত ছিল এবং প্রাদেশিক সরকার এই বিষয়-গুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিত। প্রাদেশিক বিষয়গুলি এইরূপ :—(১) আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা; (২) পুলিশ; (৩) জেলখানা, (৪) বিচার-ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক উচ্চ আদালত; (৫) শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়; (৬) জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসালয় প্রভৃতি।

প্রাদেশিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে দুই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। (১) দুই বা ততোধিক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে প্রাদেশিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিলে এই অনুরোধ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা এই সকল বিষয়ে আইন করিতে পারিত। (২) গভর্ণর-জেনারেল জরুরী অবস্থা ঘোষণা

প্রাদেশিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের সর্ত

করিলে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রাদেশিক বিষয়ে আইন করিতে পারিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা এই ক্ষমতা পাইয়াছিল।

যুগ্ম বিষয়ঃ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। তবে, ইহার কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন করিলে সেই বিষয়ে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আইন বলবৎ হইবে না। কিন্তু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আইনটি গভর্ণর-জেনারেলের মত প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়া তাঁহার সম্মতি পাইয়া থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের উপর বলবৎ থাকিবে। যুগ্ম বিষয়গুলি এইরূপ:—(১) ফৌজদারী আইন ও বিচার-প্রণালী; (২) দেওয়ানী বিচার-প্রণালী; (৩) সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি; (৪) বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ; (৫) উইল; (৬) চুক্তি ইত্যাদি।

যুগ্ম বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃত্ব

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনের আংশিক প্রবর্তন:

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত যে সকল বিধান ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনে লিপিবদ্ধ ছিল তাহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। সুতরাং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন বলবৎ না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত) কেন্দ্রীয় শাসন প্রধানতঃ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারেই পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন বলে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় বহু অদল-বদল করা হইয়াছিল।

প্রদেশগুলিতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন বলবৎ হইয়াছিল। গভর্ণর-শাসিত ১১টি প্রদেশে (বাঙ্গালা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তিত হইয়াছিল।

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial Autonomy):

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের অর্থই হইল এই যে প্রদেশকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইবে (যথা,—কয়েকটি বিষয়ে আইন প্রণয়নের ও শাসনকার্যের ক্ষমতা, কর বসানোর ও টাকা খরচ করার ক্ষমতা ইত্যাদি) সে সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ১৯৩৫ সালের পূর্বে ভারতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ছিল না।

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের অর্থ

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে কিছু পরিমাণ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তিত হয়। কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র ও দায়িত্বশীল শাসন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব সুনির্দিষ্টভাবে কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে পৃথক করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গভর্ণর-জেনারেল নানাভাবে প্রাদেশিক শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। সুতরাং ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে নামে মাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কার্যতঃ শাসন-ব্যবস্থা ছিল একক শাসন-ব্যবস্থার হেরফের; ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের পর প্রাদেশিক সরকারের স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা আর একটু বৃদ্ধি পায়।

১৯৩৫ সালের আইনে ব্যবস্থা ও ইহার ত্রুটি

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে প্রাদেশিক শাসন-পদ্ধতি ঃ

প্রাদেশিক গভর্ণর ঃ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে প্রদেশে দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া সমস্ত প্রাদেশিক বিষয়ে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা গভর্ণরের নিজস্ব বিবেচনা (discretion) ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির (individual judgment) দ্বারা কণ্টকিত ছিল। এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে গভর্ণর শাসিত এগারটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) স্থাপিত হইবে। সমস্ত প্রাদেশিক বিষয়ের শাসনভার মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত থাকিবে। মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিবে। কয়েকটি ব্যাপারে গভর্ণরকে নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে কাজ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভার আহ্বান ও ভঙ্গ, মন্ত্রীদের নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে গভর্ণর মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ নাও করিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া গভর্ণরকে কয়েকটি বিষয়ে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বগুলি ইহার অন্তর্গত; বিশেষ দায়িত্বগুলি নিম্নলিখিতরূপ ঃ—প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার রক্ষা, দেশীয় রাজন্যবর্গের অধিকার রক্ষা ইত্যাদি।

আংশিক দায়িত্বশীল সরকারের প্রবর্তন

এই সকল বিষয়ে পরিচালনা সম্পর্কে গভর্ণরকে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে হইত, কিন্তু পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করার পর তিনি তাঁহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতে পারিতেন। গভর্ণর তাঁহার নিজস্ব বিবেচনা ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেলের তত্ত্বাবধানাধীন ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহাকে ইহাদের প্রয়োগ ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি লইতে হইত।

প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা: ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে ১১টি গভর্ণর শাসিত প্রদেশের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মন্ত্রিসভার কায ছিল, গভর্ণরকে শাসনকায পরিচালন সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া ও সহায়তা করা। অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার রীতি অনুসারে প্রদেশের শাসনকায পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গভর্ণর মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিতেন। তিনি মন্ত্রীদের যে কোন মুহূর্তে মন্ত্রিত্ব হইতে বরখাস্ত করিতে পারিতেন। অপরদিকে মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার নিকটও দায়িত্বশীল ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভা তাঁহাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হইত।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা: ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে একাদশটি গভর্ণরের প্রদেশ সৃষ্ট হইয়াছিল, যথা—বাঙ্গালা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু। প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা ছিল। বাঙ্গালা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসাম—এই ছয়টি প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার দুইটি কক্ষ (Chamber) ছিল। গভর্ণর সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থাপক সভার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেন।

গঠন

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাকে প্রাদেশিক ও যুগ্ম বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। সংখ্যাধিক্য ভোটে দুই কক্ষের সম্মতি না পাইলে কোন বিল (খসড়া আইন) পাশ হইত না। বিল পাশ হইবার পর গভর্ণর সহি করিলে বিলটি আইন বলিয়া গণ্য হইত। আইন প্রণয়ন ব্যতীত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অন্যান্য

ক্ষমতা

ক্ষমতা ছিল। মন্ত্রীদের প্রতি আস্থা বা অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া এবং প্রয়োজন হইলে মন্ত্রিসভার রদবদল করিয়া ব্যবস্থাপক সভা গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি কার্যকরী করার চেষ্টা করিত।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সহিত মন্ত্রীদের সম্পর্ক

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রণয়নের ও অন্যান্য ক্ষমতা গভর্ণরের ক্ষমতা দ্বারা নানা প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও কংগ্রেসের অসহযোগিতা :

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সহিত আংশিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করিয়া কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভারতবাসীদের মত না লইয়া, এমন কি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধে ভারতবর্ষকে লিপ্ত করিয়া লইল। কংগ্রেস এই অন্যায় নীতির প্রতিবাদ করিল এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবৃন্দের স্বার্থরক্ষার্থ যে যুদ্ধ তাহাতে সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃত হইল; এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস এই দাবি উপস্থিত করিল যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ রূপে স্বীকার করিতে হইবে এবং যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য (War aims) কি তাহা ঘোষণা করিতে হইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সকল দাবির কোন সঙ্গত প্রত্যুত্তর না দেওয়ায় কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ ১৯৩৯ সালের শেষভাগে পদত্যাগ করিলেন। তখন কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুযায়ী গভর্ণরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল এবং এই ব্যবস্থা ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসের পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ পর্যন্ত বলবৎ রহিল।

ভারতের অমতে ভারতকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লিপ্ত করার প্রতিবাদে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ

মুসলিম লীগ ও দ্বিজাতিতত্ত্ব :

মুসলমান সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনৈতিক দাবি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'মুসলিম লীগ' নামক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ কংগ্রেসের বিরোধিতা করিত; কিন্তু ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে উভয়ে এক সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-লীগ

চুক্তি সম্পাদন করে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতেই ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যেই মুসলিম লীগকে সমর্থন করিতে থাকে। দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩০-৩১) পর হইতে মিঃ মোহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। মিঃ জিন্না ১৯৩৫ সালের আইনের প্রাদেশিক শাসন সংক্রান্ত অংশ গ্রহণ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনসংক্রান্ত অংশ বর্জন করেন। ১৯৩৭-১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের শাসন মুসলমানদের স্বার্থহানিকর বলিয়া প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। পরে তিনি ঘোষণা করেন যে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি; এক রাষ্ট্রে দুই জাতির স্থান নাই। এই কারণে তিনি মুসলমান "জাতির" আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকাব দাবি করেন এবং তাহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে লাহোরে মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিঃ জিন্নার নীতি

আগষ্ট ঘোষণা, ১৯৪০ (August Declaration, 1940):

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরে কংগ্রেসদলভুক্ত মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার অবসানকল্পে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট, তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো একটি ঘোষণা জারী করেন।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সহ ভারতের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনৈতিক দল এই ঘোষণা অসন্তোষজনক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে।

ক্রীপ্‌স্‌ প্রস্তাব, ১৯৪২ (Cripps' Proposals, 1942):

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান যে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে, তাহার ফলে, বিশেষ করিয়া সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মের পতনের ফলে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন বোধ করিল। সেই উদ্দেশ্যে মিঃ চার্চ্চিলের নেতৃত্বাধীন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিল। ব্রিটিশ সরকারের তরফ হইতে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ যে প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন তাহার মর্ম এই:

ডোমিনিয়ন মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি

(১) ভারতবর্ষ অন্যান্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অনুরূপ মর্যাদাভোগী ডোমিনিয়ন হিসাবে পরিগণিত হইবে।

(২) যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে একটি গণপরিষদ গঠিত হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিম্নতম কক্ষ হইতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত সভ্য এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইবে।

(৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন এবং ইংলণ্ড হইতে ভারতের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্বন্ধে উক্ত গণপরিষদ ব্রিটিশ সরকারের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবে।

(৪) ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে পারিবে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকিয়াও একটি পৃথক শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া ইংলণ্ডের সহিত পৃথক চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৫) নূতন শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ও দেশরক্ষা ব্যাপারে চরম দায়িত্ব স্বহস্তগত রাখিবে।

ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীনতা অর্পণ না করার ফলে কংগ্রেস কর্তৃক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। মুসলিম লীগও উহা প্রত্যাখ্যান করিল।

ওয়াভেল পরিকল্পনা, ১৯৪৫ (Wavell Plan, 1945):

ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার পর ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কংগ্রেস বিখ্যাত "ভারত ছাড়ো" (Quit India) প্রস্তাব গ্রহণ করিল। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর নির্দেশে ভারত সরকার কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে এবং সমগ্র দেশে চরম দমননীতি অনুসৃত হয়। আগষ্ট আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারতে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়—ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়।

"ভারত ছাড়ো" আন্দোলন

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর পরবর্তী ভাইস্‌রয় লর্ড ওয়াভেল প্রধান দলগুলির সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াসী হইলেন। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ কারামুক্ত হইলেন। প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি লইয়া একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

গঠন করিতে লর্ড ওয়াভেল মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল।

মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬ (The Cabinet Mission Plan):

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী ও জাপানের পরাজয়েব পর সমগ্র এশিয়ায় বিরাট স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্র আলোডন সৃষ্ট হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষগণের ব্রিটিশ আদালতে বিচার উপলক্ষে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয়। সেই অভ্যুত্থানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পাবিল যে ভাবতকে পূর্বের মতো শাসন করা আর সম্ভব হইবে না, ইহার ফলে ইংলণ্ডের নবগঠিত শ্রমিক মন্ত্রিসভা ভারত সম্বন্ধে নীতি পরিবর্তন করিল।

যুদ্ধাবসানে ভারতে গণ-অভ্যুত্থান

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত কথাবার্তা চালাইবার উদ্দেশ্যে এদেশে প্রেরিত হন। তদানীন্তন ভাইস্‌রয় লর্ড ওয়াভেলের ঘনিষ্ঠ সাহচযে তাঁহারা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগেব মধ্যে আপোষরফা করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই আপোষ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তাঁহারা একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে উহা প্রকাশিত হইল।

মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব:

এই পরিকল্পনা ভাবতের কোন রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। এই পরিকল্পনা যে গণপরিষদ আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছিল তাহার সার্বভৌমিকতার অভাবে কংগ্রেস ইহা গ্রহণে আপত্তি করিল। আবার এই পরিকল্পনা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি অগ্রাহ্য করিয়াছিল বলিয়া মুসলিম লীগেরও আপত্তির কারণ হইল। তথাপি উভয় দলই প্রথমে কার্যকর ভিত্তি রূপে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। কিন্তু অচিরেই গণপরিষদের গঠন ও দায়িত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা লইয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইল। ফলে, মুসলিম লীগ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর যখন গণপরিষদের অধিবেশন সুরু হইল, তখন মুসলিম

মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতা

লীগের প্রতিনিধিগণ উহা বর্জন করিলেন। ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল তাহার সমাধানের জন্য ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সরকার আব একটি বিবৃতি দিয়া ঘোষণা করিলেন যে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে তাঁহারা ভারত ত্যাগ করিবেন।

অন্তর্বর্তী সরকার, ১৯৪৬-৪৭ (Interim Government) :

মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রীমিশন পবিকল্পনা বর্জন করায় কেবলমাত্র কংগ্রেস-মনোনীত সভ্যগণ কর্তৃক এই সবকার গঠিত হইয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইহার সহকাবী সভাপতি (Vice-President) হইয়াছিলেন ; সভাপতি ছিলেন স্বয়ং বড়লাট। লর্ড ওয়াভেলের অনুরোধে ১৯৪৬ সালের অক্টোবব মাসে মুসলিম লীগ কর্তৃক মনোনীত সভ্যগণ এই সরকারে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত এই সরকাব বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিল। গঠন-পদ্ধতি এবং শাসনতান্ত্রিক মর্যাদায় ইহা ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত বড়লাটের শাসন পরিষদ (Executive Council) মাত্র ছিল, ইহাকে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা বলা যায় না।

কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন

মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা, ১৯৪৭ (Mountbatten Plan, 1947) :

লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করায় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দেব মার্চ মাসে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রচেষ্টার ফলে কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সম্মতি সহ নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গৃহীত হইল।

মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি মানিযা লওয়া হইল। স্থির হইল যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির (অর্থাৎ বাঙ্গালা, পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ যদি সংখ্যাধিক ভোটে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে বাঙ্গালা ও পঞ্জাবের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি

ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ

ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ও পঞ্জাব বিভক্ত হইবে এবং এই দুই প্রদেশের হিন্দুপ্রধান অংশ যাইবে ভারতে এবং মুসলমানপ্রধান অংশ যাইবে পাকিস্তানে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলা ভারতে থাকিবে, না পাকিস্তানে যাইবে, ইহা স্থির করার জন্য ঐ অঞ্চলগুলিতে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও নবগঠিত পাকিস্তানের মধ্যে দেনা-পাওনা (assets and liabilities) পৃথক করার ব্যবস্থাও হইল।

। সীমানির্দেশ

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে মন্ত্রীমিশনের নীতি অক্ষুণ্ণ রহিল। স্থির হইল যে ভারত হইতে ব্রিটিশ-শাসনের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের উপর হইতে ব্রিটিশরাজের সার্বভৌম ক্ষমতার (Paramountcy) অবসান হইবে এবং উভয় ডোমিনিয়নের যে কোন একটিতে যোগদান করিবার অথবা স্বাধীন থাকিবার অধিকার প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের থাকিবে।

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা

ভারত ও পাকিস্তান, উভয়েই ডোমিনিয়ন রূপে স্বীকৃত হইবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করার অধিকার তাহাদের থাকিবে।

দুই নূতন রাষ্ট্রের ডোমিনিয়ন মর্যাদা লাভ

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ (Indian Independence Act):

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে, মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ করিল। এই আইনে বলা হয় যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতে ব্রিটিশ-শাসন শেষ হইবে। ঐ তারিখে ভারতবর্ষে দুইটি 'ডোমিনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটির নাম 'ভারতবর্ষ' (India) এবং অপরটির নাম 'পাকিস্তান'। উভয় ডোমিনিয়নই কানাডা প্রভৃতি অন্যান্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ভোগ করিবে। তাহাদের উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোনপ্রকার কর্তৃত্ব থাকিবে না। ব্রিটেনের রাজা এই দুইটি ডোমিনিয়নের রাজা হইবেন ; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি (Constitutional Head of State) থাকিবেন,

ভারতে ডোমিনিয়ন শাসন প্রবর্তন

অর্থাৎ কার্যতঃ তাঁহার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। রাজা প্রত্যেক ডোমিনিয়নের জন্য একজন করিয়া গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করিলেন। গভর্ণর-জেনারেল পূর্বেকার সমুদয় ক্ষমতা হারাইয়া মন্ত্রিসভার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। ভারত-সচিবের পদ বিলুপ্ত হইল। প্রতি ডোমিনিয়নের ব্যবস্থাপক সভাকে নিজ এলাকার জন্য আইন প্রণয়ন করার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোন আইন ভারতে প্রযুক্ত হইবে না। দেশীয় রাজ্যগুলির উপর ব্রিটিশ-রাজের প্রভুত্ব (Suzerainty) এবং ব্রিটিশ ভারতের উপর ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্বের অবসান হইল। উভয় ডোমিনিয়নের গণপরিষদকে (Constituent Assembly) ক্ষমতা দেওয়া হইল নিজ ডোমিনিয়নের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা রূপে কাজ করার জন্য। উভয় গণপরিষদ স্ব স্ব ডোমিনিয়নের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার পাইল। ফলে ভারতে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইল।

এই আইন অনুসারে ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হইল। বাঙ্গালা ও পঞ্জাব বিভক্ত হইল। গণভোটেব ফলে শ্রীহট্ট জেলাব অধিকাংশ, উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। একটি সীমান্ত কমিশনের রোয়েদাদ (Radcliffe Award) দুই বাঙ্গালা ও দুই পঞ্জাবের সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া দিল। ফলে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুইটি ডোমিনিয়ন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট স্থাপিত হইল।

দুই ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠা

ভারত ডোমিনিয়নের শাসন-পদ্ধতি (১৯৪৭-১৯৫০) ঃ

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত ভারত একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত ডোমিনিয়ন ছিল। কেন্দ্রে এবং প্রদেশে সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। বহিঃরাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ বিষয়েও ভারত সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল।

এই সময়ে গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে রাজা কর্তৃক নিয়োজিত হইতেন এবং সকল বিষয়েই মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতেন। কোন

নিয়মতান্ত্রিক বড়লাট

বিষয়েই তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা বা বিশেষ দায়িত্ব রহিল না। নামে অধিকাংশ ব্যাপারেই গভর্ণর-জেনারেলের পূর্ব ক্ষমতা ও দায়িত্ব বহাল রহিল, কিন্তু কার্যতঃ ঐ সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতে লাগিল।

গভর্ণর-জেনারেলেব শাসন পরিষদ (Executive Council) বিলুপ্ত হইল। মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) তাহার স্থান গ্রহণ করিল। একজন প্রধান মন্ত্রী ও কয়েকজন মন্ত্রী মিলিয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। তাঁহারা সম্মিলিতভাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাব নিকট দাযী থাকিতেন। তাঁহাদেব পরামর্শ অনুসাবে বড়লাট সকল কাজ কবিতেন। কার্যতঃ মন্ত্রিগণই দেশেব শাসক হইলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গণপরিষদ (Constituent Assembly) কেবল যে নূতন শাসনতন্ত্র বচনা কবিতে লাগিল তাহা নহে, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা রূপে কাজ কবিতে লাগিল। ইহাব নিকটই মন্ত্রিসভা দাযী রহিল। ভাবত সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবাব অবাধ অধিকাব ইহাব ছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা

প্রাদেশিক গভর্ণবও গভর্ণব-জেনাবেলের ন্যায নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইলেন। তিনি পূর্বেব ন্যায় সম্রাট্ কর্তৃক নিযুক্ত না হইযা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাব পরামর্শ অনুসারে বড়লাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। তিনি সকল বিষয়েই প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাব পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতেন। কোন বিষয়েই তাঁহাব বিশেষ ক্ষমতা বা বিশেষ দায়িত্ব রহিল না।

প্রাদেশিক গভর্ণর

১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক গভর্ণর-শাসিত প্রদেশে মন্ত্রিসভা এবং ব্যবস্থাপক সভা রহিল। গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় মন্ত্রিসভাব ক্ষমতা বাড়িল। কার্যতঃ মন্ত্রিগণই প্রদেশের প্রকৃত শাসক হইলেন।

প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও ব্যবস্থাপক সভা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র ঃ ভূমিকা

মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে যে গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হইয়াছিল তাহা ভাবত বিভাগের ফলে দুই ভাগে বিভক্ত হইযা যায়। স্বাধীন ভারতের গণপবিষদ সার্বভৌমিকতা লাভ করে, উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে গণপবিষদের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতির উপব যে সকল বাধা-নিষেধ ছিল সেগুলি ব্রিটিশ-শাসন লোপের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয। এই সার্বভৌম গণপরিষদ বহু আলোচনার পর নূতন শাসনতন্ত্রেব প্রণযন-কার্য সম্পূর্ণ করে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বব গণপরিষদ কর্তৃক নূতন শাসনতন্ত্র (সংবিধান) গৃহীত হয। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুযাবী হইতে এই শাসনতন্ত্র চালু হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্র ২২টি ভাগে (Part) বিভক্ত এবং ইহাতে ৩৯৫টি ধারা (Article) আছে। বিভিন্ন ধরণের নয়টি তালিকা (Schedule) ইহাব সহিত জুডিযা দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর লিখিত সংবিধানগুলির মধ্যে আকাবে ইহা বৃহত্তম।

ভারতীয় রাষ্ট্রের গঠন ঃ

শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে 'ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ 'ভাবত' বিভিন্ন বাজ্যেব একটি 'ইউনিয়ন' (Union) অর্থাৎ সম্মিলিত রাষ্ট্র হইবে। এইজন্য ভারতীয় রাষ্ট্রকে 'ভারতীয় ইউনিয়ন' বা রাজ্যসংঘ বলা হয়। মোটামুটি বলিতে গেলে 'ভারতীয় ইউনিয়ন' একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federation)। এই রাষ্ট্র অনেকগুলি রাজ্য (State) লইয়া গঠিত। সংবিধানে উল্লিখিত 'ক', 'খ', ও 'গ' বিভাগের (Parts A, B and C) রাজ্যগুলি লইয়া 'ভারতীয় ইউনিয়ন' গঠিত। এই সকল রাজ্য এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ লইয়া 'ভারতীয় ইউনিয়নের' এলাকা। এতদ্ব্যতীত, অন্য ভূখণ্ডও ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ইতিমধ্যেই চন্দননগর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ভারতীয় ইউনিয়ন বা রাজ্যসংঘ

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র কিনা? (Is India a Federation)?

'ভারতীয় ইউনিয়ন' একটি যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি তিনটি যথা,—(১) যুক্তরাষ্ট্রে দুইপ্রকার সরকার থাকে, কেন্দ্রীয় অথবা সমগ্র দেশের সরকার ও দেশের অংশগুলির (Units) সরকার। অংশগুলি সাধারণতঃ রাজ্য বলিয়া অভিহিত হয়। লিখিত সংবিধানের দ্বারা এই দুই প্রকার সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

(২) যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই চরম আইন। সংবিধান লঙ্ঘন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কোন কাজ করিবার অধিকার থাকে না। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কোন সরকারের পক্ষে অপর কোন সরকারের নিজস্ব ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা অবৈধ বলিয়া পরিগণিত। (৩) যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় বা ফেডারেল কোর্ট থাকে। এই বিচারালয় বিচার করে যে কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের কোন কার্য বা আইন দ্বারা সংবিধানের কোন বিধি ভঙ্গ করা হইল কিনা। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় 'কেন্দ্রীয়' ব্যবস্থাপক সভা অথবা রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার যে কোন আইনকে সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে। মোটের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ই সংবিধানের রক্ষক (Guardian of the Constitution)।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও মোটের উপর এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। (১) 'ভারতীয় ইউনিয়নে' দুইপ্রকার সরকার আছে, কেন্দ্রে 'ইউনিয়ন' সরকার এবং রাজ্যে 'রাজ্য' সরকার। ভারতের শাসনতন্ত্র এই দুই সরকারের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমানা নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছে। সংবিধানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগুলিকে তিনটি তালিকায় বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা,—'ইউনিয়ন' তালিকা, 'রাজ্য' তালিকা, এবং 'যুগ্ম' তালিকা। 'ইউনিয়ন' তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতা 'ইউনিয়ন' সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। 'রাজ্য' তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের 'একমাত্র' ক্ষমতা 'ক' ও 'খ' বিভাগের রাজ্য সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। 'যুগ্ম' তালিকার বিষয়ে 'ইউনিয়ন' সরকার ও 'রাজ্য' সরকার উভয়ের আইন রচনার ক্ষমতা আছে, তবে এইরূপ

ভারতীয় ইউনিয়নে যুক্ত-রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান

কোন বিষয়ে রাজ্য সরকার প্রণীত আইন যদি ইউনিয়ন সরকারের আইনের বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হয় তবে রাজ্য সরকারের আইন যতদূর বিরোধী ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইউনিয়ন আইনই বলবৎ থাকিবে। (২) ভারতে সংবিধান চরম আইন রূপে গণ্য। কোন সরকারই সংবিধানে উল্লিখিত সীমা লঙ্ঘন করিতে পাবে না। (৩) ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের 'সুপ্রীম কোর্ট'ই যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়। 'সুপ্রীম কোর্ট' 'ইউনিযন' পার্লামেণ্টের বা বাজ্য ব্যবস্থাপক সভার যে কোন আইনকে সংবিধানবিরোধী বলিয়া বাতিল করিযা দিতে পারে।

কিন্তু ভারত প্রকৃতপক্ষে পুবাপুরি যুক্তরাষ্ট্র নয। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যেব মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন অপবিবর্তনীয় নয়। আবও পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে, শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রাজ্যসমূহকে যে ক্ষমতা দিয়াছে তাহাতে কেন্দ্র নানাভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। প্রথমতঃ 'ইউনিয়ন' পার্লামেণ্টের উচ্চতন কক্ষ (রাজ্য পরিষদ) যদি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে ঘোষণা করে যে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের দ্বারা আইন প্রণযন জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় অথবা সুবিধাজনক, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট সে বিষয়ে ভারতের সকল অঞ্চলের জন্য আইন রচনা করিতে পারিবে। এইভাবে বাজ্য সরকারের ক্ষমতাকে পার্লামেণ্ট আইনতঃ স্বীয় অধিকারে আনিতে পারে এবং এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের কিছু বলিবার থাকিবে না।

ভারত প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র নহে, কারণ রাজ্যের উপর কেন্দ্রের নানাবিধ কর্তৃত্ব রহিয়াছে

দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইযাছে এই মর্মে রাষ্ট্রপতি যদি ঘোষণা জারী করেন, তাহা হইলে রাজ্য তালিকার যে কোন বিষযে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। তৃতীয়তঃ, কোন রাজ্যের রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখের বিবরণী পাঠ করিয়া বা অন্য কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত করেন যে সেই রাজ্যের শাসনকার্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়, তাহা হইলে সেই রাজ্যের শাসনভার রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন। এইভাবে পুরাপুরি কেন্দ্রীয় শাসন সেই রাজ্যে স্থাপিত হইতে পারে। চতুর্থতঃ আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতির সর্তাদি রক্ষার জন্য পার্লামেণ্ট সমগ্র ভারত বা দেশের কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পঞ্চমতঃ 'ক' শ্রেণীর রাজ্যগুলির রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং 'খ' শ্রেণীর রাজপ্রমুখগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত (recognised) হন।

সুতরাং রাজ্যগুলির শাসন বিভাগের নায়ক মনোনয়নে কেন্দ্রের কর্তৃত্ব রহিয়াছে।

অতএব এই সকল কারণে 'ভারতীয় ইউনিয়ন' বাহিরের আকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরের প্রকৃতিতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary State)। যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের ধর্ম ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অধিক পরিমাণে আছে। ভারতের শাসনকার্য সাধারণ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হইলেও, জরুরী অবস্থায় বা বিশেষ জাতীয় প্রয়োজনে রাজ্যের কর্তৃত্ব কমাইযা বা বিলুপ্ত করিয়া কেন্দ্রের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ভারত আকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু প্রকৃতিতে একক রাষ্ট্র

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা (Preamble) ঃ

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে ভারতীয় জনগণ এই শাসনতন্ত্র রচনা ও বিধিবদ্ধ করিল এবং তাহাদের উদ্দেশ্য হইল ভারতে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) প্রতিষ্ঠা করা। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হইল প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার (Justice) ; চিন্তা, বাচন, প্রত্যয়, ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরোপাসনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা (Freedom) ; সকলের জন্য মর্যাদা ও সুযোগলাভ সম্বন্ধে সমানাধিকার (Equality) ; এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য অটুট রাখিয়া সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব (Fraternity)।

প্রস্তাবনার মর্ম

ভারত সার্বভৌম রাষ্ট্র, কেননা বিদেশী রাষ্ট্রের কোন আইন বা নির্দেশ ভারতের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য নয়। গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ শাসনতন্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথা,—সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ; চিন্তা, সমাবেশ, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ; নির্বাচিত ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার ; ইত্যাদি।

প্রস্তাবনার ব্যাখ্যা ঃ ভারতীয় রাষ্ট্রের (১) সার্বভৌমতা, (২) গণতান্ত্রিকতা, (৩) সাধারণতান্ত্রিকতা

ভারতীয় রাষ্ট্র একটি সাধারণতন্ত্র, কেননা এখানকার রাষ্ট্রের অধিনায়ক অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাচিত হন। ভারতের শাসন কোন রাজবংশের উপর ন্যস্ত নয়।

ভারত অবশ্য ব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশগুলির সহিত একযোগে একটি 'কমন্‌ওয়েল্‌থের' (Commonwealth of Nations) অন্তর্ভুক্ত। বৈদেশিক নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি পরিচালনা কালে ভারত আবশ্যকমত 'কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌'-ভুক্ত দেশগুলির সহিত পরামর্শ করে, কিন্তু ঐ সকল দেশের উপদেশ বা নির্দেশ ভারত মানিতে বাধ্য নহে। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীকে (British Monarch) ভারত 'কমন্‌ওয়েল্‌থের' মধ্যে প্রধান (Head of the Commonwealth) বলিয়া গণ্য করে; কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসন বা বৈদেশিক নীতি পরিচালনা সম্বন্ধে রাজা বা রাণীর কোন কর্তৃত্ব নাই। কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে ভারত কি সত্যই স্বাধীন, সার্বভৌম এবং সাধারণ-তন্ত্রী রাষ্ট্র, না ব্রিটিশ 'ডোমিনিয়নের' একটি বিশেষ সংস্করণ মাত্র। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে কার্যতঃ ভারতের সহিত ব্রিটেনের বা 'কমন্‌ওয়েল্‌থের' অন্যান্য দেশের সম্পর্ক যাহাই হউক না কেন, এই সম্পর্ক ভারত সরকারের স্বাধীন ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। আইনতঃ, ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ভারতের উপর ব্রিটেনের কোন আইনগত জোর নাই। স্বেচ্ছায় ভারত সরকার যদি 'কমন্‌ওয়েল্‌থে'র দেশগুলির সহিত রাজনৈতিক সহযোগিতা বা চুক্তি করে, তাহা হইলে শাসনতন্ত্রের দিক হইতে ভারতের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমতা ক্ষুণ্ণ হয় না। ভারত যে কমন্‌ওয়েল্‌থের ভিতর রহিয়াছে তাহাও বর্তমান ভারত সরকারের একটি চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হইয়াছে। শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের কোন ধারায় ভারতকে কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ভবিষ্যতে যে কোন সরকার যখন খুসি কমন্‌ওয়েল্‌থের সহিত ভারতের এই সম্পর্ক ছেদ করিতে পারে। তাহাতে কোন আইন লঙ্ঘন করা হইবে না।

'কমন্‌ওয়েল্‌থের' অন্তর্ভুক্তি এবং ভারতের সার্বভৌমতা ও সাধারণতান্ত্রিকতা

ভারতীয় নাগরিকতা:

'ভারতীয় ইউনিয়নে' নাগরিকতা (Citizenship) বলিতে বুঝায় শুধু সর্বভারতীয় নাগরিকতা অথবা 'ইউনিয়ন' নাগরিকতা। এখানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত কোনরূপ রাজ্য নাগরিকতা (State Citizenship) নাই। এক কথায়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতা (Dual Citizenship) নাই। বাঙ্গালীরা একথা

সর্ব-ভারতীয় নাগরিকত্ব

বলিতে পারে না যে তাহারা বাঙ্গালার নাগরিক। বাঙ্গালী, বিহারী, মারাঠী প্রভৃতি সকলেই ভারতীয় নাগরিক।

ভারতের নাগরিকতা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কতকগুলি নিয়ম শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ভাবতীয় 'ইউনিয়নে'র ভূমিতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহাদের নিম্নলিখিত যোগ্যতা আছে তাঁহারা নাগরিক অধিকার লাভ করিবেন: (১) যিনি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং (২) (ক) যিনি 'ভারতীয় ইউনিয়নে'র এলাকার মধ্যে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন; অথবা (খ) যাঁহার পিতামাতার মধ্যে একজন 'ভারতীয় ইউনিযনে'র এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অথবা (গ) যিনি 'ইউনিয়ন' গঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে অন্যূন পাঁচ বৎসর কাল 'ইউনিয়নে'র ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন।

নাগরিকত্ব লাভের যোগ্যতা

বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হইতে ভারতে আগত ও ভারতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের নাগরিকতা পাইবেন, যদি—(১) তিনি বা তাঁহার পিতামাতা বা পিতামহ-পিতামহী বা মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে যে কোন একজন অবিভক্ত ভাবতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং (২) (ক) তিনি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইযের পূর্বে ভাবতে আগমন করিয়া থাকেন; (খ) আগমনের তারিখ হইতে 'ভারতীয় ইউনিয়নে'র জমিতে বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে বা তাহার পরে পাকিস্তান হইতে আসিয়াছেন তাঁহাদের সম্পর্কে ব্যবস্থাটি এইরূপ: এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি অন্ততঃ ছয় মাস এখানে বসবাস করার পর ভারতের নাগরিকতার জন্য শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্বে দরখাস্ত করিয়া থাকেন এবং তদুদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নিযুক্ত কর্মচারী তাঁহার নাম ভারতের নাগরিক রূপে রেজেষ্ট্রী করিয়া থাকেন তবে তিনি ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন। অবশ্য যদি তিনি বা তাঁহার পিতামাতা বা পিতামহ-পিতামহী বা মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে কেহ অবিভক্ত ভারতের এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ তারিখের পর যে ব্যক্তি ভারত হইতে পাকিস্তানে বাস করার জন্য গিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি ভারতের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হইবেন। তবে যদি সেই ব্যক্তি পাকিস্তান হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া

থাকেন এবং এখানে পুনর্বসতির অথবা স্থায়ী পুনরাগমনের আইনসঙ্গত অধিকার পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের পরে প্রত্যাগত হিসাবে গণ্য হইয়া উক্ত সর্তগুলি পূরণ করিলে ভারতের নাগরিকত্ব পাইবেন।

পাকিস্তান-প্রত্যাগতদের জন্য নাগরিকত্ব লাভের বিশেষ ব্যবস্থা

যদি কেহ অথবা তাঁহার পিতামাতার মধ্যে একজন অথবা তাঁহার পিতামহ-পিতামহীব অথবা মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে একজন ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, অথচ তিনি অবিভক্ত ভারতবর্ষের (ভারত ও পাকিস্তানের) বাহিরে কোন দেশে বসবাস করিতেছেন, তাহা হইলে সেই দেশে নিযুক্ত ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধি অথবা কন্সাল (Consul) অফিসের প্রতিনিধির নিকটে আবেদন কবিলে তিনি ভারতেব নাগরিকতা পাইবেন। কিন্তু তিনি যদি কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাবতীয় নাগরিকতা বিলুপ্ত হইবে।

বিদেশবাসী ভারতীয়দের নাগরিকত্ব লাভের ব্যবস্থা

সংবিধানেব অন্তর্ভুক্ত নাগবিকতা সংক্রান্ত ব্যবস্থাব অদলবদল করিবাব ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দেওয়া হইয়াছে।

মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights):

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে নাগবিকদের মৌলিক অধিকাবগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যাহাতে এই সকল অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হয়। ডাইসী (Dicey) প্রভৃতি কোন কোন লেখক বলেন যে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের নির্দেশ অনাবশ্যক ও অস্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রচিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ভারতীয় সংবিধানেও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংবিধানটির ইহা একটি বিশেষত্ব।

আইনতঃ প্রযোজ্য বিভিন্ন মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকারগুলি আইনতঃ প্রযোজ্য। মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে আদালতে তাহার প্রতিকারের জন্য যাওয়া যায়।

মৌলিক অধিকারগুলি চরম অধিকার নয়। সংবিধানে মৌলিক অধিকার-গুলির কতকগুলি সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মৌলিক অধিকারসমূহের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Fundamental Rights):

ভারতের শাসনতন্ত্রে সাত রকমের মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা আছে: (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতার অধিকার, (৫) কৃষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, (৬) সম্পত্তি সম্বন্ধে অধিকার, (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান বিষয়ে অধিকার।

(১) সাম্যের অধিকার (Right to Equality)—নিম্নলিখিত অধিকারগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত:—(ক) আইনের চক্ষে সমানাধিকার; (খ) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ অথবা জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে বাছবিচার সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা; (গ) অস্পৃশ্যতা বিলোপ; (ঘ) সামরিক বা শিক্ষাবিষয়ক উপাধি ছাড়া অন্যান্য উপাধির লোপ; এবং (ঙ) রাষ্ট্রের চাকুরীতে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ।

(২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)—নিম্নলিখিত অধিকারগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত:—(ক) বাক্-স্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা; (খ) শান্তিপূর্ণ এবং নিরস্ত্রভাবে সমবেত হইবার অধিকার; (গ) সমিতি ও সংঘ গঠনের অধিকার; (ঘ) ভারতীয় রাষ্ট্রের সর্বত্র অবাধ গমনাগমনের অধিকার; (ঙ) ভারতের যে কোন স্থানে অবস্থান করিবার এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস করার অধিকার; (চ) সম্পত্তির ভোগ, দখল ও বিক্রয়ের অধিকার; (ছ) যে-কোন বৃত্তির অনুশীলন অথবা যে-কোন কাজ বা ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার অধিকার; (জ) অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার হইলে বিচারালয়ে প্রেরিত হইবার অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নাগরিকদিগকে বিনা বিচারে আটক করার এবং তাঁহাদের বাক্-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হ্রাস করার ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে ভারতীয় শাসনতন্ত্র দান করিয়াছে।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)—নরনারী লইয়া ব্যবসায় এবং বেগার বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)—(ক) সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মবিশ্বাস,

ধর্মানুষ্ঠান এবং ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা থাকিবে। (খ) রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা, নীতি ও স্বাস্থ্য সাপেক্ষে ধর্মবিষয়ক ক্রিয়াদি সম্পাদন করিবার অধিকার থাকিবে। (গ) কোন বিশেষ ধর্মের উন্নতির জন্য কর দিতে কেহ বাধ্য হইবে না। (ঘ) শিক্ষায়তনে ধর্মোপদেশ এবং ধর্মমূলক উপাসনা প্রভৃতিতে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হইবে না। (ঙ) জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সকল শ্রেণীর হিন্দুর নিকট উন্মুক্ত থাকিবে।

(৫) কৃষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights)—(ক) ভাষা, লিপি এবং কৃষ্টি সম্বন্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে। (খ) কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষাব হেতু দেখাইয়া রাষ্ট্র-পরিচালিত কোন শিক্ষায়তনে কাহারও প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা চলিবে না। (গ) সংখ্যালঘিষ্ঠগণ আপন আপন পছন্দমত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিবার অধিকার পাইবে।

(৬) সম্পত্তি বিষয়ক অধিকার (Right to Property)—কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজন ব্যতীত এবং বে-আইনী ভাবে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। সরকার কাহারও সম্পত্তি হস্তগত করিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)—মৌলিক অধিকারগুলি কার্যকর এবং সুনিশ্চিত করার জন্য যথাযথ উপায়ে প্রধান ধর্মাধিকরণে (Supreme Court) আবেদন করিবার সুনির্দিষ্ট অধিকার সকল নাগরিকের থাকিবে। মৌলিক অধিকারগুলিকে কার্যকর করার জন্য সর্বোচ্চ ও অন্যান্য বিচারালয় নিজ নিজ এলাকার মধ্যে পরোয়ানা জারি করিতে পারিবেন। অবশ্য যখন (Emergency) জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইবে তখন রাষ্ট্রপতি এই অধিকার রহিত করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিসমূহ (Directive Principles of State Policy) :

সংবিধান অনুসারে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র কয়েকটি মঙ্গলময় ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ অনুসরণ করিবে। এইগুলি শাসনতন্ত্রের "নির্দেশমূলক নীতিসমূহের" মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই নীতিগুলি আইনতঃ প্রযোজ্য (justiciable) নহে, অর্থাৎ কোন বিচারালয় এই নীতিগুলিকে সরকারের

উপর বাধ্যতামূলক ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবে না। ইহাই মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ঐ সকল নীতির গুরুত্ব কম নহে। স্বাধীন ভারতের জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এই নীতিগুলিব দ্বারা সূচিত হইতেছে।

শাসনতন্ত্রে সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র (Welfare State) গঠনের নির্দেশ

শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, "দেশ শাসনের পক্ষে এগুলি ভিত্তিস্বরূপ এবং আইন প্রণয়নের সময এই নীতিগুলিকে প্রয়োগ করাই হইবে রাষ্ট্রের কর্তব্য।" যে কোন রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, এই নীতিগুলিকে অগ্রাহ্য কবিলে সেই দলকে নির্বাচকদিগের নিকট, অর্থাৎ জনসাধারণের নিকট, জবাবদিহি কবিতে হইবে। মোট কথা, নির্দেশমূলক নীতিগুলির লক্ষ্য এই যে, রাষ্ট্র যেন এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে যাহার ফলে জনগণের কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ ভারতীয় সাধাবণতন্ত্রকে একটি সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র (Welfare State) হইতে হইবে। সংক্ষেপে ইহাই হইল নির্দেশমূলক নীতিগুলির তাৎপর্য।

নীচে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ করা হইল :—

(১) দেশেব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার এমনভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে যাহাতে সাধারণের কল্যাণ সাধিত হয়।

(২) সমাজে যাহাতে সম্পত্তি বা আয়ের অত্যধিক বৈষম্য না হয় রাষ্ট্রকে তাহা দেখিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক নাগরিককে কাজ করিবার অধিকার ও শিক্ষার অধিকার দিতে হইবে এবং বেকার-অবস্থা, বার্ধক্য, পীড়া, অসামর্থ্য প্রভৃতি কারণে দারিদ্র্য ঘটিলে সরকারী সাহায্য পাওয়ার অধিকার দিতে হইবে—অর্থাৎ রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, জীবনযাত্রার উন্নত মান, বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত।

(৫) সমবায় সমিতিগুলিকে রাষ্ট্রের উৎসাহ দেওয়া উচিত। সমবায়ের ভিত্তিতে কুটির শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে।

(৬) গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠন করিতে হইবে।

(৭) চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা, সম্ভব হইলে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে।

(৮) অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার জন্য ও তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৯) রাষ্ট্রের বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক্ করা উচিত।

(১০) মদ্যপান নিবারণ করিতে হইবে।

(১১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধি প্রতিপালন করিতে হইবে এবং সালিসীর সাহায্যে আন্তর্জাতিক কলহের মীমাংসা করিতে হইবে।

আইন প্রণয়নে এবং শাসনকার্য পরিচালনায় রাষ্ট্রকে (State) এই সকল নীতি অনুসরণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানের এই অংশে 'রাষ্ট্র' শব্দ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে 'রাষ্ট্র' অর্থে কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্লামেণ্ট, প্রত্যেক রাজ্যের সরকার ও ব্যবস্থাপক সভা এবং ভারতের এলাকাভুক্ত অথবা ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীন যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বুঝাইবে। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যাহাতে নির্দেশমূলক নীতিগুলি কার্যকরী হয় তাহাব জন্যই 'রাষ্ট্র'কে এই ব্যাপক অর্থে ধরা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন-বিভাগ

একজন রাষ্ট্রপতি (বাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে সহ-রাষ্ট্রপতি) ও একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন-বিভাগ (Union Executive) গঠিত হয়। যে সকল বিষয়ে ভারতীয় পার্লামেণ্ট আইন পাশ করিতে পারে সেই সকল বিষয়ে এবং অন্যান্য দেশের সহিত সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কার্যনির্বাহ করিবার ক্ষমতা ইউনিয়নের শাসন-বিভাগের রহিয়াছে।

রাষ্ট্রপতি (The President) :

'ভারতীয় ইউনিয়নে'র একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। 'ইউনিয়নে'র শাসন পরিচালনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে। তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধীন কর্মচারীদের দ্বারা শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনঃ রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচকমণ্ডলীর (Electoral College) দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের সকল নির্বাচিত সদস্য এবং সমুদয় রাজ্য বিধান সভার (State Legislative Assemblies) নির্বাচিত সদস্য লইয়া নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মোট ভোট-সংখ্যা এবং পার্লামেণ্টের সদস্যগণের মোট ভোট-সংখ্যা সমান হইবে। রাষ্ট্রপতি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা (Proportional Representation) অনুসারে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট (Single Transferable Vote) দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচনের সময়ে গোপনে ভোট লওয়া হইবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-ব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল, নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা, মাহিনা, ইত্যাদিঃ রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে। পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি সহ-রাষ্ট্রপতিকে (Vice-President) পত্র লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতিব কার্যকাল উত্তীর্ণ হইলেও অপর এক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। কার্যকাল শেষ হইলে রাষ্ট্রপতি পুনরায় ঐ পদে নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন।

কার্যকাল

শাসনতন্ত্র অমান্য করার অপরাধে রাষ্ট্রপতির বিচার করিয়া পার্লামেণ্ট তাঁহাকে পদত্যাগ করাইতে পারে। পার্লামেণ্টের এক কক্ষ (House) অভিযোগ আনিবে এবং অন্য কক্ষে সেই অভিযোগের শুনানি হইবে। এই বিশেষ বিচার-পদ্ধতির নাম 'ইম্‌পিচ্‌মেণ্ট' (Impeachment)। সংবিধান অনুযায়ী নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রপতি কোন কাজ করিলে তিনি কোন বিচারালয়ের বিচাবাধীন থাকিবেন না।

পদচ্যুতি

রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনপ্রার্থী হইতে গেলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন : (১) তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। (২) তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই। (৩) তিনি আইনতঃ লোকসভায় (House of the People) নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হইবেন।

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

বেতনভুক্‌ বা লাভজনক সরকারী পদে (রাষ্ট্রপতি বা সহ-রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি

কয়েকটি নির্দিষ্ট পদ ব্যতীত) যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হইতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের বা কোন রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে পারিবেন না। এরূপ কোন লোক যদি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন, তাহা হইলে তাঁহার পার্লামেণ্টের বা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ খারিজ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শপথ বা স্বীকৃতি গ্রহণ

কার্যভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মুখে নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী শপথ (Oath) অথবা স্বীকৃতি (Affirmation) গ্রহণ করিতে হইবে।

বেতন ও ভাতা

রাষ্ট্রপতি বিনা ভাড়ায় সরকারী প্রাসাদে বাস করিবেন এবং মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন ও অন্যান্য নির্দিষ্ট ভাতা পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির শাসন-ক্ষমতা (President's Executive Power) :

১। [illegible] পরিচালনা

ভারতীয় 'ইউনিয়নে'র শাসনকার্য পরিচালনার ভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয় এবং সকল সরকারী আদেশ প্রচারিত হয়।

মন্ত্রী নিয়োগ

[illegible] ও 'ইউনিয়ন' মন্ত্রিসভা : রাষ্ট্রপতিকে 'ইউনিয়নে'র শাসন-[illegible] ও পরামর্শ" দিবার জন্য (aid and advise) প্রধান মন্ত্রীর [illegible] মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিবেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি মন্ত্রীদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দিবেন। মন্ত্রিসভার সকল সিদ্ধান্ত প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানাইবেন এবং রাষ্ট্রপতি যে কোন খবর জানিতে চাহিলে প্রধান মন্ত্রী তাহা সরবরাহ করিবেন। সংবিধানের ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি য[illegible] ততদিন মন্ত্রিগণ স্বীয় পদে বহাল রহিবেন। কিন্তু তাঁহ[illegible]ভার নিকট দায়িত্বশীল বলিয়া কার্যতঃ যতদিন লোকসভার অ[illegible]দিনই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

যদিও শাসনতন্ত্রে[illegible]রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে

বাধ্য, তথাপি ইহা প্রত্যাশা করা যায় যে এ বিষয়ে তিনি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর দৃষ্টান্ত অনুসারে মন্ত্রীদের পরামর্শ মতোই চলিবেন। সুতরাং সংবিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে লোকসভার নিকট দায়ী মন্ত্রিগণই দেশের প্রকৃত শাসক হইবেন।

রাষ্ট্রপতি নামে শাসক; মন্ত্রিগণই প্রকৃত শাসক

রাষ্ট্রপতির বিবিধ ক্ষমতাঃ রাষ্ট্রপতি ভারতের স্থল সৈন্য বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক।

২। দেশরক্ষা বাহিনীর অধিনায়কত্ব

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ দাক্ষিণ্যের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছা করিলে দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জনা করিতে পারেন অথবা দণ্ডিতের দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিতে বা দণ্ড হ্রাস করিতে পারেন:

(ক) সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত যে কোন ব্যক্তিকে;

(খ) মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে; এবং

(গ) যে সকল আইন লঙ্ঘন করিলে ইউনিয়ন সরকার শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে সেই সকল আইনের বিরুদ্ধে অপরাধী যে কোন ব্যক্তিকে।

বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন; যথা,—ভারতের অ্যাটর্নী-জেনারেল, অডিটর-জেনারেল, নির্বাচন কমিশনারগণ; বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল (Governor); প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ; 'ইউনিয়নে'র রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সভ্যগণ; ইত্যাদি।

৩। কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা

বিভিন্ন রাজ্যের উপর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা: 'ক' বিভাগের রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। রাজ্যপালের পদে অধিষ্ঠিত থাকা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'ইউনিয়নে'র শাসন-ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ের কর্মভার রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে রাজ্য সরকারের হাতে সমর্পণ করিতে পারিবেন। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ স্বার্থে কোন বিষয়ে তদন্ত ও আলোচনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি একটি অন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter-State Council) প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রপতি কোন জরুরী অবস্থা ঘোষণা (Proclamation of Emergency) করিলে কোন রাজ্যের শাসন কি ভাবে চালিত হইবে, সেই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সেই

রাজ্যকে নির্দেশ দিবেন। প্রতি রাজ্যকে বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করার ভার এবং শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী যাহাতে রাজ্য শাসিত হয় তাহার ব্যবস্থা করার ভার শাসনতন্ত্রে 'ইউনিয়নে'র উপর ন্যস্ত হইয়াছে। রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখের রিপোর্ট পাঠ করিয়া বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোন রাজ্যে শাসনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী রাজ্যশাসন সম্ভব নয়, তাহা হইলে তিনি ঘোষণা জারি করিয়া ঐ রাজ্যের শাসন বিভাগের সকল বা যে-কোন ভার নিজহস্তে লইতে পারেন এবং এই আদেশ দিতে পারেন যে রাজ্যটির ব্যবস্থাপক সভার সকল ক্ষমতা পার্লামেন্টের হস্তে ন্যস্ত হইবে। ভারতের অথবা ভারতের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা আর্থিক ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতা যদি বিপন্ন হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি কোন রাজ্যকে আর্থিক সুব্যবস্থা রক্ষা করার নিয়ম জানাইয়া সেই নিয়মগুলি মানিয়া চলার নির্দেশ দিতে পাবেন।

৪। রাজ্য সরকারের উপর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

'গ' বিভাগের রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রপতি তাঁহার নিযুক্ত কোন চীফ কমিশনার বা উপ-রাজ্যপালের (Lieutenant-Governor) সাহায্যে অথবা কোন প্রতিবেশী রাজ্যের সরকারের সাহায্যে শাসন করিবেন।

শাসনসংক্রান্ত অন্যান্য ক্ষমতাঃ 'ইউনিয়নে'র ব্যাপাবে সকল চাকুরিতে ও পদে লোক নিয়োগ ও চাকুরির সর্ত সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি নিয়মাবলী রচনা করিবেন। এ বিষয়ে পার্লামেন্টের যদি কোন আইন থাকে, সেই আইনের অনুবর্তী হইয়া নিয়মগুলি প্রযুক্ত হইবে। 'ইউনিয়নে'র সকল কর্মচারীর স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'ইউনিয়নে'র অধীনে কোন অসামরিক পদে বা চাকুরিতে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত বা স্থানান্তরিত করিতে পারেন, কিংবা কোন ছোট পদে তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া তাঁহার মর্যাদা লাঘব করিতে পারেন। ঐ ব্যক্তিকে ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কোনরূপ কারণ দেখানোর সুযোগ দেওয়া হইবে না, যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন ঐরূপ কারণ দেখানো রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে।

৫। 'ইউনিয়নে'র চাকুরির সর্ত নিয়ন্ত্রণ

নির্বাচন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচন কমিশন (Election Commission) নিযুক্ত করিবেন।

৬। নির্বাচন পরিচালনা

তপশীলভুক্ত শ্রেণীর বা বর্ণের হিন্দুগণের* (Scheduled Castes) এবং তপশীলভুক্ত উপজাতিগুলির† (Scheduled Tribes) স্বার্থরক্ষা এবং উন্নতি বিধানের জন্য রাষ্ট্রপতি একটি বিশেষ কর্মচারী (Special Officer) নিযুক্ত করিবেন। এই বিশেষ কর্মচারী মধ্যে মধ্যে ঐ সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং সেই রিপোর্ট পার্লামেণ্টে প্রেরিত হইবে।

৭। তপশীলভুক্ত জাতি এবং উপজাতির স্বার্থ রক্ষা

তপশীলভুক্ত অঞ্চলের (Scheduled Areas) শাসন এবং তপশীলভুক্ত উপজাতিগুলির মঙ্গল সম্বন্ধে রিপোর্ট করাব জন্য যে কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; কিন্তু শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার দশ বৎসর পরে এইরূপ একটি কমিশন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতেই হইবে। অনুন্নত শ্রেণীগুলির অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্যও রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে পারেন।

শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর পরে এবং তাহার পর প্রতি দশ বৎসর অন্তর সরকারী কাজে হিন্দী ভাষা কতদূর প্রযুক্ত হইয়াছে সে বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন গঠন করিবেন।

৮। হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে ক্ষমতা

আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (President's Legislative Powers) :

রাষ্ট্রপতি, লোকসভা (House of the People) ও রাষ্ট্র পরিষদ (Council of States)—এই তিন লইয়া ভারতীয় পার্লামেণ্ট গঠিত। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র পরিষদের ১২ জন সভ্যকে মনোনীত করেন। লোকসভাতেও তিনি অনধিক দুইজন ইঙ্গ-ভারতীয় সভ্য মনোনয়ন করিতে পাবেন। বর্তমানে, রাষ্ট্রপতি লোকসভার আরও কয়েকটি আসন মনোনয়ন দ্বারা পূর্ণ

১। পার্লামেণ্টে সভ্য মনোনয়নের ক্ষমতা

* তপশীলী বর্ণ বা জাতি (Scheduled Castes) : শাসনতন্ত্রের ৩৪১নং ধারা অনুযায়ী কয়েকটি হিন্দু বর্ণ বা জাতি বা উপজাতিকে (Tribe) সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে রাষ্ট্রপতি তপশীলী জাতি বলিয়া বর্ণনা করিবেন। এই সকল জাতির জন্য শাসনতন্ত্রে নানারূপ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

† তপশীলী উপজাতি (Scheduled Tribes) : শাসনতন্ত্রের ৩৪২নং ধারা অনুযায়ী কয়েকটি উপজাতিকে (Tribes) সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে রাষ্ট্রপতি তপশীলী উপজাতি বলিয়া বর্ণনা করিবেন। ইহাদের জন্য শাসনতন্ত্রে নানারূপ বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

করেন। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করিবেন ও স্থগিত রাখিবেন। প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি লোকসভাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। তিনি পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের বা উভয় কক্ষের সম্মিলিত অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারিবেন। তিনি পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে বাণী পাঠাইতে পারেন।

২। পার্লামেণ্টের উপর ক্ষমতা

পার্লামেণ্টের কোন কোন অধিবেশনের স্বরুতে রাষ্ট্রপতি একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে পার্লামেণ্টকে কেন ডাকা হইয়াছে, কি কি কাজ পার্লামেণ্টকে করিতে হইবে—এই সকল বিষয় সূচিত হয়। মন্ত্রিসভাই এই ভাষণ রচনা করে এবং মন্ত্রিগণই এই ভাষণের জন্য দায়ী। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে রাজার বা রাণীর ভাষণ বলিতে যাহা বুঝায় ভারতে রাষ্ট্রপতির ভাষণও সেইরূপ।

পার্লামেণ্টের দুই কক্ষ কোন বিল সম্বন্ধে একমত হইতে না পারিলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন।

পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত প্রতি বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে। তিনি সম্মতি দিতে পারেন, আবার না দিতেও পারেন। অর্থ বিল ছাড়া অন্য কোন বিলকে রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্টে পাঠাইতে পারেন। পুনর্বিবেচনার পর বিলটি তাঁহার নিকটে পুনরায় প্রেরিত হইলে তিনি উহাতে সম্মতিদান করিতে বাধ্য।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত থাকার কালে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন (Ordinance) জারি করিতে পারেন। পার্লামেণ্টের পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি আইনটি উভয় কক্ষের দ্বারা সমর্থিত না হয়, তাহা হইলে ইহা বাতিল হইয়া যাইবে। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পর ছয় সপ্তাহের পূর্বেও পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স বাতিল করিয়া দিতে পারে।

৩। জরুরী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

কোন রাজ্যের বিধান মণ্ডলে গৃহীত বিল যদি রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি সেই বিলে সম্মতি দিতে অথবা না দিতে পারেন, কিংবা সেই বিলটি যদি অর্থ বিল না হয় তবে তিনি রাজ্যের বিধান মণ্ডলে পুনর্বিবেচনার জন্য উহাকে ফেরত পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়নের উপর ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির আর্থিক ক্ষমতা (President's Financial Powers):

পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি (মন্ত্রী মারফত) সংবৎসরের আর্থিক বিবৃতি উপস্থিত করান। সরকারী ব্যয় বাবদ কোন বরাদ্দ প্রস্তাব (Demand for Grant) রাষ্ট্রপতির স্থপারিশ ব্যতীত লোকসভায় উত্থাপিত করা যায় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নামে মন্ত্রিগণ ব্যতীত আর কেহ পার্লামেণ্টে টাকা খরচ করার প্রস্তাব আনিতে পারেন না।

১। সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর ক্ষমতা

'ইউনিয়ন' ও রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর প্রভৃতি করগুলির বণ্টন সম্বন্ধে স্থপারিশ করার জন্য শাসনতন্ত্র স্থরু হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে এবং তাহার পর প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর (কিংবা তৎপূর্বে) রাষ্ট্রপতি একটি 'ফিনান্স কমিশন' (Finance Commission) নিযুক্ত করিবেন।

২। রাজস্ব বণ্টন সম্বন্ধে ক্ষমতা

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা (President's Emergency Powers):

(১) যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে যুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ অথবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে সমগ্র ভারতের বা দেশের কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে তবে তিনি ঘোষণা-পত্র (Proclamation) দ্বারা জরুরী অবস্থা (Emergency) ঘোষণা করিতে পারেন। জরুরী অবস্থা যতদিন থাকে ততদিন রাষ্ট্রপতি, পার্লামেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন।

তিনপ্রকার জরুরী অবস্থা (Emergency)

(২) যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে কোন রাজ্যে সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে তবে তিনি ঘোষণাপত্র (Proclamation) দ্বারা ঐ রাজ্যের শাসন-বিভাগের ভার স্বহস্তে লইতে এবং পার্লামেণ্টকে ঐ রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার দিতে পারেন। রাজ্যপাল অথবা রাজপ্রমুখের রিপোর্ট অনুযায়ীও রাষ্ট্রপতি ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

(৩) যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে ভারতের অথবা ইহার কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা স্থনাম ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে তবে তিনি ঘোষণাপত্র

(Proclamation) দ্বারা এই সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব লইতে পারেন।

শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির স্থান (Constitutional Status of the President) :

রাষ্ট্রপতি আইনতঃ রাষ্ট্রের নায়ক (Head) হইলেও তিনি কার্যতঃ রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক নহেন। তিনি জাতির প্রতিনিধি, কিন্তু তিনি জাতিকে শাসন করেন না। সংবিধান তাঁহাকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়াছে, কিন্তু এই ক্ষমতা তিনি নিজের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী প্রয়োগ না করিয়া মন্ত্রিসভার উপদেশ অনুযায়ী প্রয়োগ করেন। সুতরাং শাসনকার্য তাঁহার নামে সম্পাদিত হইলেও ইহার জন্য তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। সকল কাজের জন্য মন্ত্রিগণই দায়ী। নিন্দা বা সুখ্যাতি তাঁহাদেরই প্রাপ্য। মন্ত্রিগণই দেশের প্রকৃত শাসক।

সহ-রাষ্ট্রপতি (Vice-President) :

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একজন সহ-রাষ্ট্রপতি আছেন। তিনি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে সভ্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট প্রথা অনুসারে এবং গোপন ভোটে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। সহ-রাষ্ট্রপতিকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে। তাঁহার বয়স অন্যূন ৩৫ বৎসর হওয়া চাই এবং রাজ্য-পরিষদের সভ্য হওয়ার যোগ্যতা থাকা চাই। সহ-রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের বা কোন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে পারিবেন না।

নির্বাচন

সহ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যপরিষদে সভাপতিত্ব করেন। এ বিষয়ে ভারতীয় শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে অনুসরণ করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি অল্পদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার কাজ সহ-রাষ্ট্রপতি নির্বাহ করিবেন। রাষ্ট্রপতির পদ হঠাৎ শূন্য হইলে, নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সহ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। রাজ্য পরিষদ অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া সহ-রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে।

রাজ্যপরিষদে সহ-রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্ব

মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) :

প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এক মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যে সহায়তা করে। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবে ও পরামর্শ

দিবে ("aid and advise")। মন্ত্রীদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে আইনতঃ বাধ্যতামূলক কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু উহা যে কার্যতঃ বাধ্যতামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভাই রাষ্ট্রপতির নামে দেশ শাসন করিয়া থাকে।

মন্ত্রীরাই দেশের প্রকৃত শাসক

প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সাধারণতঃ পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেতা তিনিই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। অন্যান্য মন্ত্রীরাও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, তবে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে। প্রত্যেক মন্ত্রীকেই পার্লামেণ্টের সভ্য হইতে হইবে। অবশ্য উভয় কক্ষের যে কোনটির কোন মনোনীত সভ্যও মন্ত্রী হইতে পারেন। তবে কোন মন্ত্রী যদি পার্লামেণ্টের কোন কক্ষের নির্বাচিত বা মনোনীত সভ্য না হন, তাহা হইলে কার্য গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সভ্য হইতে হইবে, নচেৎ তিনি আর মন্ত্রী থাকিতে পারিবেন না।

নিয়োগ

রাষ্ট্রপতির যতদিন খুশি ততদিনই মন্ত্রীরা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন, তবে তাঁহাদিগকে লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিতে হইবে। মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility) শাসনতন্ত্রে স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি নিম্ন কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই প্রধান মন্ত্রী রূপে নিয়োগ করেন। শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে এ বিষয়ে কিছু বলা না হইলেও ইহা আশা করা হয় যে রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মতো মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী সকল বিষয়ে চলিবেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদিগকে বরখাস্ত করিতে পারেন, কিন্তু নিম্ন কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি যদি কখনও এইরূপ করিয়া বসেন তাহা হইলে তিনি তখনই দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার বা পরামর্শ দিবার মত কোন মন্ত্রী নাই, কেননা তাঁহার নিযুক্ত যে-কোন নূতন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেই নিম্ন কক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। সুতরাং, রাষ্ট্রপতিকে কার্যতঃ লোকসভার আস্থাভাজন মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে। রাষ্ট্রপতির প্রায় সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা মন্ত্রিগণই বস্তুতঃ প্রয়োগ করেন।

লোকসভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্ব

মন্ত্রিসভার প্রকৃত কর্তৃত্ব

শাসনতন্ত্রে যদিও কেবল মন্ত্রিসভারই ব্যবস্থা আছে তথাপি বর্তমানে কার্যতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেছেন। মন্ত্রিসভার ভিতরে রহিয়াছে একটি

মন্ত্রিপরিষদ (Cabinet)। অর্থাৎ এমন একটি প্রথা গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছে যাহার ফলে (১) পরিষদভুক্ত মন্ত্রী (Cabinet Minister), (২) পরিষদভুক্ত মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন হইলেও পরিষদভুক্ত নহেন এইরূপ মন্ত্রী (Ministers having Cabinet rank but not in the Cabinet) এবং (৩) উপমন্ত্রী (Deputy Minister) —এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রী থাকিবে। এই তিন শ্রেণীর পার্থক্য পদমর্যাদায় ও ক্ষমতায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রিগণ পরিষদভুক্ত মন্ত্রী অপেক্ষা পদমর্যাদায় নিচু; নিমন্ত্রিত না হইলে (অর্থাৎ স্বাধিকার বলে) তাঁহারা মন্ত্রিপরিষদের সম্মেলনে যোগদান করেন না। উপমন্ত্রিগণ পদমর্যাদায় আরও অনেক নিচু। মন্ত্রিগণকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন পার্লামেন্টীয় সচিব (Parliamentary Secretaries) আছেন। স্বাধীনভাবে কোন বিভাগের ভার তাঁহারা কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা মন্ত্রিসভার (Cabinet) সদস্য নহেন।

মন্ত্রীদের শ্রেণীবিভাগ

মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যনির্বাহ ব্যাপারে সাহায্য করেন এবং পরামর্শ দেন। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতিকে কোন পরামর্শ দিয়াছিলেন কিনা এবং কি পরামর্শ দিয়াছিলেন—এই ধরণের কোন প্রশ্ন সম্পর্কে কোন ধর্মাধিকরণই অনুসন্ধান করিতে পারিবে না।

যে কোন কক্ষের দৈনন্দিন কার্যাবলীতে যোগদানের অধিকার প্রত্যেক মন্ত্রীরই আছে। তবে যে কক্ষের তিনি সভ্য নন সেই কক্ষের কোন ব্যাপারে ভোট দিবার অধিকার তাঁহার নাই। প্রকৃতপক্ষে, প্রধান মন্ত্রী হইতেছেন পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ উহার প্রধান প্রধান সভ্য। সুতরাং পার্লামেন্টও সাধারণতঃ তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত হইবে। বেশির ভাগ বিল তাঁহাদের দ্বারাই উপস্থাপিত হইবে, [illegible] অনুমোদন না করিলে অন্য কোন স্বতন্ত্র সভ্যের কোন বিল [illegible] কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে।

পার্লামেন্টের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক

অর্থসংক্রান্ত বিধিগুলি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্র[illegible] কর্তৃকই পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হইতে পারিবে।

প্রধান মন্ত্রীই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্তা। মন্ত্রিপরি[illegible] তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং এই সমস্ত সম্মেলনে [illegible] তিনি

রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করবেন। রাষ্ট্রব্যাপার পরিচালনা এবং আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যে-সমস্ত তথ্য চাহিয়া পাঠাইবেন প্রধান মন্ত্রীই তাহা জোগাইবেন ; এবং রাষ্ট্রপতির নির্দেশ হইলে, সমগ্র মন্ত্রিসভা কর্তৃক যে-বিষয়টি বিবেচিত হয় নাই—কেবল কোন একজন মন্ত্রীই যাহার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন—সেই বিষয়টি মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য তিনি উপস্থাপিত করিবেন।

প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা

মন্ত্রীর কাজে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ

মন্ত্রিসভা এবং পার্লামেণ্টের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the Council of Ministers and Parliament) :

(১) মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের সভ্য। তাঁহাদের মধ্যে একজন—সাধারণতঃ প্রধান মন্ত্রীই—লোকসভার নেতা। পার্লামেণ্টের সভ্য না হইয়া কেহই ছয় মাসের বেশি মন্ত্রী থাকিতে পারিবেন না।

(২) গুরুত্বপূর্ণ বিধি ও বিলগুলির অধিকাংশই মন্ত্রীদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

(৩) অর্থসংক্রান্ত সমস্ত বিধি কেবলমাত্র মন্ত্রীদের দ্বারাই উপস্থাপিত হইবে।

(৪) তাঁহারা লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। পার্লামেণ্ট মন্ত্রীদিগকে প্রশ্ন করিতে পারে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে মুলতুবী প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদি আনিতে পারে। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

লোকসভা কর্তৃক অনাস্থা প্রকাশে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Departments of the Government of India) :

ভারত সরকারের শাসনকার্য কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি বিভাগই এক একজন মন্ত্রীর অধীনে ; তবে একজন মন্ত্রীকে একাধিক বিভাগের ভারও দেওয়া যাইতে পারে। সচিব, সহ-সচিব, অবর-সচিব প্রভৃতি বহু স্থায়ী কর্মচারী এবং অধস্তন কর্মচারী ছাড়াও একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of State) বা উপমন্ত্রীও (Deputy Minister) কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে তাঁহার কার্যনির্বাহের ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারেন।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভাগগুলির সংখ্যা বিভিন্ন হইতে পারে। বর্তমানে (আগষ্ট, ১৯৫৩) নিম্নলিখিত বিভাগগুলি রহিয়াছে :—

১। **পররাষ্ট্র ও সহরাষ্ট্র বিভাগ (External Affairs and Commonwealth Relations)** : বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত ভারতের সম্পর্ক পররাষ্ট্র বিভাগের বিষয়ীভূত। রাষ্ট্রসম্মেলনের (Commonwealth) অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির সহিত ভারতের সম্পর্ক পররাষ্ট্র বিভাগের বিষয়াধীন। এই বিভাগ দুইটি বর্তমানে প্রধান মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন।

২। **দেশরক্ষা বিভাগ (Defence)** : ভারতের দেশরক্ষা বিভাগের কার্যাবলী ইহার বিষয়ীভূত এবং স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী এই বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন।

৩। **স্বরাষ্ট্র বিভাগ (Home)** : ভারতের সাধারণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ইহার বিষয়ীভূত। সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ, পুলিশ বা আরক্ষা, জেল বা কারা, আইন ও বিচারের পরিচালনা এবং আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী ইহার কর্তৃত্বাধীন।

৪। **অর্থবিভাগ (Finance)** : রাজস্ব আদায় ও ব্যয় এবং সরকারের আয়ব্যয়ক বা 'বাজেট' ঠিক করার জন্য এই বিভাগ দায়ী। আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা সমস্ত সরকারী প্রস্তাবের বিচার করে। সরকারী রাজকোষের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এই বিভাগ সরকারের অন্যতম প্রধান বিভাগ।

৫। **আইন-প্রণয়ন বিভাগ (Legislative Department)** : এই বিভাগ আইন-প্রণয়নের জন্য খসড়া তৈয়ারী করে এবং আইন প্রণয়নের সমস্ত প্রস্তাব আলোচনা করে। আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা সরকারকে পরামর্শ দেয়।

৬। **বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ (Commerce and Industry)** : ভারতের ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, শুল্ক, সংখ্যাতত্ত্ব প্রভৃতির সহিত সম্পর্কিত বিষয়গুলি ইহার কর্তৃত্বাধীন।

৭। **শ্রম বিভাগ (Labour)** : শ্রমিক সমস্যা এবং তৎসংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন এই বিভাগের কর্তৃত্বাধীন।

৮। **রেলপথ ও যানবাহন বিভাগ (Railways and Transport)** : রেলপথ, রাজপথ এবং ভারতের মধ্যে ও উপকূলে জাহাজ চলাচল সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় এই বিভাগের কর্তৃত্বাধীন।

৯। **সংসরণ বিভাগ (Communications):** ডাক ও তার, টেলিফোন, আভ্যন্তরীণ বিমান-চলাচল ইত্যাদি ইহার অধীন।

১০। **শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ (Education, Natural Resources and Scientific Research):** শিক্ষাব্যাপারে ভারতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী নীতির সংযোগসাধন এই বিভাগের কর্তৃত্বাধীন।

১১। **স্বাস্থ্য বিভাগ (Health):** জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যাগুলি এই বিভাগের পরিচালনাধীন।

১২। **পরিকল্পনা ও নদী উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগ (Planning and River Valley Schemes):** পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের উন্নতি সাধন এবং নদী উপত্যকা উন্নয়ন এই বিভাগের কার্য।

১৩। **প্রচার ও বেতার বিভাগ (Information and Broadcasting):** সংবাদ সরবরাহ, বেতারবার্তা প্রভৃতি এই বিভাগের অধীন।

১৪। **খাদ্য ও কৃষি বিভাগ (Food and Agriculture):** দেশে খাদ্যসঙ্কটের প্রতিরোধকল্পে এই বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সরকারের খাদ্যনীতি ও খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই বিভাগ দায়ী।

১৫। **রাজ্য বিভাগ (States):** পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি, যেগুলি বর্তমানে 'খ' অংশভুক্ত রাষ্ট্র, সেইগুলি ইহার কর্তৃত্বাধীন।

১৬। **আশ্রয় ও পুনর্বাসন (Relief and Rehabilitation):** পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় ও পুনর্বাসন এই বিভাগের কর্তৃত্বাধীন।

১৭। **পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ বিভাগ (Works, Housing and Supply):** সরকারী পূর্তবিভাগ অর্থাৎ সরকারী ইমারত তৈয়ারী ইত্যাদি ইহার কর্তৃত্বাধীন।

১৮। **উৎপাদন বিভাগ (Production):** দেশের আর্থিক উন্নতিকল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এই বিভাগের কার্য।

১৯। **সংখ্যালঘু বিভাগ (Minority Affairs):** ভারতের মুসলমান ও পাকিস্তানের হিন্দুর ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা এই বিভাগের কার্য।

২০। পার্লামেন্টের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য একজন মন্ত্রী আছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সরকারের প্রধান 'হুইপ' (Whip)।

রাষ্ট্রপতির নামে কার্যনির্বাহ :

প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিগণই দেশ শাসন করিবেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রপতির নামে কাজ করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতির নামে হুকুম জারী না হইলে তাহা আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না। মন্ত্রীরা স্ব স্ব নামে শাসনসংক্রান্ত কার্য করিতে পারিবেন না।

অ্যাটর্নী-জেনারেল (The Atto ney-G-neral of India) :

রাষ্ট্রপতি একজন অ্যাটর্নী-জেনারেল নিযুক্ত করিবেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন অ্যাটর্নী-জেনারেলেরও সেই যোগ্যতা থাকা চাই। অ্যাটর্নী-জেনারেল ভারত সরকারকে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিবেন এবং প্রয়োজন হইলে যে কোন বিচারালয়ে ভারত সরকারের মামলা পরিচালনা করিবেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকাল ও বেতন স্থির করিবেন।

কম্প্‌ট্রোলার এবং অডিটর-জেনারেল (Comptroller and Auditor-General) :

কম্প্‌ট্রোলার এবং অডিটর-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদিগকে যে পদ্ধতি অনুসারে বরখাস্ত করা যায় (অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট অপরাধ বা দোষের জন্য পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের প্রস্তাব অনুসারে) কেবলমাত্র সেই পদ্ধতি অনুসারেই তাঁহাকে বরখাস্ত করা যায়। এই ব্যবস্থার ফলে কম্প্‌ট্রোলার এবং অডিটর-জেনারেল সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সমুদয় রাজ্য সরকারের হিসাব পরীক্ষা করা তাঁহার কার্য। তিনি প্রতিবৎসর রাষ্ট্রপতির নিকট এবং প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখের নিকট হিসাব সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন। রাষ্ট্রপতি উহা পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে উপস্থিত করাইবেন। রাজ্যপাল (বা রাজপ্রমুখ) উহা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভায় উপস্থিত করাইবেন। হিসাব সম্বন্ধে সরকারের কোন ত্রুটি বা অন্য গোলযোগ থাকিলে এইভাবে তাহা আইনসভার সভ্যগণের ও জনসাধারণের গোচরীভূত হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. How is the President of India elected? How can he be removed from office? (২৪৩ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Briefly enumerate the powers and functions of the President. (২৪৪-২৫০ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Describe the position of the President in relation to the Council of Ministers. (C. U., 1951). (২৪৪-২৪৫ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Describe the composition and functions of the Council of Ministers. (২৫০-২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ)

5. Describe the constitution of the Union Executive under the present Constitution of India. (C. U. 1952). (২৪১, ২৫০-২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ)

6. Describe the position and powers of the President of the Union of India. (C. U., 1953). (২৪৪-২৫০ পৃষ্ঠা দেখ)

চতুর্থ অধ্যায়

ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা-বিভাগ

শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা আছে যে যুক্তরাষ্ট্রের একটি পার্লামেণ্ট বা সংসদ থাকিবে। রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্য পরিষদ (Council of States) ও লোকসভা (House of the People)—এই দুইটি কক্ষ লইয়া ঐ পার্লামেণ্ট গঠিত হইবে।

রাজ্যপরিষদ (Council of States) :

(ক) বিভিন্ন রাজ্যগুলির অনধিক ২৩৮ জন প্রতিনিধি এবং (খ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১২ জন সভ্য, এইরূপ অনধিক ২৫০ জনকে লইয়া রাজ্যপরিষদ গঠিত হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টিত আসনের সংখ্যা শাসনতন্ত্রের চতুর্থ তপশীলে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'ক' এবং 'খ' অংশভুক্ত প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে নির্বাচিত করিবেন উক্ত রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সভ্যগণ। 'গ' অংশভুক্ত যে সকল রাজ্যে বিধানসভা আছে, সেই সকল রাজ্যের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইবেন বিধানসভার নির্বাচিত সভ্যগণ কর্তৃক; আর যে সকল রাজ্যে (মণিপুর, ত্রিপুরা, বিলাসপুর, কচ্ছ) বিধানসভা নাই সেই সকল রাজ্যের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইবেন জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক। উভয় ক্ষেত্রেই নির্বাচন

রাজ্যপরিষদের গঠন

ঘটিবে একক হস্তান্তরযোগ্য [illegible] সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক [illegible] সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজ-সেবা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান [illegible] তা থাকা চাই।

রাজ্যপরিষদের সভ্যপদপ্রা [illegible] র বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। উন্মাদ, দেউলিয়া, [illegible] দণ্ডিত কোন ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ব্যবসায়ে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি সভ্য হইতে পারিবেন না।

রাজ্যপরিষদ কোনদিন ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে না, তবে দুই বৎসর অন্তর অন্তর সভ্য-সংখ্যার ⅓ অংশকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের সহ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যপরিষদের সভাপতি হইবেন। রাজ্যপরিষদ উহার একজন সভ্যকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করিবে।

রাজ্যপরিষদে আসন বণ্টন (Allocation of Seats in the Council of States) ঃ

'ক' অংশভুক্ত রাজ্যসমূহ ঃ—আসাম ৬, বিহার ২১, বোম্বাই ১৭, মধ্য প্রদেশ ১২, মাদ্রাজ ২৭, উড়িষ্যা ৯, পঞ্জাব ৮, উত্তর প্রদেশ ৩১, পশ্চিমবঙ্গ ১৪। (মোট ১৪৫)।

'খ' অংশভুক্ত রাজ্যসমূহ ঃ—হায়দরাবাদ ১১, জম্মু ও কাশ্মীর ৪, মধ্যভারত ৬, মহীশূর ৬, পাতিয়ালা ও পূর্ব পঞ্জাব রাজ্যসম্মেলন ৩, রাজস্থান ৯, সৌরাষ্ট্র ৪, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ৬। (মোট ৪৯)। বর্ত্তমানে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন।

'গ' অংশভুক্ত রাজ্যসমূহ ঃ—আজমীর ও কুর্গ ১, ভূপাল ১, বিলাসপুর ও হিমাচল প্রদেশ ১, দিল্লী ১, কচ্ছ ১, মণিপুর ও ত্রিপুরা ১, বিন্ধ্যপ্রদেশ ৪। (মোট ১০)।

সুতরাং রাজ্যপরিষদে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধির সংখ্যা হইল ২০৪। ইহার সহিত রাষ্ট্রপতি মনোনীত ১২ জন লইয়া রাজ্যপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হইল ২১৬।

লোকসভা (House of the People) ঃ

স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে বিভিন্ন রাজ্যের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোটে লোকসভার প্রায় সকল সভ্য প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ৫০০ জনের অনধিক

সভ্য লইয়া লোকসভা গঠিত হইবে। জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলিতে রাষ্ট্রপতি সভ্য মনোনয়ন করিবেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন সভ্য এই কক্ষে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপগুলির প্রতিনিধিত্ব করিবেন। আসামের একটি নির্দিষ্ট উপজাতি অঞ্চল হইতেও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি লোকসভার সদস্য হইবেন। ১৯৫০ সালের জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইনের (Representation of the People Act, 1950) প্রথম তপশীলে যেরূপ দেখান আছে সেইভাবেই এই কক্ষের আসনগুলির বণ্টন হইবে। প্রথম দশ বৎসর পর্যন্ত কয়েকটি আসন তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং রাষ্ট্রপতি অনধিক দুইজন ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indian) সভ্যও মনোনীত করিতে পারিবেন। রাজ্যগুলিকে অনেকগুলি আঞ্চলিক নির্বাচন-এলাকায় (Territorial Constituencies) ভাগ করা হইবে।

লোকসভার নির্বাচন : প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

অন্যূন পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যে কোন ভারতীয় নাগরিকই এই কক্ষের সভ্যপদের জন্য নিবাচনযোগ্য। কিন্তু উন্মাদ, দেউলিয়া, গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডিত কোন ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ব্যবসায়ে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ইহার সভ্য হইতে পারিবেন না।

এই কক্ষ ইহার দুইজন সভ্যকে যথাক্রমে পরিষদপাল (Speaker) এবং উপ-পরিষদপাল (Deputy Speaker) রূপে নির্বাচিত করিবে। লোকসভা সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে। অবশ্য রাষ্ট্রপতি ইহার পূর্বেই লোকসভাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। তবে কোন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে রাষ্ট্রপতি লোকসভার মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে আরো এক বৎসর করিয়া বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

বর্তমান লোকসভার মোট সদস্যসংখ্যা ৪৯৯। ইহার মধ্যে 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের প্রতিনিধি ৩৭৪ জন (আসাম ১২, বিহার ৫৫, বোম্বাই ৪৫, মধ্যপ্রদেশ ২৯, মাদ্রাজ ৭৫, উড়িষ্যা ২০, পঞ্জাব ১৮, উত্তর প্রদেশ ৮৬, পশ্চিমবঙ্গ ৩৪), 'খ' শ্রেণীর রাজ্যের প্রতিনিধি ৯৬ জন (হায়দরাবাদ ২৫, জম্মু ও কাশ্মীর ৬, মধ্যভারত ১১, মহীশূর ১১, পেপসু ৫, রাজস্থান ২০, সৌরাষ্ট্র ৬, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ১২), 'গ' শ্রেণীর রাজ্যের প্রতিনিধি ২৫ জন (আজমীর ২, ভূপাল ২, কুর্গ ১, বিলাসপুর ১, দিল্লী ৪, হিমাচল প্রদেশ ৩, কচ্ছ, ২, মণিপুর ২, ত্রিপুরা ২, বিন্ধ্যপ্রদেশ ৬), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রতিনিধি ১ জন,

আসামের একটি উপজাতি-অঞ্চলের প্রতিনিধি ১জন, এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য ২ জন আছেন।

পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিকার (Privileges of Parliament):

পার্লামেণ্টের সদস্যদের বাক্-স্বাধীনতা থাকিবে। পার্লামেণ্টে প্রদত্ত কোন বক্তৃতা বা ভোটের জন্য কোন সভ্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করা যাইবে না। অন্যান্য বিষয়ে পার্লামেণ্টের সভ্যদের ক্ষমতা, বিশেষ অধিকার, দোষমুক্তি ইত্যাদি পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। যতদিন পর্যন্ত না পার্লামেণ্ট কোনরূপ আইন প্রবর্তন করে ততদিন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাউস অফ কমন্স্ ও উহার সভ্যগণ যে-সমস্ত ক্ষমতা, বিশেষ অধিকার প্রভৃতি ভোগ করেন, সেইগুলি ভারতীয় পার্লামেণ্ট এবং উহার সভ্যগণ ভোগ করিবেন।

পার্লামেণ্টের নিয়মাবলী:

পার্লামেণ্টের কক্ষ দুইটিকে বৎসরে অন্ততঃ দুইবার অধিবেশনের জন্য আহ্বান করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত রাখিতে পারেন এবং তিনি লোকসভাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি যে কোন কক্ষে বাণী পাঠাইতে পারেন। কোন কোন অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে তিনি দুই কক্ষকে একত্র করিয়া অভিভাষণ দিবেন।

পার্লামেণ্টের ক্ষমতা (Powers of Parliament):

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

ইউনিয়ন বিষয়গুলি সম্পর্কে (অর্থাৎ দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, রেলপথ, বিমানপথ, ডাক ও তার, বীমা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে) আইন প্রণয়ন করিবার সমস্ত ক্ষমতা কেবল পার্লামেণ্টেরই আছে। যুগ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কেও (অর্থাৎ ফৌজদারী আইন, বিদ্যুৎ, কারখানা, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক-সঙ্ঘ এবং দেউলিয়াগিরি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে) পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। রাজ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সচরাচর পার্লামেণ্টের থাকিবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধেও আইন করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যপরিষদ যদি দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে স্থির করে যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন

রাজ্য বিষয় সম্পর্কে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করা উচিত, তাহা হইলে সে বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন রচনা করিতে পারিবে। তৃতীয়তঃ, দুই বা ততোধিক রাজ্য সম্মতি দিলে ও অনুরোধ করিলে পার্লামেণ্ট রাজ্য বিষয় সম্বন্ধে ঐ সকল রাজ্যে প্রযোজ্য আইন করিতে পারিবে। চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি সর্তাদি রক্ষার জন্য পার্লামেণ্ট যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

করস্থাপন সংক্রান্ত ক্ষমতা

সরকারী আয়ব্যয় মঞ্জুর ও কর বসানোর ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত এই সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইবে না। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, রাজ্যপরিষদের সভাপতি এবং সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা, লোকসভার পরিষদপাল ও উপ-পরিষদপালের বেতন ও ভাতা, সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি ব্যয় মঞ্জুরী পার্লামেণ্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে। অন্যান্য বিষযে ব্যয়ের দাবী লোকসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। অনেকগুলি বিষযের ব্যয় লোকসভার ভোটসাপেক্ষ না হওয়ায় এই বিষয়ে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সংকুচিত রাখা হইয়াছে।

পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি ঃ

আইন প্রণয়ন করিতে গেলে প্রথমে একটি বিল আনিতে হয়। অর্থ বিল (Money Bill) কেবল মাত্র লোকসভাতেই উত্থাপিত হইবে এবং সরকারের মুখপাত্র রূপে কোন মন্ত্রীই তাহা উত্থাপিত করিবেন। অন্যান্য বিল যে কোন কক্ষে যে কোন সভ্য উত্থাপিত করিবেন। সাধারণ সভ্য কোন বিল আনিতে চাহিলে এক মাস পূর্বে নোটিশ দিতে হইবে। পরে নির্দিষ্ট দিনে সভা বিলটি উত্থাপিত করার অনুমতি দিবে। কোন মন্ত্রী কোন বিল আনিতে চাহিলে তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিলেই চলিবে।

প্রথম পাঠ ঃ প্রথমে প্রস্তাব করা হয় যে বিলটি প্রথম বার পাঠ করা হউক। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে সচরাচর বিলটিকে একটি কমিটিতে (Select Committee) প্রেরণ করা হয়। কমিটি বিলটি আলোচনা করিয়া সংশোধন সহ অথবা বিনা সংশোধনে একটি রিপোর্ট দাখিল করে। কখন কখন বিলটিকে কমিটিতে না পাঠাইয়া জনমত নির্ধারণের জন্য প্রচার করা হয়।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ তাহার পর বিলটি দ্বিতীয় বার পাঠ করা হয়। প্রত্যেকটি

ধারা আলোচিত হইয়া তাহার সম্বন্ধে আলাদা ভাবে ভোট নেওয়া হয়। সভ্যেবা বিলটির প্রত্যেক ধারা সম্বন্ধে যে কোন সংশোধন প্রস্তাব করিতে পারেন। এইভাবে সমগ্র বিলটিব উপর ভোট লওয়া হয়।

তৃতীয় পাঠ ঃ তাহার পুব বিলটি তৃতীয় বার পঠিত হউক এই মর্মে প্রস্তাব আসে। এই সময়ে বিলটি সম্বন্ধে শুধু সাধাবণ ভাবে আলোচনা চলে।

তৃতীয় বার পাঠের পর বিলটি গৃহীত হইলে সেটি অন্য কক্ষে আলোচনা ও গ্রহণেব জন্য পাঠানো হয়। অন্য কক্ষেও বিলটি তিন বার পঠিত হয। দ্বিতীয় কক্ষ বিলটিকে যদি বিনা সংশোধনে গ্রহণ করে, তাহা হইলে বিলটি রাষ্ট্রপতির নিকটে তাঁহাব সম্মতির জন্য প্রেবিত হইবে এবং এই সম্মতি লাভ করিলে বিলটি আইন বলিয়া গণ্য হইবে।

দুই কক্ষের সম্মতি ব্যতীত বিল পাশ হয় না

প্রথম কক্ষে গৃহীত হওয়াব পব দ্বিতীয় কক্ষ যদি বিলটিকে সংশোধন কবে, তাহা হইলে সংশোধনগুলির অনুমোদনেব জন্য বিলটি পুনবায় প্রথম কক্ষে প্রেরিত হইবে। যদি দুই কক্ষেব মধ্যে মতভেদ চলিতে থাকে তাহা হইলে বাষ্ট্রপতি দুই কক্ষেব একটি যুক্ত অধিবেশন ডাকিতে পাবেন। এই যুক্ত অধিবেশন বিলটিব গ্রহণ বা বর্জন সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত দান করিবে।

দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশন

অর্থ বিল (Money Bill) লোক সভায় গৃহীত হওয়াব পর বাজ্য পরিষদে প্রেবিত হইবে। রাজ্য পরিষদ ১৪ দিনেব মধ্যে বিলটিকে সুপাবিশ সহ ফেবৎ পাঠাইবে। লোকসভা যদি রাজ্য-পরিষদের সুপারিশ গ্রহণ না-ও কবে তাহা হইলেও বিলটি পাশ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং বাষ্ট্রপতিব সম্মতিব জন্য প্রেবিত হইবে।

অর্থ বিল সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ঃ রাষ্ট্রপতিব সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে না। অর্থ বিল ব্যতীত অন্য কোন বিলে তিনি সম্মতি না দিয়া উহা পার্লামেণ্টের পুনর্বিবেচনাব জন্য পাঠাইতে পাবেন। এইরূপে পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেবিত বিল যদি পুনরায় পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয় তবে তাহা পুনরায় রাষ্ট্রপতির সম্মতিব জন্য দাখিল করা হইবে এবং তখন রাষ্ট্রপতি উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকিবেন। অর্থ বিল রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন না।

বাজেট পাশের নিয়ম ঃ

নূতন সরকারী বৎসর আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট দিনে অর্থ মন্ত্রী নূতন বৎসরের আয়-ব্যয়ের তালিকা অর্থাৎ বাজেট পার্লামেণ্টে উপস্থিত করেন। নূতন কর বসাইতে হইলে বা পুরাতন করের হার সংশোধিত করিতে হইলে সে বিষয়ে বিল আনিতে হইবে।

প্রথম কয়েকদিন বাজেট সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা হয়। এই উপলক্ষে সভ্যগণ সরকারী নীতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মন্ত্রিগণ সমালোচকদের জবাবে সরকারের পক্ষ হইতে উত্তর দেন। তাহার পর সরকারী ব্যয়ের বিভিন্ন দফা সম্বন্ধে পৃথকভাবে লোকসভায় আলোচনা ও ভোট নেওয়া হয়। টাকা খরচের দাবীগুলি লোকসভায় গৃহীত হইলে সবগুলিকে একত্র করিয়া একটি 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন আইন' (Appropriation Act) পাশ করিতে হয়।

বৎসরের মধ্যেও সরকার প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত বাজেট আনিতে পারে।

সরকারী ব্যয় ঃ

বাজেটে সরকারী খরচ দুইটি ভাগে দেখানো হয় ঃ (১) যে খরচ অবশ্যই করিতে হইবে, অর্থাৎ যাহা লোকসভার ভোটসাপেক্ষ নহে ("expenditure charged upon the Consolidated Fund of India")। যেমন,—রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ইত্যাদি ; সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের বেতন, ভাতা ও পেনসন ; অডিটর-জেনারেলের বেতন, ভাতা ও পেনসন ; সরকারী ঋণ ও তাহার সুদ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা ; ইত্যাদি। (২) যে খরচ লোকসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ ("expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of India")।

ভারত সরকারের তহবিল—যাহাতে ঐ সরকারের প্রাপ্য সমুদয় অর্থ জমা হয়—Consolidated Fund of India নামে পরিচিত।

নূতন শাসনতন্ত্রে বিষয় বিভাগ ঃ

শাসনতন্ত্রে তিনপ্রকার বিষয় ভাগ

শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্লামেণ্ট এবং রাজ্য সরকার ও রাজ্য বিধানমণ্ডলের মধ্যে ক্ষমতার সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া বিভিন্ন বিষয়ের বিভাগ করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের আইনের খানিকটা রদবদল করিয়া তিনটি তালিকায় আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিভক্ত হইয়াছে।

১। **'ইউনিয়ন' তালিকা (Union List)**ঃ ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা, অর্থাৎ বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি, যুদ্ধ বাধিলে যুদ্ধ পরিচালনা ইত্যাদি; নৌ, সামরিক ও বিমানবাহিনী এবং 'ইউনিয়নে'র অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী; আণবিক শক্তি ও তাহার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ; কেন্দ্রীয় গুপ্তচর বিভাগ; বৈদেশিক ব্যাপার ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কারণে বিনা বিচারে আটক; বৈদেশিক ব্যাপারসমূহ; যুদ্ধ ও শান্তি, নাগরিকতা ও নাগরিকতা প্রাপ্তি; ভারত হইতে বহির্গমন, পাসপোর্ট, ভিসা, রেলপথ, পার্লামেণ্ট কর্তৃক জাতীয় বলিয়া ঘোষিত রাজপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথ, লাইটহাউস; পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে ঘোষিত প্রধান বন্দরসমূহ, বিমানপথ, বিমানপোত, বিমান চলাচল; ডাক ও তার, টেলিফোন, বেতার ইত্যাদি; মুদ্রা ও মুদ্রাঙ্কন; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, বীমা, ইত্যাদি; হুণ্ডি, চেক ইত্যাদি; আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য; পার্লামেণ্ট কর্তৃক যে সব শিল্প জনস্বার্থে 'ইউনিয়নের' নিয়ন্ত্রণযোগ্য বলিয়া ঘোষিত, খনি ও তৈলক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ; জনস্বার্থে পার্লামেণ্টের ইচ্ছা অনুসারে আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী-উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন; ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি, বেনারস ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাচীন এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কীর্তিস্তম্ভ ও দলিল, আদমসুমারি, ইত্যাদি।

এই সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ভার একমাত্র পার্লামেণ্টের হাতে ন্যস্ত।

২। **রাজ্য তালিকা (State List)**ঃ রাজ্যের শৃঙ্খলা; পুলিশ; বিচারকার্য; জেলখানা; স্থানীয় শাসন; জনস্বাস্থ্য; হাসপাতাল; ডাক্তারখানা; মদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়; শিক্ষা; রাস্তাঘাট, পুল, ফেরী ইত্যাদি; কৃষি; জমি, জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক, জমির উন্নতি ইত্যাদি; বন; মৎস্যপালন; মহাজন ও মহাজনী ব্যবসায়; সমবায় সমিতি; ইত্যাদি।

এই সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ভার রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার উপর ন্যস্ত। কিন্তু রাজ্যপরিষদ জাতির বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার্থ আবশ্যক বোধ করিলে, অথবা দুই কিংবা ততোধিক রাজ্য অনুরোধ করিলে, অথবা রাজ্যে শাসনতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িলে, রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদির সর্তাদি রক্ষার জন্য

পার্লামেণ্ট সমগ্র ভারত বা ভারতের যে কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩। **যুগ্ম তালিকা (Concurrent List) ঃ** ফৌজদারী আইন ও ফৌজদারী কর্মবিধি ; দেওয়ানী কর্ম্মবিধি ; রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বিনা বিচারে আটক ; বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, দত্তক গ্রহণ, যৌথ পরিবার ও সম্পত্তি বিভাগ ; আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ; ঔষধ ও বিষ ; একচেটিয়া ব্যবসায় ; ট্রেড ইউনিয়ন ; শিল্প ও শ্রমিক সংক্রান্ত বিবাদ ; শ্রমিক কল্যাণ ; আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায় ; পার্লামেণ্টের দ্বারা জনকল্যাণমূলক বলিয়া ঘোষিত শিল্প ও বাণিজ্য ; বয়লার ; বিদ্যুৎ ; সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখানা ; ইত্যাদি।

এই সকল বিষয়ে পার্লামেণ্ট ও রাজ্যের বিধানমণ্ডল উভয়েই আইন করিতে পারিবে। সাধারণতঃ পার্লামেণ্টের আইন রাজ্যের বিধানমণ্ডল প্রণীত আইনের উপর বলবৎ হইবে। কিন্তু রাজ্যের বিধানমণ্ডলের আইন যদি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হইয়া তাঁহার সম্মতি লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ আইন পার্লামেণ্টের আইনের উপর বলবৎ হইবে।

৪। **অবশিষ্ট বিষয় (Residuary Subjects) :** রাজ্যতালিকা এবং যুগ্ম তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলি বাদে অন্যান্য সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং করস্থাপন করিবার অধিকার একমাত্র পার্লামেণ্টের থাকিবে।

৫। **বিষয় বিভাগের নীতি :** উক্ত তিনটি তালিকা পরীক্ষা করিলে কি নীতি অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিষয় বিভাগ করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে সকল বিষয়ের সহিত সমগ্র ভারতের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে (যেমন, দেশরক্ষা, রেলপথ) সেই সকল বিষয় যাহাতে সমগ্র ভারতের স্বার্থে পরিচালিত হয় সেজন্য সেগুলি কেন্দ্রের অধীন রাখা হইয়াছে। যে সকল বিষয়ের সহিত প্রধানতঃ প্রাদেশিক স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে (যেমন, পুলিশ, হাসপাতাল) সেগুলি রাজ্যের অধীন রাখা হইয়াছে। যে সকল বিষয় সময় বা অবস্থা বিশেষে সমগ্র ভারতের অথবা কোন একটি রাজ্যের স্বার্থের সহিত জড়িত হইতে পারে সেগুলি যুগ্ম তালিকায় রাখা হইয়াছে। আবার সময় এবং অবস্থা বিশেষে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সাময়িক ভাবে সমগ্র ভারতের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন হইতে পারে। তখন রাজ্যপরিষদের সম্মতি অনুসারে কেন্দ্র উহা নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিবে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনসংক্রান্ত সম্বন্ধ (Administrative Relations between the Union and the States) :

পার্লামেণ্ট কর্তৃক রচিত আইন যাহাতে সুচারুভাবে প্রয়োগ করা যায় প্রত্যেক রাজ্য সরকার সেইভাবে শাসনকার্য পরিচালনা কবিবে। প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সবকার এই বিষয়ে বাজ্য সবকাবকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে স্বীয় শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করিতে পারে প্রত্যেক রাজ্য সরকার সেইভাবে শাসনকার্য পবিচালনা করিবে। প্রযোজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষযে রাজ্য সবকাবকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

রাজ্য সরকারের সম্মতি থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীয় শাসনসংক্রান্ত কোন কার্যের ভার ঐ রাজ্য সরকারকে দিতে পারিবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায কেন্দ্র ও রাজ্যেব মধ্যে শাসনসংক্রান্ত অধিকাব ও দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওযা হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকাবের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে শাসনকার্য সুপবিচালিত হইতে পারে না। এইজন্য সংবিধানে উক্ত ব্যবস্থা কবা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

‘ক’ বিভাগের রাজ্যের শাসন-বিভাগ

রাজ্য (State) :

‘রাজ্য’ বলিতে ভাবতেব শাসনতন্ত্রে বুঝায পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, মহীশূব, সৌরাষ্ট্র, ত্রিপুবা, মণিপুব প্রভৃতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেব অংশগুলি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে ‘State’ বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ‘State’ (অর্থাৎ রাজ্য) কথাটি সেই অর্থে ব্যবহার কবা হইয়াছে।

রাজ্যের তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ

রাজ্যগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। **‘ক’ বিভাগ :** (১) আসাম ; (২) বিহাব ; (৩) বোম্বাই ; (৪) মধ্য প্রদেশ ; (৫) মাদ্রাজ ; (৬) উড়িষ্যা ; (৭) পঞ্জাব ; (৮) উত্তর প্রদেশ ; (৯) পশ্চিম বঙ্গ।

'খ' বিভাগ : (১) হায়দরাবাদ ; (২) জম্মু ও কাশ্মীর ; (৩) মধ্য ভারত ; (৪) মহীশূর ; (৫) পাতিয়ালা ও পূর্ব পঞ্জাব রাজ্য সম্মেলন (পেপ্‌সু) ; (৬) রাজস্থান ; (৭) সৌরাষ্ট্র ; (৮) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন।

'গ' বিভাগ (১) বিন্ধ্যপ্রদেশ ; (২) আজমীর ; (৩) ভূপাল ; (৪) বিলাসপুর ; (৫) কুর্গ ; (৬) দিল্লী ; (৭) হিমাচল প্রদেশ ; (৮) কচ্ছ ; (৯) মণিপুর ; (১০) ত্রিপুরা।

'ঘ' বিভাগ : ইহা ছাড়া আর একটি বিভাগ আছে—তাহা 'State' নয়, 'Territory' বা রাজ্যখণ্ড।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে যেগুলিকে গভর্ণরের প্রদেশ বলা হইত, সেগুলি 'ক' বিভাগের রাজ্য হইয়াছে। ইংরেজ আমলে পাঁচশতাধিক দেশীয় রাজ্য ছিল। সেগুলির মধ্যে হায়দরাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং মহীশূরকে আগের মত স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে রাখা হইয়াছে। বাকীগুলির মধ্যে কয়েকটিকে 'খ' ও 'গ' বিভাগের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অনেকগুলিকে 'ক' বিভাগের রাজ্যের এলাকাভুক্ত করা হইয়াছে—যথা, বরোদা, কুচবিহার, ইত্যাদি।

রাজ্যপাল (Governor) :

'ক' বিভাগের প্রত্যেক রাজ্যের শাসনভার একজন রাজ্যপালের উপর ন্যস্ত। তাঁহাকে সাহায্য করিবার এবং পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা আছে। রাজ্যপালের সহিত রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্বন্ধ রাষ্ট্রপতির সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্বন্ধের অনুরূপ।

রাজ্যপালের নিয়োগ, কর্মকাল ও মাহিনা

রাজ্যপালকে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি, এবং স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করিলে বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুত না হইলে রাজ্যপালগণ পাঁচ বৎসরের জন্য স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক ব্যতীত কেহই রাজ্যপালরূপে নিয়োগযোগ্য হইতে পারিবেন না।

রাজ্যপাল ভারতের কোন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারিবেন না এবং লাভজনক অন্য কোন পদেও অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। তিনি বিনাভাড়ায় একটি বাড়ী এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিহিত পারিশ্রমিক, ভাতা ও বিশেষ

বিশেষ সুবিধা পাইবেন। যতদিন পার্লামেণ্ট নূতন ব্যবস্থা না করে ততদিন পর্যন্ত তিনি মাসিক ৫,৫০০৲ টাকা করিয়া পাইবেন।

অসুস্থতা ইত্যাদির জন্য রাজ্যপাল অনুপস্থিত থাকিলে, অথবা তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ প্রভৃতি ঘটিলে, অথবা এইরূপ কোন বিশেষ জরুরী অবস্থায় রাজ্যপালের পদ সাময়িকভাবে শূন্য হইলে, তাঁহার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

নিয়োগ ও অপসারণের দিক হইতে দেখিলে বলা যায় যে রাজ্যপাল এক অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁহার পদ খুবই মর্যাদাসম্পন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও ইহাও সত্য যে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মচারী। মন্ত্রি-মণ্ডলী এবং রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের দিক হইতে দেখিতে গেলে বলা যায় যে এক অতি সম্মানিত পদের তিনি অধিকারী। স্বায়ত্ত-শাসনযুক্ত রাজ্যের তিনি নামে প্রধান এবং শাসনতান্ত্রিক শাসকের পদ-মর্যাদার তিনি অধিকারী।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of the Governor):

১। বিশেষ ক্ষমতা

কেবলমাত্র আসামের রাজ্যপালেরই উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি সম্বন্ধে দুইটি বিষয়ে 'ইচ্ছাধীন' (discretionary) ক্ষমতা রহিয়াছে। অন্য কোন রাজ্যপালের কোনরূপ 'ইচ্ছাধীন' ক্ষমতা নাই। সুতরাং আসামের রাজ্যপাল ব্যতীত অন্যান্য রাজ্য-পালগণ তাঁহাদের সমস্ত কার্যের পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সহায়তাপ্রাপ্ত ও উপদিষ্ট হইবেন। এমন কি, আসামের রাজ্যপালও দুইটি নির্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মন্ত্রিসভার নিকট হইতে সহায়তা ও উপদেশ লইবেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নলিখিত শিরোনামায় আলোচনা করা যাইতে পারে: শাসন, আইন প্রণয়ন, বিচার-বিষয়ক ও অর্থসম্বন্ধীয়।

২। শাসন পরিচালনা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Powers): রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা রাজ্যপালের উপর ন্যস্ত। সরকারী কার্যাবলী তিনি মন্ত্রীদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন, মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিবরণী শ্রবণ করেন, শাসন পরিচালনা সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে পারেন

এবং কোন বিশেষ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সমগ্র মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাবী করিতে পারেন।

মন্ত্রিগণকে এবং রাজ্যের মহাব্যবহারিক (Advocate-General), জেলার বিচারক (District Judges) প্রভৃতিকে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। রাজ্য-কৃত্যকের উচ্চতর পদগুলিতে নিয়োগও তিনিই করেন। মহাধর্মাধিকরণের বিচারক নিয়োগকালে রাষ্ট্রপতি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবেন।

আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে ক্ষমতা (Legislative Powers)ঃ রাজ্যপাল রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার এক অংশ, যদিও তিনি ইহার সভ্য নহেন।

বিধান পরিষদে ও বিধান সভায় সভ্য মনোনয়নের ক্ষমতা

যে রাজ্যে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট বিধানমণ্ডল (Bicameral Legislature) আছে তথায় রাজ্যপাল বিধান পরিষদের (Legislative Council) সভ্য-সংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশকে মনোনীত করিবেন। শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) প্রথম দশ বৎসর পর্যন্ত তিনি রাজ্যের বিধান সভায় (Legislative Assembly) উপযুক্ত সংখ্যক ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indian) সভ্য মনোনীত করিতে পারেন, অবশ্য যদি তাঁহার মনে হয় যে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় নির্বাচনে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে নাই।

রাজ্যের বিধানমণ্ডলের (State Legislature) কক্ষ বা কক্ষদ্বয়ের অধিবেশন তিনি আহ্বান করিতে এবং স্থগিত রাখিতে পারেন এবং বিধান সভা (Legislative Assembly) ভাঙিয়া দিতে পারেন।

খুশিমত তিনি কক্ষ বা কক্ষদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা দিতে পারেন। কিন্তু কয়েকটি নির্দিষ্ট অধিবেশনের প্রারম্ভে ব্যবস্থাপক সভার নিকট সভা আহ্বানের কারণ জানাইয়া একটি বিশেষ বক্তৃতা তাঁহাকে দিতেই হইবে। ব্যবস্থাপক সভার নিকট তিনি বাণী (messages) প্রেরণ করিতে পারেন।

আইন প্রণয়ন বিষয়ে ক্ষমতা

রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কক্ষ বা কক্ষদ্বয় কর্তৃক অনুমোদিত বিল (Bill) তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিতেই হইবে। তিনি হয় ইহাতে সম্মতি দিবেন, না হয় ইহা বাতিল করিয়া দিবেন (veto), অথবা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাখিয়া দিতে পারেন। 'অর্থ বিল' (Money Bill) ছাড়া অন্য বিল তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য বাণী সহ কক্ষ বা কক্ষদ্বয়ের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিতে পারেন। যদি কোন বিল (Bill)

ফেরৎ পাঠাইবার পর পুনরায় বিধানমণ্ডল কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে তিনি আর তাহাতে সম্মতি না দিয়া পারিবেন না। কতকগুলি বিল (Bill) আছে যেগুলি তিনি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য অবশ্যই ধরিয়া রাখিবেন। অন্যান্য বিলগুলি তিনি, ইচ্ছা করিলে, এইভাবে ধরিয়া রাখিতে পারেন।

রাজ্যের বিধানসভার বিরতিকালে রাজ্যপাল আইনের ক্ষমতাবিশিষ্ট 'অর্ডিন্যান্স' (Ordinances) অর্থাৎ জরুরী আইন জারি করিতে পারেন। যে-কোন সময়ে তিনি যে-কোন 'অর্ডিন্যান্স' প্রত্যাহার করিতে পারেন। তবে, বিধানমণ্ডলের পুনরধিবেশনের পর অর্ডিন্যান্সগুলি উহার নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে, এবং এইরূপ পুনরধিবেশনের পর ছয় সপ্তাহের বেশী কোন অর্ডিন্যান্স বলবৎ থাকিতে পারে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে নির্দেশ না পাইলে রাজ্যপাল কোন অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারিবেন না।

জরুরী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

বিচার বিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers) : কোন রাজ্যের আইন সম্পর্কিত অপরাধের ব্যাপারে অপরাধীকে ক্ষমা করিবার এবং দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিবার, নাকচ করিবার বা কমাইয়া দিবার ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে।

অর্থসম্বন্ধীয় ক্ষমতা (Financial Powers) : কর স্থাপনের কোন-প্রকার দাবী বা কোন অর্থ বিল (Money Bill) অথবা অর্থসম্বন্ধীয় কোন বিষয় রাজ্যপালের অনুমোদন ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থাপিত করা যাইবে না।

রাজস্ব ও অর্থ সম্বন্ধে ক্ষমতা

নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার রীতি অনুসারে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার উপদেশ মত এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) :

'ক' এবং 'খ' বিভাগভুক্ত প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া মন্ত্রিসভা আছে—মুখ্যমন্ত্রী ইহার নেতা। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ এবং মধ্য ভারতের মন্ত্রিসভায় সর্বসময়েই উপজাতীয়গণের উন্নতির জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকিবেন। তাঁহাকে ইহা ছাড়াও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়গুলির এবং অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির বা অন্য কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইতে পারে।

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে, এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মত অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে, নিযুক্ত করেন। মন্ত্রীদের স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা রাজ্যপালের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে,

কিন্তু তাঁহারা যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়িত্বশীল, অর্থাৎ কার্যতঃ যতদিন তাঁহারা বিধান সভার আস্থাভাজন থাকেন, ততদিনই স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কোন মন্ত্রী যদি একাদিক্রমে ছয় মাস কাল পর্যন্ত বিধানমণ্ডলের সভ্য না থাকেন (অবশ্য তিনি মনোনীত সভ্য হইলেও চলিবে) তাহা হইলে ঐ ছয় মাস সময় শেষ হইবার পর তিনি আর মন্ত্রী থাকিবেন না। রাজ্যপাল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মখ্যমন্ত্রী রূপে নির্বাচিত করেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীদিগকেও ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই লওয়া হয়।

বিধান সভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্ব

রাষ্ট্রনৈতিক এবং শাসনকায পরিচালনা সম্পর্কীয় বহু দায়িত্বই মুখ্যমন্ত্রীর রহিয়াছে। দলগত ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহাকে সজাগ থাকিতেই হয়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীও তাঁহাকে সুসংহত করিতে হয়।

সংবিধানে ব্যবস্থা আছে যে সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালকে যে সমস্ত কার্য নিজের স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইয়া করিতে হয় সেই সমস্ত কার্য ছাড়া তাঁহার অন্যান্য কার্য পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রিসভা তাঁহাকে সাহায্য করিবে এবং উপদেশ দিবে। পূর্বেই বলা হইযাছে সামান্য দুইটি বিষয়ে আসামের রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে। অন্য কোন রাজ্যপালের কোন ইচ্ছাধীন ক্ষমতা নাই, আসামের রাজ্যপালেরও অন্য কোন বিষয়ে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা নাই।

ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও কার্যতঃ মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই সংবিধান অনুসারে তাঁহার কর্তব্য সম্পন্ন করিবেন এইরূপ আশা করা যায়।

মন্ত্রিসভার সহিত রাজ্যপালের সম্পর্ক (Relation between the Governor and the Council of Ministers):

রাজ্যপাল মন্ত্রীদিগকে নিয়োগও করেন, আবার বরখাস্ত করিতেও পারেন। তবে তাঁহাকে সাহায্য করিবার এবং পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা তাঁহাকে রাখিতেই হইবে। সুতরাং মন্ত্রিসভা এবং বিধানমণ্ডল যদি শক্তিশালী হয় তাহা হইলে তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করিয়া কোন রাজ্যপালই স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না। পদত্যাগ করিয়া মন্ত্রিগণ শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে জানাইতে পারেন যে শাসনতন্ত্রের

মন্ত্রিসভার প্রকৃত কর্তৃত্ব

বিধি-ব্যবস্থা অনুসাবে ঐ বাজ্যেব শাসনকার্য চলিতে পাবে না। তখন বাষ্ট্রপতি ঘোষণা (Proclamation) জাবি কবিয়া ঐ বাজ্যেব শাসনভাব নিজহস্তে লইতে পাবেন এবং ঐ বাজ্যেব জন্য বাজ্যতালিকাভুক্ত বিষযে আইন প্রণয়নেব ক্ষমতা পার্লামেণ্টেব হাতে অর্পণ কবিতে পাবেন। কিন্তু এইরূপ ঘোষণা দুই মাসেব অধিক বলবৎ থাকিতে হইলে পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওযা চাই।

শাসনকার্য পবিচালনা এবং আইন প্রণযনেব প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রিসভাব সমস্ত সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীই বাজ্যের বাজ্যপালকে জানাইবেন। শাসনকার্য পবিচালনা এবং আইন-প্রণযনেব প্রস্তাব সম্পর্কে বাজ্যপাল যে সমস্ত সংবাদ জানিতে চাহিবেন তাহাও মুখ্যমন্ত্রীই যোগাইবেন। তাহা ছাড়া, বাজ্যপাল যদি প্রযোজন বোধ কবেন তাহা হইলে মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পাবেন যে, কোন একজন মন্ত্রীব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সমগ্র মন্ত্রিসভাব বিবেচনাব জন্য উপস্থাপিত কবিতে হইবে।

মন্ত্রিসভার কাজে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ

রাজ্য বিধানমণ্ডল এবং মন্ত্রিসভার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the State Legislature and the Council of Ministers) :

(১) মন্ত্রীবা বাজ্য বিধানমণ্ডলেব সভাব সভ্য হইবেন।

(২) গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলিব অধিকাংশই মন্ত্রীবা উপস্থাপিত কবেন।

(৩) অর্থসংক্রান্ত সমস্ত বিধি মন্ত্রিগণ কর্তৃকই উপস্থাপিত হইবে।

(৪) মন্ত্রীবা বাজ্যেব বিধান সভাব নিকট যৌথভাবে দায়ী। বিধানমণ্ডলেব সভ্যগণ মন্ত্রীদিগকে প্রশ্ন কবিতে পাবেন। তাঁহাবা মন্ত্রিগণেব বিরুদ্ধে মুলতুবী প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতি আনিতে পাবেন। বিধান সভায় মন্ত্রীদেব বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ কবিবেন।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the position of the Governor of a State in relation to his Council of Ministers under the present Constitution of India (C. U., 1952). (২৭০-২৭২ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Describe briefly the nature of the functions discharged by the Ministers of the West Bengal Government in (i) legislative and (ii) financial matters. (C. U., 1953). (২৬৭-২৬৯ পৃষ্ঠা দেখ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

'খ' বিভাগের রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি

'খ' বিভাগের রাজ্যসমূহের পূর্বতন ইতিহাস (Previous History of the Part B States) :

পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির সাধারণ বর্ণনা : ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত ভারত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারত। শেষোক্ত ভারত গঠিত ছিল ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য লইয়া। ভারতের সমগ্র ভূ-ভাগের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ জুড়িয়া ছিল এই দেশীয় রাজ্যগুলির বিস্তার। দেশীয় রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা ছিল ৯৩০ লক্ষ, অর্থাৎ ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ অপেক্ষা সামান্য কম।

আয়তন, জনসংখ্যা, রাজস্ব এবং শাসন-ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে এক একটি দেশীয় রাজ্য ছিল এক এক প্রকারের। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বৃহত্তম রাজ্য ছিল হায়দরাবাদ ; আয়তনে ইহা ছিল অবিভক্ত বঙ্গদেশ অপেক্ষা বৃহত্তর এবং ইতালীর সমান। ৮ কোটি টাকা ছিল ইহার রাজস্ব। আবার লাওয়া (রাজপুতানায়) এবং ওয়াদি-র (কাথিয়াবাড়ে) ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও ছিল—সামান্য কয়েক বর্গমাইল মাত্র যাহাদের বিস্তার, সামান্য কয়েক সহস্র মাত্র যাহাদের জনসংখ্যা এবং মাত্র কয়েক সহস্র টাকা যাহাদের রাজস্ব।

দেশীয় রাজ্যগুলি ছিল ভারতের দেহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতীক। সর্বোত্তর অংশে ছিল কাশ্মীর রাজ্য—৮৯,০০০ বর্গমাইল ইহার বিস্তার এবং ইহা তিব্বত ও সোভিয়েট এশিয়ার সমীপবর্তী। পঞ্জাবের একদা-পরাক্রান্ত শিখ-রাজ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিল পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ, ফরিদকোট, কপূরতলা প্রভৃতি রাজ্যসমূহ। রাজপুতানার রাজ্যগুলি (যথা, উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি) শাসন করিত সেই সমস্ত প্রাচীন রাজবংশ, ভারতের ইতিহাসে যাহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের ধারে ধারে দেখা যাইত ছোট ছোট কয়েকটি রাজপুত-রাজ্য, স্বাধীনতার প্রতি অটুট অনুরাগের দ্বারা যাহাদের দীর্ঘ দিনের ইতিহাস অনুরঞ্জিত। কোলাপুরে রাজত্ব করিতেন

জগদ্বিখ্যাত শিবাজীব বংশধবগণ। ইংবাজ একদিন যে প্রবল পবাক্রান্ত মাবাঠা সাম্রাজ্য ধ্বংস কবিয়া দিযাছিল, তাহাবই ধ্বংসাবশিষ্ট বাজ্যগুলিব প্রতিনিধিস্থানীয ছিল ববোদা, গোয়ালিযব এবং ইন্দোব বাজ্য। মাবাঠা সাম্রাজ্যেব নিকট একদা যাঁহাবা বশ্যতা স্বীকাব কবিয়াছিলেন তাঁহাদেবই উত্তবপুরুষগণ কাথিযাবাড়েব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজ্যগুলি শাসন কবিতেন। বঙ্গদেশেব কুচবিহাব ও পার্বত্য ত্রিপুবায় শাসনকার্য চালাইত দুইটি প্রাচীন বাজবংশ। বিন্ধ্য পবতেব দক্ষিণে ছিল হাযদবাবাদ ও বেবাবেব নিজামেব বাজ্য। ইহাব শাসক হইলেন আসফজাহী বংশেব এক উত্তব পুরুষ—মুঘল-শাসনেব কথা স্মবণ কবাইযা দেয তাহাব বংশেতিহাস। আবও দক্ষিণে মহীশূব,—প্রাচীন বিজযনগব সাম্রাজ্যেব ধ্বংসাবশেষ। সর্বদক্ষিণে ছিল কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুব বাজ্যদ্বয—ইহাব শাসনকর্তাবা প্রাচীন চেব বাজগণেব বংশধব বালযা দাবী কবেন।

এই সমস্ত দেশীয় বাজ্যেব শাসনকায পবিচালিত হইত স্বৈবতান্ত্রিক ভাবে। বাজ্যেব জনসাধাবণেব মৌলিক পৌ ও বাষ্ট্রনৈতিক অধিকাবেব অভাব ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৬০টিব অধিক বাজ্যে ব্যবস্থাপক সংস্থা ছিল। অন্য কযেকটি বাজ্যে জনসাধাবণকে বাজ্য-পবিচালনাব কাযে অংশ দানেব কথা চিন্তা কবা হইতেছিল। কিন্তু অধিকাংশ দেশীয বাজ্যেই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিব উন্নতি হইতেছিল অতি মন্দগতিতে এবং কখনও কখনও মধ্যযুগীয অত্যাচাবও পবিলক্ষিত হইত। তবে সর্বত্রই জনসাধাবণ তাহাদেব অধিকাব সম্বন্ধে সচেতন হইযা উঠিতেছিল।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব পর্যন্ত দেশীয় রাজ্যগুলির মর্যাদা : ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভাবতীয় স্বাধীনতা আইন প্রবর্তনেব পূর্ব পযন্ত দেশীয় বাজ্যগুলি ব্রিটিশবাজেব কর্তৃত্বের অধীন ছিল। এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ কেবল সার্বভৌম শক্তি (ব্রিটিশরাজ) কর্তৃক অনুমোদিত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ব্রিটিশবাজের সার্বভৌম ক্ষমতা (Paramountcy) এই সমস্ত দেশীয় বাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ও বহির্ব্যাপাব উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত ছিল। প্রচলিত প্রথা, অকথিত সম্মত, এবং বাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাব অঙ্গীভূত ভাবত সরকার ও ভারত-সচিবের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি দ্বারা পরিপূরিত সন্ধি, প্রতিশ্রুতি, সনদ ইত্যাদিব উপর এই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ব্রিটিশ শাসনেব আমলে দেশীয় বাজ্যের ব্যাপারে বড়লাটের প্রভুত্বমূলক ক্ষমতা

বাহ্যিক ভাবে এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যেব কোন আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব ছিল না,

এবং সার্বভৌম শক্তি তাহাদের পক্ষে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন করিত তদনুযায়ী কার্য করিতে তাহারা বাধ্য ছিল। যুদ্ধ, সন্ধি বা বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত আলোচনা করিবার একমাত্র অধিকার ছিল ব্রিটিশরাজের।

শাসকের, রাজ্যের অথবা সমগ্র ভারতের কল্যাণের জন্য কিংবা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের জন্য এই সমস্ত রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌম শক্তি হস্তক্ষেপ করিতে পারিত। অর্থাৎ, সার্বভৌম শক্তির অধিকারগুলি ছিল নিম্নরূপ :—

(১) সুবিচার ও সুশাসনের উদ্দেশ্যে রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার, (২) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গোলযোগে সালিশী করার অধিকার; (৩) রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের নিষ্পত্তি করার অধিকার, (৪) কোন রাজ্যের কোন শাসকের পোষ্য গ্রহণ সম্পর্কে অনুমতি দিবার অধিকার; (৫) অমানুষিক প্রথাসমূহ রোধ করিবার অধিকার; (৬) ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার।

এই অধিকারসমূহের পরিবর্তে ব্রিটিশরাজের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্বও ছিল, যেমন,—(১) রাজ্যগুলির আয়তনের সমগ্রতা (territorial integrity) বজায় রাখা, (২) বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা হইতে রাজ্যগুলিকে রক্ষা করা; (৩) শাসক বংশকে রক্ষা করা এবং (৪) নৃপতিদের অধিকারসমূহ এবং তাঁহাদের ইজ্জত রক্ষা করা।

সার্বভৌম শক্তি নানা ছুতায় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারেও যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করিত। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বাট্লার কমিটি (Butler Committee) এই মত প্রকাশ করেন—"সার্বভৌম শক্তিকেই সার্বভৌম থাকিতে হইবে, কালের নিত্য পরিবর্তনশীল প্রয়োজন এবং রাজ্যগুলির ক্রমোন্নতি অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়া ইহাকে ইহার দায়িত্বগুলি অবশ্যই পালন করিতে হইবে।"

ভারতীয় রাজ্য ও ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা (১৯১৯-৪৭)ঃ মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার প্রবর্তিত হইবার পরেও ভারতীয় রাজ্যসমূহ ব্রিটিশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিল। তাহারা রেসিডেণ্ট ও রাষ্ট্রনৈতিক এজেণ্ট মারফৎ গভর্ণর-জেনারেলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে ভারত সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক

দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হইত। শাসন-পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলির সহিত ব্রিটিশ ভারতের সংযোগ স্থাপনের জন্য সাইমন কমিশন সুপারিশ করেন। এই সমস্ত ভারতীয় রাজ্যের নৃপতিগণ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ ও ভারতীয় রাজ্যগুলি লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যসমূহের যোগদান স্বেচ্ছামূলক ছিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-গঠন নির্দিষ্টসংখ্যক রাজ্যের যোগদান সাপেক্ষ ছিল। নৃপতিবর্গের স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ক্ষমতা ত্যাগ করার অনিচ্ছাবশতঃ এবং আরও অনেকগুলি কারণে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনে পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা (১৯৪৬) অনুসারে ভারতীয় রাজ্যসমূহের অবস্থা ও মর্যাদা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইল। ইহা স্পষ্টই ঘোষিত হইল যে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসমূহের উপর সার্বভৌমত্ব ব্রিটিশরাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। ঐ সার্বভৌমত্ব স্বাধীন ভারতীয় সরকারের হস্তে সমর্পিত হইবে না, সার্বভৌম শক্তির নিকট সমর্পিত অধিকারসমূহ রাজ্যগুলিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে একদিকে রাজ্যসমূহ এবং অন্যদিকে ব্রিটিশরাজ ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধের অবসান হইবে। স্বাধীন [illegible] যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া কিংবা ইহার সহিত বিশেষ [illegible] সম্পর্ক স্থাপন করা রাজ্যসমূহের ইচ্ছাধীন হইল। ভারতীয় [illegible] অনূর্ধ্ব ৯৩ জন প্রতিনিধির ভারতীয় গণপরিষদে (Constituent [illegible]bly) যোগদানের ব্যবস্থা করা হইল।

দেশীয় রাজ্যের উপর ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমত্ব লোপ

গণপরিষদের সহিত বহু ভারতীয় রাজ্য সহযোগিতা করিল, কিন্তু মুসলিম [illegible]গের বিরোধিতার ফলে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভবপর হইল না। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় রাজ্যসমূহের অবস্থা মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় বর্ণিত তাহাদের অবস্থার সহিত অভিন্ন রহিল, এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্তানে যোগ দেওয়া তাহাদের ইচ্ছাধীন রহিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন বলে রাজ্যসমূহের উপর ব্রিটিশ-রাজের সার্বভৌম অধিকার লুপ্ত হইল। ফলে ব্রিটিশরাজের সহিত নৃপতিদের সন্ধি ও চুক্তিগুলিও বাতিল [illegible]। আইনতঃ রাজ্যসমূহ স্বাধীন হইল, কিন্তু [illegible] স্বাধীনতা ভৌগোলিক, [illegible], অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল।

স্বাধীন ভারতে পূর্বতন দেশীয় রাজ্যসমূহের স্থান (Position of "Native States" in Independent India) ঃ

পূর্বতন দেশীয় রাজ্যসমূহের বর্তমান অবস্থা নিম্নে মোটামুটি বর্ণিত হইল।

(১) বাহাওয়ালপুর, কালাত ও বেলুচিস্থানের কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত আর সমস্ত রাজ্যই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে। বাহাওয়ালপুর, কালাত ও লাস বেলার আর বেলুচিস্থানের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পাকিস্থানে যোগদান করিয়াছে।

(২) "যোগদান" (Accession) বলিতে বুঝায় ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত (অথবা পাকিস্থানের সহিত) যোগদান এবং ভারতীয় ইউনিয়নের (অথবা পাকিস্থানের) সরকারের নিকট দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার ও পরিবহন ও সংবাদ ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, এবং অন্য কোন বিষয়ে চুক্তি থাকিলে তাহাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, সমর্পণ।

(৩) কয়েকটি রাজ্য (যেমন, মহীশূর, হায়দরাবাদ) এককভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে 'খ' বিভাগে এককরূপে যুক্ত হইয়াছে। আবার কয়েকটি রাজ্য (যেমন, মণিপুর, ত্রিপুরা) এককভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে 'গ' বিভাগে রাষ্ট্রপালশাসিত হইয়াছে।

(৪) কতকগুলি রাজ্য একত্রে সাম্মিলিতভাবে হয় 'খ' বিভাগের রাজ্যরূপে, (যেমন, রাজস্থান, মধ্যভারত ইত্যাদি) না হয় 'গ' শ্রেণীর রাজ্যরূপে (যেমন, বিন্ধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ) ভারতীয় ইউনিয়নের অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

(৫) বরোদা, কোহ্লাপুর, কুচবিহার প্রভৃতি রাজ্য এবং উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ বা সন্নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ভারতের সহিত যোগদানের পর শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থ প্রতিবেশী 'ক' বিভাগের রাজ্যের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে (Merger)।

এক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অংশকে কি করিয়া একত্রীভূত করা যায় —এই লক্ষ্যই ভারতীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে সর্দার প্যাটেলের ও ভারত সরকারের নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। নৃপতি-শাসিত এই সমস্ত রাজ্য সমেত সমগ্র ভারত কেবল একটি ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক এককই নয়, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়াও তাহার সত্তা অবিভাজ্য। তিনটি উপায়ে ভারতীয়

রাজ্যগুলি সম্পর্কিত এই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে—(১) ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বৃহৎ রাষ্ট্রে সংহত করিয়া, (২) কতকগুলি রাজ্যকে সন্নিহিত ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলির অন্তর্ভুক্ত করিয়া, এবং (৩) কয়েকটি বৃহত্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্যকে তাহাদের পৃথক সত্তা বজায় রাখিতে দিয়া। জাতীয় ঐক্য স্থাপনের এই সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়—তাহা হইল রাজ্যগুলির পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের স্থানে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা।

অসংখ্য দেশীয় রাজ্যের একীকরণ—সদার প্যাটেলের নীতি

বর্তমান শাসনতন্ত্রে নৃপতিদের অধিকার ও বিশেষ সুবিধাসমূহ ঃ নৃপতিগণ তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হারাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও তাহাদের কিছু কিছু অধিকার ও বিশেষ সুবিধা বজায় রহিয়াছে। নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলিকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত বা ভারতের সহিত সংযুক্ত করিবার সময় ভারত সরকার চুক্তি বা স্বীকৃতি দ্বারা নৃপতিদিগকে কতকগুলি ব্যক্তিগত অধিকার ও বিশেষ সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। সংবিধানে ঐ সকল প্রতিশ্রুতি পালনের স্বীকৃতি রহিয়াছে। ভারতীয় রাজ্যগুলির পূর্বতন শাসকবর্গের সহিত সন্ধি বা চুক্তিঘটিত বিবাদ প্রধান বিচারালয় ও অন্যান্য ধর্মাধিকরণগুলির বিচার ক্ষমতার বহির্ভূত।

কেন্দ্রীয় সরকার ও 'খ' বিভাগের রাজ্য ঃ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য রাজ্য দপ্তরের (Ministry of States) ভার গ্রহণ করেন।

শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর দশ বৎসর কাল 'খ' শ্রেণীর রাজ্যগুলি রাষ্ট্রপতির (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের) সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধীন থাকিবে। পার্লামেন্ট এই নিয়ন্ত্রণ-কাল কমাইয়া বা বাড়াইয়া দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি যে কোন 'খ' বিভাগের রাজ্যকে এই নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিতে পারেন। সম্প্রতি মহীশুর রাজ্যকে এই সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রের এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা 'ক' বিভাগের কোন রাজ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। ইহাই 'ক' এবং 'খ' বিভাগের রাজ্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্য।

'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য

রাজপ্রমুখ ও মন্ত্রিসভা ঃ

'খ' বিভাগের রাজ্যে রাজ্যপালের পরিবর্তে থাকেন রা[illegible]। ভারত সরকারের সহিত দেশীয় রাজগণের চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কো[illegible]কে 'রাজপ্রমুখ' রূপে স্বীকার করেন। রাজপ্রমুখের মর্যাদা ও ক্ষম[illegible] রাজ্যপালের মর্যাদা ও ক্ষমতার অনুরূপ হইলেও ইহা দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত ভারত সরকারের যে চুক্তি হইয়াছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহার উপর নির্ভর করে

প্রত্যেক 'খ' বিভাগের রাজ্যে মন্ত্রিসভা ও বিধানমণ্ডল আছে। ইহাদের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি সর্বাংশে 'ক' বিভাগের রাজ্যের মন্ত্রিসভা ও বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতির অনুরূপ।

একমাত্র মহীশূর রাজ্যের বিধানমণ্ডলে দুইটি কক্ষ আছে। 'খ' বিভাগের অন্যান্য সকল রাজ্যের বিধানমণ্ডলে কক্ষ একটি মাত্র। 'খ' বিভাগের প্রত্যেক রাজ্যেই সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ঃ

'খ' বিভাগের রাজ্যগুলির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরকে অনেকগুলি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ, কেবলমাত্র তিনটি বিষয়ে (দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা) জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্লামেন্টের অধীন। অন্যান্য বিষয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, 'খ' বিভাগের অন্যান্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-পদ্ধতি ভারতের গণপরিষদ কর্তৃক রচিত হইয়া ভারতের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ শাসন-পদ্ধতি ঐ রাজ্যের গণপরিষদ কর্তৃক পৃথকভাবে রচিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ, জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ দাবি করিলে ঐ রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে। এই অধিকার আর কোন রাজ্যকে দেওয়া হয় নাই। চতুর্থতঃ, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে রাজপ্রমুখের পরিবর্তে আছেন 'সদর-ই-রিয়াসৎ'। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানমণ্ডল (বর্তমান গণপরিষদ) কর্তৃক নির্বাচিত। স্থির হইয়াছে যে যিনিই 'সদর-ই-রিয়াসৎ' পদে নির্বাচিত হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকেই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজপ্রমুখ রূপে স্বীকার করিয়া লইবেন।

কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র্য

প্রশ্নোত্তর

Describe the present position of what were formerly known as Indian States (C U 1951) (২৭৭-২৭৯ পৃষ্ঠা দেখ)

সপ্তম অধ্যায়

'ক' ও 'খ' অংশভুক্ত রাজ্যসমূহের ব্যবস্থা বিভাগ

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা ঃ

প্রত্যেক 'ক' বিভাগের রাজ্যে রাজ্যপাল এবং প্রত্যেক 'খ' বিভাগের রাজ্যে রাজপ্রমুখকে লইয়া একটি করিয়া বিধানমণ্ডল (Legislature) থাকিবে। (১) বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ এবং মহীশূর রাজ্যের বিধানমণ্ডলে দুইটি কক্ষ থাকিবে। (২) অন্যান্য রাজ্যের বিধানমণ্ডলে একটি কক্ষ থাকিবে। নিম্নতন কক্ষের নাম বিধান সভা (Legislative Assembly) এবং উচ্চতন কক্ষের নাম বিধান পরিষদ (Legislative Council)।*

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার সমালোচনা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতিতে কেন্দ্রে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা অপরিহার্য হইলেও প্রদেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই স্বীকার করেন না। ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কালে এই বিষয়ে মতৈক্য না হওয়ায় বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। অধিকন্তু সংবিধানে এই ব্যবস্থা আছে যে, কোন রাজ্যের বিধান সভার অনুরোধক্রমে পার্লামেণ্ট ঐ রাজ্যে বিধান পরিষদ থাকিলে তাহা উঠাইয়া দিতে পারে এবং না থাকিলে নূতন ভাবে উহা স্থাপন করিতে পারে।

---

* এতদিন পর্যন্ত 'Legislature'-কে বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভা বা আইন সভা বলা হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি 'Legislature'-এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হিসাবে 'বিধানমণ্ডল' বিশেষ ভাবে প্রচলিত হইয়াছে। সংবাদপত্র, সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতিতে State Legislature-কে বিধানমণ্ডলই বলা হইতেছে। এইজন্য রাজ্যসমূহের ব্যবস্থা বিভাগ সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভা কথাটির পরিবর্তে 'বিধানমণ্ডল' শব্দটি ব্যবহার করা হইল। উপরন্তু বলা যায় যে 'Legislative Assembly-কে যদি 'বিধান সভা' এবং 'Legislative Council'-কে 'বিধান পরিষদ' বলা হয়, তবে 'Legislature'-কে 'বিধানমণ্ডল' বলিয়া অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত।

বিধান পরিষদ (Legislative Council) :

বিধান পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বিধান সভার সভ্য-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী হইবে না, কিন্তু চল্লিশের কমও হইবে না। বিধান পরিষদের গঠন এইরূপ হইবে :—⅓ সভ্য মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি লইয়া গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হইবেন, $\frac{1}{12}$ সভ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের পুরাতন গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন; $\frac{1}{12}$ সভ্য মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব মানের শিক্ষায়তনের তিন বৎসরের পুরাতন শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন, ⅓ সভ্য বিধান সভার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে কেহ নির্বাচিত হইবেন না; বাকি সভ্য রাজ্যপাল কর্তৃক বিজ্ঞান, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন, সমাজসেবা প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। বিধান পরিষদের সভ্যের বয়স অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর হওয়া চাই। তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে।

বিধান পরিষদের গঠন

পশ্চিম বঙ্গের বিধান পরিষদে নিম্নলিখিত ভাবে আসন বণ্টন করা হইয়াছে :—

মোট আসন সংখ্যা—৫১। ইহার মধ্যে—

পশ্চিম বঙ্গের বিধান পরিষদের গঠন

(ক) পৌরসংঘ, জেলা বোর্ড প্রভৃতি কর্তৃক নির্বাচিতের সংখ্যা—১৭,

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিতের সংখ্যা—৪,

(গ) মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব মানের শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিতের সংখ্যা—৪,

(ঘ) বিধান সভা কর্তৃক নির্বাচিতের সংখ্যা—১৭,

(ঙ) রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীতের সংখ্যা—৯।

বিধান পরিষদকে কোন দিন ভঙ্গ করা যাইবে না। প্রত্যেকটি বিধান পরিষদই হইবে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। তবে দুই বৎসর অন্তর অন্তর সভ্যগণের ⅓ অংশকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

বিধান পরিষদের স্থায়িত্ব

বিধান সভা (Legislative Assembly) :

প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত সভ্যগণকে লইয়া প্রত্যেক রাজ্যের বিধান সভা গঠিত হইবে। ২১ বৎসর বা ততোধিক বয়সের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক

(নারী ও পুরুষ) বিধান সভার নির্বাচনে ভোট দিবেন। কোন বিধান সভার সদস্য সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক অথবা ষাটের কম হইবে না। বিধান সভার সভ্যের বয়স অন্ততঃ ২৫ বৎসর হওয়া চাই। তাহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর হইতে প্রথম দশ বৎসর তপশীলভুক্ত জাতি ও তপশীলভুক্ত উপজাতিসমূহের জন্য কয়েকটি আসন সংরক্ষিত থাকিবে। ইহা ছাড়া রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ ইচ্ছা করিলে বিধান সভার ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo Indian) সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান বিধান সভা ২৩৮ জন নির্বাচিত সদস্য এবং দুইজন মনোনীত ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য এই মোট ২৪০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছে।

বিধান সভার গঠন

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ভাঙিয়া দেওয়া না হইলে প্রত্যেক রাজ্যের বিধান সভার আয়ুষ্কাল হইবে পাঁচ বৎসর কিন্তু রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ ইচ্ছা করিলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিধান সভা ভাঙিয়া দিতে পারিবেন। জরুরী অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে পার্লামেন্ট আইন দ্বারা বিধান সভার আয়ুষ্কাল এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে পারিবে।

বিধান সভার স্থায়িত্ব

রাজ্য বিধানমণ্ডলগুলির ও উহাদের সভ্যগণের বিশেষ অধিকার (Privileges of State Legislatures):

প্রত্যেক রাজ্য বিধানমণ্ডলের সভ্যগণের বাক স্বাধীনতা থাকিবে। বিধান-মণ্ডলে প্রদত্ত ভাষণ বা ভোটের জন্য কোন সভ্যের বিরুদ্ধেই কোন ধর্মাধিকরণে মামলা করা যাইবে না। বিধানমণ্ডলেরও কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকিবে।

কোন রাজ্য বিধানমণ্ডলের এবং উহার সভ্যদের বিশেষ অধিকার ও সুবিধা ইত্যাদি যতদিন না বিধানমণ্ডল কর্তৃক কোন আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, ততদিন পর্যন্ত ঐ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশ হাউস অব কমনসের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার অনুরূপ হইবে।

বিধানমণ্ডলের বিশেষ অধিকার ব্রিটিশ হাউস অব কমনসের বিশেষ অধিকারের মত

রাজ্য বিধানমণ্ডলের কার্য ও ক্ষমতা (Functions and Powers of State Legislatures):

বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা ও কাজ মোটামুটি তিন প্রকারের:—

(১) প্রধান কাজ হইল পুলিশ, জেলখানা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প,

সমবায় প্রভৃতি রাজ্যবিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা। ফৌজদারী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, শ্রমিক সংঘ, কারখানা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি যুগ্ম বিষয় সম্বন্ধেও আইন করার ক্ষমতা রাজ্য বিধানমণ্ডলের আছে, তবে এ সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন রাজ্যের আইনের উপর বলবৎ হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি রাজ্য বিধানমণ্ডল প্রণীত আইনে সম্মতি দিয়া থাকেন তবে তাহা কেন্দ্রীয় আইনের উপর বলবৎ হইবে।

১। যা ... ক্ষমতা

(২) দ্বিতীয়তঃ, বিধানমণ্ডলের নিম্নতন কক্ষ অর্থাৎ বিধান সভা সরকারী আয়ব্যয় মঞ্জুর করিবে। বৎসরের গোড়ায় সরকারী আয়ব্যয়ের তালিকা ব্যবস্থা পক সভায় উপস্থিত করা হয় এবং আলোচিত হয়। রাজ্যপালের বেতন, হাইকোর্টের বিচারপতি, পরিষদ পাল, উপ-পরিষদপাল, বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ সভাপতি—ইহাদের বেতন এবং অন্যান্য কয়েকটি ব্যয় বিধান সভার মঞ্জুরীর অপেক্ষা করে না। অন্যান্য ব্যয় সভার মঞ্জুরীসাপেক্ষ। বিধান পরিষদ আয়ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে কিন্তু ইহার অনুমোদন নিষ্প্রয়োজন।

২। সরকারী ব্যয়মঞ্জুর

(৩) তৃতীয়ত, বিধান সভা মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর খবরদারী করে। বিধান সভার অনাস্থাভাজন হইলে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই বিষয়ে বিধান পরিষদের কোন ক্ষমতা নাই।

৩। মন্ত্রীদের উপর খবরদারী

বিধানমণ্ডলের নিয়মাবলী ও কার্যক্রম:

প্রতি বৎসর বিধানমণ্ডলের অন্ততঃ দুইবার অধিবেশন হইবে। রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ বিধানমণ্ডলের কক্ষ দুইটিকে আহ্বান করিতে বা উহাদের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং বিধান সভাকে ভাঙিয়া দিতে পারেন। রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ কোন একটি কক্ষকে পৃথকভাবে উদ্দেশ করিয়া অথবা উভয় কক্ষকে যুক্তভাবে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা দিতে পারেন। যে কোন কক্ষের নিকটই তিনি বাণী প্রেরণ করিতে পারেন।

আহ্বান

বিধান পরিষদ সভ্যদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন উপ-সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচন করিবে। বিধান

সভা সভ্যদেব মধ্য হইতে একজন পবিষদপাল (Speaker) ও একজন উপ-পবিষদপাল (Deputy Speaker) নির্বাচন কবিবে। সভাপতিব অনুপস্থিতিতে উপ-সভাপতি এবং পবিষদপালেব অনুপস্থিতিতে উপ-পবিষদপাল যথাক্রমে বিধান পবিষদেব এবং বিধান সভাব অধিবেশনে সভাপতিত্ব কবিবেন।

সভাপতিত্ব

কোন বিল দুই কক্ষেব দ্বাবা অনুমোদিত না হইলে আইন হইবে না। কিন্তু বিধান সভাকে বিধান পবিষদেব চেয়ে কিছু বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ, অর্থ বিল (Monev Bill) প্রথমেই বিধান সভায উপস্থিত কবিতে হইবে। ঐ সভা ঐ বিল পাশ কবাব পব উহা বিধান পবিষদে প্রেবিত হইবে এবং বিধান পবিষদ ঐ বিল পাশ করুক বা না করুক, ১৪ দিন পবে বিলটি বাজ্যপাল বা বাজপ্রমুখেব সম্মতিব জন্য প্রেবিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ অন্য বিল অর্থাৎ সাধাবণ বিল যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হইতে পাবে। কিন্তু বিধান সভা যে ভাবে বিলটি পাশ কবিবে তাহাতে বিধান পবিষদেব আপত্তি থাকিলে বিলটি প্রথমে তিন মাস বিধান পবিষদ আটকাইয়া বাখিতে পাবে। কিন্তু তিন মাস পবে বিধান সভা যদি বিলটিকে বিধান পবিষদেব সংশোধন সহ অথবা বিনা সংশোধনে পুনবায পাশ কবে তাহা হইলে আব এক মাস পবে, বিধান পবিষদেব আপত্তি থাকিলেও, বিলটি বাজ্যপাল বা বাজপ্রমুখেব সম্মতিব জন্য প্রেবিত হইবে এবং এই সম্মতি পাওয়া গেলে বিলটি আইন বলিযা গণ্য হইবে। সুতবাং সাধাবণ আইন প্রণযনেব ব্যাপাবে বিধান পবিষদ মাত্র চাবি মাস বিলম্ব ঘটাইতে পাবে। ইহাব বেশী ক্ষমতা তাহাব নাই।

বিধান সভা ও বিধান পরিষদের আপেক্ষিক ক্ষমতা—বিধান পবিষদ বিল পাশেব ব্যাপাবে শুধু কিছুকাল বিলম্ব ঘটাইতে পাবে

বিধান পবিষদেব নিকট মন্ত্রিসভাব শাসনতান্ত্রিক দাযিত্ব নাই, অর্থাৎ বিধান পবিষদ অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ কবিলেও মন্ত্রিগণ পদত্যাগ কবিতে বাধ্য নহেন।

রাজ্যের আইন প্রণয়নের পদ্ধতি :

প্রতিটি আইন প্রথমে বিল হিসাবে বিধানমণ্ডলে উত্থাপিত হয। যদি বাজ্যেব বিধানমণ্ডলে দুই কক্ষ থাকে তাহা হইলে অর্থ বিল ছাডা অন্য বিল যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হইতে পাবে। অর্থ বিল নিম্নতন কক্ষে উত্থাপিত হইবে।

প্রথম পাঠ ঃ প্রতিটি বিল প্রথমে কোন এক কক্ষে প্রথম বার পঠিত হয়। বিলটি প্রথম বার পাঠের পর প্রায়ই ঐ কক্ষের [illegible] একটি কমিটিতে প্রেরিত হয়। কমিটি বিলটি আলোচনা করিয়া সংশোধন সহ অথবা বিনা সংশোধনে বিলটি সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবে।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ তাহার পর বিলটি দ্বিতীয় বার পাঠ করার প্রস্তাব আসে এই স্তরে বিলটির প্রতিটি ধারা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়। প্রতিটি ধারা সম্বন্ধে আলাদা করিয়া ভোট নেওয়া হয়। সভ্যেরা প্রতিটি ধারা সম্বন্ধে যে কোন সংশোধন প্রস্তাব আনিতে পারেন। এইভাবে সমগ্র বিলটির উপর ভোট নেওয়া হয়।

তৃতীয় পাঠ ঃ দ্বিতীয় বার পাঠের পর প্রস্তাব আসে যে বিলটি তৃতীয় বার পঠিত হউক। এই স্তরে বিলটি সম্বন্ধে শুধু সাধারণ আলোচনা চলিবে। তাহার পর তৃতীয় পাঠ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

তৃতীয় পাঠ গৃহীত হইলে বিধানমণ্ডল যদি এককক্ষবিশিষ্ট হয় তবে বিলটি রাজ্যপালের বা রাজপ্রমুখের নিকট তাহার সম্মতির জন্য প্রেরিত হইবে। তিনি সম্মতি দিতে পারেন আবার না দিতেও পারেন। রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ সম্মতি দিলে বিলটি আইন বলিয়া গণ্য হইবে। প্রয়োজন বুঝিলে রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ বিলটিকে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য তাহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। কয়েকটি বিষয় সংক্রান্ত বিলকে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করা রাজ্যপালের বা রাজপ্রমুখের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য।

বিধানমণ্ডল দুইকক্ষবিশিষ্ট হইলে এক কক্ষে বিল পাশ হইবার পর উহাকে অন্য ক[illegible] বিধা[illegible]াইতে হইবে এবং সেখানেও বিলটি তিন বার পঠিত হইবে। অর্থা[illegible] পর সভায় পাশ হইবার পর বিধান পরিষদে যাইবে এবং সেখান হইতে ১৪ দিনের মধ্যে বিলটি ফেরত আসিবে। উচ্চতন কক্ষ কোন সংশোধন করিলে তাহা যদি বিধান সভায় গৃহীত না হয় তবে বিলটি সরাসরি রাজ্যপালের বা রাজপ্রমুখের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইবে। অর্থ বিল ছাড়া অন্য বিলকে উচ্চতন কক্ষ চারি মাস ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। চারি মাস পর নিম্নতন কক্ষ যেভাবে বিলটিকে পাশ করিতে চায় সেইভাবে বিলটি রাজ্যপালের বা রাজপ্রমুখের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1 Describe the composition and functions of the Legislatures in Part A and Part B States (২৮১-২৮২ পৃষ্ঠা দেখ।)

2 What are the different stages through which a bill must pass in a State Legislature (২৮৪-২৮৫ পৃষ্ঠা দেখ)

অষ্টম অধ্যায়

'গ' বিভাগের রাজ্য, 'ঘ' বিভাগের অঞ্চল, তপশীলভুক্ত এলাকা এবং উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা

'গ' অংশভুক্ত রাজ্যসমূহ (Part C States) ঃ

'গ' বিভাগের রাজ্যসমূহ হইতেছে ঃ (১) আজমীর, (২) ভূপাল (৩) হিমাচল প্রদেশ (৪) বিলাসপুর, (৫) কুর্গ, (৬) বিন্ধ্যপ্রদেশ (৭) দিল্লী, (৮) মণিপুর, (৯) ত্রিপুরা ও (১০) কচ্ছ ইহাদের শাসনভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত আছে। রাষ্ট্রপতি এই সকল রাজ্যের শাসনকার্য একজন উপ-রাজ্যপাল (Lieutenant Governor) বা চীফ কমিশনার অথবা কোন প্রতিবেশী রাজ্যের সরকারের মারফৎ নির্বাহ করিবেন। শেষের ব্যবস্থাটি করিতে হইলে প্রতিবেশী রাজ্য-সরকারের মতামত লইতে হইবে। উপ-রাজ্যপাল বা চীফ কমিশনারের দ্বারা শাসিত রাজ্যে পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন করিয়া সম্পূর্ণ মনোনীত বা কতক মনোনীত ও কতক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া বিধানমণ্ডল অথবা পরামর্শ পরিষদ গঠন করিতে পারা যাইবে।

'গ' বিভাগের রাজ্যশাসন রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত

বিলাসপুর, মণিপুর, ত্রিপুরা, ও কচ্ছ ব্যতীত অন্যান্য 'গ' অংশভুক্ত রাজ্যে বিধানমণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা 'ক' ও 'খ' অংশভুক্ত রাজ্যের বিধানমণ্ডলের ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম। ঐ সকল রাজ্যে উপ-রাজ্যপাল বা চীফ কমিশনারকে সাহায্য করিবার জন্য 'ক' ও 'খ' অংশভুক্ত রাজ্যের মন্ত্রিসভার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতা-বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

বিধানমণ্ডল ও মন্ত্রিসভা

'ঘ' বিভাগের অঞ্চলসমূহ (Part D Territories):

বর্তমানে কেবলমাত্র আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জই 'ঘ' অংশভুক্ত অঞ্চল বা রাজ্যখণ্ড বলিয়া অভিহিত। এইরূপ অঞ্চলের শাসনকার্য চীফ কমিশনের বা অনুরূপ কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন ব্যক্তির মারফৎ রাষ্ট্রপতি পরিচালনা করিবেন।

এইরূপ অঞ্চলের শান্তি এবং সুশাসনের জন্য রাষ্ট্রপতি বিধি-নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারেন এবং এরূপ যে-কোন বিধি নিয়ম পার্লামেণ্ট-কৃত কোন আইন বা কোন প্রচলিত আইনকে বাতিল বা সংশোধন করিতে পারে।

তপশীলভুক্ত এলাকাসমূহ (Scheduled Areas):

কোন 'ক' বা 'খ' বিভাগের রাজ্যগুলির শাসন ক্ষমতা উক্ত রাজ্যের অন্তর্বর্তী তপশীলভুক্ত এলাকাগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ প্রতি বৎসর, বা রাষ্ট্রপতি যখন চাহিবেন তখনই, তপশীলভুক্ত এলাকাগুলির শাসনকার্য-পরিচালনা সম্বন্ধে একটি বিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিবেন। তপশীলভুক্ত এলাকা বিশিষ্ট রাজ্যে অনধিক ২০ জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি উপজাতি উপদেষ্টা সভা (Tribes Advisory Council) থাকিবে—ঐ সমস্ত সভ্যের তিন চতুর্থাংশ রাজ্যের বিধান সভায় তপশীলভুক্ত উপজাতিসমূহের প্রতিনিধি হওয়া চাই।

রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ নির্দেশ দিতে পারেন যে পার্লামেণ্টের বা রাজ্য বিধানমণ্ডলের কোন একটি আইন তাঁহার শাসনাধীন তপশীলভুক্ত এলাকা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে না, বা তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট পরিবর্তন সহ প্রযোজ্য হইবে। তপশীলভুক্ত কোন এলাকার শান্তি এবং সুশাসনের জন্য তিনি বিধি-নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারেন। এই সমস্ত বিধি-নিয়ম পার্লামেণ্টের বা রাজ্যের বিধানমণ্ডলের আইন বাতিল বা সংশোধিত করিয়া দিতে পারে। এইরূপ সমস্ত বিধি-নিয়মই রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে, এবং তিনি সম্মতি না দিলে এগুলি বৈধ হইবে না।

তপশীলভুক্ত অঞ্চল সম্বন্ধে রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখের ক্ষমতা

উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা (Tribal Areas):

উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি বলিতে আসামের কয়েকটি উপজাতি এলাকাকেই বুঝায়। উন্নতির পরিমাণ অনুসারে এই অঞ্চলগুলিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—'ক' অংশভুক্ত এলাকাগুলি (যেমন, গারো পর্বত জেলা, লুসাই

পর্বত এলাকা প্রভৃতি) 'খ' অংশভুক্ত এলাকাগুলি (যেমন, আবর পর্বত এলাকা এবং মিশমি পর্বত এলাকা প্রভৃতি) অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী প্রগতি-সম্পন্ন। এই দুই শ্রেণীর এলাকাগুলির শাসনকার্য পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালিত হইবে।

'ক' অংশভুক্ত এলাকাগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন জেলা লইয়া গঠিত; তবে কোন স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন জেলায় যদি তপশীলভুক্ত বিভিন্ন উপজাতি বাস করে তাহা হইলে তাহাদের অধ্যুষিত এলাকা বা এলাকাগুলিকে আসামের রাজ্যপাল কয়েকটি স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন অঞ্চলে ভাগ করিয়া দিতে পারেন। স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন জেলা এবং অঞ্চলগুলির শাসনকার্য যথাক্রমে জেলা পরিষদ (District Councils) এবং আঞ্চলিক পরিষদগুলির দ্বারাই পরিচালিত হইবে। আসামের রাজ্যপালের সাধারণ পরিদর্শন, নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণের অধীনে জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদগুলি উহাদের অন্তর্বর্তী এলাকাগুলিতে শাসনকার্য-পরিচালনা সংক্রান্ত, আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধীয়, বিচার সম্বন্ধীয় এবং অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

উপজাতি এলাকার শাসনে রাজ্যপালের কর্তৃত্ব

'খ' অংশভুক্ত উপজাতি অঞ্চলগুলির শাসনকার্য রাষ্ট্রপতি, আসামের রাজ্যপালকে তাঁহার কার্যনির্বাহক করিয়া, তাঁহার মারফৎ পরিচালিত করিবেন। আসামের রাজ্যপাল কোন কোন বিষয়ে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে (discretion) কাজ করিবেন এবং এই বিশেষ কার্যনির্বাহের ব্যাপারে মন্ত্রিসভার উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন না।

প্রশ্নোত্তর

1. How are Part C States governed to-day? (২৮৬ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Mention some of the special provisions for the administration of Scheduled Areas and Tribal Areas. (২৮৭-২৮৮ পৃষ্ঠা দেখ)

নবম অধ্যায়

সংবিধানের বিবিধ বিধান

নির্বাচন ঃ

প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাত্রই (আইনতঃ দোষী বা অযোগ্য না হইলে) ভোট-দানেব অধিকারী। পূর্বপ্রচলিত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা রহিত করা হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটদাতাগণ সম্মিলিত ভাবে ভোট দিবেন। তবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোন কোন শ্রেণীর সুবিধার জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা সংবিধান চালু হইবার (২৬শে জানুয়াবী, ১৯৫০) পর দশ বৎসর মাত্র বলবৎ থাকিবে। ভারত ধর্মনিবপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে কোন সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ অধিকার নাই, সকলেরই সমান অধিকার। জাতির ঐক্য এবং শক্তি এই ব্যবস্থাব উপব নির্ভর কবে।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের সেবা করিয়া যাঁহারা খ্যাতিমান হইয়াছেন তাঁহাদেব পবামর্শ ও উপদেশ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় তাঁহারা ঝামেলার ভয়ে নির্বাচনে দাঁড়াইতে চাহেন না। এই শ্রেণীব লোককে মনোনয়ন দ্বারা পার্লামেন্টে ও রাজ্যের বিধান-মণ্ডলে আনয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নির্বাচন কমিশন

ভারতের বিধানমণ্ডলগুলিতে এবং রাষ্ট্রপতি ও সহ-রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণের ভার একটি নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) উপর ন্যস্ত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সমেত নির্বাচন কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। নির্বাচন কমিশনের অধীনে কার্য করিবার জন্য কয়েকজন আঞ্চলিক কমিশনারও রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিতে পারেন।

সরকারী ভাষা ([illegible] Language) ঃ

[illegible] রূপে হিন্দী। তবে, সংবিধান চালু [illegible] ইংরাজীই ইউনিয়নের রাষ্ট্রভাষা রূপে

চালু থাকিবে, অবশ্য রাষ্ট্রপতি এই সময়ের মধ্যে ইংরাজী ছাড়াও হিন্দীর ব্যবহার বলবৎ করিতে পারেন। ১৫ বৎসরের পরেও ইংরাজী রাখা যাইতে পারিবে, অবশ্য পার্লামেণ্ট যদি এই মর্মে কোন আইন প্রণয়ন করে।

বর্তমানে ইংরাজী ও ভবিষ্যতে হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা

কোন রাজ্য একটি বা দুইটি আঞ্চলিক ভাষাকে উহার রাজ্যভাষা রূপে রাখিতে পারিবে। তবে যতদিন পর্যন্ত কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল উহার রাজ্যভাষা সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়ন না করে ততদিন ইংরাজীই উহার রাজ্যভাষা রূপে চালু থাকিবে। কোন রাজ্যকে উহার রাজ্যভাষা সম্পর্কে নির্দেশ দিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে।

ইউনিয়নের রাষ্ট্রভাষাই এক রাজ্য এবং অন্য রাজ্যের মধ্যে অথবা কোন একটি রাজ্য এবং ইউনিয়নের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের ভাষা হইবে।

পার্লামেণ্ট অন্য কোন বিধান না দেওয়া পর্যন্ত [illegible] ধর্মাধিকরণে এবং সমস্ত আইন বা বিল প্রভৃতির [illegible] ব্যবহার্য ভাষা হইবে ইংরাজী। কোন রাজ্যের রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ, রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতি অনুসারে, উক্ত রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণে [illegible] জন্য (কিন্তু রায়, ডিক্রী বা হুকুমনামার জন্য নহে) সেই রাজ্যের রাজ্যভাষার ব্যবহার বলবৎ করিতে পারেন।

সংবিধানের পরি[illegible] [illegible]endm[illegible] [illegible]titution)ঃ

সংবিধানের পরিবর্তন, ঐ [illegible] যে কোন কক্ষে উপস্থাপিত বিলের দ্বারাই সুরু করা যায়। [illegible] কোন বিল প্রতি কক্ষে ঐ কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের [illegible] এবং [illegible] কক্ষে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সভ্যগণের দুই তৃতীয়াংশ কর্তৃক [illegible] অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাহার নিকট উপস্থাপিত করিতে [illegible] তাহার সম্মতিদানের পর বিলের মর্ম অনুযায়ী সংবিধান সংশোধিত আকার ধারণ করে।

তবে বিলটি যদি সংবিধান নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ বিধান সম্পর্কে (যেমন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ইউনিয়ন এবং অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের শাসন-ক্ষমতার বিস্তৃতি, বিচার-বিভাগ, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত তালিকা প্রভৃতি) কোন পরিবর্তন সাধন করিতে চায়, তাহা হইলে 'ক' এবং 'খ' বিভাগের রাজ্যগুলির অন্যূন অর্ধসংখ্যকের বিধানসভাগুলি কর্তৃক উক্ত বিলটিকে অনুমোদিত করাইতে হইবে।

শাসনতন্ত্রের কতকগুলি বিধান, শাসনতন্ত্র (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৫১ [Constitution (First Amendment) Act, 1951] দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আয় ব্যয় (Revenue and Expenditure of Union and State Governments) :

কেন্দ্রীয় সরকারের আয় চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) কর হইতে প্রাপ্ত আয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন কোন কর কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ, আদায় ও ব্যয় করে। কোন কোন কর কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ ও আদায় করে কিন্তু রাজ্য সরকারগুলিকে প্রদান করে। কোন কোন কর কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ ও আদায় করিবার পর উহা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হয় (যেমন, আয়কর)। কোন কোন কর কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ ও আদায় করিবার পর উহা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হইতে পারে। (২) করের উপর অতিরিক্ত কর (surcharge on duties and taxes) হইতে প্রাপ্ত আয়। (৩) রেলওয়ে, পোস্ট অফিস প্রভৃতি হইতে আয়। (৪) অন্যান্য বিবিধ সূত্রে প্রাপ্ত আয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় দুই ভাগে বিভক্ত : (১) Capital Expenditure—যে ব্যয় একবার করিলেই চলে প্রতি বৎসর করিতে হয় না। (২) Revenue Expenditure—যে ব্যয় প্রতি বৎসর করিতে হয়।

রাজ্য সরকারের আয় দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) কর হইতে প্রাপ্ত আয়। কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি কর নির্ধারণ ও আদায় করিয়া রাজ্য সরকারগুলিকে প্রদান করে, কতকগুলি কর নির্ধারণ ও আদায় করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করে, আবার কতকগুলি কর নির্ধারণ ও আদায় করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিতে পারে। ইহা ছাড়া রাজ্য সরকার নিজেই নানাপ্রকার কর নির্ধারণ ও আদায় করিতে পারে। (২) কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাপ্ত সাহায্য। ইহা ছাড়া আসাম, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা পাটশুল্কের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সাহায্য পাইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের ন্যায় রাজ্য সরকারের ব্যয়ও দুই ভাগে বিভক্ত : Capital Expenditure এবং Revenue Expenditure।

দশম অধ্যায়

বিচার বিভাগ (The Judiciary)

প্রধান ধর্মাধিকরণ (Supreme Court):

ভারতের বিচার বিভাগের শীর্ষদেশে রহিয়াছে প্রধান ধর্মাধিকরণ (Supreme Court)।

বিচারকের নিয়োগ ও যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত মুখ্য বিচারপতি এবং অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া এই প্রধান ধর্মাধিকরণটি গঠিত। সকল বিচারপতিই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কর্মে বহাল থাকিবেন। মুখ্য বিচারপতি ছাড়া অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্ত করার সময় রাষ্ট্রপতি মুখ্য বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। কেহ যদি (১) ভারতের নাগরিক হন এবং (২) পূর্বে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাল কোন মহাধর্মাধিকরণের (High Court) বিচারপতি রূপে বা অন্ততঃ দশ বৎসর কাল কোন মহাধর্মাধিকরণের ব্যবহারিক (Advocate) রূপে কাজ করিয়া থাকেন, অথবা (৩) রাষ্ট্রপতির মতে একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ (Eminent Jurist) বলিয়া গণ্য হন, তাহা হইলে তিনি প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

বিচারকের পদচ্যুতি

কোন বিচারপতির প্রমাণিত অসদাচরণ (Misbehaviour) বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ যদি অভিযোগ করিয়া আবেদন করেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি সেই বিচারপতিকে ৬৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই পদচ্যুত করিতে পারেন। প্রধান ধর্মাধিকরণে যিনি একবার বিচারপতির কাজ করিয়াছেন তিনি ভারতের কোন ধর্মাধিকরণে আর ওকালতি বা অন্য কোন কাজ করিতে পারিবেন না। প্রধান বিচারপতি মাসিক ৫০০০৲ টাকা বেতন পাইবেন, অন্যান্য বিচারপতিগণ পাইবেন মাসিক ৪০০০৲ টাকা।

প্রধান ধর্মাধিকরণের কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) মৌলিক বিভাগ, (২) আপীল বিভাগ ও (৩) পরামর্শদান বিভাগ।

১। **মৌলিক বিভাগ (Original Jurisdiction):** ভারত

সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির পরস্পরের মধ্যে যদি বিবাদ বাধে তবে তাহার বিচার প্রধান ধর্মাধিকরণে হইবে। ভারত সরকারের সহিত পূর্বতন ভারতীয় রাজ্যগুলির সন্ধিসর্ত, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি, সনদ এবং অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজের ব্যাপারে প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচার ক্ষমতা নাই।

ক্ষমতা

২। আপীল বিভাগ (Appellate Jurisdiction): ভারতের যে কোন মহাধর্মাধিকরণের (High Court) ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিষয়ক রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপীল করা চলিবে, যদি ঐ মহাধর্মাধিকরণ এই মর্মে সার্টিফিকেট দেন যে এই ব্যাপারের সহিত বর্তমান শাসনতন্ত্রেব কোন ধারার ব্যাখ্যার প্রশ্ন জড়িত আছে। মহাধর্মাধিকরণ এইরূপ সার্টিফিকেট না দিলেও প্রধান ধর্মাধিকরণ ঐ আপীল করার জন্য বিশেষ অনুমতি (Special Leave) দান করিতে পারেন।

মহাধর্মাধিকরণের রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণে দেওয়ানী মামলার আপীল চলিবে, যদি মামলায় অন্যূন ২০,০০০ টাকার দাবীদাওয়া উত্থাপিত হইয়া থাকে। ফৌজদারী মামলায় যদি মহাধর্মাধিকরণ নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল করিয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল চলিবে।

৩। পরামর্শদান বিভাগ (Advisory Jurisdiction): রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন হইলে আইন সংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধান ধর্মাধিকরণের মতামত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Federal Court) যে সকল ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিত প্রধান ধর্মাধিকরণ সে সকল ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিবে। প্রধান ধর্মাধিকরণের রায় অন্যান্য সমস্ত ধর্মাধিকরণ মানিয়া লইতে বাধ্য। পূর্বে ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলই (Privy Council) ছিল ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ আদালত। এখন স্বাধীন ভারতের উপর প্রিভি কাউন্সিলের কোন ক্ষমতা নাই। প্রধান ধর্মাধিকরণই এখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী সর্ববিধ মামলার বিচারের জন্য সর্বোচ্চ আদালত।

ভারতের যে কোন নাগরিক বা অধিবাসী তাহার মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) রক্ষার জন্য প্রধান ধর্মাধিকরণের শরণাপন্ন হইতে পারিবে। জরুরী অবস্থা (Emergency) উপস্থিত হইলে রাষ্ট্রপতি সাময়িক ভাবে এই অধিকার প্রয়োগ বন্ধ করিতে পারেন।

মহাধর্মাধিকরণ (High Court) ঃ

'ক' ও 'খ' বিভাগের প্রত্যেক রাজ্যে একটি মহাধর্মাধিকরণ আছে। ঐ রাজ্যের এলাকার জন্য উহাই দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য সর্বোচ্চ আদালত। অবশ্য সংবিধানে নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে মহাধর্মাধিকরণের রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপীল করা যাইতে পারে।

মহাধর্মাধিকরণে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলার শুনানী হয়। জেলা ও নিম্ন আদালত হইতে আপীল মহাধর্মাধিকরণে গৃহীত হয়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ মহাধর্মাধিকরণে বড় বড় মামলার মৌলিক শুনানীও হয়।

মহাধর্মাধিকরণে থাকিবেন একজন প্রধান বিচারপতি এবং একাধিক সাধারণ বিচারপতি। রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত রাষ্ট্রের মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিদিগকে নিযুক্ত করিবেন। কোন মহাধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যাপারে উক্ত মহাধর্মাধিকবণের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। যদি কেহ (১) ভারতের নাগরিক হন এবং (২) অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়া ভারতে কোন বিচারালয়ে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, অথবা অন্যূন দশ বৎসর ধরিয়া কোন এক মহাধর্মাধিকরণে ব্যবহারিক (Advocate) রূপে কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি হইতে পারিবেন।

পদত্যাগ না করিলে বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পূর্বেই অপসারিত না হইলে কোন মহাধর্মাধিকরণের যে-কোন বিচারপতিই ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। প্রমাণিত অসদাচরণ (misbehaviour) এবং অযোগ্যতার জন্য যে-কোন মহাধর্মাধিকরণের যে-কোন বিচারপতিকেই রাষ্ট্রপতি অপসারিত করিতে পারেন, অবশ্য যদি এই মর্মে পার্লামেণ্টে নির্দিষ্ট সংখ্যাধিক্যে সমর্থিত কোন আবেদন তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করা হয়। সংবিধান চালু হইবার পর হইতে যাঁহারা মহাধর্মাধিকরণগুলির বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের কেহই অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগের পর ভারতের কোন ধর্মাধিকরণে ব্যবহারজীবী রূপে ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। মহাধর্মাধিকরণগুলি রাজ্য সরকারসমূহের দ্বারাই পোষিত হইয়া থাকে।

আপীল বা আবেদন শোনা ছাড়াও মহাধর্মাধিকরণগুলির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ

ক্ষমতা এবং কাজ আছে। আঞ্চলিক সমস্ত দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালত-গুলির কার্যাবলীর তাহারাই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। কোন মহাধর্মাধিকরণ যদি বুঝিতে পারে যে নিম্ন আদালতের কোন একটি মামলার সহিত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন গুরুত্বপূর্ণ আইনঘটিত প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত মহাধর্মাধিকরণ ঐ মামলাটি নিম্ন আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজেই উহার মীমাংসা করিতে পারে।

হাইকোর্টের বিভিন্ন ক্ষমতা

দেওয়ানী আদালত বা ন্যায়াধিকরণ (Civil Court) :

ছোটখাট দেওয়ানী মামলার শুনানীর ভার পড়ে গ্রাম্য পঞ্চায়েত সভার আদালতের উপর। কোন কোন রাজ্যে ইহাকে Union Court বলে। ইহাই সর্বনিম্ন দেওয়ানী আদালত।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে ছোটখাট দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য ছোট আদালত (Small Causes Court) আছে।

মফঃস্বল অঞ্চলে জেলা এবং মহকুমা শহরে ও চৌকীতে মুন্‌সেফী আদালত আছে। মুন্‌সেফী আদালতের উপরে আছে সাব-জজের আদালত। মুন্‌সেফদের রায়ের বিরুদ্ধে সাব-জজ আপীল শুনেন। খুব বেশী টাকা মূল্যের দেওয়ানী মামলার মৌলিক শুনানী সাব-জজের আদালতে হয়। মুন্‌সেফের ও সাব-জজের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য জেলা সদরে আছে জেলা আদালত। জেলা বিচারপতি (District Judge) সমগ্র জেলার বিচারকার্য তত্ত্বাবধান করেন।

ফৌজদারী আদালত বা দণ্ডাধিকরণ (Criminal Court) :

গ্রামাঞ্চলে ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার থাকে ইউনিয়ন বেঞ্চের উপর। ফৌজদারী আদালতগুলির মধ্যে ইহাই সর্বনিম্নে অবস্থিত।

শহরাঞ্চলের ছোটখাট ফৌজদারী মামলা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণ (Honorary Magistrate) বিচার করেন। অপেক্ষাকৃত গুরুতর মামলা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা-বিশিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করেন। প্রেসিডেন্সী শহরে তথাকার স্থানীয় ফৌজদারী মামলা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুরশাসক বিচার করেন।

জেলাগুলিতে সর্বাপেক্ষা গুরুতর মামলাগুলির শুনানী প্রথম শ্রেণীর বিচারকগণ গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা অভিযুক্তদিগকে দায়রায় সোপর্দ করিতে পারেন। দায়রার মামলার শুনানী জেলা ও দায়রা জজ গ্রহণ করেন এবং জুরীর সাহায্যে অভিযুক্তের বিচার পরিচালনা করেন।

দায়রা জজ এবং প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুরশাসকের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল মহাধর্মাধিকরণ কর্তৃক গ্রাহ্য হইতে পারে। প্রেসিডেন্সী শহরে তথাকার স্থানীয় কোনও গুরুতর মামলায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুরশাসক অভিযুক্তকে মহাধর্মাধিকরণে দায়রায় সোপর্দ করিতে পারেন। কোনও গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে মহাধর্মাধিকরণের রায়ের বিরুদ্ধে ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপীল করা চলে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the constitution, and the scope of the jurisdiction, of the Supreme Court of India to-day. (C. U., 1952). (২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Describe briefly the functions of the Supreme Court of India. (C. U., 1953). (২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠা দেখ)

একাদশ অধ্যায়

জেলার শাসন-পদ্ধতি

ভুক্তিপতি (Divisional Commissioner):

প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি ভুক্তিতে বা বিভাগে (Division) বিভক্ত; প্রত্যেকটি বিভাগ একজন ভুক্তিপতির কর্তৃত্বাধীন। ভুক্তিপতি সাধারণতঃ ভারতীয় জনপালন কৃত্যকের একজন প্রবীণ সভ্য। তাঁহাকে প্রধানতঃ রাজস্ব পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা শাসকের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করাও তাঁহার কর্তব্য। রাজ্য সরকার ও জেলা শাসকের মধ্যে ভুক্তিপতি যোগসূত্র। মাদ্রাজ রাজ্যে ভুক্তি নামক বিভাগ নাই, ভুক্তিপতি নামক কর্মচারীও নাই। অন্যান্য রাজ্যেও এই কর্মচারীর পদ বিলোপ করা উচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর :

প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। জেলা ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রাণ-কেন্দ্র। জেলা শাসন-ব্যবস্থার পুরোভাগে জেলা শাসক বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর (District Magistrate and Collector) অবস্থিত। আসাম প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে জেলা-শাসক "উপ-ভুক্তিপতি" রূপে পরিচিত। তিনি সাধারণতঃ ভারতীয় জনপালন-কৃত্যক-ভুক্ত। প্রাদেশিক জনপালন কৃত্যকের প্রবীণ সভ্যদিগকে কোন কোন সময় জেলা শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জেলা-শাসকের নানাবিধ ক্ষমতা ও দায়িত্ব

জেলা-শাসক একাধারে দুইটি পদের অধিকারী। তিনি জেলার রাজস্ব সংগ্রাহক বা কালেক্টর এবং তিনি জেলার শাসক বা ম্যাজিস্ট্রেট। এই দুই পদকে একত্র করিয়া তাঁহাকে জেলা অফিসার আখ্যা দেওয়া হয়।

সংগ্রাহক রূপে তিনি জেলায় রাজস্ব সংগ্রহের কার্য পরিচালনা করেন। তিনি ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর সংগ্রহ করেন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্যাদিও তিনি সংগ্রহ করেন। জেলার রাজকোষ তিনি পরিচালনা করেন। কৃষি ঋণ এবং দুর্ভিক্ষ সাহায্য তিনি পরিচালনা করিয়া থাকেন। সরকারী জমিজমা এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ (Court of Wards) তিনি পরিচালনা করেন। শাসক রূপে তিনি জেলায় সরকারের প্রধান প্রতিনিধি ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। জেলার মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাঁহার কর্তব্য। আরক্ষার কার্য অর্থাৎ পুলিশের কাজ তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। জেলার আরক্ষাধ্যক্ষ (Police Superintendent) তাঁহার পরিচালনাধীনে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী বিচারের তত্ত্বাবধান করেন। পুলিশের কর্তা হিসাবে তিনি আসামীকে বিচারের জন্য পাঠান। আবার বিচারক রূপে তিনি ফৌজদারী অপরাধের বিচার করেন এবং ফৌজদারী মামলায় নিম্নতন বিচারালয় হইতে আপীল শোনেন।

শাসন বিভাগ (Executive) ও বিচার বিভাগের (Judiciary) কাজ একই লোকের হাতে থাকা অবাঞ্ছনীয়। শাসকের হাতে বিচারের ভার থাকিলে অবিচার হওয়ারই সম্ভাবনা। এই কারণে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা চলিতেছে। ভারতের সংবিধানে এই বিষয়ে নির্দেশ রহিয়াছে।

জেলা-শাসকের আরও বহুবিধ কর্তব্য রহিয়াছে। জেলাস্থ বিভিন্ন সরকারী বিভাগের উপর তিনি সাধারণভাবে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক (School Inspector), সরকারী শস্ত্রচিকিৎসক (Civil Surgeon) এবং নির্বাহী বাস্তুকারের (Executive Engineer) কার্যের তিনি তত্ত্বাবধান করেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য প্রদান, চাউল, কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণ (Ration) এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ তাঁহার দায়িত্বাধীন। জেলা বোর্ড, পঞ্চায়েত সভা প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর তিনি নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা পরিচালন করেন।

জেলা-শাসক সরকারের "চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্ত"

জেলা-শাসক দেশশাসন-ব্যবস্থায় মুখ্য স্থান অধিকার করেন। জেলার শাসন পরিচালনার তিনি কেন্দ্রস্বরূপ। জেলা শাসনের প্রত্যেকটি অঙ্গের সহিত তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাঁহার কৌশল, বিচারবুদ্ধি ও দক্ষতার উপর সরকারের সম্মান ও সাফল্য নির্ভর করে। তাঁহাকে সরকারের "চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্ত" বলা হয়। তিনি সর্বদাই সফরে বাহির হন এবং নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসেন। তিনি জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া সবকারের নিকট বিবরণী দাখিল করেন। সেই বিবরণী অনুসারেই দেশ শাসিত হয়। কোথায় কতখানি বৃষ্টিপাত হইল, অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ হইবে কিনা, চাষীরা চাষ ছাড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হইতেছে কিনা, চুরিডাকাতি বাড়িয়াছে কিনা, স্থানীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের হালচাল কিরূপ, রাজদ্রোহমূলক কাজ কেহ করিতেছে কিনা, ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁহাকে ওয়াকিবহাল থাকিতে হয় ও সরকারের নিকট বিবরণী পাঠাইতে হয়। তাঁহাকে সর্বদা জেলার প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতে হয় এবং জেলার জীবনের বিভিন্ন দিকের সহিত গভীর সংস্পর্শ রাখিতে হয়। তাঁহার সুলেখক ও সুবক্তা হওয়া উচিত। বহুবিধ সভায় সভাপতিত্ব করা, বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ করা প্রভৃতি তাঁহার দৈনন্দিন কর্তব্য। যে সকল সামাজিক উৎসবাদিতে তিনি নিমন্ত্রিত হন সে সকল স্থানে জনপ্রিয় হওয়ার মত ক্ষমতা তাঁহার থাকা প্রয়োজন। একাধারে প্রায় সকল কর্তব্যই তিনি পালন করেন এবং জেলা শাসন-ব্যবস্থার সমগ্র দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত।

জেলা-শাসক একাধারে শাসক এবং বিচারক। শাসকের হস্তে বিচার-ক্ষমতা থাকিলে তাহা নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষে হানিকর হইতে পারে। এইজন্যই ভারতের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে

যে শাসন-ক্ষমতা ও বিচার-ক্ষমতা পৃথক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকা উচিত। এই নির্দেশ অনুসারে জেলা-শাসকের বিচার-ক্ষমতার বিলোপ হওয়া উচিত।

মহকুমা বা উপ-বিভাগঃ

প্রত্যেকটি জেলা কয়েকটি মহকুমায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি মহকুমায় একজন করিয়া মহকুমা-শাসক (Sub-Divisional Officer) আছেন। ভারতীয় জনপালন কৃত্যকের নবীন সভ্য অথবা রাজ্যের জনপালন কৃত্যকের প্রবীণ সভ্যদের মধ্য হইতে এই কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। মহকুমার এলাকায় জেলা-শাসকের অনুরূপ সর্ববিধ কার্যভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। জেলা-শাসক মহকুমা-শাসকের কার্যের তত্ত্বাবধান করেন।

প্রত্যেক মহকুমা কয়েকটি থানায় বিভক্ত। থানার কর্মকর্তৃগণ থানার এলাকায় শান্তিরক্ষা করেন।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by the saying that the District Officer is the pivot of Indian administration? (C. U., 1937). (২৯৭-২৯৯ পৃষ্ঠা দেখ)

2. "The District administration in India constitutes an essential part of the Government." Show how the administration of a district in British India is carried on. (C. U., 1943). (২৯৭-২৯৯ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Give an idea of how district administration is carried on in Bengal or Assam. (C. U., 1948). (২৯৭-২৯৯ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Describe the system of administration in a West Bengal district, with special reference to the position of the District Officer in it. (C. U., 1951). (২৯৭-২৯৯ পৃষ্ঠা দেখ)

দ্বাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্র কৃত্যক

শাসনসংক্রান্ত সকল কার্য পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রভৃত্যদের লইয়া রাষ্ট্র কৃত্যক গঠিত। পূর্বে ভারত-সচিব, ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ রাষ্ট্র কৃত্যকের বিভিন্ন বিভাগে লোক নিয়োগ করিতেন। বর্তমানে নিয়োগের ভার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের উপর।

রাষ্ট্র কৃত্যক দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত; একটি জনপালন কৃত্যক এবং অপরটি সমর কৃত্যক।

জনপালন কৃত্যক (Civil Services):

জনপালন কৃত্যককে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা চলে: (১) নিখিল ভারত কৃত্যক (All-India Services), (২) কেন্দ্রীয় কৃত্যক (Central Services), (৩) রাজ্য কৃত্যক (State Services)।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখের পূর্ব পর্যন্ত নিখিল ভারত কৃত্যক সাম্রাজ্য কৃত্যক (Imperial Services) রূপে পরিচিত ছিল। (১) ভারতীয় জনপালন কৃত্যক (Indian Civil Service), (২) ভারতীয় আরক্ষা কৃত্যক (Indian Police Service), (৩) ভারতীয় চিকিৎসা কৃত্যক (Indian Medical Service)—এই তিনটি নিখিল ভারতীয় কৃত্যকের সভ্যগণ ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। এই তিনটি নিখিল ভারতীয় কৃত্যকের সভ্যবৃন্দের বহু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল এবং এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের (Govt. of India Act, 1935) দ্বারা সংরক্ষিত ছিল।

ইংরাজ-শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই নিখিল ভারত কৃত্যকসমূহের সমস্ত ইউরোপীয় সভ্যই কার্যতঃ স্বেচ্ছায় পেন্সন লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ভারতীয় সভ্যগণ নূতন সরকারেরই সেবা করিতে থাকিলেন। ইংরাজ-শাসনের সময় তাঁহারা যে সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রেও তাঁহাদের জন্য সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষিত রহিল। তবে বর্তমানে পূর্বতন ভারতীয় জনপালন কৃত্যক অবলুপ্ত হইয়াছে এবং তৎস্থলে

একটি নূতন নিখিল ভারত কৃত্যকের উদ্ভব হইয়াছে—ভারতীয় শাসন-পরিচালন কৃত্যক (Indian Administrative Service)। ভারতীয় আরক্ষা কৃত্যক (Indian Police Service) এখনও আছে। ভারতীয় চিকিৎসা কৃত্যক পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

ইউনিয়ন রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের (Union Public Service Commission) সুপারিশ অনুসারে ইউনিয়ন সরকার ভারতীয় শাসন-পরিচালন কৃত্যকে এবং ভারতীয় আরক্ষা কৃত্যকে লোক নিয়োগ করেন। নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ এবং চাকুরীর সর্তাদি পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সমস্ত কৃত্যকের সভ্যগণ হয় ইউনিয়ন সরকারকে, না হয় ভারতের যে কোন অংশে অবস্থিত কোন রাজ্য সরকারকে, সেবা করিতে বাধ্য থাকিবেন। যদিও ইউনিয়ন সরকারই নিখিল ভারত কৃত্যকগুলির চরম নিয়ন্ত্রক, তথাপি যখন ইহার কোন সভ্য কোন রাজ্য সরকারের সেবায় নিযুক্ত থাকেন তখন সাধারণতঃ তিনি উক্ত রাজ্যের সরকারেরই নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখের পূর্ব পর্যন্ত কতকগুলি কেন্দ্রীয় কৃত্যক (Central Services) ছিল (যেমন, ভারতীয় হিসাবপরীক্ষা কৃত্যক, ভারতীয় শুল্ক কৃত্যক, ইত্যাদি)। এই সকল কৃত্যক এখনও আছে। বর্তমানে ইউনিয়ন সরকারই এই সমস্ত কৃত্যকে ইউনিয়ন রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী লোক নিয়োগ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় কৃত্যকসমূহে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ এবং চাকুরীর সর্তাবলী পার্লামেণ্টকেই আইনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। যতদিন না এরূপ কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় ততদিন রাষ্ট্রপতি বা তন্নির্দেশিত কোন ব্যক্তিই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার অধিকারী থাকিবেন। এই সমস্ত কৃত্যকের সভ্যগণ ভারতের যে কোন অংশে ইউনিয়ন সরকারের সেবা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

স্বাধীনতা লাভের পর নবপ্রবর্তিত ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যকের (Indian Foreign Service) সভ্যগণ পৃথিবীর যে কোন অংশেই ভারত সরকারের সেবা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

রাজ্য-শাসন পরিচালনার সর্বোচ্চ পদগুলি নিখিল ভারত কৃত্যকসমূহের সভ্যগণ কর্তৃক পূরণ করা হইয়া থাকে। তাঁহাদের নিচে থাকেন রাজ্য কৃত্যকগুলির (State Services) সভ্যগণ। রাজ্য কৃষি কৃত্যক, রাজ্য আরক্ষা কৃত্যক, রাজ্য শিক্ষা কৃত্যক ইত্যাদি রাজ্য কৃত্যক আছে। রাজ্য কৃত্যকগুলি

দুই প্রকারের—(১) উচ্চতন রাজ্য কৃত্যক এবং (২) নিম্নতন রাজ্য কৃত্যক। গতানুগতিক কাজ লইয়া যে সমস্ত কর্মচারী ব্যাপৃত থাকেন তাঁহাদের লইয়াই নিম্নতন কৃত্যকগুলি গঠিত। রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা রাজ্য কৃত্যকগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ এবং চাকুরীর সর্তাবলী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। যতদিন পর্যন্ত না এরূপ আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হয় ততদিন প্রদেশপাল বা রাজপ্রমুখ বা তন্নির্দেশিত কোন ব্যক্তিই যথাযথ ব্যবস্থা করিতে পারেন। রাজ্য কৃত্যকের সমস্ত কর্মচারীর চাকুরীর মেয়াদ রাজ্যপালের বা রাজপ্রমুখের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

সমর কৃত্যক (Military Service) ঃ

যুক্তরাষ্ট্র সরকার সমর কৃত্যকগুলিতে লোক নিয়োগ করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্ট সমর কৃত্যকসমূহে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ এবং চাকুরীর সর্তাবলী নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদ (Public Service Commissions) ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি এবং প্রত্যেক 'ক' এবং 'খ' বিভাগের রাজ্যের জন্য একটি করিয়া রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদ আছে। তবে, দুই বা ততোধিক রাজ্য সম্মত থাকিলে তাহাদের জন্য একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদ থাকিতে পারে। কোন রাষ্ট্রের প্রদেশপাল বা রাজপ্রমুখ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে ইউনিয়ন রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া উক্ত রাষ্ট্রের সমস্ত বা কোন একটি প্রয়োজন সাধন করিতে পারে। ইউনিয়ন রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদ এবং সংযুক্ত রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের সভাপতি এবং অন্যান্য সভ্যগণকে নিযুক্ত করিবেন রাষ্ট্রপতি, এবং কোন রাজ্যের রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের সভাপতি এবং অন্যান্য সভ্যগণকে নিযুক্ত করিবেন উক্ত রাজ্যের রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ। নিয়োগের পূর্বে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের সভ্যগণের অর্ধেকের কাছাকাছি সভ্য এমন হইবেন যাঁহারা অন্ততঃ দশ বৎসর কাল কোন রাষ্ট্র কৃত্যকের সভ্য ছিলেন। রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের সভ্যের চাকুরীর মেয়াদকাল হইবে ছয় বৎসর। কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য-নিয়োগ পরিষদের সভ্যের বয়স ৬৫ বৎসর হয়, অথবা প্রাদেশিক রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ

রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের গঠন—রাষ্ট্রপতির নিয়োগ-ক্ষমতা

সভ্যের বয়স ৬০ বৎসর হয় তাহা হইলে ছয় বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই অবসর গ্রহণ করিবেন।

বিভিন্ন কৃত্যকে নিয়োগের জন্য পরীক্ষাদি পরিচালনার কর্তব্যভার রাষ্ট্রভৃত্য-যোগ পরিষদগুলির উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। জনপালন কৃত্যকসমূহে এবং সামরিক পদগুলিতে নিয়োগ ব্যাপারে লোক সংগ্রহ পদ্ধতি, নিয়োগ নীতি, তি ও বদলী, প্রার্থিগণের যোগ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা-ক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার, মামলা-মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ-র্থনের ব্যয় সম্পর্কিত দাবী বা ক্ষতিপূরণ বাবদ ন্সন মঞ্জুরী প্রভৃতি সকল বিষয়েই রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদগুলির পরামর্শ গ্রহণ তে হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ র প্রয়োজন হইবে না, এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ নিজ জ ক্ষেত্রে বিধান দিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের কর্তব্য ও গুরুত্ব

রাষ্ট্রভৃত্যগণের নিয়োগ, বদলী বা শাস্তি যাহাতে রাজনৈতিক বা দলগত ভিসন্ধির দ্বারা প্রভাবিত না হয়, তাহার জন্যই এই সমস্ত পরিষদ প্রতিষ্ঠিত য়াছে। রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের ন্যায় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান সরকারী র্মচারীদের নিয়োগ করিলে দুর্নীতি, উৎকোচ ও সুপারিশের বলে কেহ চাকুরী াইবে না, এবং চাকরীতে উন্নতি করিতে পারিবে না। ইহার ফলে রাষ্ট্রভৃত্যগণের [illegible] এবং নৈতিক বল অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য, রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদগুলি নিয়োগের জন্য কেবল সুপারিশই করিয়া থাকে—তাহাদের এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করার অধিকার বিভিন্ন সরকারের আছে,—তবে, সরকার যথেচ্ছভাবে কাজ করিতে পারে না। কোন সরকার কোন বিষয়ে রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগ পরিষদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে তাহা সংশ্লিষ্ট বিধানমণ্ডলকে জানাইতে হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Write short notes on: The Civil Services in India. (C. U., 1936) (৩০০-৩০২ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Write short notes on: Public Service Commission. (C. U., 1933, [illegible] 1948). (৩০২-৩০৩ পৃষ্ঠা দেখ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (Local Self-Government)

বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান :

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুই শ্রেণীতে মোটামুটি ভাগ করা চলে : (১) গ্রাম্য (Rural), (২) পৌর (Urban)। ভারতবর্ষে গ্রাম্য জীবন পৌর বা নাগরিক জীবন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; সেইজন্য এই দুই ধরণের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। পল্লী এলাকায় শাসন পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন বোর্ড আছে। তাহাদের এলাকা একটি গ্রাম কিংবা পরস্পরসংলগ্ন কতকগুলি গ্রাম ব্যাপিয়া বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় তালুক বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ড রহিয়াছে। তাহাদের এলাকা মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত। জেলা বোর্ডের ক্ষমতার এলাকা একটি জেলার সমগ্র পল্লী অঞ্চলে সহর বা নগর অঞ্চলসমূহের শাসনের জন্য প্রেসিডেন্সী সহরগুলিতে কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সহর ও নগরগুলিতে পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি রহিয়াছে। যে সমস্ত এলাকায় সৈন্য মোতায়েন আছে সেই সমস্ত এলাকার জন্য ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড বা সেনানিবাস সংঘ রহিয়াছে। প্রেসিডেন্সী সহরগুলিতে নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান বা ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট ও বন্দরগুলিতে বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান বা পোর্ট ট্রাষ্ট আছে।

স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী বিভাগ : (১) গ্রাম্য, (২) পৌর

গ্রাম পঞ্চায়েত (Village Panchayets) :

ভারতে প্রাচীন কাল হইতে গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল। ব্রিটিশ শাসন ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নষ্ট করে। ১৯০৮ সালে "বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন" ইহার পুনঃপ্রবর্তন সুপারিশ করে। এই সুপারিশ অনুসারে পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে গ্রাম্য পঞ্চায়েত আইন প্রবর্তিত হয়। স্থানীয় জনকল্যাণ ব্যবস্থা, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার মীমাংসা ও বিচার ইত্যাদি কাজের ভার গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত আইন

...রতের শাসনতন্ত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে ...য়াছে: "রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের ...রূপ ক্ষমতা সমর্পণ করিবে যেন তাহারা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক ...রূপে কার্য করিতে পারে।" উত্তর প্রদেশে ব্যাপক ভাবে "গাঁও সভা" ... হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে ৫০০ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হ। ...দের শিক্ষার ব্যবস্থা, পথঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, স্বাস্থ্যোন্নতির ..., কৃষির উন্নতি প্রভৃতি কাযের ভার ইহাদের উপর অর্পণ করা হইবে। ... সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়িক (Co-operative) কৃষির ... জন্য গ্রাম উৎপাদন পরিষদ (Village Production Council) ... করার প্রস্তাব আছে। যে গ্রামে পঞ্চায়েত আছে সেখানে গ্রাম উৎপাদন ...পঞ্চায়েতের একটি সাব-কমিটি হইবে।

...নিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েত সভা (Union Boards):

গঠন (Composition): ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন ...নুসারে ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েত সভা এক বা একাধিক গ্রামের স্থানীয় কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া থাকে। পঞ্চায়েত সভার সভ্য-সংখ্যা ৬ হইতে ৯এর মধ্যে নির্দিষ্ট। প্রথমে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। বর্তমানে সকলেই নির্বাচিত হন। চারি বৎসর কালের জন্য সভ্যগণ নির্বাচিত ও মনোনীত হন; ইহার পর নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে বোর্ডের একজন প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি নির্বাচন করেন। তিনিই মুখ্য কার্য নির্বাহক (Chief Executive) রূপে বোর্ডের কার্য পরিচালনা করেন। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচিত হয় না। ২১ বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যাহারা ৬ আনা হারে ইউনিয়ন কর অথবা ৮ আনা হারে সেস দিয়া থাকে, অথবা যাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা আছে, কেবলমাত্র তাহারাই ভোট দিতে অধিকারী। সুতরাং ভোটাধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সরকারী সার্কেল অফিসার বোর্ডের তত্ত্বাবধান করেন। উপর হইতে অতিরিক্ত সরকারী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয় বলিয়া এবং ভোটের সীমাবদ্ধতার দরুণ ইউনিয়ন বোর্ড জনসাধারণের [illegible] কোন উৎসাহ সৃষ্টি করে নাই।

পঞ্চায়েত অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের গঠন ও ক্ষমতা

২। **কার্য (Functions) :** ইউনিয়ন বোর্ডের বা পঞ্চায়েত কর্তব্য বহুবিধ। গ্রামে শান্তি রক্ষা ইহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এই চৌকিদার নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং তাহাদের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা আয় হইতে দিতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব এই বোর্ডের স্বয়ং অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে অথবা অর্থ দ্বারা করে। গ্রামের রাস্তা, পুল ইত্যাদি তৈয়ারী করা এবং রক্ষা করা সভার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কূপ খনন করিয়া ও নলকূপ বসাই সরবরাহের ব্যবস্থা করাও ইহার কার্য। ঔষধালয় মারফৎ অসুস্থ ব্যক্তিদের সাহা ইহার অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, পানীয় জল নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা, জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব, মেলা প্রভৃতির এবং গো-মড়ক ও মহামারীর প্রতিষেধ ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করা সভার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু জেলা বোর্ড কর্তৃক হস্তান্তরিত দায়িত্ব পঞ্চায়েত সভার উপর অর্পিত হইতে পারে। কতকগুলি অপরাধের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সভার বিচার-ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। ছোটখাট ও ফৌজদারী মামলা পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত সভার সভ্যগণ "ইউনিয়ন ও "ইউনিয়ন বেঞ্চ" নামক বিচারালয় গঠন করেন।

পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজ

৩। **আয় (Sources of Income) :** ইউনিয়ন বোর্ডের বা সভার আয় অত্যন্ত সামান্য। পঞ্চায়েত আয়ের উপায় তিনটি : (১) ইউনিয়ন কর, (২) এবং জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড (লোক্যাল বোর্ড) কর্তৃক প্রদত্ত সাহা (৩) বিবিধ আয়।

পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয়

আয়ের উপায়সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান "ইউনিয়ন [illegible] আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগের উপর এই কর হইতে সংগৃহী[illegible] "ইউনিয়ন কর" চৌকিদারী কর নামেও পরিচিত। গ্রা[illegible] বাড়ীর অধিকারী ও অধিবাসীদের উপর এই কর [illegible] এতদ্ব্যতীত সরকার ও জেলা বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দ সাহায[illegible] থাকে। পঞ্চায়েত সভা নিজের সমগ্র আয়ের শত[illegible] সরকারের নিকট হইতে এবং জেলা বোর্ড হইতে পায় [illegible] লাইসেন্স ফি ও জরিমানা বাবদ এবং বিবিধ উপায়ে পঞ্চা[illegible]

আয় হয়। ইউনিয়ন বেঞ্চ ও কোর্ট মধ্যে মধ্যে অপরাধীদের জরিমানা করে এবং সেই জরিমানা সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ পঞ্চায়েত সভার তহবিল বৃদ্ধি করে। খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্ত অর্থ বোর্ডের সমগ্র আয়ের শতকরা ২ ভাগ।

৪। **ব্যয় (Expenditure)ঃ** সভার সমগ্র আয় উপরোক্ত কর্তব্যসমূহ পালনের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্তু শান্তিরক্ষার জন্য চৌকিদার ও দফাদার পোষণ করিতেই সমগ্র আয়ের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় হয়; অর্থাৎ আয়ের অধিকাংশ শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যয়িত না হইয়া গ্রাম্য পুলিশ বা আরক্ষা পোষণের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। গ্রামের নিরাপত্তা রক্ষা একটি প্রাথমিক দায়িত্ব সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারী তহবিল হইতে ইহা বহন করা উচিত। বিদ্যালয়, ঔষধালয়, নর্দমার ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, পুল ও রাস্তা তৈয়ারী প্রভৃতি কার্যের জন্য শতকরা ২৬ ভাগ ব্যয় করা হয়। বাকী অংশ ইউনিয়ন বেঞ্চ, কোর্ট ও খেয়া ব্যবস্থার জন্য ব্যয়িত হয়।

স্থানীয় বোর্ড (Local Boards)ঃ

ইউনিয়ন বোর্ডের বা পঞ্চায়েত সভার উপরে স্থানীয় বোর্ড অবস্থিত। বিভিন্ন প্রদেশে ইহা তালুক বোর্ড, মহকুমা বোর্ড অথবা সার্কেল বোর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। স্থানীয় বোর্ডের ক্ষমতা মহকুমার মধ্যে নির্দিষ্ট থাকে। অন্যূন ছয়জন মনোনীত ও নির্বাচিত সভ্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সভ্য-সংখ্যা সরকার কর্তৃক ধার্য হয়। দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্বাচিত ও এক-তৃতীয়াংশ সভ্য মনোনীত হন। সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে সভ্যদিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত করা হয়।

স্থানীয় বোর্ড সাধারণতঃ জেলা বোর্ড কর্তৃক হস্তান্তরিত ক্ষমতাসমূহ পরিচালন করিয়া থাকে। ইহার কোনও স্বতন্ত্র আয়ের পথ নাই। জেলা বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দ অর্থের সাহায্যে ইহার কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থানীয় বোর্ড জেলা বোর্ডের মহকুমাস্থ শাখা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সমালোচকদের মতে পল্লী (Rural) স্বায়ত্ত শাসনের কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় বোর্ডের অবস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। স্থানীয় বোর্ডের কর্তব্যসমূহ সহজেই জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারে। সুতরাং ইহার অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্বে অবিভক্ত বাঙ্গালার সরকার স্থানীয় বোর্ড উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, স্থানীয় বোর্ডের যখন

কোনও স্বতন্ত্র দায়িত্ব ও আয় নাই তখন স্বায়ত্ত শাসন প্রথার সহিত ইহাকে যুক্ত রাখিয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এইজন্যই বর্তমানে কোন কোন রাজ্যে (যেমন, পশ্চিম বঙ্গে) স্থানীয় বোর্ড বিলুপ্ত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে একমাত্র দার্জিলিং জেলায় স্থানীয় বোর্ড (Local Board) রহিয়াছে, অন্য কোন জেলায় স্থানীয় বোর্ড নাই। দার্জিলিং জেলায়ও ইউনিয়ন বোর্ড নাই বলিয়াই লোক্যাল বোর্ড আছে।

জেলা বোর্ড (District Boards) ঃ

১। জেলা বোর্ডের গঠন (Composition) ঃ জেলার পল্লীঅঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক কার্যসমূহ নির্বাহ করার জন্য জেলা বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ক্ষমতার পরিধি সমগ্র জেলায় বিস্তৃত। বোর্ডের সভ্যগণ সকলেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সভ্যসংখ্যা অন্যূন ৯ হইবে, কিন্তু কার্যতঃ ১৮ হইতে ৩৩-এর মধ্যে ইহা নির্দিষ্ট থাকে। সদস্য-সংখ্যা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দেন। সভ্যগণ সাধারণতঃ স্থানীয় বোর্ড (Local Board) কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু যে সকল স্থানে স্থানীয় বোর্ড নাই সে সকল স্থানে ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে অবস্থিত গ্রামগুলির ভোটদাতাগণ জেলা বোর্ডের সভ্য নির্বাচন করে। সাধারণতঃ চার বৎসর কাল পর্যন্ত তাঁহারা সভ্যপদে বহাল থাকেন।

জেলা বোর্ডের গঠন

বোর্ডের সভাপতি ও সহ-সভাপতি সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। জেলা বোর্ড কার্য পরিচালনার জন্য কর্মসচিব (Secretary), বাস্তুকার (Engineer) ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারে। সভাপতি বোর্ডের **মুখ্য নির্বাহক** (**Chief Executive**)।

২। জেলা বোর্ডের কার্য (Functions) [illegible] কর্তব্য বহুবিধ। স্থানীয় যাতায়াত-ব্যবস্থা রক্ষা এবং সেই [illegible] পুল তৈয়ারী করা ও তাহাদের মজবুত অবস্থায় রাখা বোর্ডের [illegible] জেলা বোর্ড জেলার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যবস্থা করে এবং ডাক্তার[illegible] স্থাপনা ও পরিচালনা করে [illegible] ব্যবস্থা করে এবং সেই উদ্দে[illegible] প্রভৃতি খনন করে। ম্যা[illegible] এবং কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর বিরুদ্ধে প্র[illegible]

জেলা বোর্ডই জেলা স্বায়ত্ত শাসনের কেন্দ্রস্থল

গ্রহণ করা বোর্ডের অবশ্য কর্তব্য। প্রসূতিদের জন্য বোর্ড ধাত্রীর ব্যবস্থা করে। বোর্ড গো-মড়ক নিবারণ করে ও সেই উদ্দেশ্যে পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করে। শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করা জেলা বোর্ডের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বোর্ড প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং টোল ও মক্তব প্রভৃতিকে অর্থ সাহায্য দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে জেলা বোর্ড সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করে। খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা করা বোর্ডের অন্যতম কর্তব্য। বোর্ড হাট, ডাক বাংলো প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। বোর্ড ছোট রেলপথ (Light Railways) নির্মাণের জন্য রেল কোম্পানীকে অর্থ সাহায্য দিতে পারে।

৩। **জেলা বোর্ডের আয় (Income) ঃ** জেলা বোর্ডের আয় বিভিন্ন ভাবে সংগৃহীত হয়। আয়ের প্রধান উপায় হইল রোড-সেস বা পথকর। জমির খাজনার উপর 'টাকায় এক পয়সা' হিসাবে এই কর ধার্য হয়। খোঁয়াড় ও ফেরী ঘাট হইতে, রাস্তা এবং সেতু বাবদ শুল্ক হইতে এবং ফি ও জরিমানা হইতে বোর্ড কিছু আয় করে। ইহা ব্যতীত বোর্ড প্রাদেশিক সরকার হইতে বরাদ্দ অর্থ সাহায্য পায়। বোর্ড সরকারের অনুমতি অনুসারে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। যে স্থলে বোর্ড রেলপথ নির্মাণের অনুমতি দেয় সেস্থলে লাভের অংশ বোর্ড ভোগ করিয়া থাকে।

৪। **জেলা বোর্ডের ব্যয় (Expenditure) ঃ** জেলা বোর্ড সাধারণতঃ বিবিধ কর্তব্য পালনে ও কার্যালয় রক্ষণে তাহার আয় ব্যয় করিয়া থাকে। সমগ্র আয়ের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ বোর্ডের আফিস পরিচালনায় ব্যয়িত হয়। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয় হয়। বাস্তুকর্মের অর্থাৎ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণের (Public Works) জন্য ব্যয় হয় শতকরা ১৭ ভাগ, শিক্ষার জন্য শতকরা ১৪ ভাগ এবং জল সরবরাহ বাবদ শতকরা ৫ ভাগ। বাকী অংশ অন্যান্য কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়িত হয়।

পশ্চিম বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসংঘ (Municipality) ঃ

১। **পৌরসংঘের গঠন (Composition) ঃ** প্রতি শহরে একটি করিয়া পৌরসংঘ আছে। কলিকাতা পৌরসভা (কর্পোরেশন) ব্যতীত পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য পৌরসংঘগুলি ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে গঠিত ও পরিচালিত হয়। পৌরসংঘের সভ্যদের নাম কমিশনার বা

পৌরাধ্যক্ষ। সভ্যগণ সকলেই নির্বাচিত হন। পৌরাধ্যক্ষের সংখ্যা বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে বিভিন্ন রকম। পৌরসংঘের সভ্য-সংখ্যা ৯-এর কম বা ৩০-এর বেশী হইবে না। পৌরসংঘের আয়ুষ্কাল চার বৎসর, তবে সরকার ইচ্ছা করিলে আয়ুষ্কাল এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে পারেন।

পৌরসংঘের গঠন

পৌরসংঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতি পৌরাধ্যক্ষগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। পৌরাধ্যক্ষগণের নির্দেশাধীনে সভাপতি পৌরসংঘের সমুদয় কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। পৌরসংঘের বাৎসরিক আয় এক লক্ষের উপর হইলে একজন মুখ্য নির্বাহক (Executive Officer) নিযুক্ত করা যাইবে। কর্মসচিব (Secretary), বাস্তুকার (Engineer), স্বাস্থ্যাধিকারিক (Health Officer), স্বাস্থ্য পরিদর্শক (Sanitary Inspector) প্রভৃতি অন্যান্য আধিকারিক (Officer) নিযুক্ত করা যাইবে। পৌরসংঘের কার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কমিশনারগণ স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) নিযুক্ত করিতে পারেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতির পদ অবৈতনিক, কিন্তু কর্মচারিগণ বেতনভোগী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা শাসক (Magistrate) মারফৎ সরকার এখন পর্যন্ত পৌরসংঘের উপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বজায় রাখিয়াছে। কোনও প্রকার অব্যবস্থা, অপব্যবহার, কর্তব্যে ত্রুটি বা অর্থ অপহরণ ক্ষেত্রে সরকার পৌরসংঘ বাতিল করিতে পারে।

২। **পৌরসংঘের কর্তব্য (Functions):** পৌরসংঘের কর্তব্য বহুবিধ। নাগরিক জীবনের প্রায় সকল রকমের সুবিধার ব্যবস্থা পৌরসংঘকে করিতে হয়। রাস্তা ও রাজপথ নির্মাণ করা এবং রক্ষা করা; উহাদিগকে পরিষ্কার, জলসিঞ্চিত ও আলোকিত করা; স্কোয়ার, পার্ক, উদ্যান, ক্রীড়াভূমি নির্মাণ ও রক্ষা করা, অগ্ন্যুৎপাত বা বিপজ্জনক গৃহ হইতে নিরাপত্তা রক্ষা— এইগুলি পৌরসংঘের অন্যতম কর্তব্য। জনস্বাস্থ্য রক্ষা পৌরসংঘের একটি প্রধান কর্তব্য এবং সেই উদ্দেশ্যে টিকা দেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল নির্মাণ ও রক্ষা করা এবং মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইহার কার্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তি উন্নয়নও মিউনিসিপ্যালিটির একটি প্রাথমিক দায়িত্ব। সেবিকা (Nurse) ও ধাত্রী (Midwife) সরবরাহ এবং শিশুমঙ্গলের ব্যবস্থাও করা উচিত। জলাশয় রক্ষা ও নর্দমা পরিষ্কারের জন্য

পৌরসংঘের জনকল্যাণকর কর্মসমূহ

পৌরসংঘ কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। কূপ, পুষ্করিণী ও জলকলের সাহায্যে পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা পৌরসংঘের দায়িত্ব। জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব অর্থশালী পৌরসংঘগুলি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকে। বাজার, কসাইখানা, শ্মশানঘাট, গোরস্থান ইত্যাদির ভার পৌরসংঘ গ্রহণ করে এবং জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রাখে। ওজন ও মাপের নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য ও ঔষধ বিক্রয়ের নিয়ন্ত্রণ পৌরসংঘের কর্তব্যের তালিকাভুক্ত। শিক্ষা-ব্যবস্থা পৌরসংঘের আর একটি প্রধান কর্তব্য। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর প্রভৃতিকে অর্থসাহায্য করা পৌরসংঘের কর্তব্য।

৩। **পৌরসংঘের আয় (Income) :** নানা উপায়ে পৌরসংঘের আয় হয়। যথা : (১) বাড়ী ও জমি হইতে প্রাপ্ত আনুমানিক বাৎসরিক আয়ের উপর নির্ধারিত কর পৌরসংঘের আয়ের সর্বপ্রধান উপায়। তাহা ছাড়া জল সরবরাহ, রাস্তা আলোকিত করা ও ময়লা নিষ্কাশনের জন্য বাড়ী ও জমির উপর কর নির্দিষ্ট হয়। (২) জলকর, বিদ্যুৎকর এবং জলাশয় কর। (৩) চক্রযান, নৌকা এবং পশুর উপর নির্ধারিত কর। (৪) ব্যবসায়, পেশা, বৃত্তি এবং প্রমোদের উপর ধার্য কর। (৫) খেয়া ও পুলের উপর নির্ধারিত কর। (৬) বে-সরকারী বাজারের উপর স্থাপিত কর—এই সমস্ত বিভিন্ন সূত্র হইতে পৌরসংঘের অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। পৌরসংঘের সম্পত্তি এবং পৌরসংঘের উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু আয় হইয়া থাকে। নির্দিষ্ট কাজের জন্য সরকার হইতে সময় সময় পৌরসংঘকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া পৌরসংঘ জনসাধারণ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

৪। **পৌরসংঘের ব্যয় (Expenditure) :** এই সকল বিভিন্ন উপায়ে প্রাপ্ত অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় নিম্নলিখিত দফায় : (১) পৌরসংঘের আফিস পরিচালনা ; (২) মলমূত্র নিষ্কাশন ; (৩) রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জল সরবরাহ ইত্যাদি। হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, গ্রন্থাগার, শ্মশান, গোরস্থান প্রভৃতি বাবদেও পৌরসংঘ অর্থব্যয় করে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাবদ ব্যয় অতি সামান্য।

কলিকাতা কর্পোরেশন :

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতার মত মহানগরীর মিউনিসিপ্যালিটিকে কর্পোরেশন বলা হয়।

নূতন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের বিভিন্ন ব্যবস্থা ঃ

১। কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যান ঃ ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশন গঠিত ও পরিচালিত হয়। ৭৬ জন কাউন্সিলর ও ৫ জন অল্ডারম্যান লইয়া কর্পোরেশন গঠিত হইবে। ৭৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবেন। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে (Ex-officio) কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হইবেন। ৫ জন অল্ডারম্যান কাউন্সিলরগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানদের কার্যকাল ৩ বৎসর। বাড়ী ও বস্তির মালিক, কর্পোরেশনকে যাঁহারা রেট, ট্যাক্স ও লাইসেন্স ফি দেন, বস্তিতে বাস করিয়া যাঁহারা মাসিক অন্ততঃ চার টাকা ভাড়া দেন, অন্য বাড়ীর বাসিন্দা হিসাবে যাঁহারা মাসিক অন্ততঃ আট টাকা ভাড়া দেন, যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন,—এই সকল লোকের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহারা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে ভোটের অধিকারী হইবেন।

২। মেয়র ও ডেপুটি মেয়র ঃ বৎসরের প্রথম অধিবেশনে কর্পোরেশনের সভ্যগণের মধ্য হইতে এক বৎসরের জন্য একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইবেন। মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়র সভাপতি হইবেন।

৩। কমিশনার ঃ রাজ্য সরকার কর্পোরেশনের কমিশনারকে ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিবেন। ৫ বৎসর কর্মকাল উত্তীর্ণ হইলে কর্পোরেশন কমিশনারকে রাজ্য সরকারের অনুমতি লইয়া আর একবার ৫ বৎসরের জন্য নিয়োগ করিতে পারেন। কর্পোরেশনের সমগ্র পরিচালনা-ক্ষমতা কমিশনারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। কমিশনার কর্পোরেশনের সভ্য হইবেন না। তিনি কর্পোরেশনের সভায় অংশ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ভোট দিবেন না। কমিশনার কর্পোরেশনের সকল দলিলপত্র নিরাপদ ভাবে গচ্ছিত রাখিবার জন্য দায়ী থাকিবেন। কর্পোরেশনের কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকার যদি বাতিল না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করিতে কমিশনার বাধ্য থাকিবেন। কর্পোরেশন প্রস্তাব পাশ করিয়া নিজের ক্ষমতা কমিশনারের হাতে অর্পণ করিতে পারেন। জরুরী অবস্থায় কমিশনার কর্পোরেশনের বা স্থায়ী কমিটির অনুমতি না লইয়াই

কমিশনারের বিপুল ক্ষমতা

কোন কাজের নির্দেশ দিতে পারেন, অবশ্য যদি সেই কাজ করিতে গেলে ১০,০০০ টাকার বেশী খরচ না হয়। ১৯৫১ সালের আইনের দ্বারা কমিশনারকে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯৫৩ সালে এই ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কমিশনারের আইনসঙ্গত ক্ষমতায় কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধান ও কমিশনারের বিপুল কর্তৃত্ব—এই দুইটি বর্তমান আইনের বিশেষত্ব।

৪। **স্থায়ী কমিটি:** কলিকাতা কর্পোরেশন (১) শিক্ষা; (২) হিসাব; (৩) কর ও ফিনান্স, (৪) স্বাস্থ্য, (৫) শহর পরিকল্পনা ও উন্নতি; (৬) পূর্ত কার্য এবং (৭) গৃহ নির্মাণ, এই সকল বিষয়ে একটি করিয়া স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে। কোন সভ্যই একাধিক স্থায়ী কমিটির সভ্য হইতে পারিবেন না। স্থায়ী হিসাব কমিটির হাতে কাজের টাকা খরচের তদারক করা, কর্পোরেশনের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করা, হিসাব অডিট করা ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা থাকিবে।

৫। **এলাকা কমিটি (Borough Committee):** চার পাঁচটি ওয়ার্ড বা পল্লী লইয়া একটি করিয়া এলাকা (borough) গঠিত হইবে। এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের লইয়া একটি করিয়া এলাকা কমিটি গঠিত হইবে। এই ব্যবস্থাটি নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনের একটি বিশেষত্ব।

কর্পোরেশনের কার্য (Functions): কর্পোরেশনের দায়িত্বসমূহ প্রায় পৌরসংঘের অনুরূপ। ইহা রাস্তা, চত্বর (square), পার্ক, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষা করে। রাজপথসমূহ আলোকিত, আবর্জনামুক্ত ও জলসিঞ্চিত করা ইহার কর্তব্য। শোধিত পানীয় জল এবং অশোধিত জল সরবরাহ করা ইহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। নগরের নর্দমা-ব্যবস্থা কর্পোরেশনের কর্তৃত্বাধীন। জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কর্পোরেশন বাস্তনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিপজ্জনক গৃহগুলি বিনষ্ট করা হয়। ঔষধালয় এবং হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা করা, টিকা দেওয়া, নানাবিধ উপায়ে সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি নিবারণ করা কর্পোরেশনের অন্যতম কর্তব্য। জনস্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশন খাদ্য, ঔষধাদি এবং দুগ্ধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। বাজার এবং কসাইখানা কর্পোরেশনের রক্ষণাধীনে পরিচালিত হয়। পথঘাট রক্ষা করা কর্পোরেশনের আর একটি কর্তব্য। মৃতদেহের সংকার-ব্যবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ

এবং মৃত্যু ও জন্মের হিসাব রক্ষার ভার কর্পোরেশন গ্রহণ করে। অগ্ন্যুৎপাতের বিরুদ্ধে অগ্নিনির্বাণবাহিনী রক্ষার ব্যবস্থা ইহাব করিতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ইহার একটি মৌলিক কর্তব্য। সেইজন্য বহুসংখ্যক অবৈতনিক প্রাথমিক বিত্যালয় ইহার বক্ষণাধীনে পরিচালিত। কর্পোরেশনের রক্ষণাধীনে গ্রন্থাগারও আছে। কলিকাতা কর্পোরেশন জনসাধারণকে দেশীয় জিনিসপত্রের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া কুটির শিল্প বিকাশে সাহায্য করার জন্য একটি বাণিজ্যিক যাতুঘর (Commercial Museum) স্থাপন করিযাছে। উপসংহারে এই কথা বলা চলে যে কর্পোরেশনের আদর্শ হওয়া উচিত সু-নগবী প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থাৎ—যে নগর শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান এবং উন্নতমনা নাগরিকের বাসস্থান হইবে।

কর্পোরেশনের আয় (Income) ঃ অবিভক্ত বঙ্গে কলিকাতা কর্পোরেশনের মোট বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় আড়াই কোটি টাকা, অর্থাৎ ইহার আয় প্রায় সমগ্র আসাম প্রদেশের রাজস্বের সমান ছিল। ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে ইহার আনুমানিক আয় ৫,৯৩,১০,০০০৲ টাকা এবং আনুমানিক ব্যয় ৫,৯৯,৯৭,০০০৲ টাকা। নগরের জমির ও বাস্তর বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্য কর কর্পোরেশনের আয়ের সর্বপ্রধান অংশ। বর্তমান বাৎসরিক মূল্যের শতকরা ২০ টাকা হিসাবে ইহা ধার্য হয়। অধিকারী ও অধিবাসী, উভয়কে সমভাবে এই কর দিতে হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির উপর কর স্থাপন আয়ের আর একটি প্রধান উপায়। শকটাদির উপর নির্ধারিত কর হইতে কর্পোরেশনের রাজস্ব কিছুটা বৃদ্ধি পায়। বাজার ও নিজস্ব সম্পত্তি হইতে কর্পোরেশনের কিছু আয হয়। মোটরযানের উপর কর অধুনা রাজ্য সরকার কর্তৃক সংগৃহীত হয়। এই করের একাংশ রাজ্য সরকার নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট কর্পোরেশনকে প্রদান করে।

কর্পোরেশনের ব্যয় (Expenditure) ঃ এইরূপে সংগৃহীত আয় বিভিন্ন কর্তব্য পালনে কর্পোরেশন ব্যয় করিয়া থাকে। আয়ের একাংশ সংস্থা (Establishment) রক্ষার জন্য ব্যয়িত হয় ; অবশিষ্টাংশ "সু-নগরী" সৃষ্টির আদর্শ পরিপূরণের জন্য ব্যয়িত হয়।

সেনানিবাস সঙ্ঘ (Cantonment Board) ঃ

নগরস্থ সৈন্যাবাসের এলাকায সেনানিবাস সঙ্ঘ (Cantonment Board) থাকে। যে সমস্ত এলাকায় সৈন্যগণ বাস করে সে সমস্ত এলাকার শাসনকার্য এই সঙ্ঘ পরিচালনা করে। সঙ্ঘের সভ্যগণ সাধারণতঃ নির্বাচিত হন এবং

সঙ্ঘের সভাপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। সেনানিবাস সঙ্ঘসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা (Defence) দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট বা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান (Improvement Trust) :

বিশেষ দায়িত্বসহ আরও দুই প্রকারের স্থানীয় সংগঠন আছে। তাহারা Improvement Trust ও Port Trust নামে পরিচিত।

ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের কার্য (Functions) : সহরের স্বাস্থ্য ও বাস-ব্যবস্থার উন্নযনের জন্য কয়েকটি প্রধান নগরে ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট বা নগরোন্নতি বিধাযক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। প্রধান নগরগুলিতে সাধারণতঃ লোক-সংখ্যার চাপ অত্যধিক হয এবং বস্তিগুলি "মরণাগার" বিশেষ হইয়া উঠে। জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বস্তি এলাকা বাড়িতে থাকে ; ফলে মহামারী ও সংক্রামক রোগ দেখা দেয় এবং নগরের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। এইরূপ জনাধিক্যের ফলে মানুষের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়। বস্তি অঞ্চলগুলি পরিষ্কার করিয়া আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা করা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তব্য। নূতন বাসযোগ্য এলাকা সৃষ্টি করাও ইহার কর্তব্য। যথাযোগ্য উপায়ে নগর-জীবনের উন্নতিসাধন করাই এই ট্রাষ্টের লক্ষ্য। ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট বা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা না থাকিলে "সু-নগরী" সৃষ্টির আশা সুদূরপরাহত হইত।

কলিকাতা নগরোন্নতি প্রতিষ্ঠান (Calcutta Improvement Trust) :

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক ইহা সৃষ্ট হয়। এই ট্রাষ্টের কর্তব্য **উল্লিখিত কর্তব্যসমূহের** অনুরূপ। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সভাপতি সহ আরও **দশ জন সভ্য লইয়া** এই ট্রাষ্ট গঠিত। এই দশ জনের **মধ্যে চার জন** সরকার কর্তৃক নিযুক্ত, চার জন **কর্পোরেশন কর্তৃক** নির্বাচিত এবং দুই জন বিভিন্ন **বণিকসভার প্রতিনিধি** রূপে সভ্যপদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা কর্পোরেশন **কর্তৃক বরাদ্দ সাহায্য**, জনসাধারণ হইতে সংগৃহীত ঋণ এবং উন্নত জমির **বিক্রয়লব্ধ অর্থ** এই ট্রাষ্টের আয়ের প্রধান উপায়।

কলিকাতা ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের গঠন ও কর্তব্য

কানপুর, লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি নগরেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান

আছে। বোম্বাই ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট বা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

পোর্ট ট্রাষ্ট বা বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান (Port Trust) ঃ

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ভিজাগাপটম প্রভৃতি ভারতের প্রধান বন্দরগুলির কার্য পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণতঃ পোর্ট কমিশনার (বন্দরপাল) রূপে পরিচিত কয়েকজন কমিশনারের উপর ন্যস্ত হয়।

কলিকাতা বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান (Calcutta Port Trust) ঃ

কলিকাতা বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান ১৭ জন সভ্য লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে ১১ জন সভ্য বণিকসভা ও অন্যান্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত, একজন সভ্য কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্বাচিত এবং বাকী ৫ জন সভ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত। বন্দরপালগণের কর্তব্য বহুবিধ। তাঁহারা বন্দরের সর্ববিধ কার্য পরিচালনা করেন। পোতাশ্রয়, ডক এবং জেটি প্রভৃতি নির্মাণ ও মেরামত করা তাঁহাদের কর্তব্য। তাঁহারা গুদামঘর ও পণ্যাগার রক্ষা করেন। তাঁহারা ষ্টিমার যোগে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা করেন। বন্দরে আগত জাহাজগুলিকে পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করাও তাঁহাদের কর্তব্য। নদী আবর্জনামুক্ত রাখাও তাঁহাদের কর্তব্য। বন্দরের আয় ও ব্যয় স্বভাবতঃই তাঁহারা পরিচালনা করেন। জাহাজ চলাচল হইতে প্রাপ্য অর্থ এবং পণ্যাগার ও গুদামঘরের ভাড়া হইতে বন্দরের আয় সংগৃহীত হইয়া থাকে। কলিকাতা বন্দরের বাৎসরিক আয় প্রায় তিন কোটি টাকা।

বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত পোর্ট বা বন্দরগুলি এত সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতে পারিত না, এবং দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে ব্যাহত হইত।

ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের আংশিক ব্যর্থতার কারণ ঃ

ভারতবর্ষে গ্রাম এবং সহর উভয় স্থানেই স্থানীয় সংগঠনগুলি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে অসমর্থ হইয়াছে। কৃতকার্যতার যাহা ভিত্তি তাহা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অবর্তমান।

পৌরচেতনার অভাব এখানে পরিস্ফুট। শতকরা দশের নীচে যেখানে

শিক্ষার হার, "বিচক্ষণ নাগরিকতা" সেখানে কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। প্রাণবন্ত ও কর্মঠ করদাতার অস্তিত্ব ভারতে নিয়ম নয়—নিয়মের ব্যতিক্রম। উদাসীনতা ও আলস্য এখানকার করদাতাদের বৈশিষ্ট্য।

নাগরিক অঞ্চলসমূহে এবং গ্রামাঞ্চলেরও এক বিরাট অংশে করদাতাগণ স্ব স্ব দলের নির্দেশক্রমে ভোট দিয়া থাকে এবং ভোট দেওয়ার সময় স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তাহারা আদৌ চিন্তা করে না।

উপরন্তু, স্থানীয় সংগঠনগুলির উপর সরকারী হস্তক্ষেপ এখানে অত্যধিক। সরকারী নিয়ন্ত্রণ এখনও বজায় রাখা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ এখানে প্রায়শঃই অসাধুতা দোষে দুষ্ট। পদপ্রাপ্তি দক্ষতার উপর নির্ভর না করিয়া, অনেক সময় প্রভাব ও স্বজনপ্রীতির উপর নির্ভর করে। সভ্যগণ সময় সময় স্বার্থসাধনের জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিতে কুন্ঠিত হন না।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ

আয়ের বণ্টন-ব্যবস্থা যথাযথরূপে পরিচালিত না হওয়া আর একটি প্রধান ত্রুটি। ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েত সভাগুলির ক্ষেত্রে চৌকিদার ও দফাদার পোষণের জন্যই অর্ধেক আয় ব্যয়িত হয়। নাগরিক অঞ্চলে আয়ের এক বিরাট অংশ সংস্থা (Establishment) রক্ষণে ব্যয়িত হয় এবং জাতিগঠনের জন্য আয়ের একটি ক্ষীণ অংশ বরাদ্দ হয়।

এই অবস্থার জন্য অবশ্য আংশিক রূপে দায়ী অর্থাভাব। আয়ের পন্থা এখানে সঙ্কীর্ণ; তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান তাগিদ মিটাইতে ইহা অসমর্থ। উপরন্তু, নূতন কর সংস্থাপন অথবা পুরাতন কর বৃদ্ধির প্রতি জনসাধারণের বীতরাগ পরিস্ফুট। কর্তৃপক্ষও এ ধরণের কোনও পন্থা অবলম্বন করিয়া জনপ্রিয়তা হারাইতে নারাজ, কেননা আগামী নির্বাচনে ভোটদাতাগণ তাঁহাদের প্রতিকূল হইতে পারে।

ভারতের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির ব্যাহত গতির জন্য উপরোক্ত কারণগুলিই প্রধানতঃ দায়ী। এই অবস্থার আশু অবসান প্রয়োজন। স্থানীয় সংগঠনগুলির আর্থিক সংস্থানের উন্নতি করিতে হইবে। সেইজন্য সরকারী বরাদ্দ সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত এবং আয়ের অতিরিক্ত পন্থা উদ্ভাবন করা কর্তব্য। পৌরসংঘ কর্তৃক নূতন কর স্থাপনের প্রতি জনসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাবের অবসান হওয়া উচিত। সরকারী নিয়ন্ত্রণ যদি প্রত্যাহার করা

হয় তবে করদাতাগণ ইহা অনুভব করিবে যে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর কর স্থাপন করিতেছে; সে ক্ষেত্রে করের বোঝা তাহাদের নিকট লঘু মনে হইবে। স্থানীয় উন্নতির জন্য স্থানীয় অর্থভাণ্ডারের ভিত্তি শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা তাহাদিগকে উপলব্ধি করাইতে হইবে। শিক্ষা প্রসারের গতি দ্রুততর হওয়া প্রয়োজন। যাহাতে জনসাধারণ তাহাদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইতে পারে সেজন্য পৌর আদর্শের (civic ideals) বহুল প্রচার প্রয়োজন। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের আগ্রহ বাড়াইবার জন্য প্রচারকার্যের আবশ্যকতা আছে। আয়-বৃদ্ধির পথ হিসাবে পৌরসংঘের আয়প্রদ কার্যভার (যেমন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ট্রাম বা বাস চালানো, ইত্যাদি) গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্নোত্তর

Describe the constitution and functions of Union Boards in West Bengal. (C. U., 1953). (৩০৫-৩০৭ পৃষ্ঠা দেখ)

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থবিদ্যা

ও

ভারতীয় অর্থবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু

সাধারণভাবে বলিতে পারা যায়, আমরা সকলেই চাই যে পৃথিবীতে সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করুক; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই দারিদ্র্য, ব্যাধি, অজ্ঞতা প্রভৃতি অমঙ্গলজনিত দুঃখকষ্ট মানুষকে ঘিরিয়া আছে। মানুষকে সুখী করিতে হইলে এই সকল অমঙ্গলকে দূর করিতে হইবে; এবং এই উদ্দেশ্যে ইহাদের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং মানুষের জীবন ও সুখশান্তির উপর যাহা কিছুরই প্রভাব আছে আমাদের তাহারই পর্যালোচনা করিতে হইবে।

মানুষের জীবনের উপর অনেক কিছুরই প্রভাব আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি—যেমন, কোন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও জীববিজ্ঞান সমূহের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু প্রাকৃতিক ও জৈবিক কারণ ছাড়াও মানুষ যে ভাবে সমাজ-জীবন যাপন করে তাহাও অনেক ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ দুঃখকষ্টের কারণ হয়। সুতরাং মানুষের সমাজ-জীবন ও সমাজের সভ্য হিসাবে মানুষের কাজকর্ম বা আচরণ পর্যালোচনা করিতে হইবে। যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞানসমূহ ইহা করে তাহাদিগকে সামাজিক বিজ্ঞান (Social Sciences) বলা হয়। অর্থবিদ্যা হইল অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান।

অর্থবিদ্যা কাহাকে বলে? (What is Economics ?)

আমরা দেখিলাম যে অর্থবিদ্যা সমাজের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণ বা কাজকর্মের পর্যালোচনা করে। অবশ্য অর্থবিদ্যাবিদ মানুষের সকল প্রকার কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করেন না। যাহাদিগকে সাধারণ বা দৈনন্দিন কাজ-কর্ম বলা হয় মাত্র তাহাই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। এই সকল দৈনন্দিন কাজ-কর্ম হইল অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সম্পর্কিত।

অর্থবিদ্যা মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের পর্যালোচনা করে

মানুষ [illegible] উপায়ে অর্থোপার্জন করে। আমরা দেখিতে পাই যে সমাজে কেহ [illegible] কাজ করিতেছে, কেহ বা শিক্ষকতা করিতেছে, কেহ বা কৃষিকর্মে নিযুক্ত আছে ইত্যাদি। ইহাদের কাহারও কর্মের সহিত কাহারও কর্মের মিল নাই। একদিক দিয়া দেখিলে কিন্তু মিল আছে। এই সকল

কাজকর্মের প্রত্যেকটির দ্বারা মানুষ অর্থোপার্জন বা জীবিকার্জন করে। মানুষ চিকিৎসকই হউক আর শিক্ষকই হউক আর কৃষকই হউক, তাহাকে অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়ের কাজকর্মেই সারাদিন ব্যস্ত থাকিতে হয়। এই উপার্জন ও ব্যয়সংক্রান্ত কাজকর্মই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।

এই দৈনন্দিন কাজকর্ম হইল টাকাকড়ি সম্পর্কিত

কিন্তু অর্থবিদ্যাকে মানুষের উপার্জন ও ব্যয়সংক্রান্ত কাজকর্মের শাস্ত্র হিসাবে বর্ণনা করিলেই চলিবে না। অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট করিবার জন্য বিষয়টিকে আরও তলাইয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে যে মানুষ অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় করে কেন? মানুষ অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় করে জিনিসপত্র কিনিবার জন্য এবং জিনিসপত্র কেনে অভাবমোচন করিবার জন্য। সুতরাং তলাইয়া দেখিলে দেখা যায়, মানুষ প্রধানতঃ তাহার অভাব মোচন করিবার জন্যই কাজকর্ম করে। অর্থ বা টাকাকড়ি তাহার লক্ষ্য নহে; ইহাকে সে চায় কেবলমাত্র অভাব মোচনের উপায় হিসাবে।

মানুষের অভাবের পরিসীমা নাই, কিন্তু অভাব পরিতৃপ্তির জন্য দ্রব্যগুলি নিতান্ত অপ্রচুর। অবশ্য প্রকৃতি তাহার অফুরন্ত দানে মানুষের অনেক অভাব মোচন করে বটে; কিন্তু মাত্র প্রকৃতির দানে মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। আহার্য, পরিচ্ছদ প্রভৃতির মত মানুষের অভাব মোচনের উপায় হিসাবে অধিকাংশ দ্রব্যই পরিমাণে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। অভাব পরিতৃপ্তির উপায়ের এই অপ্রাচুর্য মানুষকে কাজকর্ম করিতে বাধ্য করে। মানুষ তাহার কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা অভাব মোচনের দ্রব্যগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে; এবং এই সকল দ্রব্য যত পারে নিজে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। উপরন্তু, মানুষের অভাব মোচনের দ্রব্য বা উপায়ের অনেকগুলি বিভিন্ন অভাব মোচন করিতে সক্ষম। কিন্তু পরিমাণে সীমাবদ্ধ বলিয়া এই সকল উপায়কে একসঙ্গে সকল অভাবমোচনের কাজে নিযুক্ত করা যায় না। সুতরাং মানুষ এই সকল উপায়কে এমন এমন অভাব মোচনের কাজে নিযুক্ত করে যাহাতে তাহার অভাববোধের তৃপ্তি সর্বাধিক হয়। অভাববোধের সর্বাধিক তৃপ্তিই তাহার লক্ষ্য। মানুষ যখন অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় করে তখন প্রকৃতপক্ষে সে তাহার অভাবমোচনের সীমাবদ্ধ উপায়গুলির পরিমাণ বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে নিযুক্ত করিয়া অভাববোধের সর্বাধিক তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করে। অতএব এখন অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়: যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞান মানুষের অপরিসীম অভাববোধের

সর্বাধিক পরিতৃপ্তির জন্য অভাবমোচনকারী সীমাবদ্ধ উপায়গুলির পরিমাণ-বৃদ্ধি ও ব্যবহার সম্পর্কিত মানুষের কাজকর্মের পর্যালোচনা করে, তাহাকেই অর্থবিদ্যা বলে।

অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা

অর্থবিদ্যার উপরোক্ত সংজ্ঞাটি সম্পর্কে তিনটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ, অর্থবিদ্যা তোমার আমার মত সাধারণ সমাজবদ্ধ লোকের কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে; সন্ন্যাসী, ফকির বা রবিনসন্ ক্রুসোর মত সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের কাজকর্ম ইহার আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা সমাজে বাস করি বলিয়া আমাদের অভাব, আমাদের আচরণ রবিনসন্ ক্রুসোর মত ব্যক্তির অভাব ও আচরণ হইতে পৃথক ও অনেক বেশী জটিল। সমাজে বাস করার জন্য মানুষকে অভাবমোচনের জন্য সমাজের অপর সকলের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়; অপরদিকে সে আবার সমাজের অপর সকলের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য লাভও করে। রবিনসন্ ক্রুসোর মত মানুষের বেলায় প্রতিযোগিতা বা সাহায্যের কোন প্রশ্নই নাই। ফলে রবিনসন্ ক্রুসোর মত মানুষের আচরণের পর্যালোচনা সামাজিক মানুষের সমস্যার উপর কোনরূপ আলোকসম্পাত করে না। যাহার সহিত সামাজিক সমস্যার কোন সংস্রব নাই তাহা কোন সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং সন্ন্যাসী, ফকির বা রবিনসন্ ক্রুসোর আচরণ অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

অর্থবিদ্যা অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের অভাব দূর করিবার জন্য যে কোন কাজ করা হয় তাহাই অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নহে। যে সকল কাজকর্মের সহিত টাকাকড়ির সম্পর্ক আছে মাত্র তাহারাই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। মাতার সেবা, পিতার স্নেহ, পরিবারের লোকদের যত্ন প্রভৃতি অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু নহে, কারণ ইহাদের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কবিহীন কাজকর্মকে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর বহির্ভূত করিয়া রাখার কারণ হইল যে এগুলির বেলায় কোনরূপ শৃঙ্খলিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু যে সকল কাজকর্মের সহিত টাকাকড়ির সম্পর্ক আছে তাহাদিগকে লইয়া আমরা শৃঙ্খলিতভাবে আলোচনা করিতে পারি। যে সকল প্রবৃত্তি বা প্রেরণা মানুষের টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত কাজকর্মের ভিত্তি তাহাদিগের শক্তি আমরা মোটামুটি ভাবে অর্থ দিয়া পরিমাপ করিতে পারি। যেমন, আমরা জানি যে কোন দ্রব্যের

টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কবিহীন কাজকর্ম অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর বহির্ভূত

জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা যতই তীব্র হইবে, দ্রব্যটির মূল্যও তত বেশী হইবে, অথবা, যে বৃত্তি বা ব্যবসায়ে অধিক উপার্জন হয় মানুষ তাহার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়; ইত্যাদি। কিন্তু যে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না, যাহা স্নেহ, মমতা বা কর্তব্যবশে করা হয় তাহার পশ্চাতে যে প্রেরণা কার্য করে তাহা পরিমাপ করিবার কোন উপায় নাই। যেমন, মাতা যখন সন্তানের প্রতি মমতাবশতঃ কোন কাজ করেন তখন আমরা বলিতে পারি না যে এই মমতার পরিমাণ কতটুকু। এইভাবে পরিমাপ করিবার উপায় নাই বলিয়া এই সকল কাজকর্মকে লইয়া শৃঙ্খলিতভাবে আলোচনা করিবারও উপায় নাই।

অর্থের সহিত সম্পর্কবিহীন কাজকর্মকে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর বহির্ভূত করিয়া রাখা সত্যই দুঃখের বিষয়, কারণ এই সকল কাজকর্মের মধ্যে কতকগুলি সমাজ-জীবনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু অর্থবিদ্যাবিদ উপায়ান্তরবিহীন। অধ্যাপক মার্শালকে অনুসরণ করিয়া বলিতে পারা যায় যে অনিচ্ছার কারণে নয়, অসম্ভব বলিয়াই এই সকল কাজকর্মকে অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত করিয়া রাখা হইয়াছে। যদি এই সকল কাজকর্মকে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া সম্ভব হইত তবে অর্থবিদ্যার উপযোগিতা বহুগুণে বাড়িয়া যাইত; কিন্তু তাহা সম্ভব নয় বলিয়াই ইহাকে অর্থসম্পর্কিত কাজকর্মের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

মনে রাখিবার তৃতীয় বিষয়টি হইল অভাবমোচনের উপায় হিসাবে অপ্রচুর দ্রব্য বা জিনিসগুলির সম্পর্কে। যে কোন দ্রব্য চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর তাহার মূল্য কমই হউক আর বেশীই হউক, অর্থবিদ্যায় তাহাকে 'সম্পদ' (wealth) আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থবিদ্যা এই অপ্রচুর দ্রব্যগুলি বা সম্পদ লইয়া আলোচনা করে বলিয়া এই শাস্ত্র সম্পর্কে অনেক সময় ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্পদ বা ধন বলিতে সাধারণ লোকে টাকাকড়িকে বুঝে। সেইজন্য অনেক সময় অর্থবিদ্যাকে নিছক টাকাকড়ির বিজ্ঞান বলিয়া মনে করা হইয়াছে। শুধু সাধারণ লোকে নয়, চিন্তাশীল লেখকগণও কয়েকক্ষেত্রে এই ভুল করিয়াছেন। ইংরাজ মনীষী কার্লাইল, রাস্‌কিন প্রভৃতি মনে করিতেন যে অর্থবিদ্যা শুধু ধনীদের সমস্যা লইয়া আলোচনা করে এবং এই কারণে ইহা মানুষকে স্বার্থপর ও অর্থলোলুপ করিয়া তুলে।

ইহা 'যখের শাস্ত্র' নহে

সুতরাং ইহা 'যখের শাস্ত্র'; ইহার আলোচনা করিলে সমাজের অকল্যাণ হইবে। এই ধারণা অবশ্য ভুল। অর্থবিদ্যায় মাত্র টাকাকড়িকেই সম্পদ আখ্যা দেওয়া হয় না; যাহাই মানুষের

অভাব দূর করিতে পারে এবং যাহারই যোগান অপ্রচুর, তাহাই সম্পদ। ধনীর ধনরত্ন যেমন সম্পদ, ভিখারীর ভিক্ষাপাত্রটিও তেমনি সম্পদ। অর্থবিদ্যা ধনরত্ন ও ভিক্ষাপাত্র উভয়কে লইয়াই আলোচনা করে, শুধু ধনরত্ন লইয়া নয়। ধনী-দরিদ্র সকলের সমস্যাই অর্থবিদ্যার আলোচ্য।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। অর্থবিদ্যা সম্পদ লইয়া আলোচনা করিলেও ইহার প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় হইল মানুষের দৈনন্দিন অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়সংক্রান্ত কাজকর্ম। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। ধরা যাউক যে কুইনাইনের অপেক্ষা অনেক অধিক ফলপ্রদ ও সুলভ কোন ম্যালেরিয়ার ঔষধের আবিষ্কার হইয়াছে। ফলে মানুষ কুইনাইন ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়াছে এবং কুইনাইনও আর উৎপাদিত হয় না। কুইনাইন বা সিঙ্কোনার গাছকে এখনও 'সম্পদ' বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে, কারণ ইহা এখনও ম্যালেরিয়া নিবারণে সক্ষম। কিন্তু মানুষ আর কুইনাইন উৎপাদন করিবার জন্য কাজকর্ম করে না বলিয়া অর্থবিদ্যাবিদের আর কুইনাইনের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তিনি এখন হইতে নূতন আবিষ্কৃত ঔষধটি লইয়াই আলোচনা করিবেন। কি উপায়ে ইহা আরও সুলভ ও কার্যকর হইতে পারে সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অর্থবিদ্যায় সম্পদ লইয়া ততদূরই আলোচনা করা হয় যতদূর ইহা মানুষের কাজকর্ম ও কল্যাণের সহিত সম্পর্কিত। এইভাবে তলাইয়া দেখিলে অর্থবিদ্যাকে টাকাকড়ির বিজ্ঞান না বলিয়া মানুষের কল্যাণের শাস্ত্র (Science of Welfare) বলিয়াই বর্ণনা করা উচিত।

অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা চলে কি? (Is Economics a Science ?)

অর্থবিদ্যা অন্যতম আধুনিক শাস্ত্র। যদিও বিশেষ আলোচনার ফলে এই শাস্ত্রের যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে তবুও ইহা পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন যেরূপ উন্নত হইয়াছে সে পর্যায়ে উপনীত হইতে পারে নাই। এই কারণে অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন যে অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা চলে না। অনেকের মতে আবার ইহা কখনই বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইতে পারিবে না। এইরূপ অভিমত সম্বন্ধে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জাগে—বিজ্ঞান কাহাকে বলে?

বিজ্ঞান হইল "কোন এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে শৃঙ্খলিত জ্ঞান"। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত; এবং ইহা বিষয়সমূহ বা ঘটনাবলী

নিয়ন্ত্রণকারী কতকগুলি বিধি বা নিয়মের প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে কোন শাস্ত্র বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইতে হইলে ইহার তিনটি অপরিহার্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকিতে হইবে।

বিজ্ঞানের অপরিহার্য লক্ষণ

(১) কোন বিজ্ঞান বিশেষ এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহকে লইয়া আলোচনা করে। অপরাপর শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহ বা ঘটনাবলী ইহার আলোচ্য বিষয় নহে। যেমন, জড় পদার্থ পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন উভয়ের বিষয়বস্তু হইলেও পদার্থবিদ্যার সম্পর্ক সেই সকল পদার্থের সহিত যাহাদের রূপান্তর ঘটে না এবং রসায়নের সম্পর্ক সেই সকল পদার্থের সহিত যাহাদের রূপান্তর ঘটে। অনুরূপভাবে অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই সামাজিক মানুষের কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করিলেও অর্থবিদ্যা মাত্র সেই সকল কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে যাহা অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়ের সহিত সম্পর্কিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের পরিধি অন্যান্য বিজ্ঞানের মতই সীমাবদ্ধ। সুতরাং বিজ্ঞানের তিনটি লক্ষণের প্রথমটি ইহার আছে।

১। পরিধির সীমাবদ্ধতা

(২) আলোচনা পদ্ধতি অনুসারে বিজ্ঞানসমূহ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—যথা, যেগুলি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা উভয় পদ্ধতিরই সাহায্য লয়; যেগুলি কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে এবং যেগুলি সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ বিজ্ঞান প্রথম শ্রেণীভুক্ত—অর্থাৎ, তাহারা উভয় পদ্ধতির সাহায্য লয়। জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির মত বিজ্ঞান দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত; তাহারা মাত্র পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। জ্যোতির্বিদ্যাবিদের পক্ষে সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতিকে লইয়া পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইল পদার্থবিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞানসমূহ—[illegible] প্রথমে সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিত, কিন্তু বর্তমানে [illegible] পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। অর্থবিদ্যা কোন্ পদ্ধতির উপর নি[illegible] অর্থবিদ্যার কারবার মানুষকে লইয়া। মানুষ জড় পদার্থ [illegible] ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব। এই কারণে অর্থবিদ্যাবিদের পক্ষে [illegible] মানুষকে পরীক্ষাগারে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করা সম্ভব নহে। [illegible] নিয়ম যাচাই করিতে গিয়া অর্থবিদ্যাবিদ কোনও জিনিসের [illegible] বা[illegible] বাড়াইতে পারেন না। ফলে অর্থবিদ্যাকে জ্যোতির্বিদ্যার [illegible] পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিতে হয়। অবশ্য পর্যবেক্ষণের উপর [illegible]ও

২। আলোচনা পদ্ধতি

অর্থবিদ্যা অবরোহ পদ্ধতির (Method of Deduction) সাহায্য লয়। অর্থবিদ্যাবিদ প্রথমে ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য পর্যবেক্ষণ করিয়া অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করেন এবং কার্যকারণ সম্বন্ধ দেখাইয়া কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন; পরে তিনি এই সকল সাধারণ সিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্য লইতে পারে না বলিয়া অর্থবিদ্যায় বিজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণটি সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয় না, তবে পর্যবেক্ষণ ও অবরোহ পদ্ধতির সাহায্য লয় বলিয়া অনেকাংশে উহা পরিলক্ষিত হয়।

বৈজ্ঞানিক সূত্র বা বিধি

(৩) প্রত্যেক বিজ্ঞানই ইহার আলোচ্য বিষয়সমূহ বা ঘটনাবলীর মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করে এবং তাহা হইতে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বা বিধির প্রতিষ্ঠা করে। এই সকল নিয়ম বা বিধি হইতে ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারা যায়। জ্যোতির্বিদ্যা কখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হইবে এবং তাহা কতক্ষণ থাকিবে তাহার সম্বন্ধে নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারে। অর্থবিদ্যারও কতকগুলি বিধি বা নিয়ম আছে। এই বিধিগুলি অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অর্থবিদ্যা মানুষ লইয়া কারবার করে বলিয়া ইহার বিধিগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের বিধির মত নিশ্চিত বিধি হইয়া উঠিতে পারে নাই; ইহাদের ব্যতিক্রম সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে অর্থবিদ্যার বিধিগুলি হইতে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করা সকল সময় সম্ভব হয় না। অর্থবিদ্যার বিধির এই অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ইহা সত্য যে যতক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক পবিবেশের পরিবর্তন না ঘটে ততক্ষণ এই বিধিগুলি অধিকাংশে ব্যতিক্রমবিহীনই থাকে; ফলে অর্থবিদ্যার বিধিগুলি হইতে সাধারণভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। এই দিক দিয়া অর্থবিদ্যা অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ বিজ্ঞান, কিন্তু পদার্থবিদ্যা বা জ্যোতির্বিদ্যার তুলনায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান। অতএব, বিজ্ঞানের তৃতীয় লক্ষণ অর্থাৎ ইহার কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি থাকিবে, অনেকাংশে অর্থবিদ্যায় পরিলক্ষিত হয়। উহা সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া আপত্তি উঠিলে বলা যায় যে বর্তমানে জীববিদ্যা বা আবহবিদ্যা যে স্তরে উন্নীত হইয়াছে তাহাতে ইহাদেরও বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

অর্থবিদ্যার বিধিগুলির প্রকৃতি

অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান, কিন্তু সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নহে

দেখা যাইতেছে যে বিজ্ঞানের তিনটি লক্ষণ দিয়াই বিচার করিলে অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান আখ্যা দিতে হইবে, যদিও ইহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নহে।

অর্থবিদ্যা আলোচনার লক্ষ্য ও গুরুত্ব (Aim and Importance of Economic Studies) :

মানুষ টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিভাবে কাজ করে অর্থবিদ্যা তাহা লইয়া আলোচনা করে। দেখা যায় আর্থিক ব্যাপারে মানুষ প্রায়ই স্বার্থপর বা বোকার মত কাজ করিয়া বসে। কাজেই অর্থবিদ্যায় যদি কতকগুলি স্বার্থপর ও লোভী মানুষ কিভাবে টাকাকড়ি উপার্জন করে, কেবল তাহারই আলোচনা হয়,—তবে এই শাস্ত্র চর্চার অযোগ্য। আমরা দেখিয়াছি যে, এইভাবে বিচারের ফলে, রাস্‌কিনের মত অনেক মনীষী অর্থবিদ্যার নিন্দা করিয়া ইহাকে 'যখের শাস্ত্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অর্থবিদ্যার কি কোন আদর্শ নাই ?

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে এই ধরণের সমালোচনা ভুল। মানুষ ও বিবিধ বস্তুকে ঠিক যে অবস্থায় দেখা যায় সেই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থবিদ্যাবিদ তাহাদের আলোচনা করে। কিন্তু তাই বলিয়া অর্থবিদ্যা কোন আদর্শেরই ধার ধারে না বলিলে ভুল হইবে। মানুষ চুরি করে কেন,—একজন নীতিবিদ এ প্রশ্নের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করিতে পারেন। ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তিনি চোরের কার্য অনুমোদন করেন? জাতি কিভাবে সমৃদ্ধ হইতে পারে, দারিদ্র্য কিভাবে দূর হইতে পারে, সারা ছুনিয়ায় ধন উৎপাদন এবং বণ্টন কিভাবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে,—তাহার আলোচনা করাই অর্থ[illegible] আদর্শ। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনয়নে সফল হইতে হ[illegible] কিভাবে এই পরিবর্তন ঘটিতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। [illegible] ঘটনাসমূহের বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রয়োজন। মানুষ কেন চু[illegible] জানিলে নীতিবিদ যেমন চুরি করার 'রোগ' সারাইতে পারেন [illegible] তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা অর্থবিদ্যার নিয়মগুলি ন[illegible] অর্থবিদ্যাবিদও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথ দেখাইতে পারেন না।

অতএব অর্থবিদ্যা একদিকে বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে [illegible]

হিসাবে ইহা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিবিধ নিয়ম ও গতির আলোচনা করে ; আর কলা হিসাবে ইহা আলোচনা করে—কিভাবে অর্থনৈতিক নিয়ম অনুসারে একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করা যায়। রাষ্ট্রনায়ক এবং নেতারাই জাতির জন্য অর্থনৈতিক কর্মসূচী স্থির করেন। এই কর্মসূচীকে কিভাবে কার্যে পরিণত করা যায় তাহা দেখাইয়া দেওয়াই অর্থবিদ্যাবিদের কর্তব্য। অর্থবিদ্যা-চর্চার নীতিগত এবং ব্যবহারিক গুরুত্ব দুই-ই রহিয়াছে।

অর্থবিদ্যা একাধারে বিজ্ঞান ও কলা

কোন কোন মহলে বস্তুগত সম্পদ ও সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করিয়া দেখা একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য একথা ঠিক যে কেবল অন্ন জুটিলেই মানুষ বাঁচিতে পারে না। কেবলমাত্র উদরপূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়ার সব-কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। তবু আমাদের জগতে উদরেরও একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা রহিয়াছে। বস্তুগত সমৃদ্ধিই যে আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল ভিত্তি, একথা অনস্বীকার্য। আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন, হরেক রকমের শাসনযন্ত্র, আমোদ-প্রমোদের রীতি, চিন্তা-পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্তই যুগে যুগে সেই আমলের ধন উৎপাদনের পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। ইতিহাসের প্রগতিকে বুঝিবার জন্যও তাই অর্থবিদ্যার আলোচনা প্রয়োজন।

অর্থবিদ্যা ইতিহাসের প্রগতি ব্যাখ্যা করে

অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত অর্থবিদ্যার সম্বন্ধ :

১। **অর্থবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান** (Sociology) : সামাজিক বিজ্ঞান-গুলির মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের পরিধিই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। ইহা সমাজকে সমগ্র-ভাবে আলোচনা করে। ইহা সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও অবনতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এবং সামাজিক ক্রমবিকাশ ও ক্রমাবনতির নিয়ম সম্বন্ধে গবেষণা করে। [illegible] অর্থবিদ্যা, মানুষের আচরণের যে অংশ [illegible] বা [illegible]র সঙ্গে সম্পর্কিত,—কেবলমাত্র সেই [illegible]চনা করে। অর্থবিদ্যার পরিধি [illegible]পরিধির চেয়ে সংকীর্ণতর। অর্থবিদ্যা মানুষের অর্থসম্পর্কিত আচরণের [illegible] করে। আর সমাজবিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে বহু যুগ ধরিয়া বিদ্যমান [illegible]আচরণের পর্যালোচনা করে।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা অর্থবিদ্যার পরিধি সংকীর্ণতর

[illegible] **ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Politics) :** অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে স[illegible]নিবিড়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যাবতীয়

কর্মপ্রচেষ্টার পর্যালোচনা করে। আর অর্থবিদ্যা রাষ্ট্রের কর্মপ্রচেষ্টার শুধু সেই অংশেরই আলোচনা করে, যে অংশ ধন উৎপাদন ও বণ্টনের সহিত সম্পর্কিত। আধুনিক কালে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যসমূহ বিশেষভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা এইভাবে পরস্পরের সহিত অনেকখানি মিশিয়া গিয়াছে।

৩। **অর্থবিদ্যা ও নীতিবিজ্ঞান (Ethics):** নীতিবিজ্ঞান মানুষের আচরণের ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করে। আর অর্থবিদ্যার কাজ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক আচরণের কার্যকারণ সম্পর্কে গবেষণা করা। অবশ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনিয়া উন্নততর অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টির জন্যই অর্থবিদ্যা মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে নীতিবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার সম্বন্ধ খুবই নিকট। পূর্বে অর্থবিদ্যাকে 'ধনের শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত করা হইত। তখন নীতিবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যাকে পরস্পরের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হইত। বর্তমানে উভয়ের নিকট সম্পর্ক অর্থবিদ্যাবিদরা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

৪। **অর্থবিদ্যা ও ইতিহাস:** অতীতে যুগের পর যুগ ধরিয়া মানবসমাজে যে ঘটনা-প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহারই আলোচনা করে। আর, বর্তমান সমাজে দৈনন্দিন কাজকর্মে মানুষের যে আচরণ প্রকাশ পায়, তাহাই মূলতঃ অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। কিন্তু বর্তমান অতীতেরই উত্তরাধিকারী। কাজেই ইতিহাসের জ্ঞান না থাকিলে অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানলাভ করা যায় না।

অর্থবিদ্যার বিভাগসমূহ (Divisions of Economics):

আলোচনার সুবিধার জন্য অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি।

(১) ভোগ বা ব্যবহার (Consumption): অর্থবিদ্যার চর্চা সুরু করিতে হয় ভোগ বা ব্যবহার হইতে। ভোগের জন্যই উৎপাদন। অর্থবি[illegible] মূলে আছে মানুষের অভাব। অভাব মোচনের জন্যই মানুষের [illegible] অর্থ[illegible] কর্মপ্রচেষ্টা, উৎপাদনের প্রয়াস। অভাব মোচন হয় ভো[illegible] দ্বারা। [illegible]রাং ভোগ হইতেই অর্থবিদ্যাচর্চার সুরু। অর্থবিদ্যার যে [illegible] ভোগ আখ্যা দেওয়া হয় সেই অংশে অভাবের প্রকৃতি, অভাবের শ্রেণী, [illegible]ের বিবিধ বিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

(২) উৎপাদন (Production): ভোগ করিতে হইলে চাই ভোগ্য সম্পদ। মানুষের শ্রমের দ্বারা প্রকৃতির দানকে কাজে লাগাইয়া এই সম্পদ সৃষ্টি করিতে হয়। সম্পদ সৃষ্টিকেই অর্থবিদ্যায় উৎপাদন আখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃতির দান (অর্থবিদ্যায় যাহাকে ভূমি বা Land বলে), শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন —এই চারিটি উপাদানের পরস্পরের সহযোগিতায় কি ভাবে সম্পদ সৃষ্টি হয়, অর্থবিদ্যার এই বিভাগে তাহাই আলোচিত হয়। উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্য হইল, কি করিলে উৎপাদন-দক্ষতা বাড়িতে পাবে তাহা নির্ণয় করা।

(৩) বিনিময় (Exchange): উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার পরই বিনিময় সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন হয়, কারণ বর্তমান যুগের সম্পদ-সৃষ্টি বা উৎপাদন-ব্যবস্থা শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিবিধ উৎপন্ন সম্পদের মধ্যে কি হারে বিনিময় হয়, বিনিময় সম্পর্কিত আলোচনায় তাহাই দেখান হয়। অর্থবিদ্যার এই অংশে সম্পদের মূল্য (value) এবং দাম (price) সম্পর্কিত সমস্যাগুলিরও আলোচনা করা হয়।

(৪) বণ্টন (Distribution): ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের সমবায়েই সম্পদের সৃষ্টি হয়। সম্পদ সৃষ্টি করিয়া মানুষ আয় করে। রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর আয় যোগ করিলে যাহা হয় তাহাকে জাতীয় আয় বলা হয়। অর্থবিদ্যায় বণ্টন বলিতে উৎপাদনের এই চারিটি উপাদানের মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টন বুঝায়। ব্যক্তিসমুদয়ের মধ্যে বণ্টন লইয়া অর্থবিদ্যা আলোচনা করে না। বিভিন্ন উপাদানের কার্যের জন্য জাতীয় আয় কি ভাবে বণ্টিত হয়, কি ভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত, এই সমস্তই অর্থবিদ্যার এই অংশের আলোচনার বিষয়বস্তু।

(৫) টাকাকড়ির বিজ্ঞান (Science of Money): বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনে টাকাকড়ির ভূমিকার বিশেষ গুরুত্ব। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, মূল্যের পরিমাপ হিসাবে, [illegible]দনের উপাদানগুলির নিয়োগে টাকাকড়ি যে ভূমিকা [illegible] এই অংশে তাহাই আলোচনা করা হয়। বর্তমান [illegible]ষভাবে টাকাকড়ির ভূমিকার সহিত জড়িত। সুতরাং অর্থ[illegible]লোচ্য বিষয়ের মধ্যে বেকার সমস্যাও পড়ে।

(৬) [illegible] বাণিজ্য (International Trade): অর্থবিদ্যার আলোচ্য [illegible] গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। পৃথিবীর [বর্ত]মান অবস্থায় [illegible] সভ্য দেশই অন্যান্য দেশের সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্করহিত

অবস্থায় বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না, টিকিয়া থাকিতে পারিলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। কি ভাবে বহির্বাণিজ্যের উদ্ভব হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের পক্ষে কি নীতি অনুসরণ করা উচিত, কি ভাবে জাতিপুঞ্জ পৃথিবীর কল্যাণকল্পে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—এই সমস্ত বিষয়ই অর্থবিদ্যার এই বিভাগে আলোচনা করা হয়।

(৭) রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় (Public Finance): বর্তমান যুগে রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়ও অর্থবিদ্যায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্বে রাষ্ট্রকে শুধু দেশ রক্ষা করিতে ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইত। বর্তমানে কিন্তু তাহাকে বহুবিধ কর্তব্য পালন করিতে হয়। যথা—শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বৃদ্ধ ও অক্ষমদের সাহায্যের ব্যবস্থা, বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা, জাতীয় কল্যাণকল্পে উৎপাদন ও ভোগ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি। এই সকল কার্যের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। কিভাবে এই অর্থ সংগৃহীত হয়; সংগ্রহের কি কি নীতি; কিভাবে সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হয়; কিভাবে ব্যয়িত হওয়া উচিত—এইসকল বিষয় লইয়া ধনবিজ্ঞানের এই বিভাগ আলোচনা করে।

প্রশ্নোত্তর

1. "Economics is the study of mankind in the ordinary business of life." Explain. (C. U., 1933)

[**উত্তরের কাঠামো**:—বাস্তবিক পক্ষে অর্থবিদ্যা ধনদৌলতের বিজ্ঞান বা 'Science of wealth' নয়। সম্পদ বা ধনের সম্পর্কে থাকিয়া মানুষের যে আচরণ প্রকাশ পায়, তাহা লইয়াই অর্থবিদ্যার কারবার (Economics deals with man's activities in relation to wealth)। ধন নয়,—মানুষই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। অবশ্য অর্থবিদ্যা মানুষের জীবনের সব দিককে ব্যাখ্যা করে না। আমাদের আচরণের যে অংশ আয়ের উপার্জন ও ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, অর্থবিদ্যা শুধু সেই অংশেরই আলোচনা করে। মানুষের অধিকাংশ দৈনন্দিন কর্মপ্রচেষ্টাই উপার্জন ও ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক মানুষই চেষ্টা করে যাহাতে নিজের পরিমিত শ্রমের সাহায্যে যথাসম্ভব অধিক ধন উৎপাদিত হয়। যাহাতে সর্বাপেক্ষা অল্প খরচে উৎপাদন সম্ভব হয় এবং ধনের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার হয়, সেজন্যও মানুষ চেষ্টা করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে হিসাব করিয়া চলার ইচ্ছা একটি প্রধান প্রেরণা (motive) বলা যাইতে পারে। উপার্জন বা ব্যয়ের ব্যাপারে সাধারণতঃ মানুষ নৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বিচার দ্বারা পরিচালিত হয় না। এই জন্যই অর্থবিদ্যাকে 'Study of mankind in the ordinary business of life' বা 'মানুষের দৈনন্দিন জীবন আচরণের শাস্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়।]

2. Define the term 'economic laws'. (C. U., 1938). (৭ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Discuss the divisions of Economics. (১০-১১ পৃষ্ঠা দেখ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ

অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর (Stages in the development of economic life) :

আদিমতম যুগে মানুষ বনে জঙ্গলে ফলমূল কুড়াইয়া জীবন ধারণ করিত। অবশ্য সম্পূর্ণরূপে নিরামিষাশী মানুষ কোনদিনই ছিল না। কাজেই ফলমূল আহরণের সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরার ও জীবজন্তু শিকারের চেষ্টাও চলিত। আদিম জীবন মোটেই সুখের ছিল না। বাঁচিয়া থাকার জন্য সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত কঠোর; ফলমূল এবং শিকার খুব পর্যাপ্ত ছিল না। কোন একটি বিশেষ দিনে কতখানি মাছ বা মাংসের জোগাড় হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র নিশ্চয়তা থাকিত না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাসস্থানের নিকট শিকারের জীবজন্তু ও মাছ ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিত। সেজন্য দলবদ্ধভাবে মানুষ স্থান হইতে স্থানান্তরে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত। বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধিত। মানুষ যেন প্রকৃতি ও ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল মাত্র ছিল।

আদিমতম যুগে মানুষ প্রকৃতির হাতে খেলার পুতুল মাত্র ছিল

কিন্তু তবু মানুষ প্রকৃতির হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দেয় নাই। সে প্রাকৃতিক সম্পদকে বেশী করিয়া কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছে; সে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সমবায়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে। মানুষের মধ্যে প্র[illegible]গিতার ফলে শ্রমের দক্ষতা [illegible]এবং প্রকৃতির উপর মানুষের [illegible] হইল।

তবুও মানুষ প্রকৃতির হাতে কখনও নিজেকে ছাড়িয়া দেয় নাই

[illegible]অধিকতর সাফল্য লাভের জন্য উন্নততর অস্ত্র আবিষ্কৃত হইল। [illegible]আক্রমণ, দুই উদ্দেশ্যেই অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। কেবল জীবজন্তু [illegible]তিদ্বন্দ্বী অন্যান্য দলের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ব্যবহৃত [illegible] ক্রমে মানুষের শ্রম লাঘব করার জন্য [illegible] আবিষ্কার হইতে থাকিল। আদিম যুগের অস্ত্র হিসাবে

প্রস্তর যুগ

আমরা হাতুড়ি, বর্শা, মুষল, তীর-ধনুক প্রভৃতি অস্ত্র ও যন্ত্রপাতির উল্লেখ করিতে পারি। প্রথম প্রথম পাথর ও হাড় দিয়া এইগুলি তৈয়ারী হইত। পরে ধীরে ধীরে তামা, ব্রোঞ্জ ও লোহার প্রচলন হইল। প্রস্তর যুগ হইতে লৌহ যুগে আসিতে মানুষের হাজার হাজার বছর লাগিয়াছিল।

লৌহ যুগ

তিনটি আবিষ্কারকে আমরা সভ্যতার গোড়াপত্তন হিসাবে ধরিতে পারি: (১) আগুনের ব্যবহার, (২) জীবজন্তুকে পোষ মানানো, এবং (৩) কৃষিকার্যের সূত্রপাত। আগুনের ব্যবহারের আবিষ্কার সম্ভবতঃ আকস্মিক ভাবে ঘটিয়াছিল। প্রথম প্রথম দাবানলের আগুন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে সেই আগুনকে রক্ষা করা হইত। পরে মানুষ নিজে নিজে আগুন জ্বালাইতে শিখিল। অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করার জন্য আগুনের সাহায্য লওয়া হইল। মানুষ অবশেষে আগুনের সাহায্যে রাঁধিয়া খাইতেও শিখিল।

সভ্যতার গোড়াপত্তন:
১। আগুনের ব্যবহার

জীবজন্তুকে পোষ মানানো সুরু হইলে মানুষ সভ্যতার পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হইল। এইবার খাদ্য সরবরাহের পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মাংস সরবরাহের জন্য মানুষকে আর সম্পূর্ণরূপে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইল না। গৃহপালিত জীবজন্তুর নিকট হইতে মাংস ছাড়া দুগ্ধও পাওয়া যাইত। দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত নানারূপ দ্রব্য খাদ্য-তালিকাভুক্ত হইল। গৃহপালিত ভেড়ার পশমে পরিচ্ছদ তৈয়ারী হইত পালিত পশুকে দিয়া অনেক কাজ করানোর ফলে মানুষের পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হইল। এই ভাবে আর একটি শক্তির উৎস—পশু-শক্তি—আবিষ্কৃত হইল। পশুপালন করিয়া মানুষ জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। পশুপালনের দ্বারাই যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে তাহাদিগকে পশুপালক নামে অভিহিত করা যায়। পশুপালন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তৃণভূমি-অঞ্চলে বড় বড় পশুপালক সমাজ গড়িয়া উঠিল। পশুপালক সমাজগুলি ছিল ভ্রাম্যমাণ মানবগোষ্ঠী। ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিল। সমাজ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইল; এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব করিত। শাসন এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সম্ভবতঃ পশুপালক সমাজেই সর্বপ্রথম দেখা দিয়াছিল। [illegible] গোষ্ঠীগুলি দলে ভারী হওয়া

২। জীবজন্তুকে পোষ মানানো

এবং যুদ্ধে ঘোড়া ব্যবহার করায়, শিকারজীবী ও কৃষিজীবী মানবগোষ্ঠীগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। এই ভাবে বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হইল। বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রে জীবিকার সংস্থানের জন্য পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়া গেল।

৩। উদ্ভিদ্পালন ও কৃষিকাজ

পশুপালনের মত উদ্ভিদ্পালনও আবিষ্কৃত হইল। ফলে, চাষবাস দেখা দিল। মানুষ যখন নিজের ইচ্ছায় ফসল ফলাইতে শিখিল তখন সে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করার পথে আরও-এক পদ অগ্রসর হইল। এখন হইতে মানুষ অধিকতর খাদ্য যোগাইতে প্রকৃতিকে বাধ্য করিতে শিখিল।

কৃষিজীবী সম্প্রদায়গুলি এক জায়গায় স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করিল, তাহারা শিকারী ও পশুপালক সমাজের মত ভ্রাম্যমাণ ছিল না। মানুষ যে যে অঞ্চলে কৃষিজীবী হিসাবে প্রথম বসবাস সুরু করিয়াছিল, সেই সেই অঞ্চলেই সর্বপ্রথম সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। প্রথম প্রথম জমি কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই প্রতিবেশী যুদ্ধপ্রিয় ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠীগুলি শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবীদের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের জমি কাড়িয়া লইতে লাগিল এবং তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিল। এইভাবে কৃষিজীবীরা স্বাধীনতা হারাইয়া যুদ্ধপ্রিয় গোষ্ঠীপতিদের ভূমিদাসে পরিণত হইল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

তাহাদিগকে তাহাদের প্রভু সামন্ত ভূস্বামীদের জন্য কাজ করিতে হইত। কখনও কখনও ভূস্বামীরা নিজেদের জমি চাষ করিবার জন্য ক্রীতদাস নিযুক্ত করিত। শাসন করিত ভূস্বামিগণ বা সামন্তবর্গ। রাজা ছিলেন সামন্তদের মধ্যে প্রধানতম। সমস্ত জমির চূড়ান্ত মালিক ছিলেন তিনিই। রাজার ঠিক নীচেই কয়েকজন বড় বড় সামন্ত থাকিত। তাহাদের প্রত্যেকের নীচে আবার অপেক্ষাকৃত ছোট সামন্তেরা থাকিত।

সকলের নীচে থাকিত ভূমিদাসেরা। এইভাবে সমাজ ছিল একটি পিরামিডের মত। জমির মালিকানাই সকল ক্ষমতা ও মর্যাদার ভিত্তি ছিল। সাধারণ লোক [illegible] জমিতে খাটিত। তাহারা যেন জমিরই অংশ ছিল; প্রভুর বিনা অনুমতিতে [illegible] ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। কার্যতঃ ভূমিদাসেরা প্রভুর [illegible]ই গণ্য ছিল। স্বাধীন কৃষকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এই [illegible]বস্থাকেই Feudalism বা সামন্ততন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। [illegible]ন্ত্রিক সমাজ সমস্ত য়ুরোপ জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যে কেবল সামন্ত, ভূমিদাস এবং কৃষকই ছিল তাহা নয়; সমাজে ব্যবসায়ী এবং শিল্পীদেরও নির্দিষ্ট স্থান ছিল। প্রত্যেকটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের মানুষের যাহা কিছু দরকার, সমস্তই গ্রামে উৎপাদিত হইত। কাজেই গ্রামগুলির সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ খুব কমই ছিল। গ্রামের মধ্যে শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক লোকেরই একটি নির্দিষ্ট পেশা ছিল; এই পেশা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষানুক্রমিক হইত। প্রত্যেকে নিজে যে দ্রব্য তৈয়ারী করিত, তাহার বদলে অন্যের প্রস্তুত দ্রব্যের বিনিময় করিয়া তাহার বিভিন্ন অভাব দূর করিত। এই ধরণের ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থা (barter system) বলা হয়। ধীরে ধীরে টাকাকড়ির প্রচলন সুরু হইল। সমাজে টাকাকড়ির প্রচলন সুরু হওয়ার পর লোকে প্রথমে নিজের দ্রব্যের বদলে টাকাকড়ি সংগ্রহ করিত এবং তারপর টাকাকড়ির বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিত। ফলে বিনিময় পরোক্ষ রূপ ধারণ করে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম

প্রত্যক্ষ বিনিময় ও পরে টাকাকড়ি প্রচলন

টাকাকড়ির প্রচলনে ব্যবসায়ী শ্রেণীর গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গেল। যতদিন বিনিময় প্রথায় কেনাবেচা চলিত ততদিন কেবলমাত্র ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাহায্যে কাহারও ভরণপোষণ চলিত না। কিন্তু টাকাকড়ির প্রচলন হইলে ব্যবসায়ীরা শিল্পী ও কৃষকদের নিকট হইতে জিনিস কিনিয়া অধিক দামে বিক্রয় করিয়া সহজেই মুনাফা করিতে পারিত। উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা মুনাফার আশায় এক গ্রামের জিনিস বহু দূর দূর গ্রামে, এমন কি বিদেশের বাজারেও লইয়া যাইত। আবার দেশের দূর দূর অঞ্চলের জিনিস এবং বিদেশের জিনিসও তাহারা দেশের বাজারে আনিত। এই ধরণের বাণিজ্যের ফলে ধীরে ধীরে গ্রামাঞ্চলের সহিত বহির্জগ[illegible] হইত চলিয়া গেল। [illegible] বড়

ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার

ব্যবসায়-বাণি[illegible] ম্যমাণ তাঁহার অধীন [illegible] খা দিল। করিতেন। বা[illegible] উপর প্রভু বাড়িতে লাগি[illegible] স্তবতঃ পশুপাল সামাজিক ও রা[illegible] ভারী হওয়া

প্রথমে তাহারা নিজেদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠা নগরগুলির জন্য অনেকটা স্বাধীনতা আদায় করিল। অবশেষে 'ফিউড্যাল' শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া তাহারা দেশের মধ্যে শাসকশ্রেণী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিল। এইভাবে ক্ষমতা দখল করার ব্যাপারে তাহারা শিল্পী, শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীর নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছিল।

শাসন-ক্ষমতা সামন্তবর্গের হাত হইতে বণিকশ্রেণীর হাতে আসিল

বণিকশ্রেণী দ্বারা শাসিত এই অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত চলিতেছে। এই সমাজে বিত্তশালী ব্যক্তিরই আধিপত্য চলে। প্রথম প্রথম টাকাকড়ি নিছক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু পরে ব্যবসায়ীরা আবিষ্কার করিল যে টাকা দিয়া মজুর ভাড়া করিয়া উৎপাদন করিলে প্রচুর মুনাফা পাওয়া যায়। মুনাফার আশায় মজুর ভাড়া করার জন্য যে টাকাকড়ি খাটান হয় তাহাকে পুঁজি (Capital) বলে। তাই বর্তমান কালে অর্থবান্ মানুষকে বলা হয় মালিক বা পুঁজিপতি (Capitalist) এবং আধুনিক যুগকে বলা হয় ধনিকতন্ত্র বা পুঁজিবাদের (Capitalism) যুগ।

পুঁজিবাদ বা Capitalism

ধনিকতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য:

ধনিকতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, সমাজ মালিক ও শ্রমিক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে সংগঠিত। পুঁজিপতি জমি, খনি, কারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের সকল উপাদানেরই মালিক। সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্যও ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, মুনাফার প্রয়োজনেই উৎপাদন হয়। একমাত্র মুনাফা লাভের [illegible] করে। সমাজের মত। [illegible] পাদিত হয় না; [illegible] লে। [illegible] মাল তৈয়ারী [illegible] তৈয়ারী [illegible]

[illegible] শায় সারা পৃথিবীর [illegible] মাল তৈয়ারী হয়

গ্রামবাসীরা যেসব মাল কেনে, তাহার অনেকগুলিই দেশের দূর দূর অঞ্চলে এবং বিদেশে তৈয়ারী হয়।

চতুর্থতঃ, পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য খুবই বেশী। দরিদ্রেরা মজুরী খাটিয়া খায়, এবং মজুরী খাটার জন্য তাহাদিগকে পুঁজিপতিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। পুঁজিপতিরা কার্যে নিযুক্ত না করিলে তাহাদের বেকার হইয়া থাকিতে হয়। পুঁজিপতির যখন আশানুরূপ মুনাফা হয় না তখন সে উৎপাদন কমাইতে থাকে এবং বহু লোক বেকার হইয়া পড়ে। বেকার সমস্যা পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

বিজ্ঞানের কল্যাণ দরিদ্রকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই

পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞানের কল্যাণে যে বিরাট বিরাট আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সভ্যতার বস্তুগত সমৃদ্ধি যথেষ্ট বাড়াইয়াছে। কিন্তু পুঁজিবাদের আওতায়, মুনাফার প্রবৃত্তি উৎপাদনের নব নব সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পক্ষে বিরাট বাধা স্বরূপ। কাজেই বিজ্ঞানের জগতে বাস করিয়াও পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ দরিদ্র থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

কি করিলে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা টিকিয়া থাকিতে পারে

টিকিয়া থাকিতে হইলে ধনিকতন্ত্রকে অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে সাফল্য অর্জন করিতে হইবে: (১) সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান এবং মানুষের সংগঠন-নৈপুণ্যকে কাজে লাগাইয়া যতদূর সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে; এবং (২) উৎপন্নের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ দেখিতে হইবে যে জাতীয় আয়ের ন্যায্য ভাগ যেন দরিদ্রেরা পায়। বিজ্ঞানের যে উন্নতি হইয়াছে তাহার ফল যদি একমাত্র ধনিক শ্রেণীই ভোগ করে তবে ধনিকতন্ত্রকে টিকাইয়া রাখা যাইবে না।

উপরোক্ত ভাবে ধনিকতন্ত্রকে টিকাইয়া রাখার জন্য চেষ্টা অনেক দেশেই চলিতেছে, কিন্তু কোনও দেশই এ পর্যন্ত এই দুইটি বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই।

অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটির জন্য সোভিয়েট রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে পুঁজির... সমাজ-ব্যবস্থার পতন হইয়াছে। সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর শাসনে সমা... উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদের আওতায়, শ্রমি... খাটানো চলে না। রাষ্ট্রই প্রধানতঃ সেখানে সকলের নিয়োগকর্তা...

সকল উপাদান প্রধানতঃ রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকে এবং জিনিসপত্র তৈয়ারী হয় ব্যবহারের জন্য, মুনাফার জন্য নয়। ফলে ভোগ্য দ্রব্যের বণ্টন ন্যায্যভাবেই হয়।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নানা উপায়ে পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলি দূর করিবার চেষ্টা চলিতেছে। উপায়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য: (ক) পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন; (খ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের জাতীয়করণ; (গ) বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, বেকার বীমা প্রভৃতি দ্বারা শ্রমিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

ইংলণ্ডের ন্যায় এই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলা হয়। ইহা সমাজতন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যপথ অনুসরণ করে।

প্রশ্নোত্তর

1. Trace the development of economic life through the various stages from the earliest to the modern times, giving briefly the characteristics of each stage of development. (C. U., 1942). (১৩-১৭ পৃষ্ঠা দেখ)

তৃতীয় অধ্যায়

কয়েকটি মৌলিক ধারণা

যে কোন শাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই কতকগুলি মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। অর্থবিদ্যার আলোচনাতেও এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সুতরাং আমরাও প্রথমে অর্থবিদ্যার কয়েকটি মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দ্রব্য (Goods):

মানুষের অভাবমোচনের দ্রব্যাদি অপ্রচুর বলিয়া অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। এখন প্রশ্ন হইল 'দ্রব্য' কাহাকে বলে?

দ্রব্য কাহাকে বলে?

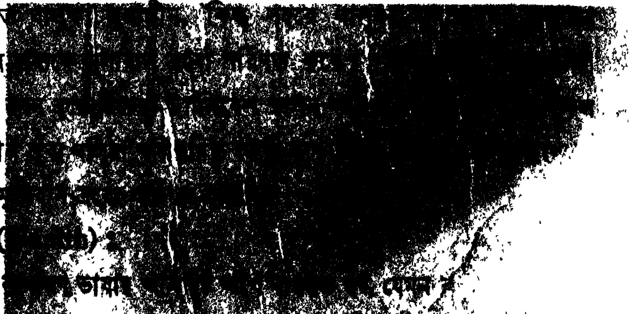
[illegible] যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে তৃপ্ত করে, অর্থবিদ্যার পরিভাষায় তাহাকেই [illegible] (Goods) বলা হয়। অভাবমোচনের ক্ষমতা বা [illegible] তাকে বলা হয় উপযোগিতা [illegible]। যাহা কিছুরই উপযোগিতা আছে, তাহাই দ্রব্য।

দ্রব্য প্রধানতঃ দুই প্রকার,—বস্তুগত (Material) এবং অ-বস্তুগত (Non-material)। একটি টেবিল বা বই বস্তুগত দ্রব্যের উদাহরণ। আর শিক্ষক বা ডাক্তারের সেবামূলক কাজ অ-বস্তুগত দ্রব্যের উদাহরণ।

অনেক দ্রব্য আবার মূল্যহীন দ্রব্য (Free Goods) বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রকৃতির অনেক দান চাহিদার তুলনায় এত প্রচুর যে তাহাদের ইচ্ছামত ব্যবহারের পক্ষে কোন বাধা নাই। বাতাস, নদীর জল, সাহারার বালুকা প্রভৃতি মূল্যহীন দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে। যে দ্রব্য বিনামূল্যের তাহার সম্বন্ধে হিসাব করিয়া চলার কোন প্রয়োজন নাই; অনেকগুলি সম্ভাব্য ব্যবহারের মধ্যে দ্রব্যটি ঠিক কোন ব্যবহারে লাগাইব, তাহা লইয়াও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নাই। সব দ্রব্যই যদি প্রকৃতির দান হিসাবে বিনামূল্যে অজস্র পাওয়া যাইত, তাহা হইলে অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার কোন প্রয়োজনই হইত না। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দ্রব্যই মূল্যহীন নয়; অধিকাংশ দ্রব্যই চাহিদার তুলনায় স্বল্প বা সীমাবদ্ধ। যে দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ, তাহাকে মূল্যবান দ্রব্য বা অর্থনৈতিক পণ্য (Economic Goods) নামে অভিহিত করা হয়। পরিমাণে স্বল্প বলিয়াই অর্থনৈতিক পণ্য লাভ করার ইচ্ছা কখনও পুরাপুরি তৃপ্ত হয় না। সেইজন্যই ইহার ব্যবহারে হিসাব করিয়া চলিতে হয় এবং ইহার বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যবহারের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইবার প্রশ্ন উঠে। কোন একটি অপ্রচুর পণ্যের উৎপাদনে আমাদের শ্রম নিয়োজিত হইলে, আমাদের সব সময়েই সতর্কভাবে বিবেচনা করিতে হয় পণ্যটি একটু কম উৎপাদন করিয়া আর কোন দ্রব্য আর একটু বেশী উৎপাদন করিলে পরিশ্রম অধিকতর সার্থক হইত কিনা।

বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য

এক স্থানে যাহা মূল্যহীন, অপর এক স্থানে তাহা অর্থনৈতিক পণ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। নদীর ধারে জল মূল্যহীন, কিন্তু সহরে জল অর্থনৈতিক পণ্য। মরুভূমিতে



চাহিদাই মূল্যহীন

প্রভৃতি মহাদেশে

স্থানে জমি মূল্যবা

বৃদ্ধির ফলে ইহা

সম্পদ (

সম্পদ শব্দটি

সম্পদ। সাধারণতঃ সম্পদ শব্দটি ব্যবহার করিয়া টাকাকড়ি বুঝান হইয়া থাকে। অর্থবিদ্যায় কিন্তু এই শব্দ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থবিদ্যার পরিভাষায় সম্পদ শব্দ দ্বারা অর্থনৈতিক পণ্য বুঝায়। সুতরাং অর্থবিদ্যাবিদের দৃষ্টিতে ভিক্ষুকেরও সম্পদ আছে।

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলে যে-কোন জিনিসকে সম্পদ বলা চলে :—

(১) উপযোগিতা (Utility) : দ্রব্যের উপযোগিতা অর্থাৎ অভাবমোচনের বা তৃপ্তিদানের ক্ষমতা থাকা চাই। বাংলা দেশে কচুরীপানা একটি অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর উদ্ভিদ্ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যদি কচুরী-পানাকে কাজে লাগানোর কোন উপায় আবিষ্কার করেন (যেমন, সার হিসাবে), তবে কচুরীপানাও সম্পদ হিসাবে গণ্য হইবে।

যে জিনিসের কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে তাহাকে সম্পদ বলে

(২) স্বল্পতা বা অপ্রাচুর্য (Scarcity) : সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবার জন্য কোন জিনিসের শুধু উপযোগিতা থাকিলে চলিবে না; ইহার পক্ষে অপ্রচুরও হওয়া চাই। অপ্রচুর বলিতে বুঝায় চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। বস্তুতঃ অপ্রাচুর্যই সম্পদের মৌলিক লক্ষণ। আমাদের অর্থনৈতিক জীবন দুইটি মৌলিক সত্যের উপর দাঁড়াইয়া আছে : (১) আমাদের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার কোন অন্ত নাই। (২) অভাববোধ তৃপ্ত করার উপায় অপ্রচুর। তৃপ্তি দানের উপায় কি কি ? প্রথমতঃ, প্রকৃতির দান। প্রকৃতির কতকগুলি দান অজস্র, যেমন সমুদ্রের জল ও বাতাস। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য অনেক দান পরিমাণে স্বল্প। জমি প্রকৃতিরই দান; কিন্তু জনাকীর্ণ দেশগুলিতে জমির পরিমাণ স্বল্প। কাজেই, জমিকে সম্পদ বলা যায়। বন, খনি ইত্যাদি প্রকৃতির দান হইলেও চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয় বলিয়া সম্পদের পর্যায়ে পড়ে।

অভাব পরিতৃপ্তির জন্য, প্রকৃতির দানগুলি [illegible] যে ভাবে আমরা পাই সেই ভাবে [illegible]বহার করি না। মানুষ সম্পদ শুধু ভোগ করে না, সম্পদ উৎপাদনও [illegible] অনেক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া সে প্রকৃতির দেওয়া জিনিসগুলি [illegible]করে, সেগুলি কাজে লাগানোর নূতন নূতন পন্থা বাহির করে এবং [illegible] পরিবর্তিত করিয়া নিজের প্রয়োজন মিটাইবার যোগ্য করিয়া তুলে। [illegible] দেয় তাহাকে ভিত্তি করিয়া মানুষ আর একটু বেশী সম্পদ সৃষ্টি

করে। পরিমিত সময় ও পরিশ্রম এবং সীমাবদ্ধ প্রকৃতির দানের সমবায়ে যতখানি সম্ভব বেশী উৎপাদন করাই মানুষের কাজ। সম্পদের স্বল্পতার মূল কারণ দুইটি :—(১) প্রকৃতির দেওয়া জিনিসের স্বল্পতা; (২) মানুষের সময় ও পরিশ্রমের সীমাবদ্ধতা। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করায় প্রকৃতির কৃপণতা, এবং এই সব দ্রব্যের যোগান বাড়ানোর জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন—এই উভয় কারণেই সম্পদ অপ্রচুর। প্রকৃতপক্ষে, উপযোগিতা ও অপ্রাচুর্য সম্পদের দুইটি পরিচায়ক চিহ্ন।

সম্পদের স্বল্পতার কারণ

(৩) হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability): সম্পদ হইতে হইলে জিনিস হস্তান্তরযোগ্যও হইতে হইবে। স্থানান্তর সম্ভব না হইলেও ক্ষতি নাই, কেবল মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হইলেই হইল। যে জিনিস হস্তান্তরযোগ্য নয় তাহা কেবল মালিকেরই অভাব দূর করে; সুতরাং মাত্র তাহার নিকটই ইহা মূল্যবান। সমাজের নিকট উহার কোনই সার্থকতা নাই। কাজেই হস্তান্তরযোগ্যতা না থাকিলে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে কোন জিনিসই সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না। জমি বা খনি স্থানান্তরিত করা যায় না। কিন্তু উহাদের মালিকানা এক হাত হইতে অন্য হাতে সহজেই যাইতে পারে। কাজেই জমি ও খনি সম্পদের পর্যায়ে পড়ে।

(৪) বহিরবস্থান (Externality): মানুষের অঙ্গীভূত কোন জিনিস হস্তান্তরযোগ্য হইতে পারে না। এক মাত্র বাহ্যিক জিনিসই হস্তান্তরযোগ্য হয়। মানুষের স্বাস্থ্য অর্থবিদ্যাবিদের দৃষ্টিতে সম্পদ নয়, কারণ ইহা মানুষের অঙ্গীভূত এবং ইহাকে হস্তান্তর করা চলে না। আভ্যন্তরীণ কোন গুণ বা দক্ষতাকে সম্পদ বলা চলে না, কারণ ইহা কাহারও ব্যক্তিগত সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ইচ্ছা করিলেই ইহাদের অন্যের কাছে হস্তান্তরিত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি[illegible] বলা চলে না, কারণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার [illegible] যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব [illegible] উৎস স্বরূপ। কিন্তু ব্য[illegible] অনেকে মানুষের [illegible] W[illegible] নামে অভিহিত ক[illegible]।

ব্যক্তিগত গুণ সম্পদ ন[illegible]

উপযোগিতা, [illegible]তা, হ[illegible] এবং বহিরবস্থান[illegible]

এই কয়টি গুণ আছে তাহাদিগকে সম্পদ বলা চলে। এই চারিটি গুণ থাকিলে কি বস্তুগত, কি অ-বস্তুগত, সকল জিনিসকেই সম্পদ বলা চলিবে। ব্যবসায়ের সুনাম প্রভৃতি অ-বস্তুগত সম্পদের উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে 'সম্পদ' বলিতে যে দুই প্রকার দ্রব্য বুঝায় তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। এই দুই প্রকার দ্রব্য হইল—(ক) ভোগ্যদ্রব্য (Consumption goods), এবং (খ) উৎপাদকের দ্রব্য (Producers' goods)। ভোগ্য দ্রব্য বলিতে বুঝায় সেই সকল দ্রব্যকে যাহারা সরাসরি মানুষের অভাবমোচন করিতে সক্ষম, যথা,—চাউল, জামাকাপড়, বই, ইত্যাদি। উৎপাদকের দ্রব্য হইল সেগুলি যাহারা পরোক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করে,—যথা, কাঁচা-মাল, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি। এগুলি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে সহায়তা করিয়া পরোক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করে। উৎপাদকের দ্রব্যকে মধ্যবর্তী দ্রব্য (Intermediate goods) বা মূলধন (Capital) বলা হয়।

ভোগ্য দ্রব্য এবং উৎপাদকের দ্রব্য

ব্যক্তিগত সম্পদ, সামগ্রিক সম্পদ এবং জাতীয় সম্পদ (Individual Wealth, Collective Wealth and National Wealth) :

সম্পদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করার পর ব্যক্তিগত সম্পদ, সামগ্রিক সম্পদ এবং জাতীয় সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

কোন লোকের ব্যক্তিগত সম্পদ বলিতে যে-সব মূল্যবান দ্রব্য তাহার অধিকারে আছে সেই সমস্তই বুঝায়। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে জমি, বাড়ী, কারখানা প্রভৃতি বস্তুগত দ্রব্যও আছে, আবার দোকানের সুনামের মত অ-বস্তুগত দ্রব্যও আছে।

ব্যক্তিগত সম্পদ

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় যে-সকল বস্তুগত দ্রব্য আছে তাহাদিগকে সামগ্রিক সম্পদ (Collective Wealth) বলা হয়। সমস্ত সরকারী জমি, সরকারী রাস্তা ও পুল, সরকারী [illegible] প্রভৃতি এবং যাবতীয় সরকারী ও স্বায়ত্তশাসন [illegible] সামগ্রিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিক সম্পদের উপযোগিতা, [illegible] আছে; কিন্তু নাগরিকেরা সকলে যৌথভাবে মালিক [illegible] হস্তান্তরযোগ্যতার কোন প্রশ্ন উঠে না।

সামগ্রিক সম্পদ

সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সামগ্রিক সম্পদের সমষ্টিকে জাতীয় সম্পদ বলা হয়। জাতীয় সম্পদের পরিমাণ হিসাব করিবার সময়ে জাতির আভ্যন্তরীণ ঋণসমূহ (নাগরিকদের কাছে রাষ্ট্রের ঋণই হউক, কিংবা নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে ঋণই হউক) হিসাবের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে না। কিন্তু বিদেশীদের কাছে পাওনা জাতীয় সম্পদের সঙ্গে যোগ করিতে হইবে; আর বিদেশীরা যত টাকা ঐ জাতির নিকট পায়, তাহা জাতীয় সম্পদ হইতে বিয়োগ করিতে হইবে।

জাতীয় সম্পদ

সম্পদ এবং কল্যাণ (Wealth and Welfare):

সম্পদ বলিতে দ্রব্যাদি এবং কল্যাণ (Welfare) বলিতে উন্নত দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থা বুঝায়। মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু পরিমাণে সম্পদ অপরিহার্য। ন্যূনতম আহার্য, পরিচ্ছদ এবং আরামদায়ক দ্রব্য ছাড়া মানুষ কিছুতেই সুখী হইতে পারে না। কিন্তু কতকগুলি সম্পদ আছে যাহা মানুষের অকল্যাণই সাধন করে; যেমন, মদ্য। অর্থবিদ্যায় মদ্য সম্পদ বা ধন বলিয়া পরিগণিত, কারণ ইহার অভাব দূর করিবার ক্ষমতা আছে এবং ইহা বাজারে বিক্রয় হয়। এই ধরণের সম্পদ বৃদ্ধিতে মানুষের অকল্যাণই হয়। সুতরাং সম্পদের বৃদ্ধির অর্থই কল্যাণের বৃদ্ধি নয়।

সম্পদ এবং কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক

আয় (Income):

আয় দুই ভাবে হিসাব করা হয়—নীট (Net) ও মোট (Gross)। মোটাবে আয় হইতে খরচ (Cost) বাদ দিলে নীট আয় পাওয়া যায়। [illegible] না। [illegible] তাহার [illegible] লাখ টাকাকে মো[illegible] যথেষ্ট

বিভিন্ন প্রকারের আ[illegible]

আর্থিক আয় [illegible] উৎস এই দুই ভাবেও [illegible] ১০০ মণ ধান পা[illegible] এবং [illegible] মহাজনকে দিতে [illegible] হইবে [illegible] বাজার অনুযায়ী [illegible] ধানের [illegible] মণ প্রতি [illegible]

কৃষকের নীট আর্থিক আয় হইবে বছরে ৩৫০ টাকা। এই টাকায় কৃষকের সংসার চালাইতে হইবে। জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন জিনিসপত্র এই টাকায় কিনিতে হইবে। যে পরিমাণ জিনিসপত্র এই টাকায় পাওয়া যায় তাহাকে প্রকৃত আয় বলা হয়। আর্থিক আয় না বাড়িলেও, কৃষকের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যদি হঠাৎ কমিয়া অর্ধেক হয় তবে তাহার প্রকৃত আয় দ্বিগুণ হইয়া গেল বলিতে হইবে।

তিনটি উপায়ে লোকে আর্থিক আয় অর্জন করিতে পারে,—কৃষক বা সূত্রধরের মত বস্তুগত জিনিস তৈয়ারী করিয়া, নাপিত বা ডাক্তারের মত অন্যের জন্য সেবামূলক কাজ করিয়া এবং সুদের আশায় নিজের সঞ্চয় বিনিয়োগ করিয়া।

জাতির আর্থিক আয় হইতেছে সকল নাগরিকের নীট আর্থিক আয় এবং সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের (রেলপথ প্রভৃতির) নীট আর্থিক আয়ের সমষ্টি। জমির মালিক প্রতি বৎসর যে খাজনা (rent) পায়, ঋণদাতা যে সুদ পায়, শ্রমজীবীরা যে মজুরী পায় এবং ব্যবসায়ীরা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি যে মুনাফা পায়—তাহাদের সকলের যোগফলই জাতির আর্থিক আয়। অবশ্য এই যোগফল হইতে বিদেশীদিগকে যত টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাদ যাইবে এবং বিদেশীরা যত টাকা দিয়াছে তাহা যোগ হইবে। তাহা হইলেই আমরা নীট জাতীয় আয়ের হিসাব পাইব। অবশ্য একই লোকের আয় যাহাতে দুইবার গণন করা না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জাতীয় আর্থিক আয় ও তাহা কিভাবে হিসাব করা হয়

অ

কা মূল্য ও দাম (Value and Price) :

দো· অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' (Value) এই শব্দটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও বা ইহার অর্থ ব্যবহার-মূল্য (Value-in-use), কখনও বা ইহার অর্থ বিনিময়-মূল্য (Value-in-exchange)। জলের ব্যবহার-মূল্য অপরিসীম; কিন্তু জল সরবরাহ পরিমাণেও অপরিসীম বলিয়া ইহার বিনিময়-মূল্য কিছুই নাই। মরুভূমি এবং [illegible] বড় শহর —যেখানে জল দুষ্প্রাপ্য—সেইসব জায়গায় ছাড়া আর কোথাও [illegible] কোন কিছুই পাওয়া যাইবে না। 'ব্যবহার-মূল্যে'র অর্থ [illegible]। 'ব্যবহার-মূল্য' এই কথাটির চেয়ে [illegible] এই কথাটি ব্যবহার করাই ঠিক হইবে।

'মূল্য' শব্দের দুই অর্থ

তাহা হইলে 'মূল্য' শব্দটি সব সময়েই বিনিময়-মূল্যের অর্থে ব্যবহার করা চলিবে। অর্থবিদ্যায় সচরাচর এই অর্থেই মূল্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বিনিময়-মূল্য

কোন দ্রব্যের এক 'এককে'র (unit) বদলে অন্য দ্রব্য যে পরিমাণ পাওয়া যাইবে, তাহাই প্রথমোক্ত দ্রব্যের এক 'এককে'র বিনিময়-মূল্য। এক মণ চাউলের বদলে যদি দুই মণ লবণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে এক মণ লবণের মূল্য হইবে আধ মণ চাউল এবং এক মণ চাউলের মূল্য হইবে দুই মণ লবণ। দুইটি দ্রব্যের মধ্যে যে বিনিময়-সম্পর্ক বিদ্যমান তাহাকেই মূল্য বলে। লবণের তুলনায় চাউলের মূল্য বাড়িলে, চাউলের তুলনায় লবণের মূল্য কমে। সুতরাং একই সঙ্গে সকল জিনিসের মূল্যে কখনও সাধারণ বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না।

দাম

কোন দ্রব্যের মূল্য টাকাকড়ির অঙ্কে প্রকাশিত হইলে তাহাকে দাম বলে। চাউলের মূল্য মণকরা ১৬৲ টাকা—এই কথার অর্থ এই যে এক মণ চাউলের বিনিময়ে লোকে ১৬৲ টাকা দিবে, অর্থাৎ টাকায় ২½ সের চাউল পাওয়া যাইবে। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ টাকার মূল্য কমিয়া গেলে এক টাকায় আরো কম চাউল পাওয়া যাইবে;

'দামের সাধারণ বৃদ্ধি' এবং 'দামের সাধারণ হ্রাস' কাহাকে বলে ?

শুধু তাই নয়, টাকার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্যও কম পাওয়া যাইবে। ফলে জিনিসপত্রের দামে সাধারণ বৃদ্ধি দেখা যাইবে। আবার মুদ্রাসঙ্কোচনের ফলে টাকার মূল্য বাড়িয়া গেলে, টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক দ্রব্যই বেশী করিয়া পাওয়া যাইবে। ফলে, জিনিসপত্রের দামে সাধারণ হ্রাস দেখা দিবে। এইভাবে মূল্যের সাধারণ বৃদ্ধি বা হ্রাস সবসময় সম্ভবপর না হইলেও, সকল জিনিসপত্রের দামের সাধারণ বৃদ্ধি বা হ্রাস সবসময়েই সম্ভব। দামের সাধারণ বৃদ্ধির অর্থ টাকাকড়ির মূল্যহ্রাস এবং দামের সাধারণ হ্রাসের অর্থ টাকাকড়ির মূল্যবৃদ্ধি।

[illegible]

1. How wou[illegible] with example. (C. U[illegible]

2. "When the word we[illegible] much restricted sense th[illegible] has in o[illegible] Explain the st[illegible] (C.[illegible]

[উত্তরের কাঠা[illegible] সাধারণ ভাষায় সম্পদ শব্দটির কোন বিশেষ অর্থ [illegible]

হয় স্বাস্থ্যই সম্পদ, বা কোন ধনী ব্যক্তিকে দেখাইয়া বলা হয় সম্পন্ন (wealth) ব্যক্তি। অর্থবিদ্যায় সম্পদ বা ধন বলিতে টাকাকড়ি, অর্থসম্পদ বুঝায় না। অর্থবিদ্যাবিদের দৃষ্টিতে বড়লোক ও গরীবের মধ্যে তফাৎ এইখানে যে বড়লোকের বেশী ধন আছে এবং গরীবের অল্প ধন আছে ; কিন্তু দুইজনেরই সম্পদ বা ধন আছে। যে জিনিসের তৃপ্তিদানের ক্ষমতা আছে, এবং যে জিনিস পরিশ্রম করিয়া পাইতে হয়, তাহাই সম্পদ। প্রকৃতির দেওয়া বিনামূল্যের জিনিস সম্পদ নয়। যে জিনিস সম্পর্কে হিসাব করিয়া চলিতে হয় তাহাই শুধু সম্পদ। ধনের বিশেষত্ব এই কয়টি ঃ (১) উপযোগিতা (utility), (২) স্বল্পতা (scarcity), (৩) বহিরবস্থান (externality) এবং (৪) হস্তান্তর-যোগ্যতা (transferability)। ধনের অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকা চাই। চাহিদার তুলনায় ইহার যোগান স্বল্প হওয়া চাই। ইহা এমন কিছু হওয়া চাই যাহা মালিকের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ বাহ্যিক কোন জিনিস। সর্বশেষে, ইহা ইচ্ছামত কেনাবেচা করা যাইবে। সমগ্র জাতির সমবেত মালিকানায় যে সামগ্রিক ধন (collective wealth) থাকে, তাহার প্রথম তিনটি বিশেষত্ব থাকে, কিন্তু ইহা কেনাবেচা করার প্রয়োজন হয় না বলিয়া হস্তান্তরযোগ্যতার প্রশ্ন উঠে না।]

3. Distinguish between value-in-use and value-in-exchange. (C. U., 1931)

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** ব্যবহার-মূল্য (value-in-use) বলিতে উপযোগিতা (utility) বুঝায়। বিনিময়-মূল্য (value-in-exchange) বলিতে দুইটি দ্রব্যের মধ্যে বিনিময়ের হার বুঝায়। হীরার ব্যবহার-মূল্য খুবই কম, কিন্তু বিনিময়-মূল্য কম নহে। এক টুকরা হীরার বিনিময়ে প্রচুর পরিমাণ চাউল, কাপড় কিংবা জমি পাওয়া যাইবে। বিনিময়-মূল্যকেই অর্থবিদ্যায় সাধারণতঃ 'মূল্য' বলা হয়।]

4. Distinguish between value and price. (C. U., 1945). (২৫-২৬ পৃষ্ঠা দেখ)

চতুর্থ অধ্যায়

অভাব ও তৃপ্তি

যে ছয় ভাগে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুকে সাধারণতঃ বিভক্ত করা হয় তাহার প্রথমটি ভোগ (Consumption) লইয়া আলোচনা করে। আমরা চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভোগ লইয়াই আলোচনা করিব। প্রথমে ভোগ কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করা হইবে এবং পরে অভাব ও ভোগ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি লইয়া আলোচনা করা হইবে।

ভোগ কাহাকে বলে? (What is Consumption ?)

অভাবের প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির জন্য জিনিস ব্যবহার করাকে ভোগ (Consumption) বলে। ক্ষুধার্ত মানুষ যখন একটি ফল খায়, তখন ফলটি নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ভোগ মানেই কোন জিনিস নিঃশেষিত করা। কিন্তু এইরূপ মনে হওয়া ভুল। মানুষ কোন দ্রব্য সৃষ্টি করিতে বা নিঃশেষ করিতে পারে না। সে কেবল উপযোগিতাই সৃষ্টি বা নিঃশেষ করিতে পারে। আর একটি দৃষ্টান্ত হইতে এই কথা পরিষ্কার হইবে। আমরা যখন একটি চেয়ার ব্যবহার করি, অর্থবিদ্যাবিদ বলিবেন ইহা আমরা ভোগ করিতেছি। কিন্তু ভোগের ফলে চেয়ারটি নিঃশেষপ্রাপ্ত হয় না; দীর্ঘকাল ভোগ করার ফলে ক্রমশঃ চেয়ারটির উপযোগিতা নষ্ট হইতে থাকে মাত্র। অর্থবিদ্যার ভাষায়, চেয়ারের উপযোগিতা আমরা একটু একটু করিয়া ভোগ করিতে থাকি।

অর্থবিদ্যায় 'ভোগ' শব্দের বিশেষ অর্থ আছে

দীর্ঘকাল পরে যখন চেয়ারটি অকেজো হইয়া পড়ে, [illegible] উপযোগিতা নিঃশেষ হইয়া যায়, [illegible] করিতে করিতে না[illegible] ভোগ করি। এ[illegible] নিঃশেষিত করি। [illegible] প্রভৃতি রূপান্তরিত হইয়া থ[illegible] ক্ষমতা বা উপযো[illegible] অভাব মিটাইবার [illegible]

ভোগ এবং উৎপাদনের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমরা অভাব বোধ করি বলিয়াই পরিশ্রম করিয়া ধন উৎপাদন করি। কিন্তু উৎপাদনের লক্ষ্য হইল ভোগ। পরিশ্রমের ফলে যখন খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন সম্পন্ন হইল, তখন তাহা আমাদের ভোগে লাগে এবং ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। আবার ভোগের ফলে খাদ্যদ্রব্যের যোগান যখন ফুরাইয়া আসে, তখন যোগান বাড়াইবার জন্য উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। এই ভাবে ভোগের ফলে উৎপাদন এবং উৎপাদনের ফলে ভোগ ক্রমাগত সংঘটিত হইতেছে। ভোগ এবং উৎপাদনের মধ্যে একটি পারস্পরিক বৃত্তাকার সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ভোগ এবং উৎপাদনের মধ্যে সম্বন্ধ

অভাব (WANTS)

উৎপাদন (PRODUCTION)

ভোগ (CONSUMPTION)

তৃপ্তি (SATISFACTION)

চিত্র ১

অভাব ও তাহার বৈশিষ্ট্য (Wants and their Characteristics) :

[illegible] বোধ [illegible] বলিয়াই ভোগের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ভোগের আলোচনা [illegible] আলোচনা [illegible] প্রয়োজন।

[illegible] বস্তুগত বা অ-বস্তুগত ভোগ্য [illegible] আকাঙ্ক্ষা [illegible] অভাবের নিম্ন- [illegible]

অভাব অসীম

(১) অভাবের অন্ত নাই। মানুষের অভাববোধের কোন্ সীমারেখা টানা যায় না। কাজেই অভাবের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি অসম্ভব। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আবরণ, আশ্রয় প্রভৃতি প্রাথমিক অভাব তৃপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অভাব অনুভূত হয়। ধনীর কাছে ক্ষুধা মিটাইবার কোন প্রশ্ন নাই; কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় নূতন নূতন বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষা তাহার রহিয়াছে। সভ্যতা ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাব বাড়িয়াছে; নূতন ও পুরাতন ভোগ্য জিনিসের রকমফের দেখা গিয়াছে। নূতন নূতন অভাববোধ মানুষকে নূতন নূতন কর্মপ্রচেষ্টায় প্রেরণা দিয়াছে। আবার নূতন নূতন কর্মপ্রচেষ্টার ফলে নূতন নূতন অভাবও দেখা দিয়াছে। নূতন ধরণের খেলা-ধূলার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নূতন ধরণের খেলার সরঞ্জাম প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এইরূপে অভাব অন্তহীন ভাবে বাড়িয়াই চলিয়াছে। মানুষের অভাবের প্রথম বিশেষত্ব তাই অভাবের সীমাহীনতা।

কিন্তু কোন বিশেষ অভাব সসীম

(২) বিশেষ কোন একটি অভাব সসীম (limited)। মানুষের সব অভাব সামগ্রিক ভাবে অসীম, কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ অভাবের সীমা আছে। মানুষের সব অভাব দূর করা অসম্ভব, কিন্তু কোন এক সময়ে বিশেষ একটি অভাবের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন অসম্ভব নয়। আমার সব অভাব কোন কালেই মিটিবে না, কিন্তু যদি আমি বসিয়া বসিয়া একটার পর একটা রসগোল্লা খাইতে আরম্ভ করি তবে কিছুক্ষণের মধ্যে এমন অবস্থা আসিবে যে আমি বলিতে বাধ্য হইব,—আমার রসগোল্লার অভাব তৃপ্ত হইয়াছে। এই তথ্য হইতে অর্থবিদ্যাবিদরা একটি বিধি বাহির করিয়াছেন। একই জিনিস যতই পাওয়া যায় তাহার উপযোগিতা ততই কমিয়া আসে। ইহাকে ক্রম-হ্রাসমান উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Utility) বলা হয়।

অভাবগুলি কখনও কখনও অনুপূরক

(৩) অনেক অভাব পরস্পরের অনুপূরক (complementary)। অভাবের প্রকৃতি কখনও কখনও এমন যে একই সঙ্গে কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন হয়। একটি জিনিসের চাহিদা বাড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে একটি জিনিসেরও চাহিদা বাড়ে। কলম করিতে হইলে কালি চাই; মোটর পেট্রোল চাই; চায়ের কাপের সঙ্গে

ফলে একটি জিনিসের চাহিদা বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনুপূরক জিনিসেরও চাহিদা বাড়িবে।

(৪) অনেক অভাব পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতামূলক (competitive)। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই অভাব দুইটি বা ততোধিক জিনিসের যে কোন একটি দিয়া মিটানো যায়। এরূপ ক্ষেত্রে জিনিসগুলি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। চায়ের সঙ্গে কফির, বিদ্যুতের সঙ্গে গ্যাসের এবং মাছের সঙ্গে মাংসের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্ক, কারণ একটি জিনিস সহজেই আর একটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। কাজেই, ইহাদের মধ্যে একটি জিনিসের দাম বাড়িলে, উহার প্রতিদ্বন্দ্বী জিনিস বা পরিবর্তের (substitute) চাহিদা বাড়িবে।

অভাবগুলি কখনও কখনও পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতামূলক

অভাবের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Wants):

অভাবকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: (১) প্রয়োজনীয় (Necessaries), (২) আরামপ্রদ (Comforts) এবং (৩) বিলাস-সামগ্রী (Luxuries)।

(১) **প্রয়োজনীয়:** প্রয়োজনীয় অভাবকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে: (ক) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়; (খ) দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয়; (গ) প্রথা বা আচারের ফলে প্রয়োজনীয়। নিছক বাঁচার জন্য মানুষের যে-সব জিনিস দরকার, সেগুলিকে 'জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস' (Necessaries for life) বলা হয়। খাদ্য, পরিচ্ছদ এবং আশ্রয়ের ন্যূনতম ব্যবস্থা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রয়োজনীয় অভাবের শ্রেণীবিভাগ

শুধু মাত্র অস্তিত্ব রক্ষাই মানব জীবনের কাম্য নয়। দক্ষ ও কর্মঠ হইতে [illegible] পুষ্টিকর খাদ্য, শীত-গ্রীষ্মের উপযোগী যথেষ্ট পরিচ্ছদ এবং ভালো একটি [illegible] থাকা প্রয়োজন; শুধু তাহাই নয়, শিক্ষালাভের উপযুক্ত সুযোগও থাকা [illegible] এই সব প্রয়োজন [illegible] দক্ষতার জন্য [illegible]নীয় জিনিস' (Necessar[illegible] [illegible]ency) বলা হয়।

[illegible]ক্ত অভাব ছাড়া অনেকেরই পান, তামাক, চা প্রভৃতির [illegible] [illegible]পায়ীর কাছে সিগারেট অভ্যাসের জোরে প্রয়োজনী[illegible] [illegible] প্রচলিত আচারের অনুশাসনে গরীব বাঙালী ভদ্র[illegible]

জুতা পরিতে হয়। অভ্যাস কিংবা প্রচলিত আচারের ফলে যে-সব জিনিস প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগকে 'আচারগত প্রয়োজনীয়' (Conventional necessaries) বলা হয়।

(২) **আরামপ্রদ:** নিছক বাঁচার জন্য নয়,—আরামে ও অক্লেশে, ভালোভাবে বাঁচিয়া থাকার জন্য যে-সব জিনিসের দরকার হয়, তাহাদিগকে আরামপ্রদ জিনিস (Comforts) বলা হয়। উপাদেয় খাদ্য, রুচিসম্মত ও প্রচুর পরিচ্ছদ, বহুকক্ষযুক্ত সুদৃশ্য বাড়ী, একটি পারিবারিক ছোটখাটো গ্রন্থাগার, বিজলী পাখা ইত্যাদি আরামপ্রদ জিনিসের উদাহরণ।

আরামপ্রদ জিনিস

আরামপ্রদ জিনিস আর দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রায়ই এক। ইহাদের মধ্যে স্পষ্ট কোন সীমারেখা টানা যায় না।

(৩) **বিলাস-সামগ্রী:** বিলাসের সংজ্ঞা লইয়া মতভেদ আছে। সাধারণতঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করার জন্য এবং জাঁকজমক দেখাইবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য যে-সব মূল্যবান জিনিস ব্যবহার হয়, তাহাদিগকে বিলাস-সামগ্রী (Luxuries) বলা হয়। বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করায় আমাদের কর্মদক্ষতা বাড়ে না, বরং অনেক সময় কর্মদক্ষতা কমিয়াই যায়। সুতরাং নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর অথচ ব্যয়সাধ্য দ্রব্যকেই বিলাস-সামগ্রী বলা যায়। অবশ্য সৌখিন জিনিস ব্যবহারের দ্বারা অনেক সময়ে আমাদের চারুকলার পিপাসা চরিতার্থ হয়। বৃহৎ অট্টালিকা, দামী আহার্য, পরিচ্ছদ, মদ্য, অলঙ্কার প্রভৃতি হইল বিলাস-সামগ্রীর উদাহরণ।

বিলাস-সামগ্রী

প্রয়োজনীয়, আরামপ্রদ ও বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এই যে শ্রেণীবিভাগ করা হইল তাহা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা অপরিবর্তনীয় নহে। ইহা মানুষের স্বভাব, রুচি, পেশা, আয় প্রভৃতির আপেক্ষিক। একটি হাতঘড়ি একজন ডাক্তারের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিন্তু একজন কৃষকের পক্ষে বিলাস-সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই না।

বিলাসের জন্য ব্যয় যুক্তিযুক্ত কি না? (Is expenditure on luxuries justified?)

নৈতিক কারণে বিলাসের জন্য ব্যয়ের তীব্র সমালোচনা করা হ[illegible] [illegible]। অবশ্য কোন্ ব্যয় সুনীতিমূলক বা দুর্নীতিমূলক তাহা লইয়া [illegible] না। উৎপাদন ও নিয়োগের উপর ভোগীর (consum[illegible]

প্রভাব অর্থবিদ্যাবিদ্ তাহাই পর্যবেক্ষণ করেন। যদি ভোগী বিলাস-সামগ্রীর উপরই অধিক ব্যয় করিতে থাকে এবং ইহার ফলে উৎপাদন ও নিয়োগ সামগ্রিকভাবে ব্যাহত হয় তবে এই প্রকার ব্যয় যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু যদি উৎপাদন ব্যাহত না হয়, যদি বেকার সমস্যা অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকে, তবে বিলাসের উপর ব্যয়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা করার পক্ষে কোন যুক্তিই নাই। ধনীদের ব্যয় হইতে বিরত থাকা অপেক্ষা বিলাস-সামগ্রীর উপর ব্যয় করা সমাজের পক্ষে কাম্য। বিলাসের উপর ব্যয়ের যে সকল সমালোচনা সাধারণতঃ করা হয় তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইল অর্থনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা। যদি সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্য না থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় বিলাস-সামগ্রীর উপর ব্যয়ের এরূপ সমালোচনা করা হইত না। প্রকৃত পক্ষে, বিলাসের উপর ব্যয়ের যে সমালোচনা করা হয় তাহা নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচনা, অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে নয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the main characteristics of human wants. (২৯-৩১ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Classify human wants. (৩১-৩২ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Are luxuries justifiable ? (৩২-৩৩ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Human wants are usually classified as necessaries, comforts and luxuries. Examine this classification. (C. U., 1948) (৩১-৩২ পৃষ্ঠা দেখ)

পঞ্চম অধ্যায়

চাহিদা ও উপযোগ

অভাব সম্বন্ধে আলোচনার পর অভাব-মোচনের দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি যে 'দ্রব্যে'র একটি অপরিহার্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য 'উপযোগ'। এখন উপযোগ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

উপযোগ কাহাকে বলে ? (What is Utility ?)

দ্রব্যের যা উপযোগিতা অভাববোধ তৃপ্ত করার ক্ষমতা ;

দেখিয়াছি যে চাউলের উপযোগিতা আছে, কারণ ইহা আমাদের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করিতে পারে। ঘর আমাদের আশ্রয়ের অভাব মিটায় বলিয়া ইহার উপযোগিতা আছে। অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' এই কথাটির সঙ্গে নীতির কোন সম্বন্ধ নাই। নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে মদ্য গর্হিত। কিন্তু পৃথিবীতে যতদিন মদ্যের চাহিদা আছে, অর্থাৎ লোকে যতদিন পয়সা দিয়া মদ্য কিনিবে, ততদিন অর্থবিদ্যায় মদ্যের উপযোগিতা আছে বলিয়াই ধরা হইবে। এই উদাহরণ হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কোন দ্রব্যের উপযোগিতা সকলের নিকট এক নয়। যে মদ্যপান করে না তাহার নিকট বস্তুতঃ মদ্যের কোন উপযোগিতাই নাই। শুধু ইহাই নহে। একজনের বেলায়ও কোন দ্রব্যের উপযোগিতা তাহার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যে ব্যক্তি বিশেষ তৃষ্ণার্ত তাহার নিকট এক গ্লাস জলের উপযোগিতা অসীম; কিন্তু তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে তাহার নিকট আর এক গ্লাস জলের কোন উপযোগ থাকিবে না।

উপযোগের সহিত নীতির সম্পর্ক নাই

উপযোগ যে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, ইহা হইতে অর্থবিদ্যার একটি সূত্র বা বিধি বাহির করা হইয়াছে। ইহা ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি নামে অভিহিত।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Utility):

অভাবের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, যে কোন একটি বিশেষ অভাব সসীম। কোন একটি জিনিস একটু একটু করিয়া যতই পাইতে থাকিবে, ততই উহার জন্য আকাঙ্ক্ষা কমিতে থাকিবে। ইহা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সাধারণ সত্য। আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই সাধারণ সত্যটিই অর্থবিদ্যায় ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Utility) রূপে পরিচিত। নিয়মটিকে এইভাবে বিবৃত করা চলে: কোন জিনিস ক্রমাগত একটু একটু করিয়া পাইতে থাকিলে, সেই জিনিস অতিরিক্ত আর এক একক (Un[illegible] পাওয়ার ইচ্ছা ক্রমাগত কমিতে থাকে (The [illegible] one more unit of a thing grows less and less as [illegible] nd more of that thing)।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি কাহাকে বলে

একটি লোক বাজারে কমলালেবু কিনিতে গেল। প্রথম লেবুটির জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা এত বেশী যে সে আট আনা পর্যন্ত দাম দিতে রাজী। কিন্তু প্রথম লেবুটি কেনার বা আস্বাদনের পর, দ্বিতীয় একটি লেবুর জন্য আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা কখনই পূর্বের মত থাকিবে না; এইবার সে দাম হিসাবে আট আনা দিতে রাজী না হইয়া আরও কম, হয়ত সাত আনা, দিতে রাজী হইবে। তৃতীয় লেবুটির জন্য সে আরো কম দাম দিতে রাজী থাকিবে। এই ভাবে ক্রমাগত লেবু কিনিতে থাকিলে, সে লেবুর দাম ক্রমাগত কম দিতে রাজী থাকিবে। ক্রেতা প্রত্যেকটি কমলালেবুর জন্য যে দাম দিতে রাজী, তাহাই ক্রেতার কাছে উহার উপযোগিতার পরিমাপ। দ্রব্যের উপযোগিতা পরিমাপ করিবার আর কোন উপায় নাই। কাজেই আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, কোন পণ্য একটু একটু করিয়া কিনিতে থাকিলে, ক্রেতার নিকট ঐ পণ্যের প্রত্যেকটি অতিরিক্ত 'একক'র উপযোগিতাও ক্রমাগত কমিতে থাকে। ইহাকেই 'ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি' (Law of Diminishing Utility) বলা হয়।

উদাহরণ

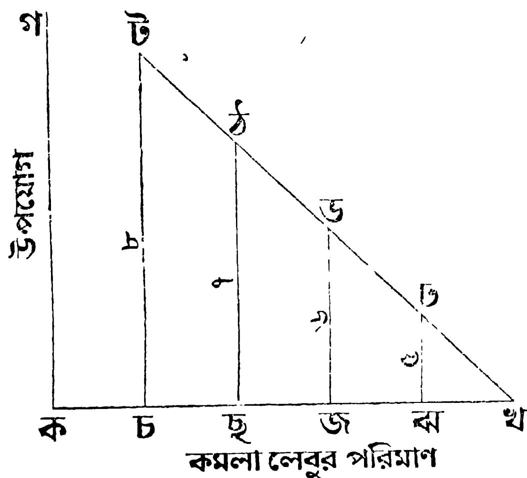
নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে এই নিয়মটি ব্যাখ্যা করা হইল।

কমলালেবুর 'একক'				দামের সাহায্যে উপযোগিতার পরিমাপ
১ম	...	...	...	৮ আনা
২য়	...	...	...	৭ "
৩য়	...	...	...	৬ "
৪র্থ	...	...	...	৫ "
৫ম	...	...	...	৪ "
৬ষ্ঠ	...	...	...	৩ "
৭ম	...	...	...	২ "

একটি রেখাচিত্র দ্বারাও এই নিয়মকে বুঝান যাইতে পারে।

ক খ অক্ষে কমলালেবুর পরিমাপ ধরা হইল এবং ক গ অক্ষে প্রতি উপযোগের মাপ ধরা হইল। প্রথম কমলালেবু হইতে যে উপযোগ

তাহার পরিমাপ হইল চ ট অংশ (আট আনা); দ্বিতীয় লেবুর উপযোগ ছ ঠ অংশ (সাত আনা); তৃতীয় ও চতুর্থ লেবুর উপযোগ যথাক্রমে জ ড (ছয় আনা)



এবং ঝ ঢ (পাঁচ আনা) অংশ। ট ঠ ড ঢ বিন্দুগুলি যোগ করিলে যে রেখা পাওয়া যায় তাহা ক্রমহ্রাসমান উপযোগের রেখা।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম (Limitation of the Law): একই নির্দিষ্ট সময়ে একটিমাত্র মানুষের কেনাকাটার বেলায়ই শুধু এই নিয়মটি খাটিবে। এই নিয়মের অর্থ এই নয় যে, আজ যদি পাঁচ আনা দিয়া একটি লেবু কিনি, তাহা হইলে আগামী কাল আর একটি লেবু চার আনার বেশী দামে কিনিতে রাজী থাকিব না। আজ একটি লেবু খাইয়া যতটা তৃপ্তি বোধ হইবে, কাল পর্যন্ত তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। সেইজন্যই লোকে একই দামে একই জিনিস দিনের পর দিন কিনিতে থাকে। বিবৃত নিয়মটি দ্বারা শুধু এই বুঝায় যে, লোকে যখন কোন জিনিস একই সময়ে একটানা কিনিতে থাকে তখন প্রথম 'একক'এর জন্য সে যত দাম দিতে রাজী হয় দ্বিতীয় 'একক'এর জন্য তাহার চেয়ে কম দিতে রাজী থাকে। প্রথম 'একক' [illegible] 'একক'

উদাহরণ

কেনার মধ্যে যদি বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে শুধু যে প্রথম 'একক' হইতে প্রাপ্ত টুকুই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে তাহা নয়,—ইতিমধ্যে আমাদের রুচি, [illegible]ায়ের পরিমাণ, এমন কি জীবনযাত্রার মান পর্যন্ত বদলাইয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায় যে কৃপণের অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা কমিয়া যায় না। ইহার বিরুদ্ধে বলা যায় যে অর্থবিদ্যা সাধারণ মানুষকে লইয়াই কারবার করে। কৃপণের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক নহে; সুতরাং তাহা অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু কতকগুলি জিনিস আছে যাহাদের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সংগৃহীত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়িতেই থাকে। যাহারা পুরাতন ডাকটিকিট ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাহাদের নিকট ঐ সকল জিনিসের আকাঙ্ক্ষা সংগৃহীত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে কমে না, বরং বাড়িয়াই চলে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায় যে সংগ্রহকারীর আগ্রহ হইল একটা বড় রকমের সংগ্রহে, সংগৃহীত দ্রব্যের বিভিন্ন এককে নহে। সুতরাং ইহাকে ঠিক নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা চলে না।

প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগ (Marginal Utility and Total Utility) ঃ

কমলালেবু কেনার জন্য বাজারে যাইয়া একটি লোক ঠিক কয়টি লেবু কিনিবে? ক্রমাগত কিনিতে থাকিলে, সে সব সময়েই আর একটির জন্য কম দাম দিতে চাহিবে। কিন্তু বাজারে জিনিসের এক দর থাকে। কাজেই, যতক্ষণ পর্যন্ত লেবুর উপযোগ বাজার দামের চেয়ে বেশী ততক্ষণ সে লেবু কিনিয়া চলিবে। সর্বশেষে কেনা লেবুটির উপযোগিতা যখন দামের সমান বলিয়া মনে হইবে তখনই সে আর লেবু কেনা বন্ধ করিবে। এই শেষ লেবুটিই ক্রয় ব্যাপারে সুবিবেচনার প্রান্ত সীমা। ইহার পর আর একটি লেবু কিনিলে যে উপযোগিতা পাওয়া যাইবে, তাহা বাজার দামের চেয়ে কম হইবে।

প্রান্তিক উপযোগ কাহাকে বলে

ক্রীত কোন জিনিসের শেষ 'একক' হইতে পাওয়া উপযোগিতাকে ক্রেতার কাছে ঐ জিনিসের 'প্রান্তিক উপযোগ' (Marginal Utility) বলে। কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে, জিনিসের দাম ক্রেতার নিকট উহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। কারণ ক্রেতা সব সময়েই এমন পরিমাণে জিনিস কেনে যাহাতে শেষ 'একক'টির উপযোগিতা (অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ) বাজার দামের সমান হয়।

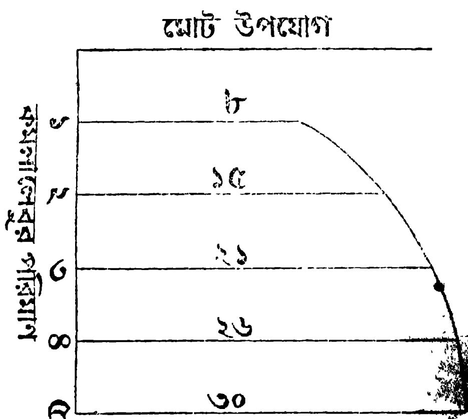
মোট উপযো[illegible]

কোন কেনা জিনিসের সবগুলি 'এককে'র আলাদা আলাদা উ[illegible] সমষ্টিকে 'মোট উপযোগ' (Total Utility) বল[illegible] হয়। প্রান্তিক উপযোগ এবং মোট উপযোগের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে এইরূপে বুঝান যায়।

ক্রেতা কত একক কমলালেবু কিনিল	দামের সাহায্যে প্রান্তিক উপযোগের পরিমাপ	দামের সাহায্যে মোট উপযোগের পরিমাপ
১	৮ আনা	৮ আনা
২	৭ আনা	১৫ আনা
৩	৬ আনা	২১ আনা
৪	৫ আনা	২৬ আনা
৫	৪ আনা	৩০ আনা
৬	৩ আনা	৩৩ আনা
৭	২ আনা	৩৫ আনা
৮	১ আনা	৩৬ আনা

যদি ক্রেতা চারিটি কমলালেবু কেনে তাহা হইলে তাহার নিকট কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ পাঁচ আনা, আর মোট উপযোগ ২৬ আনা (১৸৵০); সাতটি কমলালেবু কিনিলে, কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ দুই আনা আর মোট উপযোগ ৩৫ আনা (২৵০)।

পূর্ববর্তী রেখাচিত্রের সাহায্যেই প্রান্তিক উপযোগ বুঝান যায়। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে মোট উপযোগ বুঝান হইল।



১টি কমলালেবুর মোট উপযোগ ৮; দুইটি কমলালেবুর ১৫; তিনটির ২১;

প্রান্তিক উপযোগ এবং মোট উপযোগের মধ্যে কি সম্পর্ক, তাহা পরিষ্কার হইল। একটু একটু করিয়া যতই আমি একটি জিনিস ক্রমাগত কিনিতে থাকিব ততই উহার প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকিবে এবং মোট উপযোগ বাড়িতে থাকিবে। অবশ্য মোট উপযোগিতা বাড়িতে থাকিলেও, এই বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিতে থাকে। যখন প্রান্তিক উপযোগ শূন্যে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনই মোট উপযোগ হয় সর্বাধিক (maximum)। প্রান্তিক উপযোগ শূন্যে আসিয়া ঠেকিবার পর, জিনিসটি আর একটু বেশী কিনিলেও মোট উপযোগকে একটুও বাড়ানো যাইবে না। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, জিনিসটির জন্য আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত আর এক 'একক' কিনিলে বিন্দুমাত্র তৃপ্তিও আর পাওয়া যাইবে না।

প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক

টাকার প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility of Money) :

অর্থপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃপণের অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা কমিয়া না গেলেও, টাকার বেলাতেও ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি খাটে। টাকার উপযোগিতা অবশ্য অত্যন্ত ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তির অবস্থা আসিতে বিশেষ দেরী হয়; অনেক ক্ষেত্রে আসেই না। ইহার কারণ, টাকা দিয়া যে সমস্ত দ্রব্য কেনা যায় টাকা তাহাদের সমস্তেরই প্রতিনিধিত্ব করে। টাকা দিয়া দ্রব্য কিনিয়া যে অভাব পূরণ করা যায় তেমন অভাবও সংখ্যাহীন। এই সংখ্যাহীন অভাব পূরণ বিশেষ কঠিন ব্যাপার; অসম্ভবও বলা চলে। তবুও একথা সত্য যে যাহাদের আয় অত্যন্ত বেশী তাহাদের নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা অত্যন্ত কম। মাসিক হাজার টাকা আয়ের ব্যক্তির নিকট একটি টাকার উপযোগিতা মাসিক একশত টাকা আয়ের ব্যক্তির নিকট এক টাকার উপযোগিতার অপেক্ষা অনেক কম। প্রথম ব্যক্তি হয়ত টাকাটি বিলাস-সামগ্রী কিনিতে ব্যয় করিবে; দ্বিতীয় ব্যক্তি টাকাটি দিয়া হয়ত কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিবে। সুতরাং উভয়কে যদি এক টাকা করিয়া কর দিতে হয় তবে প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বিতীয় ব্যক্তির ত্যাগ বেশী হইবে।

টাকার বেলাতেও ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি খাটে

উদাহরণ

টাকার প্রান্তিক উপযোগিতার সূত্র স্মরণ করিয়া কর নির্ধারণ করিতে

ভোগোদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্ত তৃপ্তি (Consumer's Surplus) ঃ

কমলালেবু সংক্রান্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কমলালেবুর দাম দুই আনা করিয়া হইলে ক্রেতা ৭টি কমলালেবু কিনিবে। সাতটি লেবুই এক দামে পাওয়া যাইবে। সপ্তম কমলালেবুটির উপযোগিতা দুই আনার সমান। কাজেই পূর্বতন লেবুগুলির প্রত্যেকটিরই বাজার দামের চেয়ে বেশী উপযোগ আছে। প্রথম লেবুটি ক্রেতা আট আনা দিয়াও কিনিতে রাজী ছিল, কিন্তু তাহাকে দিতে হইবে মাত্র দুই আনা। ফলে, তাহার ছয় আনা বাঁচিয়া যাইবে। প্রথম লেবুটি হইতে পাওয়া মোট তৃপ্তি আট আনার ; দাম হিসাবে দিতে হইবে মাত্র দুই আনা। এই উদ্বৃত্ত ছয় আনার তৃপ্তিকেই প্রথম লেবুটি হইতে প্রাপ্ত ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus) বলা হয়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেবুটি হইতে যথাক্রমে পাঁচ আনা ও চার আনার ভোগোদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে।

উদাহরণ

কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিস কেনার জন্য ক্রেতা যে দাম দিতে প্রস্তুত এবং বাজারে কিনিতে যাইয়া প্রকৃতপক্ষে যে দাম দেয়,—তাহাদের অন্তর-ফলই ভোগোদ্বৃত্ত। ভোগোদ্বৃত্তের নিম্নরূপ সংজ্ঞাও দেওয়া চলে :—ভোগোদ্বৃত্ত হইল কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিসের উপযোগিতা এবং উহার দামের মধ্যে পার্থক্য। কোন জিনিস বাজারে যতই ক্রমাগত সস্তা হইতে থাকিবে ততই ইহা হইতে প্রাপ্য ভোগোদ্বৃত্ত বেশী হইতে থাকিবে।

ভোগোদ্বৃত্ত কাহাকে বলে

মোট ভোগোদ্বৃত্ত হইল জিনিসের মোট উপযোগিতা এবং মোট দামের পার্থক্য। কোন জিনিসের সবগুলি 'এককে'র আলাদা উপযোগিতা একত্রে যোগ করিলে কেনা জিনিসটির মোট উপযোগ, অর্থাৎ মোট তৃপ্তি, পাওয়া যায়। কিন্তু এই তৃপ্তিলাভ এমনিই হয় না, ইহার জন্য দাম দিতে হয়। যে কয় 'একক' কেনা হইল তাহার সংখ্যাকে বাজার দাম দিয়া গুণ করিলে তৃপ্তিলাভের জন্য ব্যয়িত মোট দাম পাওয়া যায়। জিনিসের মোট উপযোগিতা এবং মোট দামের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাই ক্রেতার ভোগকারী হিসাবে নীট লাভ। এই নীট লাভকেই মোট ভোগোদ্বৃত্ত

মোট ভোগোদ্বৃত্ত

ভোগোদ্বৃত্ত কি ভাবে হিসাব করিতে হয় তাহার উদাহরণ দেওয়া হইল।

কমলালেবুর যে কয় একক কেনা হইল	অনুক্রমিক লেবুগুলির উপযোগিতা	বাজার দাম	অনুক্রমিক এককগুলির ভোগোদ্বৃত্ত
১ ...	৮ আনা	২ আনা	৬ আনা
২ ...	৭ "	২ "	৫ "
৩ ...	৬ "	২ "	৪ "
৪ ...	৫ "	২ "	৩ "
৫ ...	৪ "	২ "	২ "
৬ ...	৩ "	২ "	১ "
৭ ...	২ "	২ "	শূন্য "
মোট উপযোগিতা = ৩৫ আনা		১৪ আনা মোট দাম	২১ আনা মোট ভোগোদ্বৃত্ত

মোট উপযোগিতা—মোট দাম = ২১ আনা = মোট ভোগোদ্বৃত্ত।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভোগোদ্বৃত্ত টাকাকড়ির হিসাবে পাওয়া যায় না। ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ধারণা। লোকে কোন জিনিস ভোগ করিয়া কতটা তৃপ্তি পাইল তাহার পরিমাপও সকল ক্ষেত্রে করা যায় না।

চাহিদা (Demand) ঃ

আকাঙ্ক্ষাই চাহিদার মূল উৎস। কোন জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উহার চাহিদাও থাকিত না। কিন্তু কেবল আকাঙ্ক্ষার ফলেই চাহিদার উদ্ভব হয় না। একজন গরীব ডাক্তারের হয়ত মোটরকারের আকাঙ্ক্ষা খুবই তীব্র, কিন্তু তাহার এই আকাঙ্ক্ষা চাহিদার সৃষ্টি করে না, কারণ মোটরকার কেনার মত সামর্থ্য তাহার নাই। মোটরকারের বাজারে এই গরীব ডাক্তারটি কখনও ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারে না। কাজেই, বাজারে তাহার সাধ বা আকাঙ্ক্ষার কোন গুরুত্ব নাই। চাহিদার উদ্ভব তখনই হয় যখন লোকে কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য বাজার দামে উহা কিনিতে প্রস্তুত থাকে। কিনিবার জন্য থাকা আবার দামের উপরে নির্ভরশীল। দাম কম হইলে, লোকে [illegible] কিনিবে ; আর দাম বেশী হইলে, লোকে কম জিনিস কিনিবে।

চাহিদার উদ্ভব

দামের সহিত আপেক্ষিক ভাবে সম্পর্কিত ; দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা বলিয়া কোন বস্তু নাই। চাহিদা মানেই নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিস পাওয়ার ইচ্ছা।

চাহিদা-দাম

কোন লোক নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিসের জন্য যে দাম দিতে ইচ্ছুক, তাহাকে ঐ পরিমাণ জিনিসের চাহিদা-দাম (Demand Price) বলা হয়। এই চাহিদা-দাম সব সময়েই ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিসের প্রান্তিক উপযোগের সমান। অর্থাৎ কোন লোক যদি ৭টি কমলালেবু কিনিতে চায় তাহা হইলে তাহার প্রতি কমলার চাহিদা-দাম সপ্তম লেবুটির উপযোগিতার সমান হইবে। ধরা যাক, সপ্তম কমলালেবুটির উপযোগিতা দুই আনা। তার মানেই প্রতিটি লেবুর বাজার দাম যদি দুই আনা করিয়া হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ৭টি কমলালেবু কিনিবে। অষ্টম লেবুটির উপযোগিতা দুই আনার কম বলিয়া, দুই আনা দামে সে আর অষ্টম লেবুটি কিনিতে যাইবে না। আবার, দাম দুই আনার উপরে উঠিলে, সে ৭টিরও কম লেবু কিনিবে। দাম

উদাহরণ

যাহাই হউক না কেন, সে ঠিক সেই কয়টি লেবুই কিনিবে যাহাতে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হয়। কমলালেবু যত বেশী করিয়া কেনা হইবে ততই প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকিবে। ফলে, দাম যত বেশী হইবে কমলালেবু তত কম কেনা হইবে এবং দাম যত কম হইবে কমলালেবু তত বেশী কেনা হইবে। চাহিদা ও দামের মধ্যে এই যে সম্পর্ক ইহাকে একটি নিয়ম বা বিধিতে দাঁড় করানো চলে।

চাহিদার নিয়ম (Law of Demand) :

দাম কমিলে জিনিসের চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে জিনিসের চাহিদা কমে। দাম—সব সময়েই যে পরিমাণ জিনিস কেনা হইল তাহার প্রান্তিক উপযোগের সমান। যতই জিনিস কেনা হইতে থাকে প্রান্তিক উপযোগ ততই কমিতে থাকে, তাই দাম না কমা পর্যন্ত কেহ কেনার মাত্রা বাড়াইবে না। চাহিদার নিয়ম ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি হইতেই উদ্ভূত।

চাহিদা-সূচী (Demand Schedule) :

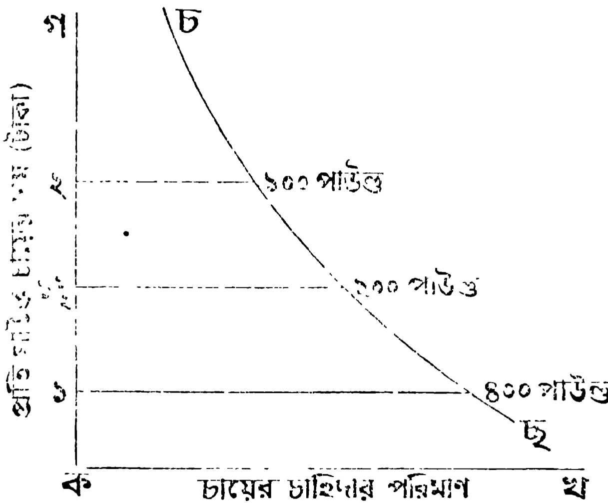
বিভিন্ন দামে বিভিন্ন জিনিসের ব্যক্তিগত কিংবা বাজারের চাহিদা কি পরিমাণ হইবে, তাহারই তালিকাকে চাহিদা-সূচী বলা হয়। একটি সম্পূর্ণ সূচী হাতে থাকিলেই কোন জিনিসের ব্যক্তিগত বা বাজারগত চাহিদার

পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা সম্ভব। নিম্নলিখিত ছকটির সাহায্যে চাহিদা-সূচী সম্বন্ধে ধারণা হইবে :—

প্রতি পাউণ্ড চা-এর দাম	চা-এর চাহিদার পরিমাণ (পাউণ্ড)
২৲ টাকা	১০০ পাউণ্ড
১½ ”	২০০ ”
১৲ ”	৪০০ ”

দেখা যাইতেছে যে চা-এর দাম যতই কমে, চাহিদা ততই বাড়ে। চাহিদার নিয়ম এবং ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি অনুসারে এই রকম হয়।

একটি রেখাচিত্র দ্বারা চাহিদার নিয়মটি বুঝান যাইতে পারে।



ক গ অক্ষে চায়ের দাম দেখান হইয়াছে এবং ক খ অক্ষে চায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। চ ছ হইল চাহিদার রেখা। দাম যখন দুই টাকা হইতে দেড় টাকা হইল, চাহিদা বাড়িয়া ২০০ পাউণ্ড হইল। দাম যখন এক টাকা হইল তখন চাহিদা বাড়িয়া ৪০০ পাউণ্ড হইল।

চাহিদার পরিবর্তনশীলতা (Elasticity of Demand)

চাহিদার নিয়ম এই কথাই বলে যে জিনিসের দাম কমিলে বাজারে [illegible] চাহিদা বাড়ে; আবার জিনিসের দাম বাড়িলে, চাহিদা কমে। সব জিনিসের বেলায়ই এই নিয়ম খাটে। কিন্তু দাম বাড়া বা কমার ফলে চাহিদা কম

বাড়ার হার বিভিন্ন জিনিসের বেলায় বিভিন্ন রকম। চাউল বাঁচার জন্য আবশ্যক জিনিস; দাম যত হউক, চাউল না হইলে চলিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে চাউলের দামের খুব বেশী রকম বৃদ্ধি হইলেও, উহার চাহিদায় সেই অনুপাতে বেশী রকম হ্রাস দেখা যাইবে না। আবার চাউলের দাম যদি খুবই নামিয়া যায় তাহা হইলে যাহারা আধপেটা খাইত তাহারা বেশী চাউল কেনা সুরু করিবে; কিন্তু সকলেরই পেট ভরিয়া খাওয়ার পর, দাম অনেক কমাইলেও চাউলের চাহিদার আর বৃদ্ধি হইবে না। লবণেরও দাম একটু বাড়িলে চাহিদার বিশেষ হ্রাস হইবে না, কিংবা দাম একটু কমিলেও চাহিদার বিশেষ বৃদ্ধি হইবে না। লবণ বা চাউলের মত জিনিসের চাহিদার পরিবর্তনশীলতা (elasticity) অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া ইহাদের চাহিদাকে অনতিপরিবর্তনশীল (inelastic) বলা হয়।

চাহিদার পরিবর্তনের প্রকৃতি ও ফল

অপর পক্ষে, গ্রামোফোন প্রভৃতি বিলাসের সামগ্রী বাঁচার জন্য অপরিহার্য মোটেই নয়। অধিকাংশ লোকেই টাকা-পয়সার অভাবে এই সব বিলাসের সামগ্রী কিনিতে অক্ষম। কাজেই, গ্রামোফোনের মত জিনিসের দাম যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে ইহা মধ্যবিত্তদের নাগালের মধ্যে আসিয়া যাইবে; ফলে উহার বিক্রয় প্রচুর পরিমাণে বাড়িবে। আবার উহার দাম বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রয় ভয়ানক ভাবে সংকুচিত হইয়া ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

চাহিদার পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে এই ধারণার পর নিম্নলিখিত ভাবে অতিপরিবর্তনশীল ও অনতিপরিবর্তনশীল চাহিদার সংজ্ঞা দেওয়া চলে।

অতিপরিবর্তনশীল চাহিদা (Elastic Demand):

যদি কোন জিনিসের চাহিদা দামের সামান্য হ্রাসের ফলে অনেকখানি বাড়ে এবং দামের সামান্য বৃদ্ধির ফলে অনেকখানি কমে, তাহা হইলে ঐ জিনিসের চাহিদা অতিপরিবর্তনশীল (elastic)। মোটরকার, সাইকেল, রেডিও, গ্রামোফোন প্রভৃতি আরামপ্রদ ও বিলাসের সামগ্রীর চাহিদা অতিপরিবর্তনশীল। এইসব জিনিস চড়া দামে বিক্রয় হয় বলিয়া দরিদ্র জনসাধারণের নাগালের বাহিরে। সুতরাং ইহাদের দাম কমিলে বিক্রয় [illegible]ভাবে বাড়িতে পারে।

অনতিপরিবর্তনশীল চাহিদা (Inelastic Demand) :

যদি কোন জিনিসের চাহিদা দামের বেশ কিছুটা হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও অতি সামান্য পরিমাণে বাড়ে, তাহা হইলে ঐ জিনিসের চাহিদা অনতিপরিবর্তনশীল। চাউল, লবণ প্রভৃতি বাঁচার জন্য আবশ্যক জিনিসের এবং তামাক, পান ইত্যাদি অভ্যাসগত বা আচারগত আবশ্যক জিনিসের চাহিদা অনতিপরিবর্তনশীল। এইসব জিনিস অপেক্ষাকৃত অল্প দামে বিক্রয় হয় বলিয়া ধনী-দরিদ্র সকলেরই নাগালের মধ্যে। কাজেই দামের সামান্য হ্রাস করিয়া এইসব জিনিসের বিক্রয় বাড়ানোর সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ।

চাহিদার পরিবর্তনশীলতা কি ভাবে পরিমাপ করা যায়? কোন জিনিস কেনায় যে মোট ব্যয় হয়, তাহার সাহায্যেই চাহিদার পরিবর্তনশীলতা মাপা যায়। দুইটি জিনিস—চাউল ও চা—উদাহরণ হিসাবে লইয়া দেখা যাউক, ভিন্ন ভিন্ন বাজার দামে এই দুইটি জিনিসের পিছনে কত টাকা ব্যয়িত হইবে।

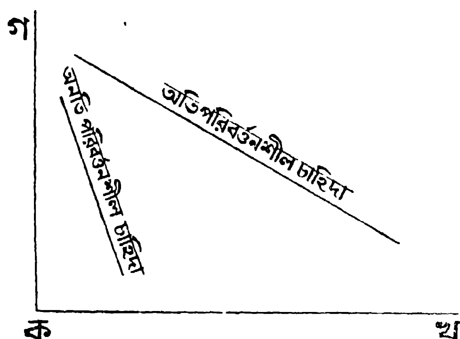
মণ-করা দাম	যে পরিমাণ চাউলের চাহিদা হইবে	মোট ব্যয়
২০ টাকা	৪০০ মণ	৮০০০ টাকা
১০ টাকা	৫০০ মণ	৫০০০ টাকা
৫ টাকা	৭০০ মণ	৩৫০০ টাকা

প্রতি পাউণ্ডের দাম	যে পরিমাণ চা-এর চাহিদা হইবে	মোট ব্যয়
২ টাকা	১০০ পাউণ্ড	২০০ টাকা
১½ টাকা	২০০ পাউণ্ড	৩০০ টাকা
১ টাকা	৪০০ পাউণ্ড	৪০০ টাকা

দেখা যাইতেছে যে চাউলের দাম কমিতে থাকিলে চাউলের চাহিদা সামান্য পরিমাণে বাড়িতে থাকে বটে, কিন্তু চাউলের উপর ব্যয়িত মোট টাকার পরি[illegible] কমিতে থাকে। ইহাই অনতিপরিবর্তনশীল চাহিদার বিশেষত্ব। পক্ষান্তরে চা-এর দাম কমিতে থাকিলে চা-এর চাহিদাও বাড়ে, চায়ের উপর ব্যয়িত টাকার পরিমাণও বাড়ে। ইহাই অতিপরিবর্তনশীল চাহিদার বিশেষত্ব।

দি কোন ক্ষেত্রে এরূপ হয় যে দাম সামান্য কমা বা বাড়ার ফলে মো[illegible]

টাকার পরিমাণে কোন পরিবর্তন হইল না—ইহা একই রহিল, তবে চাহিদার পরিবর্তনশীলতাকে 'একক' (unity) বলা হয়। অনতিপরিবর্তনশীল চাহিদার পরিবর্তনশীলতা 'একক' অপেক্ষা কম, কারণ দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয়িত



টাকার পরিমাণও কমে। অতিপরিবর্তনশীল চাহিদার পরিবর্তনশীলতা 'একক' অপেক্ষা বেশী, কারণ দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয়িত টাকার পরিমাণ বাড়ে।

যে যে বিষয়ের উপর চাহিদার পরিবর্তনশীলতা নির্ভর করে (Factors on which Elasticity of Demand depends) :

আমরা দেখিয়াছি যে চাউল, লবণ প্রভৃতির মত প্রয়োজনীয় (necessaries) দ্রব্যের চাহিদা অনতিপরিবর্তনশীল ; কিন্তু মোটরকার, গ্রামোফোন প্রভৃতির মত বিলাস-সামগ্রীর চাহিদা অতিপরিবর্তনশীল। ইহার কারণ হইল যে চাউল, লবণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমাদের অতি প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটায় এবং মোটরকার, গ্রামোফোন প্রভৃতির মত বিলাস-সামগ্রী আমাদের অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটায়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, যে দ্রব্য যত প্রয়োজনীয় অভাব দূর করে তাহার চাহিদা ততই অনতিপরিবর্তনশীল।

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায় যে সকল জিনিসের দাম অত্যন্ত বেশী তাহাদের চাহিদা অনতিপরিবর্তনশীল। ইহার কারণ এই যে মাত্র ধনী ব্যক্তিরা এই সকল জিনিস কিনিতে পারে। দাম সামান্য বাড়িলেও যখন তাহারা পূর্ববৎ কেনে তখন দাম সামান্য কমিলেও পূর্ববৎ কিনিবে।

...ব্যের যদি পরিবর্ত (substitute) থাকে তবে ইহার চাহিদা অতিপরিবর্তন-...বে। চা হইল কফির পরিবর্ত। চায়ের দাম যদি বাড়ে তবে যাহারা চা

পানে অভ্যস্ত ছিল তাহারা কফি পান সুরু করিতে পারে। পরিবর্তের সংখ্যা যত বেশী হইবে, চাহিদার পরিবর্তনশীলতাও তত বেশী হইবে।

দ্রব্যটি যদি বিভিন্ন ব্যবহারে লাগে তবে ইহার চাহিদা অতিপরিবর্তনশীল হইবে। যেমন, কয়লার দাম কমিলে যাহারা কাঠ ব্যবহার করিত তাহারা কয়লা ব্যবহার করিয়া কয়লার চাহিদা বাড়াইতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. State and explain the relation between marginal utility and total utility. Illustrate your answer by means of an example,

(C. U., 1942) (৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা দেখ)

2. State the law of demand. Explain why a rise in price tends to decrease demand and a fall in price to increase it.

(C. U., 1950) (৪১-৪২ পৃষ্ঠা দেখ)

3. State and illustrate the law of demand. Distinguish between elastic and inelastic demand.

(C. U., 1953) (৪১-৪৬ পৃষ্ঠা দেখ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভোগের বিভিন্ন সমস্যা

সঞ্চয় ও ব্যয় (Saving and Spending) :

আয়ের উপার্জন এবং ব্যয়ই অর্থনৈতিক কাজকর্মের উদ্দেশ্য। ব্যয় কা[illegible] বলে? অর্থবিদ্যায় ব্যয় মানেই আয়ের বিনিময়ে অভাব পরিতৃপ্তির জন্য জিনিস সংগ্রহ করা। 'প্রত্যক্ষ বর্তমান ভোগের উদ্দেশ্যে আয়ের ব্যবহার'—ব্যয়ের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা যাইতে পারে। সকল উৎপাদনশীল কাজকর্মের লক্ষ্য হইল ভোগ (consumption)। আমরা পরিশ্রম করি যাহাতে [illegible] ভোগের সুযোগ পাই। তাই ইহা মনে হওয়া [illegible]বিক যে আমাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে [illegible] হইলে সবটুকু আয় ভোগের জন্যই ব্যয় করা উচিত। [illegible] বলে। আয়ের যে অংশ ব্যয়িত হয় [illegible] ভোগের সংকোচ। কাজেই আয়ের [illegible]

সকল উৎপাদনশীল কর্মপ্রচেষ্টা[illegible] লক্ষ্য হইল [illegible]

কোন ভোগে লাগে না। কিন্তু সঞ্চয় যদি বর্তমান ভোগে না লাগে, তাহা হইলে লোকে সঞ্চয় করে কেন ?

ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াও মানুষ সঞ্চয় করে। মানুষের যতই বয়স বাড়িতে থাকে ততই কর্মক্ষমতা কমিয়া আসে। কাজেই বর্তমান আয় হইতেই তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য কিছু আলাদা করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। তাহা ছাড়া পরিবারের জন্যও তাহাকে উপার্জন করিতে হয়; সন্তানের ভবিষ্যৎ লইয়া তাহাকে মাথা ঘামাইতে হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে সন্তানের প্রতি সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা যায় সেজন্যও মানুষকে তাহার বর্তমান আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় ভবিষ্যতের জন্য রাখিতে হয়।

টাকা জমাইয়া সম্পত্তি করার ইচ্ছাও মানুষকে অনেক সময় সঞ্চয় করিতে উদ্বুদ্ধ করে। বাড়ীঘর, জমিজমা, বাগান, ফ্যাক্টরী ইত্যাদির মালিক হইয়া বসিয়া ধনী পরিবার হিসাবে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা অনেক সঞ্চয়েরই মূল কারণ।

এইভাবে ভবিষ্যতের চিন্তা, পরিবারের প্রতি মমতা, উচ্চাশা, সম্পত্তির জন্য কামনা, ইত্যাদি নানা কারণেই মানুষ সঞ্চয় করে। সঞ্চয়ের মূলে যে সব কারণ ও প্রেরণা কার্যকর, তাহাদের কোনটাই অসঙ্গত নয়। অভাব ও আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য মানুষের পক্ষে সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। ব্যয় এবং সঞ্চয়—উভয়ই মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে বলিয়া সমাজের পক্ষে উভয়ই সমান কল্যাণকর।

ভবিষ্যতের চিন্তা, পরিবারের প্রতি মমতা, উচ্চাশা প্রভৃতি কারণেই মানুষ সঞ্চয় করে

কখনও কখনও বলা হইয়া থাকে যে ব্যয়ই মানুষের নিয়োগের (employment) ব্যবস্থা করে; সঞ্চয় করে না। এই ধারণা ভুল। খাদ্য এবং পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য লোকের উপার্জন ব্যয়িত হইলে, ঐ সব জিনিসের উৎপাদনে বহু লোক কাজ পাইবে। আবার লোকে বাড়ী বা কারখানা করার উদ্দেশ্যে উপার্জনের অংশ [illegible] করিলেও ঘরবাড়ী বা যন্ত্রপাতি উৎপাদ[illegible] কাজ পাইবে। কাজেই, ব্যয় ও সঞ্চয়—উভয়ই লোকের [illegible] করি[illegible] পারে। ব্যয়ের ফলে, মানুষ বর্তমান অভাব মিটা[illegible] [illegible]

[illegible]র সঞ্চয়ের ফলে, মানুষ ভবিষ্যতের অভাব মিটানে[illegible]

সঞ্চয় নিয়োগের ব্যবস্থা করে না—ইহা ভুল

সঞ্চয় হইতেই মূলধন হয়। সঞ্চয় যতই বাড়ে ততই দেশে বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, রেলপথ, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদকের জিনিস (Capital Goods) উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ফলে অর্থনৈতিক প্রগতি এবং জাতীয় গৌরব সমৃদ্ধ হয়। অতীতে মানুষ সঞ্চয় না করিলে কি তাজমহল গড়িয়া তোলা সম্ভব হইত? কাজেই কোন জাতি যদি ভাল রাস্তাঘাট, রেলপথ, জাহাজ, বিদ্যুতের কারখানা, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে চায় তবে তাহাকে সঞ্চয় করিতেই হইবে। সঞ্চয়ের ফলে জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়া যায়; ফলে, ভবিষ্যতে ভোগও বাড়িয়া যায়। আয়ের সমস্তটাই বর্তমান ভোগের পথে অপচয় করিলে জাতি কখনও বড় হইতে পারে না।

সঞ্চয়ের ফলে জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, ফলে ভবিষ্যতে ভোগও বাড়িয়া যায়

অপর দিকে, ব্যয় না করার অর্থই হইল রেলপথ, কলকারখানা ইত্যাদির সাহায্যে যে সমস্ত জিনিস প্রতিনিয়ত উৎপাদিত হয় সেগুলি ভোগে না লাগানো। সঞ্চয়ের সাহায্যে যে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল, সেখানে উৎপাদিত কাপড় যদি বিক্রয়ই না হয়, তাহা হইলে আর সঞ্চয় করিয়া লাভ হইল কি? কৃপণতা জাতির পক্ষে আত্মহত্যার সামিল।

কৃপণতা জাতির পক্ষে আত্মহত্যার সামিল

কাজেই, পরবর্তী কালে ভোগ বাড়িলেই শুধু বর্তমানের সঞ্চয় সার্থক হইতে পারে। কোন দেশে যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্যই ক্রমাগত ভোগ কমাইয়া দেওয়া হইতে থাকে, তাহা হইলে অচিরেই সেই দেশে আর্থিক সংকট ও দুঃখদুর্দশা দেখা দিবে।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ব্যক্তির পক্ষে ব্যয় ও সঞ্চয়ের মধ্যে অনুপাত কি হইবে? অল্প কথায় বলা যায় যে ব্যক্তি তাহার উপার্জন হইতে ব্যয় ও সঞ্চয় এরূপভাবে করিবে যাহাতে উভয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। ব্য[illegible] বর্তমান অভাব মিটাইবার জন্য বা বর্তমানে তৃপ্তি পাইবার জন্য; এবং সঞ্চয় করা [illegible] ভবিষ্যতে তৃপ্তি পাইবার জন্য। যদি ব্যয়ের প্রান্তিক উপভোগ সঞ্চয়ের প্রান্তিক [illegible]গের সমান হয়, তাহা হইলেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মিলাইয়া ব্যক্তির মোট [illegible] [illegible]ক।

[illegible], তত্ত্ব[illegible]ক উপযোগ বিধি (Law of Equi-Marg[illegible]
[illegible]দের পরিমা[illegible]

আলোচনা করা হইতেছে। আমার হাতে ব্যয়ের জন্য যে টাকাটা আছে, জিনিস কিনিতে গেলেই মনে এই সমস্যা উঠিবে যে, ঐ টাকার কোন্ অংশ কোন্ জিনিসের জন্য ব্যয় করিব। ধর, আপাতভঃ মাছ, তরকারী ও ফল কিনিলেই চলে। সেক্ষেত্রে এই সমস্যাই উঠিবে—মাছ কত আনার কিনিব এবং তরকারী ও ফলই বা কত আনার কিনিব। অতিরিক্ত মাছ কিনিয়া ফেলিলে ফল বা তরকারী বাধ্য হইয়া কম কিনিতে হইবে, কারণ ব্যয়ের টাকা সীমাবদ্ধ; ফলে, মাছের প্রান্তিক উপযোগ হইবে কম, আর ফল বা তরকারীর প্রান্তিক উপযোগ হইবে অপেক্ষাকৃত বেশী। যদি আর একটু কম মাছ কিনিয়া আর একটু বেশী তরকারী বা ফল কিনিতাম, তাহা হইলে তৃপ্তি বা উপযোগ একদিকে যতটা কমিত আর একদিকে তাহার চেয়ে বাড়িত অনেক বেশী। এইভাবে মাছ, তরকারী ও ফল, এই তিনটি জিনিস কেনার পরিমাণ কমাইয়া বাড়াইয়া এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলা যায় যখন তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রেই ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঠিক এই অবস্থাতেই মোট তৃপ্তি হয় সর্বাধিক।

যখন সকল ক্ষেত্রে ক্রয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়, তখন মোট তৃপ্তি হয় সর্বাধিক

উপরে তিনটি জিনিসের উদাহরণ দেওয়া হইল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেনার মত জিনিস অন্তহীন। আমাদের সীমাবদ্ধ আয় এইসব জিনিস কেনায় এমনভাবে ছড়াইয়া দিতে হয় যাহাতে মোট তৃপ্তি সর্বাধিক হয়। আর মোট তৃপ্তি সর্বাধিক হয় তখনই, যখন প্রত্যেক জিনিসের বেলায়ই আমাদের ব্যয়িত টাকার শেষ 'এককে'র উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। এই সূত্রটিকেই সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Equi-marginal Utility) বলা হয়।

পারিবারিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে এঙ্গেলের নিয়মসমূহ (Engel's Laws):

পরিবারের আয় বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে কি ভাবে বণ্টিত হয়, তাহা জানা যায় পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট হইতে। একটি পরিবারের আয় ও ব্যয়ের হিসাবকে পারিবারিক বাজেট বলা হয়। জার্মানীর কয়েক শত পরিবারের বাজেট আলোচনা করিয়া এঙ্গেল ভোগের নিম্নলিখিত নিয়মগুলি (laws sumption) আবিষ্কার করিয়াছিলেন :—

১। আয় যত বেশী হইবে, খাদ্যের জন্য ব্যয়ের অনুপাত [illegible] ।কেরা আয়ের অপেক্ষাকৃত কম অংশ খাদ্যের জন্য ব্য[illegible] ত বেশী অংশ খাদ্যের জন্য ব্যয় করে।

নয়; প্রকৃত সমস্যা হইল দক্ষতার সহিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন ধন দেশের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে ন্যায্য ও উপযুক্ত ভাবে বণ্টন।

(৪) কোন নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিবেশ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব যতই বাড়িতে থাকে, ততই জন্ম-হারের কমিবার দিকেই স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়। অর্থাৎ যদি অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন না হয় তবে জনসংখ্যা বেশ কিছু বাড়িয়া গেলে তখন জন্মহার কমিতেই থাকে। মানুষের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসারও জন্মহারের কমিবার দিকে যে ঝোঁক, তাহার পোষকতা করে। এইভাবে জনসংখ্যার ঝোঁক সব সময়েই স্থিতিশীল হওয়ার দিকে। জনসংখ্যা সব সময়েই জ্যামিতিক প্রগতিতে (geometrical progression) বাড়িয়া চলার চেষ্টা করে,—ম্যাল্থাসের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল।

কাম্য জনসংখ্যা সম্বন্ধে মতবাদ (The Optimum Theory of Population):

ম্যাল্থাসের মতবাদের সমালোচনা কালে বলা হইয়াছে যে আধুনিক অর্থ-বিদগণ কোন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ঐ দেশের মোট ধনবৃদ্ধির পটভূমিকাতে বিচার করিতে চান। প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্ত-ভাবে কাজে লাগাইবার জন্য একটি বিশেষ জন-সংখ্যার প্রয়োজন। এই জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলা যায়। জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যার অপেক্ষা কম হইলে মাথাপিছু সর্বাধিক উৎপন্ন বা আয় হয় না। জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইলে মোট উৎপন্ন বাড়িতে পারে, কিন্তু মাথাপিছু আয় বা ভোগ কমিতে থাকে। সুতরাং কাম্য জনসংখ্যা হইল সেই জনসংখ্যা যাহাতে মাথাপিছু আয় বা ভোগ সর্বাধিক হয়।

কাম্য জনসংখ্যা হইল সেই জনসংখ্যা যাহাতে মাথাপিছু আয় বা ভোগ সর্বাধিক হয়

শ্রমের দক্ষতার বিভিন্ন উপাদান (Factors of Efficiency of Labour):

ধন উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রম যে পরিমাণ সাফল্য লাভ করে, তাহাই শ্রমের দক্ষতার পরিমাপ। শ্রমের দক্ষতা যত বেশী হইবে, ততই প্রতি ঘণ্টা শ্রমের ফলে উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণও বেশী হইবে। সুতরাং, ধন

শ্রমিকের যোগ্যতাই শ্রমের দক্ষতা

উৎপাদন ব্যাপারে শ্রমিকের যোগ্যতাই শ্রমের দক্ষতা,—এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রমের দক্ষতা কতকগুলি বিষয়ের বা অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রধানতঃ শ্রমিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরই তাহার দক্ষতা নির্ভর করে। অনুকূল জলবায়ু শ্রমের দক্ষতা বাড়ায়। শ্রমিকের উপর শীত-গ্রীষ্মের আতিশয্যের প্রভাব ক্ষতিকর। নাতি-শীতোষ্ণ জলবায়ুই সব দিক দিয়া প্রশস্ত। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের গুণাগুণের উপর। একজন ভালো শ্রমিকও খারাপ যন্ত্রপাতি দিয়া কাজ করিতে গেলে তাহার কাজে দক্ষতার কোন ছাপ থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, শ্রমিককে ভালো যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের যোগান দেওয়া, অর্থাৎ সোজা কথায় ব্যবসায় দক্ষভাবে চালানোর ব্যবস্থা করা, শ্রমিকের নিয়োগকর্তার কর্তব্য। শ্রমের দক্ষতা তাই অনেক পরিমাণে পরিচালনার দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

১। জলবায়ু, ২। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, ৩। পরিচালকের দক্ষতা, ৪। শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও মানসিক গুণাগুণ এবং নৈতিক চরিত্র

চতুর্থতঃ, শ্রমের দক্ষতা অংশতঃ শ্রমিকের নিজস্ব স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যের উপর এবং অংশতঃ তাহার মানসিক গুণাগুণ ও নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভর করে। মানসিক গুণাগুণ ও নৈতিক চরিত্র আবার কতক পরিমাণে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

শ্রমিকের স্বাস্থ্যের উপরই তাহার কাজ করার দৈহিক যোগ্যতা নির্ভর করে। স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য কতকটা জলবায়ুর উপর নির্ভর করিলেও প্রধানতঃ নির্ভর করে জীবনযাত্রার মানের (standard of living) উপর। ভাল স্বাস্থ্য পাইতে হইলে পুষ্টিকর খাদ্য, অভ্যাসগত আরামের জিনিস, অন্ততঃ দুই কামরা যুক্ত একটি ঘর, পরিচ্ছন্নতা, শীত হইতে রক্ষার উপযুক্ত পরিচ্ছদ এবং কিছুটা আমোদ-প্রমোদের সুযোগ থাকার একান্ত প্রয়োজন। দক্ষতার জন্য যে পরিমাণ আরাম প্রয়োজন, তাহা সকল দেশে একরকম নয়।

পঞ্চমতঃ, কেবল দৈহিক যোগ্যতা থাকিলেই চলিবে না, মানসিক যোগ্যতা এবং বুদ্ধির যোগ্যতাও থাকা চাই। মানসিক ও বুদ্ধির যোগ্যতা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর কিছুটা নির্ভর করিলেও প্রধানতঃ নির্ভর করে কতকগুলি বাহ্যিক অবস্থার উপর। শিক্ষা হইল অন্যতম বাহ্যিক অবস্থা। বুদ্ধির দিক দিয়া যোগ্যতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার ফলে

য়ুরোপ ও আমেরিকায় শ্রমের দক্ষতা বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়াও টেক্‌নিক্যাল বা কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কারিগরি শিক্ষা শ্রমিককে দক্ষ করিয়া তোলে। যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র সকল রকমের শিল্পগত বা কারিগরি শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না করিবে, ততদিন পর্যন্ত দেশের শ্রমশক্তির দক্ষতা অতি নিম্নস্তরে থাকিতে বাধ্য।

৫। বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা

মনের কয়েকটি গুণাগুণ ও নীতিবোধের উপর, অর্থাৎ সোজা কথায় চরিত্রের উপর, শ্রমিকের নৈতিক যোগ্যতা নির্ভর করে। শ্রমিকের কাজ করার ইচ্ছা থাকা চাই। এই কাজ করার ইচ্ছা অংশতঃ নির্ভর করে তাহার মানসিক উৎসাহের উপর এবং অংশতঃ নির্ভর করে যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহাকে কাজ করিতে হয়, তাহার উপর। মনের দুর্বলতা এবং আলস্য দক্ষতার পথে বাধাস্বরূপ। অপর পক্ষে যে পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে হয় তাহা এমন হওয়া উচিত যাহাতে শ্রমিকের উৎসাহ এবং উচ্চাশা পোষকতা লাভ করে। মানুষ সাধারণতঃ কাজ করে ফলপ্রাপ্তির আশায়। কাজ ভালো হইলে তাহার পুরস্কার সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া উচিত; এই পুরস্কার প্রত্যক্ষভাবে কৃত কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হইলেই ভাল হয়। কর্মঠ শ্রমিকদের পদোন্নয়ন ও উন্নতির সম্ভাবনা থাকা উচিত। শিক্ষার ও [illegible] সুযোগ সুবিধা থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা আরও বাড়ানো চলে। চাকুরীর নিশ্চয়তা এবং পুরা বেতনে ছুটির সুযোগও থাকা উচিত। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক-সংঘ গঠনের অধিকারও শ্রমিকদের দিতে হইবে। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের সততা ও আত্মসম্মানবোধ উদ্বুদ্ধ করে; ফলে শ্রমিকের দায়িত্বজ্ঞান নির্ভরযোগ্য হইয়া উঠে। ট্রেড ইউনিয়নের সাহায্যে শ্রমিকেরা মালিকদের নিকট হইতে ন্যায্য মজুরীও আদায় করিতে পারে।

৬। পুরস্কার ও পদোন্নতির সম্ভাবনা, ৭। চাকুরীর নিশ্চয়তা

৮। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিকসংঘ

প্রশ্নোত্তর

1. Analyse and comment upon the factors that determine the supply of labour in a country. (C. U., 1943)

[**উত্তরের কাঠামো:** কোন দেশে শ্রমের যোগান পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: (১) জনসংখ্যার আয়তন; (২) মোট জনসংখ্যার তুলনায় ১৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের লোকের

অনুপাত, (৩) উপযুক্ত বয়সের স্ত্রীলোকদের কত অংশ উৎপাদনশীল শ্রমে নিয়োজিত, (৪) শ্রমশীল লোকদের পরিশ্রমের পরিমাণ, এবং (৫) শ্রমের দক্ষতা।

কাজেই, নিম্নলিখিত চারিটি উপায়ের যে কোন একটি উপায়ে শ্রমের যোগান বাড়ানো যায়,—(১) জনসংখ্যা বাড়াইয়া, (২) ১৫ বছরের কম বয়সী এবং ৫০ বছরের বেশী বয়সী লোকদের কাজে নিয়োজিত করিয়া, (৩) মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ হইতে সরাইয়া আনিয়া উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত করিয়া, নিযুক্ত শ্রমশীল লোকদের পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়াইয়া, এবং (৪) শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সাহায্যে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াইয়া। যুদ্ধের সময়ে অল্প বয়সী এবং বেশী বয়সী পুরুষদের, এমন কি মেয়েদেরও একটা না একটা কাজে নিয়োজিত করিয়া শ্রমের যোগান বাড়ানো হয়। জনসংখ্যার বৃদ্ধি সবসময়ে কল্যাণকর হয় না। তাহা ছাড়া মানুষ জনসংখ্যাকে ইচ্ছামত পুরাপুরি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। কাজেই শ্রমের যোগান বাড়ানোর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হইল শ্রমের দক্ষতা বাড়ানো। জীবনযাত্রার উন্নত মানে অভ্যস্ত একজন দক্ষ শ্রমিক শুধু যে বেশী সম্পদ উৎপাদিত করে তাহাই নয়, নিজে বেশী সম্পদ ভোগও করে। এইভাবে তাহার নিজেরও কল্যাণ হয়, সমাজেরও কল্যাণ হয়।]

দশম অধ্যায়

মূলধন

মূলধন কাহাকে বলে ? (What is Capital ?)

সম্পদ মানেই এমন জিনিস, যাহার যোগান সীমাবদ্ধ, যাহার উপযোগিতা আছে এবং যাহার মূল্যও আছে। আমরা দেখিয়াছি যে সম্পদকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়ঃ (১) ভোগ্য দ্রব্য (consumers' goods) এবং (২) উৎপাদকের দ্রব্য (producers' goods)। অভাববোধের প্রত্যক্ষ তৃপ্তির জন্য ভোগ্য জিনিস ব্যবহৃত হয়। ভোগের জন্যই এইসব দ্রব্যের চাহিদা। কিন্তু উৎপাদকের দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে কোন অভাব মোচন করে না। কয়লা, তুলা, লোহা প্রভৃতি কাঁচামাল এবং ঘরবাড়ী, গুদাম, ডক, রেলপথ, জাহাজ, হালের বলদ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল দ্রব্য হইল উৎপাদকের দ্রব্যের উদাহরণ। উৎপাদকের দ্রব্যকেই মূলধন বলা হয়। উৎপাদনের সহায়ক বলিয়াই লোকের কাছে

ভোগ্য জিনিস এবং উৎপাদকের জিনিস

উৎপাদকের দ্রব্যকেই মূলধন বলা হয়

এই সকল দ্রব্যের চাহিদা আছে। এইসব দ্রব্য ভোগ্য জিনিসের উৎপাদনে সহায়তা করে। এইভাবে ইহাদের সাহায্যে পরোক্ষভাবে অভাবমোচন হয়। যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া একটি লাঙ্গল তৈয়ারী করে, সে প্রত্যক্ষভাবে ঐ লাঙ্গলের সাহায্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি কোন অভাবই তৃপ্ত করিতে পারে না। লাঙ্গলের সাহায্যে প্রথমে গম প্রভৃতি ভোগ্য জিনিস উৎপাদিত হওয়ার পরেই কেবল তাহার অভাব তৃপ্ত হইতে পারে। এইভাবে ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের সহায়তা করিয়া মূল দ্রব্য পরোক্ষভাবে আমাদের অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে। যে সম্পদ অভাব-তৃপ্তির জন্য প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত না হইয়া আরও সম্পদ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই মূলধন বলে।

উৎপাদকের দ্রব্য পরোক্ষভাবে আমাদের অভাব মোচন করে; এই সমস্ত দ্রব্যকে মূলধন বলে

মূলধনের এই সংজ্ঞা দেওয়ার পর আমরা টাকাকড়ি, সম্পদ ও ভূমি হইতে ইহার পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারি।

মূলধন ও টাকাকড়ি (Capital and Money) :

সাধারণতঃ ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থকে মূলধন বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই অর্থ বা টাকাকড়ি মাত্র কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনিবার এবং শ্রমিকদের মজুরী দিবার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যাহা মূলধন তাহার বৃদ্ধি ঘটিলে উৎপাদনেরও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু নিছক টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না। ধরা যাউক যে, দেশে টাকাকড়ির পরিমাণ হঠাৎ দ্বিগুণ হইয়া গেল, কিন্তু কাঁচামাল ইত্যাদির পরিমাণ পূর্ববৎই রহিল। ফলে দামের বৃদ্ধি হইবে মাত্র, উৎপাদনের কোনরূপ বৃদ্ধি হইবে না। সুতরাং টাকাকড়ি মূলধন নহে।

মূলধন ও সম্পদ (Capital and Wealth) :

সম্পদ বলিতে এমন দ্রব্য বুঝায় যাহার সরবরাহ অপ্রচুর এবং যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান হিসাবে, মানুষের অভাব মোচন করে। মূলধন বলিতেও অপ্রচুর দ্রব্য বুঝায়; কিন্তু এই সকল অপ্রচুর দ্রব্য মাত্র পরোক্ষ-ভাবে মানুষের অভাব দূর করে,—অর্থাৎ ইহারা উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হয় মাত্র, প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব মোচন করে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সকল মূলধনই সম্পদ, কিন্তু সকল সম্পদ মূলধন নহে। কোন দ্রব্য মূলধন কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য দেখিতে হইবে যে কিরূপ কার্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

যদি ইহা প্রত্যক্ষভাবে অভাব মোচন কার্যে ব্যবহৃত হয় তবে ইহা সম্পদ; কিন্তু যদি ইহা উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হয় তবে ইহা মূলধন। চাউল সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ইহা সম্পদ। কিন্তু অনেক সময় আবার ইহা সুতা তৈয়ারীর কাজে লাগে; তখন ইহাকে অবশ্য মূলধন হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

মূলধন ও ভূমি (Capital and Land) :

মূলধন ও ভূমি উভয়েই উৎপাদনের উপাদান; কিন্তু ভূমি হইল প্রকৃতিদত্ত এবং মূলধন হইল মানুষের সৃষ্ট। মানুষের সৃষ্ট না হইলে কোন কিছুকে মূলধন হিসাবে গণ্য করা হয় না। সুতরাং ভূমিকেও মূলধন হিসাবে গণ্য করা যায় না। কয়েকজন অর্থবিজ্ঞানী অবশ্য এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁহারা ভূমিকে মূলধন হিসাবে গণ্য করারই পক্ষপাতী। তাঁহাদের যুক্তি হইল ভূমিকে আমরা যে অবস্থায় দেখিতে পাই তাহা প্রকৃতিদত্ত নহে। জমির উপর মানুষ অনেক পরিশ্রম করিয়াছে, ইহার প্রকৃতিদত্ত গুণের অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। এই কারণে জমিকে অন্ততঃ আংশিক ভাবে মানুষের সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এবং এই স্বীকারের ফলে ইহা মূলধনের পর্যায়ভুক্ত হইবে। এই যুক্তি যদি মানিয়া লওয়া হয় তবুও ভূমিকে মূলধনের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না; কারণ ভূমির পরিমাণ প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ, মানুষ ইহা বাড়াইতে পারে না।

মূলধনের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Capital) :

মূলধনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার উৎপাদনশীলতা (productiveness)। মূলধন উৎপাদনের অন্যতম উপাদান। সম্পদের উৎপাদনে মানুষ মূলধন ব্যবহার করে। জমিও উৎপাদনের একটি উপায়; কিন্তু জমি মানুষের সৃষ্টি নয়, প্রকৃতির দান। জমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য, মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপায় (produced means of production) বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহা মানুষের অতীত শ্রমের ফল।

উৎপাদনশীলতা মূলধনের প্রধান বৈশিষ্ট্য

যে সম্পদ মানুষের শ্রমে উৎপাদিত এবং আরও সম্পদ উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত, তাহাকেই মূলধন বলা হয়। আয় সৃজনের ক্ষমতাই মূলধনের উৎপাদনশীলতার মাপকাঠি। মানুষের সৃষ্ট যে সম্পদ হইতে আয় লাভের আশা থাকে, তাহাই মূলধন। যন্ত্রপাতি, কারখানা, রেলপথ, পোতাশ্রয় প্রভৃতি আয়

আয় বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতাই উৎপাদনশীলতার মাপকাঠি

স্বজন করে বলিয়াই মূল্যবান। দোকানে এবং গুদামে যে মাল মজুত থাকে তাহাও মূলধন হিসাবেই গণ্য হওয়া উচিত, কারণ ব্যবসায়ী ঐ মাল মজুত করিয়া রাখে,—বিক্রয় করিয়া আয় করিবার জন্য। দোকানে পড়িয়া থাকা এক খণ্ড সাবানও মূলধন, কারণ দোকানদারের কাছে ইহা আয়ের উৎস। কিন্তু গৃহস্থ যখন সাবানটি কেনে, তখনই ইহা ভোগ্য জিনিসে পরিণত হয়; কারণ গৃহস্থ সাবানটি কেনে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়, ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। কয়লা রেলগাড়ীর ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হইলে তাহা মূলধন, কিন্তু গৃহে রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইলে তাহা সম্পদ। ইঞ্জিনে ব্যবহৃত কয়লা আয় স্বজন করে, কিন্তু গৃহে রন্ধন-কার্যে ব্যবহৃত কয়লা আয় স্বজন করে না। সুতরাং গৃহে ব্যবহৃত কয়লা উৎপাদনশীল নয়। মূলধনের উৎপাদনশীলতা মানেই আয় স্বজনের ক্ষমতা।

মূলধনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার সম্ভাব্যতা (prospectiveness)। কেবল কাজ করিলেই মূলধন গড়িয়া উঠে না, অপেক্ষাও করিতে হয়। কিভাবে মূলধনের উদ্ভব হয় তাহা বিচার করিয়া দেখিলেই একথা পরিষ্কার হইবে। শ্রম দ্বারাই মূলধন উৎপাদিত হয়। কেহ যখন নিজের চেষ্টায় একটি লাঙ্গল তৈয়ারী করে তখনই লাঙ্গলের অস্তিত্ব সম্ভব হয়। কিন্তু তৈয়ারী করিতে সময়ের দরকার। ধরা যাউক, লাঙ্গলটি তৈয়ারী করিতে এক মাস লাগে।

সম্ভাব্যতা মূলধনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

এই এক মাস যে লোক লাঙ্গলটি তৈয়ারী করার কাজে ব্যস্ত থাকিবে, সে এই সময়ের মধ্যে অন্য কোন ভোগ্য জিনিস উৎপাদন করিতে পারিবে না। তাহা হইলে তাহার খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত এই এক মাস কিভাবে চলিবে? বলা বাহুল্য, এই এক মাস সে অতীত সঞ্চয়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকিবে; কিংবা নিজের কোন অতীত সঞ্চয় না থাকিলে, সে অন্যের অতীত সঞ্চয় ধার করিয়া নিজের ভরণপোষণ চালাইবে। কাজেই সঞ্চয় বাদ দিয়া কখনও মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না। সঞ্চয় মানেই ভোগ মুল্‌তুবি রাখা। যে সঞ্চয় করে সে বর্তমানে ভোগ বন্ধ রাখে এবং ভবিষ্যতে ভোগের আশা রাখে। ভোগ মুল্‌তুবি রাখাকেই 'অপেক্ষা করা' (waiting) বলে। মূলধন সঞ্চয়েরই পরিণতি বলিয়া মূলধন গঠনের জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Capital): মূলধনকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একটি শ্রেণীবিভাগ হইল—

(১) স্থায়ী মূলধন (fixed capital) এবং (২) চলতি মূলধন (circulating capital)।

স্থায়ী মূলধন ঃ যে মূলধন একবার ব্যবহারে নিঃশেষ প্রাপ্ত হয় না, বরং বার বার ব্যবহৃত হইতে থাকে, তাহাকেই স্থায়ী মূলধন (fixed capital) বলে। বাড়ীঘর, পোতাশ্রয়, রেলপথ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি হইল স্থায়ী মূলধনের উদাহরণ। এই সকল দ্রব্যের স্থায়িত্ব আছে। সম্পদ উৎপাদনের কাজে এই সকল দ্রব্য বেশ কিছুকাল ধরিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে।

সম্পদ সৃষ্টির কার্যে যে উৎপাদকের দ্রব্য বেশ কিছুকাল ধরিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে

চলতি মূলধন ঃ যে মূলধন শুধু একবার মাত্র ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায় তাহাকে চলতি মূলধন (circulating capital) বলে। কয়লা, তুলা, পাট প্রভৃতি কাঁচামাল ; চামড়া, জুতা প্রভৃতি আধা কাঁচামাল এবং দোকানে-গুদামে পড়িয়া-থাকা অর্থাৎ মজুত তৈয়ারী মাল হইল চলতি মূলধনের উদাহরণ। এক বাণ্ডিল সুতা বুনিয়া কাপড় তৈয়ারী করিলে, সেই সুতা আর দ্বিতীয় বার কাপড় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় না। দোকানে মজুত মাল একবার বিক্রয় করিয়া ফেলিলে, দ্বিতীয় বার আর তাহা বিক্রয় করিতে পারিব না।

যে উৎপাদকের দ্রব্য মাত্র একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহাকে চলতি মূলধন বলে

স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য ঋণকরা মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে সহজে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাউক যে একজন তাঁতী তাঁত বসাইবার জন্য ৫০০৲ টাকা এবং সুতা কিনিবার জন্য ২৫০৲ টাকা ঋণ করিয়াছে। ধরা যাউক সে এক মাসের মধ্যেই সুতাগুলি হইতে কাপড় বুনিয়া ফেলিল। কাপড় বিক্রয় হইলে সে সুতার জন্য যে টাকা ঋণ করিয়াছে তাহার সমস্তটাই পরিশোধ করিতে পারিবে, কিন্তু তাঁত বসানর জন্য যে টাকা ঋণ করিয়াছে তাহার এক ভগ্নাংশ মাত্র পরিশোধ করিতে পারিবে।

ভোগ্য ও সহায়ক মূলধন (Consumers' Capital and Auxiliary Capital) ঃ

মূলধনের দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ হইল ভোগ্য মূলধন (Consumers' Capital) এবং সহায়ক মূলধনে (Auxiliary Capital)। যাহা সরাসরিভাবে মানুষের

অভাব দূর করে তাহা যদি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহাকে ভোগ্য মূলধন বলা হয়। যেমন খাদ্য, পোষাক, গৃহাদি। শ্রমিক যখন কাজ করে এই জিনিসগুলি তাহার চাইই। যাহা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় অথচ প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করিতে পারে না তাহাই সহায়ক মূলধন, যেমন যন্ত্রপাতি, কারখানা ইত্যাদি

যে জিনিস প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করিতে পারে তাহা উৎপাদনে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে ভোগ্য মূলধন বলা হয়, যদি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে সেই উৎপাদকের জিনিসকে সহায়ক মূলধন বলা হয়

অনেক সময় আবার বিশিষ্ট (specialized or sunk) এবং নির্বিশেষ (unspecialized or floating) মূলধনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। বিশিষ্ট মূলধন হইল তাহাই যাহা একটিমাত্র বা কয়েকটি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে, যেমন তাঁত। তাঁত দিয়া বুনা ছাড়া আর কোন কাজ চলিবে না। অপর দিকে নির্বিশেষ মূলধন অনেক প্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারে, যেমন কয়লা। ইহা রেল ইঞ্জিন, কলকারখানা, জাহাজ প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

মূলধনের কার্যাবলী (Functions of Capital) ঃ

স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পার্থক্য মনে রাখিয়া মূলধনের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলধনের কার্য প্রধানতঃ দুই প্রকারের। স্থায়ী মূলধন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সাহায্যে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ায়। যন্ত্র মানুষকে বেশী করিয়া উৎপাদন করিতে সাহায্য করে। স্থায়ী মূলধন ব্যবহারের ফলে সমাজ কতখানি উপকৃত হয়, তাহা একটি ছোট উদাহরণ হইতে বুঝা যাইতে পারে। ধরা যাউক, বিনা লাঙ্গলে পরিশ্রম করিয়া মাসে ১০ মণ ধান উৎপন্ন করা যায়। ধরা যাউক, একটি লাঙ্গল তৈয়ারী করিতে এক মাসের শ্রম এবং পাঁচ মণ ধানের সমান মূল্যের কাঠ ইত্যাদি কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। ধরা যাউক, লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ করিলে মাসে ৩০ মণ ধান উৎপাদিত হইবে। লাঙ্গল না থাকিলে, দুই মাসের শ্রমে ২০ মণ ধান উৎপাদিত হয়। লাঙ্গল তৈয়ারীর জন্য এক মাস পরিশ্রম করিয়া পরের এক মাস লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ করিলে, দুই মাসের মোট পরিশ্রমের ফল স্বরূপ ৩০ মণ ধানই পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ লাঙ্গল ব্যবহারের

স্থায়ী মূলধন শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ায়

ফলে মোট লাভ হইল ১০ মণ ধান। ইহা হইতে কাঁচামালের খরচ বাবদ ৫ মণ ধান বাদ দিলে নীট লাভ দাঁড়াইবে ৫ মণ ধান। লাঙ্গলের সাহায্যে চাষের অর্থ হইল ধন-উৎপাদনে আমাদের শ্রম সোজাসুজি নিয়োজিত না করিয়া ঘুরানো পথে নিয়োজিত করা। শ্রম প্রথমে লাঙ্গল উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া পরে ধান উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হয়। এইভাবে মূলধনের জন্য উৎপাদন পদ্ধতি জটিলতর হইয়া যায়। উৎপাদনের জটিল পদ্ধতি প্রত্যক্ষ পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী উৎপাদনশীল।

চলতি মূলধনের কাজ হইল কাঁচামাল যোগান দেওয়া ও উৎপাদন যখন চলিত থাকে তখন শ্রমিকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। কয়লা, লোহা, পাট, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামাল সম্পদ উৎপাদনের প্রয়োজনে লাগে। আর শ্রমিকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয় মজুরীর মারফৎ। পুঁজিপতিরা যে তৈয়ারী মাল মজুত করিয়া রাখে, তাহা কেনার জন্য এই মজুরী ব্যয়িত হয়।

চলতি মূলধন শ্রমিকের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে ; সঞ্চয় না করিলে মূলধন সৃষ্ট হয় না

মূলধনের বৃদ্ধি (Growth of Capital) :

মূলধন এক দিক দিয়া অপেক্ষার এবং অপর দিক দিয়া পরিশ্রমের ফল। সঞ্চয় করিতেই হইবে, তাহা না হইলে মূলধন সৃষ্ট হইবে না। ভোগের উদ্দেশ্যে শ্রম স্থগিত রাখিয়া সেই শ্রম উৎপাদকের জিনিস তৈয়ারীর কাজে নিয়োজিত করার ইচ্ছা থাকিলেই সঞ্চয় সম্ভব হয়। সঞ্চয়ের পরিমাণকে উদ্বৃত্ত (surplus) বলা হয়। শ্রমিকেরা যখন মূলধন উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে তখন এই উদ্বৃত্ত বা সঞ্চিত সম্পদের সাহায্যে তাহাদের ভরণপোষণ চলে। একটি উদাহরণ লওয়া যাক। এক দেশে জেলেরা মাছ ধরে। ধরা যাক সেখানে নৌকা নাই। আরও ধরা যাক যে সেখানে মাছ বাজারে বিক্রয় হয় না। প্রত্যেকে যাহা ধরে তাহা নিজেরাই খাইয়া ফেলে। মাত্র একজন জেলে মাছ শুকাইয়া সঞ্চয় করিতে শিখিল। তারপর ধরা যাক যে অন্য দেশ হইতে একজন শিল্পী আসিয়া নৌকা প্রস্তুত করার কৌশল শিখাইয়া দিল। তখন যে জেলে শুকাইয়া মাছ সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছে, সে-ই নৌকা তৈয়ারীর কার্যে রত হইতে পারিবে, কারণ নৌকা তৈয়ারী করিবার সময় সে তাহার সঞ্চিত শুকানো মাছ খাইয়া থাকিতে পারিবে। নৌকা তৈয়ারী হইলে তাহার পক্ষে অধিক মাছ ধরা সম্ভব হইবে।

সঞ্চয়ের পরিমাণ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : (১) সঞ্চয়ের ক্ষমতা, (২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা, এবং (৩) সঞ্চয় বিনিয়োগ করিয়া আয় করিবার সুযোগ-সুবিধা।

(১) সঞ্চয়ের ক্ষমতা (ability to save) : সঞ্চয়ের ক্ষমতা আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। আয় যত বেশী হইবে, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও ততই বেশী হইবে।

(২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা (willingness to save) : সঞ্চয়ের ইচ্ছা বিভিন্ন মানসিক প্রেরণার উপর নির্ভরশীল। সাংসারিক বুদ্ধি মানুষকে অসুখবিসুখ, দুর্ঘটনা প্রভৃতির দরুণ যে-সব আকস্মিক ব্যয় হইতে পারে তাহার জন্য সঞ্চয় করিতে প্রণোদিত করে। দূরদর্শিতা এবং বাৎসল্যও লোককে ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা ও বিবাহের ব্যয়ের সংস্থানের জন্য সঞ্চয় করিতে প্রেরণা দেয়। ক্ষমতাপ্রিয়তা এবং উচ্চাশারও সঞ্চয়ের উপর যথেষ্ট প্রভাব। সমাজজীবনের পরিবেশও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সমাজ যদি অরাজক হয়, সরকার যদি দুর্বল হয়, ধনীদের উপর যদি চোরডাকাতের উৎপাত থাকে কিংবা অত্যন্ত বেশী সরকারী করের পীডন থাকে, তাহা হইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ভয়ানক কমিয়া যায়। শক্তিশালী সরকার, সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র, স্বাধীন সমাজ এবং ন্যায্য আইন-কানুনের ফলে সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয়।

(৩) বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা (opportunities of investment) : বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সুপ্রচুর হইলেও সঞ্চয় বৃদ্ধিলাভ করে। ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতির বিকাশ এবং শিল্পের প্রগতির দরুণ বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে। ফলে সঞ্চয়ও বাড়িয়াছে।

অবশ্য কেবল সঞ্চয়ের ফলেই মূলধন সৃষ্ট হয় না। লোকে সঞ্চয় করে টাকাকড়ি; কিন্তু টাকাকড়িই মূলধন নয়। মূল জিনিস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রমিক নিয়োগ করার জন্য এই টাকাকড়ির সঞ্চয়কে ব্যবহার করিতে হইবে। মূলধন সৃষ্ট হয় শ্রম দ্বারা। বাক্সবন্দী থাকিয়া সঞ্চয় কখনও মূলধনের সৃষ্টি করিতে পারে না। মূলধন মানেই জিনিস, টাকাকড়ি নয়।

টাকাকড়ির সঞ্চয়ই যথেষ্ট নয়, এই সঞ্চিত টাকাকড়িকে মূল জিনিস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে হইবে

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between fixed capital and circulating capital. (C. U., 1940, 1943) (৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Discuss the part played by capital in production. (C. U., 1926, 1931, 1936, 1943)

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** স্থায়ী মূলধন যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া শ্রমের দক্ষতা বাড়ায়। মূলধন উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়ার অর্থই হইল প্রথমে মূল জিনিস উৎপাদনের কাজে শ্রম নিয়োজিত করিয়া পরে ভোগ্য জিনিসের উৎপাদনে ঐ সব মূল জিনিসের সহায়তা লাভ করা। মূলধন এইভাবে উৎপাদনকে জটিলতর করিয়া তোলে। জটিল (round-about) উৎপাদন প্রত্যক্ষ-ভাবে উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর।

চলতি (circulating) মূলধন দ্বারাই শ্রমিকের কাঁচামালের এবং ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়। মূলধনীরা শ্রমিকদের খোরাক-পোষাকের ব্যবস্থা করে তাহাদিগকে মজুরী প্রদান করিয়া।]

3. Indicate the causes and circumstances that promote the growth of capital in a country. (C. U., 1928, 1940)

4. Define Capital and state the functions of Capital as a factor of production (C. U., 1950) (৭২, ৭৬ পৃষ্ঠা দেখ)

একাদশ অধ্যায়

সংগঠন ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা

ব্যবসায়-সংগঠকের কার্যাবলী (Functions of the Business Organiser) :

ব্যবসায় শব্দটি অর্থবিদ্যায় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায় বলিতে যে কোন প্রকার উৎপাদন বুঝায়। বর্তমান কালের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি খুব বড় বড় আয়তনের হয়। একটি মাঝারি আয়তনের প্রতিষ্ঠানেও বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন গুণের অনেক শ্রমিক এবং অনেক যন্ত্রপাতি নিয়োজিত হয়। কাজেই, প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে যদি এমন কেউ না থাকে যে প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দ সম্বন্ধে সামগ্রিক ভাবে চিন্তা করিয়া সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম কখনও সুষ্ঠুভাবে চলিতে

বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে থাকে ব্যবসায়-সংগঠক ; ব্যবসায়ের পরিচালক সে-ই

পারে না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে থাকে ব্যবসায়ের সংগঠক।* নিয়োগকর্তাও সে-ই। নিযুক্ত শ্রমিকেরা সকলেই নিজের নিজের নির্দিষ্ট কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে; কিন্তু ব্যবসায়ের সংগঠককে সমগ্র ব্যবসায়টি দেখাশোনা করিতে হয় এবং ইহার জন্য পরিকল্পনা তৈয়ারী করিতে হয়। ব্যবসায়ের পরিচালক সে-ই।

ব্যবসায়টির জন্য তাহাকে উপযুক্ত জমির (অর্থাৎ, অবস্থান) সন্ধান করিতে হয় অর্থাৎ ঠিক করিতে হয় কোন স্থলে সে তাহার কারখানা খুলিবে। তারপর তাহাকে বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন গুণের শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দিতে হয়। ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও করিতে হয় তাহাকে। যন্ত্রপাতি নূতন ধরণের কিনা তাহাও তাহাকে দেখিতে হয়; তাহা না হইলে উৎপাদনের খরচ পড়িবে অত্যন্ত বেশী এবং অন্যান্য উৎপাদকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দেখিয়া শুনিয়া কেনা এবং কি পরিমাণে কেনা হইবে তাহা ঠিক করাও ব্যবসায়ের-সংগঠকের কাজ। কোন্ জিনিস তৈয়ারী হইবে তাহাও তাহাকে ঠিক করিতে হয়। সে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় (co-ordination) সাধন করিয়া তাহাদের মধ্যে যথোচিত সহযোগ প্রতিষ্ঠিত করে। ধরা যাউক যে এক হাজার টাকার কাঁচামালের সহিত ১০০ জন শ্রমিকের সুন্দর সমন্বয় হয়। সুতরাং সংগঠককে বিভিন্ন উপাদান নিয়োগের সময় দেখিতে হইবে যে ঐ অনুপাত রক্ষিত হইল কি না। তাহাকে দেখিতে হইবে যে খুব অল্প মূলধনের সঙ্গে খুব বেশী শ্রমিক কিংবা খুব অল্প সংখ্যক শ্রমিকের সঙ্গে খুব বেশী মূলধন নিয়োজিত না হয়।

সংগঠকের কার্যাবলী :—
১। উপযুক্ত জমির সন্ধান করা
২। শ্রমিকদের কার্যে নিযুক্ত করা ও তাহাদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া
৩। কাঁচামাল কেনা
৪। উৎপাদকের উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন

ব্যবসায়ের সংগঠক যদি স্বাধীন ব্যবসায়ী হয়, অর্থাৎ মাহিনা করা ম্যানেজার না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের ঝুঁকিও (risk) লইতে হয়। জমির মালিক, শ্রমিক, মূলধনের মালিক প্রভৃতির সঙ্গে সে নির্দিষ্ট দামের ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। জমির মালিককে

৫। ঝুঁকি লওয়া

* অবশ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি ক্ষুদ্র হয় এবং উৎপাদন-পদ্ধতি যদি বিশেষ সরল হয় তবে ব্যবসায় সংগঠক বলিয়া কোন পৃথক ব্যক্তি না-ও থাকিতে পারে। আমাদের দেশে ক্ষুদ্রায়তনে কৃষিকার্য হয়। এক্ষেত্রে কৃষক নিজেই শ্রমিক ও সংগঠক।

বাঁধা হারে খাজনা, শ্রমিককে বাঁধা হারে মজুরী এবং মূলধনের মালিককে বাঁধা হারে সুদ দেওয়ার চুক্তি করিতে হয়। উৎপাদন সমাপ্ত হইলে জিনিস বিক্রয় করিয়া যে লাভ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই সে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, সব সময়ে ঠিক তাহাই হয় না। উৎপাদন যখন সমাপ্ত হইল, তখন হয়ত আশাতীত রূপে বাজার দাম পড়িয়া গেল। ফলে যেখানে লাভের আশা করা হইয়াছিল, সেখানে প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিই হইল। সুতরাং ব্যবসায়ে লাভের নিশ্চয়তা বলিয়া কিছু নাই। লাভও হইতে পারে, লোকসানও হইতে পারে। ব্যবসায়ীকে ক্ষতির ঝুঁকি লইতেই হইবে।

ঝুঁকি লয় বলিয়াই সংগঠককে অনেক সময় ঝুঁকি-বাহক বা উদ্যোক্তা বলা হয়

ক্ষতির ঝুঁকি লইতে হয় বলিয়া ব্যবসায়ীকে ঝুঁকি-বাহক বা উদ্যোক্তা (entrepreneur, risk-taker) বলা হয়। তাহাকে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াইতে হইবে; অন্যভাবে বলিতে গেলে তাহাকে উদ্যোগী হইতে হইবে।

ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ব্যবসায়ের মালিক নিজেই সংগঠক এবং ঝুঁকি-বাহক। কিন্তু যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একজন বেতনভুক্ কর্মচারীই ম্যানেজার বা সংগঠক হয়। এই বেতনভুক্ সংগঠকই সংগঠনের সব কাজ চালায় আর

যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অংশীদারেরা ঝুঁকি বহন করে

কোম্পানীর অংশীদারেরা ঝুঁকি বহন করে। কাজেই, অংশীদারেরাই (shareholders) ঝুঁকি-বাহক। অর্থাৎ, যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সংগঠক এবং ঝুঁকি-বাহক আলাদা আলাদা লোক হয়।

শ্রম বিভাগ (Division of Labour) :

একজন লোক যদি সব জিনিসই তৈয়ারী করিতে যায়, তাহা হইলে কোন জিনিসই দক্ষভাবে তৈয়ারী করিতে পারিবে না। কিন্তু সে যদি বিশেষভাবে কেবল একটি জিনিসই তৈয়ারী করিতে থাকে তাহা হইলে সে উহা দক্ষভাবে, শীঘ্র তৈয়ারী করিতে পারিবে। শ্রমের এই বিশেষীকরণকে (specialisation) শ্রমবিভাগ (division of labour) বলা হয়।

শ্রমের বিশেষীকরণকে শ্রমবিভাগ বলা হয়

শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক তাহার কাজে বা কাজের অংশটুকুতে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠে। শ্রমবিভাগের ফলে সময় সময় কোন বিশেষ অঞ্চল কোন বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ

হইয়া উঠে। যেমন ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার বয়ন শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছে।

১। বিভিন্ন ধরণের শ্রমবিভাগ (Forms of Division of Labour)ঃ

শ্রমবিভাগ চারি রকমের হইতে পারেঃ ব্যবসায় এবং কাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভাগ (division into trades and professions); (২) কয়েকটি সুসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগ (division into complete processes); (৩) অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগ (division into incomplete processes); এবং (৪) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (territorial division of labour)।

শ্রমবিভাগ চারি রকমের হইতে পারে

(১) ব্যবসায় এবং কাজ হিসাবে বিভাগঃ এইরূপ বিভাগের দ্বারা সমাজের যাবতীয় উৎপাদনশীল কাজ বিভিন্ন শিল্প, কারুকর্ম এবং নানা সেবাত্মক কাজে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক লোক একটি নির্দিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত থাকে; এই শিল্পসংক্রান্ত সকল কিছু খুঁটিনাটি কাজ সে একাই করে। একজন চাষী, আর একজন মুচি আর একজন তাঁতী। ইহাদের প্রত্যেককেই উৎপাদিত পণ্য বাজারে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত ঐ পণ্যসংক্রান্ত সব কিছুই নিজে নিজে করিতে হয়। আমাদের দেশে বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে সমাজের বিভাগ শ্রমবিভাগের একটি আদিম উদাহরণ।

(২) কয়েকটি সুসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগঃ কাপড় বুনাকে তিনটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় ভাগ করা যায়—সুতা তৈয়ারী, বয়ন এবং রঙ করা। এই তিনটি কাজ তিনজন আলাদা লোক দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। একজনের তৈয়ারী সুতা আর এক জন কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করিবে। ফলে যে কাপড় তৈয়ারী হইবে তাহা যে রঙ করিবে তাহার কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

(৩) কয়েকটি অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগঃ কোন আধুনিক ফ্যাক্টরীতে সমগ্র উৎপাদনকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। জুতার কারখানার শ্রমিকেরা এক একজন কাজের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ব্যাপৃত থাকে। তাহাদের কেহই একা সম্পূর্ণ এক জোড়া জুতা তৈয়ারী করে না; কিন্তু জুতাজোড়ার উৎপাদনে প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অংশ থাকে। তাহাদের সকলের আলাদা আলাদা কাজগুলির আবার সমন্বয় সাধন করিতে হয়। যদি জুতার 'হিল্' বা গোড়ালি উৎপাদিত হয় বেশী সংখ্যায়, আর 'সোল্' উৎপাদিত হয় কম সংখ্যায়,

তাহা হইলে জুতার উৎপাদন ব্যাহত হইবে। সমন্বয় মানেই প্রত্যেকের কাজ অন্যান্যদের কাজের সঙ্গে সমান তালে চলিবে এইরূপ ব্যবস্থা। ব্যবসায়ের পরিচালক দ্বারাই এই সমন্বয় সাধিত হয়।

(৪) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ: আমরা অনেক সময়ই লক্ষ্য করি যে বিশেষ একটি অঞ্চলে বা দেশে বিশেষ একটি জিনিস অপেক্ষাকৃত সহজে উৎপাদিত করা যায়। বাংলার জমিতে পাট, ইতালীতে মদ আর আমেরিকায় মোটরগাড়ী যে রকম স্বচ্ছন্দে উৎপাদিত হয়, অন্যত্র তেমন হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাট বাংলা দেশেই সবচেয়ে স্বচ্ছন্দে উৎপাদিত হয়; চিনি উত্তর প্রদেশে এবং কাপড় বোম্বাইতে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দে উৎপাদিত হয়। এই ধরণের স্থানবিশেষের বিভাগ করাকেই আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বলা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকেরা বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা লাভ করে।

২। শ্রমবিভাগের সুবিধা (Advantages of Division of Labour):

১। দক্ষতা ও কর্মকৌশল বৃদ্ধি পায়

প্রথমতঃ, শ্রমবিভাগের ফলে দক্ষতা এবং কর্মকৌশল বৃদ্ধি পায়। লোকে যদি একটি মাত্র কাজ লইয়া ব্যাপৃত থাকে তাহা হইলে সে যত ভালভাবে কাজটি করিতে পারিবে, অনেকগুলি কাজ লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে কোন কাজই তত ভালভাবে পারিবে না। অভ্যাসের ফলে দক্ষতা অনেক বাড়িয়া যায়।

২। ক্ষমতা ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ বাছিয়া লওয়া সম্ভব হয়

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমবিভাগের ফলে লোকের পক্ষে নিজ নিজ ক্ষমতা ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ বাছিয়া লওয়া সম্ভব হয়। প্রত্যেক শ্রমিক সেই কাজই পায় যে কাজের জন্য সে সবচেয়ে বেশী যোগ্য। উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হয়। যে কাজের জন্য তাহার বিশেষ দক্ষতা আছে কেবল সেই কাজের জন্যই দক্ষ শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয়। ফলে প্রতিভার কোন অপচয় হয় না এবং উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

৩। সময় সংক্ষেপ হয়

তৃতীয়তঃ, শ্রমবিভাগের ফলে প্রচুর সময় বাঁচিয়া যায়। একটি কাজ সমাপ্ত করিয়া আর একটি কাজে হাত দিতে যাওয়া মানেই মধ্যবর্তী অনেকটা সময় নষ্ট হওয়া। কিন্তু শ্রমবিভাগের দরুণ শ্রমিক একই কাজ ক্রমাগত করিতে থাকায় এই সময়টুকু বাঁচিয়া যায়।

চতুর্থতঃ, শ্রমবিভাগের দরুণ নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। কোন কাজের প্রবহমান ধারাকে যখন ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করিয়া ফেলা হয়, তখন কাজের এই খণ্ডগুলি প্রত্যেকটিই আরো সহজ হইয়া দাঁড়ায় এবং কয়েকটি ধরা-বাঁধা গতিবিধিতে পরিণত হয়। কাজ যখন নির্দিষ্ট ধরা-বাঁধা গতিবিধিতে পরিণত হয়, তখনই যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভবপর হইয়া উঠে এবং যন্ত্র মানুষের স্থান অধিকার করে। অ্যাডাম স্মিথের যুগে ফ্যাক্টরীর শ্রমিকেরা প্রায়ই নিজেরাই যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিত। আধুনিক যুগে যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কাজে বিশেষজ্ঞ যাহারা তাহারাই সাধারণতঃ আবিষ্কারক। শ্রমবিভাগের ফলে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ অনেক প্রসারিত হইয়াছে এবং নূতন নূতন আবিষ্কারের পথ খুলিয়া গিয়াছে। মানুষের পরিশ্রম ও কষ্ট বহু পরিমাণে লাঘব করে বলিয়া যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সমাজের পক্ষে সুবিধাজনক।

৪। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়

শ্রমবিভাগ না থাকিলে যন্ত্রপাতির আবিষ্কারকে কাজে লাগান যাইত না। ফলে উন্নত ধরণের শিল্প ব্যবস্থা সম্ভব হইত না। আধুনিক সভ্যতা শ্রমবিভাগের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। মানুষের ভোগ করিবার সম্ভাবনা বিশেষ মাত্রায় বাড়াইয়া দিয়াছে শ্রমবিভাগ।

আধুনিক সভ্যতা শ্রমবিভাগের উপর দাঁড়াইয়া আছে

পরিশেষে, শ্রমবিভাগের ফলে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পার্থক্যের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়ে। যখন কাজকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিয়া ফেলিয়া যতদূর সম্ভব যন্ত্রপাতির ব্যবহার চালু করা হয়, তখন বিভিন্ন শিল্পের বাঁধা-ধরা ছোট ছোট অনেক কাজই একরকম হইয়া পড়ে। ফলে একজন শ্রমিক একটি কারখানা ছাড়িলে সহজেই অন্য আর একটি কারখানায় কাজ লইতে পারে, যদিও দুই কারখানাতে দুইরকম জিনিস উৎপাদিত হয়। ঘড়ির কারখানায় যে কাজ করে সে বন্দুকের কারখানাতেও কাজ করিতে পারে, কারণ বন্দুকের কারখানার কয়েকটি কাজ ও ঘড়ির কারখানার কয়েকটি কাজ প্রায় একই ধরণের।

৫। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পার্থক্যের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়ে

৩। শ্রমবিভাগের অসুবিধা (Disadvantages of Division of Labour):

শ্রমবিভাগ খুব সূক্ষ্ম হইলে মানুষের মনের উপর ভয়ানক চাপ পড়ে।

উন্নত ধরণের কৌশল প্রয়োজন হয় এমন কাজ করার সময়ে খুব কম লোকই এক সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী মনোযোগ দিয়া থাকিতে পারে। কারখানার কোন বিভাগে যদি দ্রুত গতিতে কাজ চালাইতে হয়, তাহা হইলে অন্যান্য বিভাগের কাজের গতিকেও দ্রুত করিতে হয়। তাহা না হইলে কাজের সুষ্ঠু সমন্বয় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ফলে যে বিভাগের কাজকর্মে সূক্ষ্ম কৌশলের প্রয়োজন হয়, সেখানকার অনেক শ্রমিক কারখানার কাজের এই দ্রুত গতির তাল সামলাইতে পারে না।

১। শ্রমিকের মনের উপর ভয়ানক চাপ পড়িতে থাকে

দ্বিতীয়তঃ, কাজ অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া দাঁড়ায়। শ্রমিকের মন সংকুচিত ও সংকীর্ণ হইয়া আসে। হস্তশিল্পীর কাজে বৈচিত্র্য আছে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি জিনিস নিজের ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিয়া সে সৃষ্টির আনন্দ পায়। কিন্তু কারখানার শ্রমিক এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত। অবশ্য সে যদি ভালো মজুরী পায় এবং বড় সহরে বাস করে, তাহা হইলে কারখানার বাহিরে নানাভাবে জীবন উপভোগ করার যে সুযোগ সে পায়, তাহা গ্রাম্য কারিগরের নাই।

২। শ্রমিকের মন সংকীর্ণ হইয়া আসে

তৃতীয়তঃ, শ্রমবিভাগের ফলে সমাজে বর্ণ ও শ্রেণীভেদ দেখা গিয়াছে। আমাদের বর্তমান সমাজে কেউ উচ্চ শ্রেণীর, কেউ বা নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক যুগের প্রধান দুই শ্রেণীই হইল—পুঁজিপতি (capitalist) এবং শ্রমজীবী (labourer)। পুঁজিপতি মালিকের অধীনে সামরিক শৃঙ্খলার মতই কঠোর শৃঙ্খলা মানিয়া শ্রমজীবীদের কাজ করিতে হয়। ফলে সমাজে মালিক-শ্রমিক বিরোধ সব সময়ে লাগিয়াই থাকে।

৩। সমাজে বর্ণ ও শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হয়

চতুর্থতঃ, যে লোকের সারাজীবন কাটে জুতায় শুধু লোহা লাগাইয়া কিংবা কারখানার এক নির্দিষ্ট হাতল ঘুরাইয়া, সে মানুষ হিসাবে অপদার্থ হইতে বাধ্য। সে নিজেই একটি যন্ত্রে পরিণত হইয়া যায় এবং বাঁধা-ধরা কাজটি ছাড়া অন্য কাজ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

৪। শ্রমিককে অনেক সময় যন্ত্রে পরিণত করে

পরিশেষে, শ্রমবিভাগের ফলে কারখানা প্রথার বিভিন্ন অকল্যাণগুলিও দেখা দেয়; যেমন—বস্তি জীবন, অতি-জনাকীর্ণ সহর, শ্রমিকদের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা প্রভৃতি।

শ্রমবিভাগের ফলে নিয়োগ সমস্যাও দেখা যায়। যদি কোন শ্রমিক কোন বিশেষ কাজে বিশেষ ভাবে দক্ষ হয় তবে তাহার চাকুরী গেলে তাহার পক্ষে অন্যত্র কাজ যোগাড় করা কঠিন, কারণ বিশেষ দক্ষ শ্রমিকের পদ বড় একটা খালি হয় না। উপরন্তু, যে সকল শ্রমিক একটি মাত্র জিনিস তৈয়ারীতে দক্ষ হইয়াছে তাহাদের পক্ষে বেকার হইয়া পড়িবার ভয় সকল সময় আছে। যদি কোন কারণে ঐ জিনিসের চাহিদা কমিয়া যায় তবে ঐ সকল শ্রমিকের অনেকে বেকার হইয়া থাকিবে।

৫। কারখানা-জীবনের অকল্যাণগুলি শ্রমবিভাগেরই দান

৬। শ্রমিকের বেকার হইয়া থাকিবার আশঙ্কা আছে

শ্রমবিভাগের অধিকাংশ অসুবিধাই দুরপনেয় নয়। এই সব অসুবিধার উদ্ভবের জন্য ধনিকতন্ত্র বা পুঁজিবাদ যতটা দায়ী, বিশেষীকরণ এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার ততটা দায়ী নয়। শ্রমবিভাগ এবং যন্ত্রপাতি হইল সভ্যতার ভিত্তি। ইহাদের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কাজেই, দোষ যন্ত্রপাতি বা শ্রমবিভাগের নয়। আসল দোষ হইল আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার—যে দূষিত সমাজ-ব্যবস্থার ফলে সাধারণ লোক ক্রমোন্নতিশীল সভ্যতার ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

শ্রমবিভাগের অসুবিধাগুলি প্রকৃত পক্ষে ধনিকতন্ত্রের জন্যই

যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Use of Machinery):

আমরা যে যুগে বাস করি তাহাকে যন্ত্রের যুগ বলা হয়। শ্রমবিভাগের ফলে শুধু যে যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা অনেক বাড়িয়াছে তাহা নয়, নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনাও অনেক বেশী বাড়িয়াছে। নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার আবার শ্রমবিভাগকে প্রসারিত করে ও সূক্ষ্মতর করিয়া তোলে।

যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা অনেক। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতিকে বশীভূত করে এবং তাহাকে দিয়া অনেক কাজ করাইয়া লয়। যন্ত্রের সাহায্যে নদীর স্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। যন্ত্রের সাহায্যে অণুর লুকানো শক্তিকে বাহিরে আনিয়া আণবিক অস্ত্র তৈয়ারী করা যাইতে পারে। আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত মানুষের হুকুমে যন্ত্র অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়া তোলে।

যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছে

মানুষের পেশীর শক্তিতে কুলায় না এমন অনেক ভারী কাজ যন্ত্রের সাহায্যে

করা যায়। মানুষের কাজ সবসময়ে ঠিক একরকম হয় না, কিন্তু যন্ত্রের কাজ সবসময়েই ঠিক একই রকম হয়; গুণাগুণের একটুও ইতরবিশেষ হয় না।

যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ ভারী কাজ করে এবং একই ধরণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে, উৎপাদিত জিনিসগুলির মধ্যে গুণের বা ডৌলের বিন্দুমাত্র তারতম্য থাকে না এবং একসঙ্গে বেশী উৎপাদনের দরুণ অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হয়। অবিকল এক গড়নের হাজার হাজার টুপি, ছুরি ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে অনবরত উৎপাদিত হইতেছে। যে কোন একটি সেলাই কলে ঠিক একই রকম সেলাই পড়িবে; কিন্তু মানুষের হাতে ঠিক একই রকম সেলাই সবসময়ে নাও হইতে পারে। অবিকল এক ছাঁদের জিনিস উৎপাদন এবং একসঙ্গে অনেক উৎপাদন আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রকে সস্তা করিয়া আমাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিয়াছে। আবার যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনেক কাজ খুব নিখুঁত ও সুন্দরভাবে করা যায়, যাহা হাতে করা কখনই সম্ভব হয় না।

যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনেক কাজ সুন্দর ও নিখুঁতভাবে করা যায়

শ্রমের উপর যন্ত্রপাতির প্রভাব (Effects of Machinery on Labour):

ভারী কাজ করিতে গেলে মানুষের শরীরের উপর যে চাপ পড়ে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার তাহা অনেকখানি কমাইয়া দেয়। মাল ভর্তি করা, অনেক উঁচুতে কোন জিনিস বহিয়া লইয়া যাওয়া প্রভৃতি কঠিন কঠিন কাজ সহজেই যন্ত্রের সাহায্যে করা যায়। এইভাবে মানুষের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়।

যন্ত্রপাতির জন্য শ্রমিকের পেশীর উপর চাপ কম পড়ে

অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজও যন্ত্র দিয়া করানো চলে। যন্ত্রের ব্যবহারে শ্রমের দক্ষতা বাড়িয়া যায়। ফলে, উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। যন্ত্রের কল্যাণে শ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়া গিয়াছে।

অবাঞ্ছনীয় কাজও যন্ত্র দ্বারা করান চলে

কিন্তু যন্ত্রের ব্যবহার সমাজে অনেক অকল্যাণও বহিয়া আনিয়াছে। স্ক্রু বা বল্টুর মত শ্রমিক যেন যন্ত্রের একটি অংশে পরিণত হইয়াছে। যন্ত্র ব্যবহারের ফল হিসাবে দেখা দিয়াছে কারখানা প্রথার নানা গলদ,—জনাকীর্ণ বস্তি ও

যন্ত্রের কল্যাণে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়া গিয়াছে

সহর এবং মালিক-শ্রমিক বিরোধ ইত্যাদি। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিলাসের প্রয়োজনে যন্ত্রের অতিরিক্ত ব্যবহারের দরুণ জীবন নিছক আরাম ও আলস্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। জীবন এতখানি সহজ ও অলস হইয়া পড়িলে ইহার পূর্ণ সার্থকতা থাকে না।

যন্ত্র ও বেকার সমস্যা

যন্ত্র শ্রমিককে স্থানচ্যুত করে বলিয়া বেকার সমস্যার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। যখন কলকারখানার প্রথম প্রচলন সুরু হয়, তখন যন্ত্রের সাহায্যে জিনিস এত সস্তায় তৈয়ারী হইতে লাগিল যে কুটিরশিল্পগুলি আর প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিল না। কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস হইয়া গেল এবং লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষের বাজারেও ইউরোপ হইতে যন্ত্রজাত পণ্য আমদানী হইতে সুরু করিলে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছিল। অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ অবশ্য বলেন যে যন্ত্রের প্রচলনের ফলে যে বেকার সমস্যা দেখা দেয় তাহা স্থায়ী হয় না। যন্ত্রের দ্বারা স্থানচ্যুত শ্রমিকদের অনেকেই আবার যন্ত্র তৈয়ারী ও মেরামতের কারখানায় কাজ পায়; কারণ ইতিমধ্যে যন্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া যন্ত্রের প্রচলন নিযুক্ত শ্রমিকের আয় বাড়াইয়া দেয়। এই বর্ধিত আয় জিনিস কেনার জন্য ব্যয়িত হয়; ফলে জিনিসের চাহিদা বাড়ে। বেশী জিনিস তৈয়ারী করার জন্য নূতন কারখানাও চালু হয় এবং সেখানে আরো অনেক শ্রমিক কাজ পায়। এই সব সত্ত্বেও, যন্ত্রপাতি যে শ্রমের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটায়, সেকথা অনস্বীকার্য।

বৃহদায়তনে উৎপাদন (Large Scale Production) :

বৃহদায়তনে উৎপাদন উৎপাদনের খরচ কমায়

আধুনিক কালে উৎপাদন সাধারণতঃ বহুল ভাবে বা বৃহদায়তনে সংঘটিত হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্রমশঃ বড় হইয়াই চলিয়াছে। শ্রমবিভাগ এবং বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে উৎপাদনের খরচ কমে এবং মূলধন ও শ্রমের ব্যবহারও যথাসম্ভব কমিয়া যায়। বাজারে প্রতিযোগিতা থাকার দরুণ ব্যবসায়ের সংগঠক সবসময়েই উৎপাদনের খরচ কমাইতে এবং নানাদিকে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া ব্যবসায়ের মুনাফা বাড়াইতে সচেষ্ট থাকে। সে নূতন নূতন আবিষ্কারকে কাজে লাগায়, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয় এবং সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ চালু করে। যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদন করিতে

পারিবে, শুধু তাহাই শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার বাজারে টিকিয়া থাকিতে পারিবে। ছোট ব্যবসায় ও ছোট শিল্পের বাঁচিয়া থাকার কোন আশা নাই। আত্মরক্ষার চেষ্টায় ইহাদের হয় আয়তন বাড়াইতে হইবে, না হয় বড় কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে হইবে।

১। বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাঃ বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাই হইল মূলধন ও শ্রমের হিসাবমত ও পরিমিত ব্যবহার এবং উৎপাদনের খরচ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাওয়া। নানাভাবে এই ব্যয়সংক্ষেপ হয়। বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারেঃ (ক) কারখানায় উৎপাদনের সুবিধা এবং (খ) ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করার সুবিধা।

১। সুবিধাজনক দরে কাঁচা মাল ইত্যাদি কেনা

(ক) একজন বড় উৎপাদক তাহার কাঁচা মাল, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি অনেক বেশী সুবিধাজনক দরে কিনিতে পারে। এইসব জিনিসপত্র কারখানায় স্থানান্তরিত করার খরচও তাহার পক্ষে কম পড়ে; কারণ রেলওয়ে ও ষ্টিমার কোম্পানী বড় ব্যবসায়ীকে অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক দর দেয়।

২। কারখানায় উৎপাদনের খরচও বড় বড় ব্যবসায়ীর পক্ষে কম পড়ে

কারখানার মধ্যেও উৎপাদনের খরচ বড় ব্যবসায়ীর পক্ষে কম পড়ে। একই যন্ত্রপাতি, একই কর্মচারীর সাহায্যে সে বেশী উৎপাদন পাইতে পারে। উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়ে, খরচ সে অনুপাতে বাড়ে না। বড় বহরে উৎপাদনের অর্থই হইল এই যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা যতই বাড়ে, ততই এক একজনকে বিশেষ এক একটি কাজে নিপুণ হওয়ার সুযোগ দেওয়া যায়।

৩। সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ সম্ভবপর হয়

অর্থাৎ বহুল উৎপাদনের ফলে সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। ফলে যন্ত্রের ব্যবহার আরও প্রসারিত হয়। যখন একসঙ্গে অনেক বেশী জিনিস উৎপাদিত হয় তখনই শুধু সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলির ব্যবহার সম্ভব হয়, কারণ তাহা না হইলে খরচ পোষায় না। কাজেই বহুলভাবে উৎপাদন হইলে সব যন্ত্রকেই কাজে লাগানো চলে।

৪। বড় ব্যবসায়ী গবেষণার জন্য অনেক টাকাও খরচ করিতে পারে

বড় উৎপাদকের আরো একটি সুবিধা হইল এই যে কোন যন্ত্র পুরাতন হইয়া পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা বাতিল করিয়া নূতন ধরণের যন্ত্র বসাইতে পারে।

উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য টাকা খরচ করাও একমাত্র বড় উৎপাদকের পক্ষেই সম্ভব হয়।

৫। উপজাত দ্রব্যকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগান যায়

বহুলভাবে উৎপাদনের ফলে প্যাকিংএর খরচ, ট্রেড মার্ক ছাপানোর খরচ ইত্যাদিও কমিয়া যায় এবং উপজাত দ্রব্য (bye-product) যতদূর সম্ভব কাজে লাগানো যায়।

(খ) বড় ব্যবসায়ের জিনিস বিক্রয়ের ব্যবস্থায়ও অনেক সুবিধা করা সম্ভব। বড় ব্যবসায়গুলি বিক্রয় ব্যাপারে দক্ষ "সেল্‌স্‌ম্যান্‌" নিযুক্ত করিতে পারে এবং ব্যাপক ভাবে বিজ্ঞাপন দিতে পারে। বিক্রয় যত বেশী হইবে, প্রতি 'একক' বিজ্ঞাপনের খরচ ততই কমিবে।

৬। বিক্রয় ব্যাপারে বড় ব্যবসায়ীর অনেক সুবিধা আছে

২। বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা (Limits to Large Scale Production) : বৃহদায়তনে উৎপাদনের অবশ্য অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বহর বাড়ানোরও সীমা আছে। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ কেবলই বাড়াইয়া যাওয়া চলে না। এই সীমাগুলিকেই বৃহদায়তনে উৎপাদনের অসুবিধা বলিয়া অভিহিত করা যায়। বৃহদায়তনে উৎপাদনের এই সকল অসুবিধার জন্যই ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-গুলি বড় প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া আছে।

বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা সত্ত্বেও ছোট ব্যবসায়ীর টিকিয়া থাকিবার কারণ :

প্রথমতঃ, কতকগুলি শিল্পে বহুলভাবে উৎপাদনের চেয়ে অল্প পরিমাণে উৎপাদনেই বেশী সাফল্য লাভ করা যায়। যে সব জিনিস তৈয়ারী করিতে ব্যক্তিগত নিপুণতা প্রয়োজন এবং যে সব জিনিস আমাদের চারুকলা পিপাসাকে চরিতার্থ করে, সে সব জিনিস অল্প পরিমাণ ছাড়া উৎপাদন করা যায় না। এই সব শিল্পে যন্ত্রপাতি প্রচলনের সার্থকতা খুব কম। ব্যক্তিগত রুচি ও মাপের তারতম্য অনুযায়ী যে সব জিনিসের চাহিদা, সে সব জিনিসও বড় বহরে উৎপাদনের উপযুক্ত নয়। যদিও আজকাল বাজারে প্রচুর পরিমাণে 'রেডি মেড' বা তৈয়ারী সস্তা পোষাক বিক্রয় হয়, তবুও ক্রেতাদের ব্যক্তিগত মাপ ও রুচি অনুযায়ী পোষাক এখনও দর্জিদের দ্বারা প্রস্তুত হয়।

১। সকল শিল্পে বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না

দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি শিল্পে শ্রমিকদের উপর এবং প্রতিটি কাজের উপর

মালিককে তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হয়। কৃষি এইরূপ একটি শিল্প। এই ধরণের শিল্প যদি বেশীরকম বড় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে গুণাগুণের দিক দিয়া পরিচালনা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পরিচালনার ব্যাপারে একজন লোকের ক্ষমতার একটি সীমা আছে। অন্যান্য শিল্পের চেয়ে কৃষিতে এই সীমা বেশী নিকটবর্তী। কিন্তু শিল্পের বেলায়ও শেষ পর্যন্ত এই সীমায় পৌছাইতে হয়।

২। ছোট ব্যবসায়ে মালিক প্রত্যেক কর্মচারীর উপর নজর রাখিতে পারে

তৃতীয়তঃ, আয়তনে খুব বেশী বড় হইয়া পড়িলে শিল্পেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হয়। ব্যবসায়ের আয়তন সম্প্রসারণের পক্ষে ইহা একটি বাধা।

৩। আয়তন খুব বড় হইলে শিল্পে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হয়

চতুর্থতঃ, উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে বাজারের আয়তনের উপর। যদি বিক্রয় করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে বেশী করিয়া উৎপাদনের কোন সার্থকতা নাই। এই জন্যই আড্যাম স্মিথ বলিয়াছেন যে শ্রমবিভাগ ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে বাজারের আয়তনের উপর। পরিশেষে, সকল সময় আয়তন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করা সংগঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না। মূলধনের প্রশ্নও এইভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তনকে সীমাবদ্ধ করে।

৪। উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে বাজারের আয়তনের উপর

৫। সকল সময় বেশী মূলধন সংগ্রহ করাও সম্ভব হয় না

শিল্পের একদেশতা (Localisation of Industry) :

একটি বিশেষ স্থানে একটি শিল্প ভিড় করিয়া গড়িয়া উঠিলে ঐ স্থানে ঐ শিল্পের একদেশতা বা স্থানীয়করণ (localisation) হইয়াছে বলা হয়। কোন শিল্পের সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান যখন একই অঞ্চলে পাশাপাশি গড়িয়া উঠে, তখনই একদেশতার উদাহরণ দেওয়া হয়; যেমন, ল্যাঙ্কাশায়ারের বয়ন শিল্প, বিহার ও উত্তর প্রদেশের চিনি শিল্প এবং বাংলার পাট শিল্প।

শিল্পের একদেশতা বা স্থানীয়করণ ঘটে নানা কারণে :—

একদেশতার কারণ

(১) জলবায়ু : আর্দ্র জলবায়ুর কল্যাণেই ল্যাঙ্কাশায়ার বয়নশিল্পের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

(২) কাঁচা মালের সান্নিধ্য: কাঁচা মালের এলাকা কাছাকাছি হওয়াও স্থানীয়করণের একটি প্রধান কারণ। লোহা ও কয়লার খনির কাছাকাছি অঞ্চলেই সাধারণতঃ ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠে। পাট বাংলা দেশে জন্মে বলিয়াই পাটশিল্পও বাংলা দেশেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৩) শক্তিসম্পদের (power) সান্নিধ্য: যে সব জায়গায় সস্তায় শক্তি পাওয়া সম্ভব, সেইসব জায়গায় শিল্প গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। পূর্বে যে সব জায়গায় জলশক্তি পাওয়া যাইত, অর্থাৎ স্রোতের সাহায্যে যন্ত্র চালানো সম্ভব হইত, সেইসব জায়গায় শিল্প গড়িয়া উঠিত। আজকাল বিদ্যুৎশক্তির উৎসের কাছাকাছি শিল্প গড়িয়া উঠে।

(৪) রেলপথ ও বন্দরের সান্নিধ্য: ভালো বন্দর ও রেল জংশনের সান্নিধ্য স্থানীয়করণের অন্যতম কারণ। ভালো বন্দরের সুবিধা থাকার দরুণ পাটশিল্প কলিকাতার কাছাকাছি গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৫) বাজারের সান্নিধ্য: যদি নিকটবর্তী অঞ্চলেই শিল্পজাত পণ্যের কাট্‌তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে অনেক সময়ে এই কারণেই শিল্প সেই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে।

(৬) রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা: নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতার দরুণই মুর্শিদাবাদে রেশম শিল্পের স্থানীয়করণ হইয়াছিল।

(৭) আকস্মিক কারণ: সম্পূর্ণ আকস্মিক কারণেও কোন অঞ্চলে কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পরে উহা ধীরে ধীরে স্থানীয়কৃত বা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। একদেশতার ফলে অনেক সুবিধা হয়। এইজন্যই যে স্থানে কোন শিল্পের পত্তন হইয়াছে সেই স্থানে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

একদেশতার সুবিধা: যে স্থানে শিল্পটি গড়িয়া উঠে, দক্ষ শ্রমিকেরাও সেইখানেই ভিড় করিয়া বসবাস করে। ফলে, প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দক্ষ শ্রমিক যোগাড় করা সহজ হয়। দক্ষ শ্রমিকেরাও তাড়াতাড়ি চাকুরী পাইতে পারে। কাজের আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে থাকিতে সন্তানেরা তাহাদের পিতাদের উপজীবিকা সহজেই আয়ত্ত করিয়া ফেলে। এইভাবে দক্ষতা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। শিল্পের স্থানীয়করণের ফলে সেই অঞ্চলে উক্ত

১। দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ করা সহজ হয়

শিল্পের পণ্য ও কাঁচামালের বাজারও গড়িয়া উঠে। ঐ অঞ্চলের সঙ্গে বহির্জগতের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য রেলপথ ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে। ক্রমে ঐ অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান শিল্পের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য অনেক ব্যবসায় ও শিল্পও ঐ অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। যন্ত্রপাতির মেরামতী কাজ সস্তায় ও সহজে করা সম্ভব হয়। শিল্পের অপচয় বলিয়া বিশেষ কিছুই হয় না, কারণ যাহা অপচয় বলিয়া গণ্য তাহাকেও কাজে লাগান যাইতে পারে। ফলে নূতন নূতন চিন্তা, নূতন নূতন আবিষ্কারের পথ খুলিয়া যায়। একই অঞ্চলে যদি অনেকগুলি জিনিস উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে ঐগুলি পরস্পরের প্রচারের সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। একটি শিল্প একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হইলে সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের সুনামের ফল প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই ভোগ করে। সেফিল্ডের ছুরির সুখ্যাতি আছে; বাংলা দেশের শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়ের সুনাম আছে। সেফিল্ডের ছুরি বা শান্তিপুরের কাপড় কিনিবার ক্রেতা কোন্ কারখানা বা কোন্ তাঁতীর তৈয়ারী তাহা খোঁজ করে না।

২। যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি ও নানা সহায়ক ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হয়

৩। অনেক অপচয় নিবারণ হয়

৪। নূতন নূতন চিন্তা ও আবিষ্কারের পথ খুলিয়া যায়

৫। উৎপন্ন দ্রব্যের সুনাম সকল প্রতিষ্ঠান ভোগ করে

একমাত্র অসুবিধা হইল এই যে, যদি একটি অঞ্চল জীবিকার জন্য একটি মাত্র শিল্পের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে উক্ত শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের আর্থিক চাহিদা সঙ্কুচিত হইলে সারা অঞ্চল জুড়িয়া দুর্দশা দেখা দিবে।

একদেশতা অনেক সময় বিপজ্জনক

উৎপাদনের ব্যয় এবং উৎপন্নের বিধিসমূহ (Cost of Production and the Laws of Returns) :

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns) : মোট উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ার ফলে যদি প্রতি 'এককে'র উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উৎপাদন, উৎপন্ন হ্রাসের নিয়মের অধীন বুঝিতে হইবে। নিয়মটিকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়মও বলা হয়। কৃষি, খনিশিল্প প্রভৃতি যে সব শিল্পে প্রকৃতির ভূমিকার প্রাধান্য আছে, সেইসব শিল্পেই এই নিয়ম বিশেষ করিয়া

কার্যকর। বেশী উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মানুষ যতই বেশী বেশী শ্রম নিয়োজিত করিতে থাকে ততই প্রতি 'একক' শ্রমের দরুণ প্রকৃতির প্রতিদান কমিতে থাকে। নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে এই নিয়ম আরো পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাইবে।

চাউলের উৎপাদন (মণ)	চাউলের মণ-করা উৎপাদন-খরচ
১০০০	৫৲ টাকা
২০০০	৭৲ টাকা
৩০০০	১০৲ টাকা

এই নিয়ম কৃষিকার্য প্রভৃতিতে বিশেষ করিয়া ক্রিয়া করে—ইহার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য উৎপাদনে ইহা কার্যকর হয় না—কার্যকর হইতে বিলম্ব হয় মাত্র। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, যে কোন একটি উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্য উপাদানগুলি বাড়াইয়া গেলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া সুরু করে।

ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি (Law of Increasing Returns) : যদি মোট উৎপাদন (output) বাড়িয়া যাওয়ার ফলে প্রতি 'এককে'র উৎপাদন-খরচ কমিয়া যায়, তাহা হইলে উৎপাদন, ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়মের অধীন বুঝিতে হইবে। এইরূপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষেরই প্রধান ভূমিকা, প্রকৃতির নয়। উৎপাদনের আয়তন যতই বাড়িতে থাকে, শ্রমবিভাগ এবং বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাগুলি ততই বেশী করিয়া পাওয়া যায়। শ্রমবিভাগ সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে প্রত্যেক শ্রমিককে এক একটি নির্দিষ্ট কাজ করিতে হয়, যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়িয়া যায়, 'একক' প্রতি উৎপাদন-খরচ কমিয়া যায় এবং বিক্রয়-ব্যবস্থা উন্নত হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যত বাড়ে, শিল্পের একদেশতার সুবিধাগুলি ততই দেখা দেয়। ইহার ফলে উৎপাদনের গড় ব্যয় ক্রমশঃ কমিতে থাকে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি অনির্দিষ্টকাল ধরিয়া কার্যকর থাকিতে পারে না। এক সময় আসিবেই যখন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া সুরু করিবে। ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কারখানা এবং যানবাহনের

উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি মানুষের ভূমিকা প্রধান হয় তবে বেশ কিছুদিন ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে

বেলায় প্রযোজ্য। এই নিয়মের ক্রিয়া নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

ইস্পাতের উৎপাদন (টন)	ইস্পাত উৎপাদনের খরচ (টন প্রতি)
১০০০	৬০০ টাকা
২০০০	৫০০ টাকা
৩০০০	৪০০ টাকা

সমহারে উৎপন্নের বিধি (Law of Constant Returns) :

মোট উৎপাদন বাড়িয়া গেলেও যদি 'একক' প্রতি উৎপাদন-খরচ একই থাকে, তাহা হইলে উৎপাদন সমহারে উৎপন্নের বিধির অধীন বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির কার্পণ্য যতটা বাড়িয়া যায় মানুষের কর্মকৌশল ও দক্ষতা ঠিক ততখানি বাড়িয়া গিয়া উৎপাদনের হার ঠিকই রাখে। নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে এই নিয়মটি বোঝা যাইবে।

প্রকৃতির কার্পণ্য যতটা বাড়িয়া যায় মানুষের কর্মকৌশল ও দক্ষতা যদি ঠিক ততখানি বাড়ে তবে উৎপাদনের হার ঠিকই থাকে

কাপড়ের উৎপাদন (গজ)	কাপড়ের গজ প্রতি উৎপাদন-খরচ
১০০০	৫ আনা
২০০০	৫ আনা
৩০০০	৫ আনা

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ (Internal and External economies) :

আয়তন বৃদ্ধির ফলে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যে সব ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেয়, তাহাদিগকে আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (internal economies) বলা হয়। শ্রমবিভাগ এবং বৃহদায়তনে (large scale) উৎপাদনের দরুণই এই সব ব্যয়সংক্ষেপের সূত্রপাত হয়। কোন শিল্প সামগ্রিক ভাবে গড়িয়া উঠার ফলে এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যে সব ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেয়, তাহাদের বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ (external economies) বলা হয়। এই সব ব্যয়সংক্ষেপ সাধারণতঃ শিল্পে স্থানীয়করণ হইতে উদ্ভূত হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you understand by division of labour? Indicate the advantages and disadvantages of division of labour. (C. U., 1926, 1927, 1931, 1933, 1939, 1946) (৮০-৮৫ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Discuss the effects of the introduction and use of machinery. (C. U., 1940) (৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Describe the advantages of large-scale production. How is it that in spite of all these advantages of large-scale production, the small producer is still surviving? (C. U., 1952) (৮৮-৯০ পৃষ্ঠা দেখ)

4. What are the functions of the entrepreneur or business organiser? (C. U., 1928, 1930, 1941, 1943) (৭৮-৮০ পৃষ্ঠা দেখ)

5. State and explain the laws of increasing and diminishing returns. (C. U., 1948) (৯২-৯৪ পৃষ্ঠা দেখ)

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ

একজনের ব্যবসায় (One-man Business) :

ইহাই ব্যবসায় সংগঠনের সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সাধারণ রূপ। অধিকাংশ ছোট ব্যবসায়ই এই শ্রেণীর। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ে মালিক নিজস্ব মূলধন বিনিয়োগ করে। ব্যবসায়ের পরিচালকও সে নিজেই। জায়গা ঠিক করা, শ্রমিক নিযুক্ত করা, ব্যাঙ্ক হইতে চলতি মূলধনের অংশ (working capital) ধার করা প্রভৃতি কাজ তাহাকে করিতে হয়। পণ্যের উৎকর্ষ কিরূপ হইবে এবং পণ্য কি পরিমাণে উৎপাদিত হইবে তাহাও তাহাকে ঠিক করিতে হয়। সে ব্যবসায়টি এমনভাবে চালায় যাহাতে খরচ সর্বনিম্ন এবং মুনাফা সর্বাধিক হয়। সকল প্রকার উদ্যোগ তাহাকেই করিতে হয়। সে নিজেই ঝুঁকিবাহক। মুনাফা হইলে তাহার হইবে; লোকসান হইলেও তাহারই হইবে। ব্যবসায়টি সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজস্ব বলিয়া সে পরিচালনা ব্যাপারে যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করিয়া চলে। এই ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান সুবিধা হইল এই যে ইহাতে খরিদ্দারের প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেওয়া ও

খরিদ্দারের যত্ন লওয়া মালিকের পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু একজনের ব্যবসায় অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধাজনক নয়। যে সব লোকের ব্যবসায়ে খাটাইবার মত মূলধন আছে, তাহাদের ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা না-ও থাকিতে পারে। যে সব ব্যবসায়ে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন, সেইসব ব্যবসায়ের জন্য ব্যবসায়ের এই রূপটি সুবিধাজনক নয়। সুতরাং ইহার পরিধি অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু বাজার যদি স্থানীয় হয় এবং চাহিদা যদি নিয়মিত হয় তবে এই ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

মাত্র কয়েক ক্ষেত্রে একজনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সফল হইতে পারে

অংশীদারী (Partnership) :

দুই বা ততোধিক লোক যৌথভাবে কোন ব্যবসায়ে ঝুঁকি লইতে স্বীকৃত হইলে ঐরূপ ব্যবসায় সংগঠনকে অংশীদারী বলে। একজনের ব্যবসায়ের যে সমস্ত অসুবিধা রহিয়াছে, তাহার অনেকগুলিই অংশীদারী প্রথায় দেখা যায় না। একজন অংশীদারের হয়ত মূলধন যোগানোর যোগ্যতা আছে, কিন্তু ব্যবসায় চালানোর ক্ষমতা নাই। আর একজনের হয়ত পরিচালন-ক্ষমতা আছে, কিন্তু মূলধন নাই। ইহারা ব্যবসায়ে পরস্পরের অংশীদার হইয়া পরস্পরের পরিপূরণ করিতে পারে। অংশীদারী প্রথায় ব্যবসায় সংগঠিত করিলে একক মালিকের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু অংশীদারী প্রথারও কতকগুলি গলদ আছে। একজন অংশীদারের কু-পরিচালনার ফলে অন্যান্য অংশীদারদের মূলধন একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, ব্যবসায় 'ফেল' পড়িলে প্রতিষ্ঠানের সকল দায় মিটাইবার জন্য যদি প্রত্যেক অংশীদারের মোট সম্পত্তি ধরিয়া টান পড়ে তাহা হইলে অংশীদারীতে মূলধন খাটানোর ঝুঁকি ভয়ানক বেশী হইয়া দাঁড়ায়। আজকাল অংশীদারগণের দায় সীমাবদ্ধ (limited) করার সুযোগ থাকায়, অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীদারের দায় সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার সুবিধা থাকায়, অংশীদারীর এই ত্রুটি বহুল পরিমাণে দূর হইয়াছে।

অংশীদারী প্রথার সুবিধা ও অসুবিধা

যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Company) :

ব্যবসায় সংগঠনের এই রূপটি বর্তমান কালে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বহুসংখ্যক অংশীদার একত্রে মিলিয়া কোম্পানী গঠিত করে; উহারা সকলেই ঐ

কোম্পানীর মালিক হয়। প্রত্যেক অংশ (Share) অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের হয়। প্রত্যেক অংশীদার যতগুলি খুসী অংশ কিনিতে পারে। বহুসংখ্যক লোক যৌথভাবে কোম্পানীর মূলধন যোগায় বলিয়া ইহাকে 'জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী' অর্থাৎ যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠান বা যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলা হয়। অংশীদারেরাই ঝুঁকি-বাহক। মুনাফা হইলে তাহারা পায়, লোকসান হইলেও তাহাদেরই লোকসান হয়। অংশীদারদের দ্বারা নির্বাচিত ডিরেক্টর বোর্ড বা পরিচালক মণ্ডলী (Board of Directors) প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালনা করে। প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে। কোম্পানীতে তাহার অংশের মূল্য যত, কোম্পানীর ঋণের জন্য শুধু ততখানি দায়িত্বই তাহাকে বহন করিতে হয়; সে যদি ১০০০৲ টাকার শেয়ার কিনিয়া থাকে, তাহাকে ১০০০৲ টাকার বেশী দায়ী করা যাইবে না। এইজন্য এইরূপ কোম্পানীর নামের পিছনে 'Ltd.' বা 'লিমিটেড' লেখা থাকে। যদি কোম্পানী 'ফেল' পড়ে তাহা হইলে অংশীদার কেবলমাত্র তাহার অংশের সমমূল্যের মূলধন হারায়। তাহার অন্যান্য সম্পত্তি নিরাপদ থাকে।

যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন

যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইহার স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital) দুই প্রকারে সংগ্রহ করে: (১) অংশ বিক্রয় এবং (২) ডিবেঞ্চার বিক্রয়। অংশীদার কোম্পানীর মুনাফার অন্যতম অধিকারী। সে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ পায় না। মুনাফা না হইলে সে কিছুই পায় না। মুনাফাকে 'ডিভিডেণ্ড' বা 'লভ্যাংশ' বলে। কোম্পানীর ডিভিডেণ্ডের হিসাব মোট মূলধনের শতকরা হার হিসাবে প্রকাশ করা হয়,—যেমন বলা হয় শতকরা পাঁচ টাকা ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিয়াছে। অর্থাৎ যাহার ১০০৲ টাকার শেয়ার আছে সে পাঁচ টাকা পাইবে। শেয়ার বা অংশ প্রধানতঃ দুই রকমের হয়—(১) সাধারণ শেয়ার (Ordinary Shares) এবং (২) সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার (Preference Shares)। যাহারা সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার কিনিয়াছে তাহাদের নির্দিষ্ট হারে মুনাফার উপর প্রথম অধিকার থাকে। ইহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দেওয়ার পর মুনাফার বাকী ভাগ সাধারণ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয়। সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার বা অংশ অনেক সময় সঞ্চয়কারী বা Cumulative হয়। এবছর কোন লোক ৫%এর সঞ্চয়কারী অংশ (Cumulative Preference Share) ক্রয় করিলে সামনের বছর মুনাফা হয় নাই বলিয়া হয়ত সে কিছুই পাইল না, কিন্তু

যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কি প্রকারে মূলধন সংগ্রহ করে

তার পরের বছর মুনাফা হওয়ার দরুণ সে দুই বছরের জন্যই ৫% হিসাবে পাইবে। যে বৎসরের দরুণ লভ্যাংশ সে পায় নাই তাহা তাহার হিসাবে পরের বৎসরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সঞ্চিত এবং বর্তমান, উভয় লভ্যাংশই সে একসঙ্গে পায়। আর এক ধরণের শেয়ার বা অংশ হইতে পারে। ইহা হইল প্রতিষ্ঠাতৃগণের অংশ (Founders' or Deferred Shares)। অন্যান্য অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন ও ডিবেঞ্চারের উপর সুদ দেওয়ার পর মুনাফার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা এই ধরণের অংশীদারদের মধ্যে বন্টিত হইতে পারে।

ডিবেঞ্চার কাহাকে বলে

ডিবেঞ্চার এক ধরণের বণ্ড (Bond)। মুনাফা হউক বা না হউক, কোম্পানী ডিবেঞ্চারের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়। ডিবেঞ্চারের উপর যে সুদ দিতে হয় তাহা কোম্পানীর উৎপাদন-খরচের মধ্যে গণ্য হয়।

১। যৌথ প্রতিষ্ঠান বা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর সুবিধাঃ ব্যবসায় সংগঠন হিসাবে যৌথ মূলধন প্রথার অনেকগুলি সুবিধা আছে। বড় বহরে ব্যবসায়ের পক্ষে যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুবই উপযোগী, কারণ ইহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব। প্রত্যেক অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ বা সসীম বলিয়া, কোম্পানী 'ফেল' পড়িলেও, সমস্ত সম্পত্তি নাশের কোনও আশঙ্কা নাই। কাজেই, জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী বিনিয়োগ অভ্যাস (investment habit) গড়িয়া তোলে। ছোট ছোট সঞ্চয়ীদের পক্ষেও অংশ কেনা সম্ভব হয়। এইভাবে দেশের সঞ্চয় পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগে। ব্যবসায় পরিচালনার উপযুক্ত যোগ্যতা অংশীদারদের না-ও থাকিতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাহারা শুধু ঝুঁকি লয় এবং ভালো বেতনে কোন যোগ্য লোককে ম্যানেজার নিযুক্ত করে। ইহাতে উৎপাদনের কাজে দক্ষতা দৃষ্ট হয়। অংশ বিক্রয়যোগ্য বলিয়া, অংশীদার হওয়ার ঝুঁকি সব সময়েই অন্যের কাছে হস্তান্তরিত করা যায়।

১। বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী

২। ইহা বিনিয়োগ অভ্যাস গড়িয়া তোলে

৩। শুধু ঝুঁকি লইয়াই অংশীদার হওয়া যায়

৪। উৎপাদনে দক্ষতা

৫। অংশ হস্তান্তরকরণে সুবিধা

যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের ফলেই বৃহদায়তনের ব্যবসায় সম্ভব হইয়াছে। ইহার উদ্ভব না হইলে বৃহদায়তনে উৎপাদন হয়ত সম্ভব হইত না। ফলে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইত না; সভ্যতার অগ্রগতিও সম্ভব হইত না।

২। যৌথ প্রতিষ্ঠান বা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অসুবিধা: কিন্তু জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অনেকগুলি গলদ আছে। অংশীদারেরা সকলেই প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। ডিরেক্টর বা পরিচালকগণ প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর ভাগ্য-নিয়ন্তা। পরিচালকগণ অসৎ হইলে কোম্পানী 'ফেল' পড়িতে বাধ্য। অনেক সময় অংশীদারদের ঠকাইবার জন্য অনেক ভুয়া কোম্পানী গজাইয়া উঠে। মালিক স্বয়ং ম্যানেজার হইলে যে রকম যত্ন লইত, বেতনভুক্ ম্যানেজারেরা সেরূপ যত্ন লয় না।

১। অংশীদারেরা প্রায়ই নিষ্ক্রিয় থাকে
২। ম্যানেজারও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে

যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। যে সব ব্যবসায়ে 'রুটিন' মাফিক চলা সহজেই সম্ভব হয়, কোম্পানী প্রথা বিশেষ করিয়া সেই সব ব্যবসায়ের পক্ষেই উপযোগী। যে ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী, সে ব্যবসায়ের পক্ষে ব্যক্তিগত মালিকানাই প্রশস্ত।

৩। মালিক ও কর্মচারিগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না
৪। যে ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়োজন, ইহা তাহার উপযোগী নয়

অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধা অবশ্য অনেক বেশী। বর্তমান যুগে যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। সুতরাং ইহার অসুবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

সমবায় (Co-operation):

কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা সমবায় সমিতি ব্যবসায়-সংগঠনের আর একটি রূপ। ইহা ধনিকতন্ত্রের বা পুঁজিবাদের গলদগুলি দূর করার চেষ্টা করে। উৎপাদনের জন্য যে সমবায় সমিতি গঠিত হয়, শ্রমিকেরা নিজেরাই তাহার মালিক। তাহারা নিজেরাই মূলধন যোগায়, পরিচালনা করে এবং মুনাফা ভাগ করিয়া লয়। বেতনভুক্ ম্যানেজারও অবশ্য থাকিতে পারে। শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠন বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু কৃষিতে এইরূপ ব্যবসায়-সংগঠনের সম্ভাব্যতা সুপ্রচুর।

সমবায় প্রথা পুঁজিবাদের গলদগুলি দূর করিবার চেষ্টা করে

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা (State Management):

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা আজকাল ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য লাভ করিতেছে। ডাক ও তার, টেলিফোন, বেতার-কেন্দ্র, জলের কল, গ্যাস কারখানা, ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই, রেলপথ প্রভৃতি লোকসেবামূলক কাজ (Public Utility Services)

প্রায়শঃই রাষ্ট্রের মালিকানায় ও পরিচালনায় চলে। কিন্তু ব্রিটেনে আর আমেরিকায় রেলপথের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকিলেও উহার মালিকানা এবং পরিচালনার ভার রাষ্ট্রের নহে। ভারতে রেলপথের মালিক এবং পরিচালক দুই-ই স্বয়ং রাষ্ট্র। অনেকেই মনে করে, কয়লা ও অন্যান্য মূল শিল্পেরও জাতীয়করণ হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় পরিচালনা জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল। দেশের সব লোক মিলিয়া মুনাফা উপভোগ করে। শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিকানা ও পরিচালনা যদি যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইবে এবং বেকার সমস্যাও সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারা যাইবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিচালনার একটা বিপদ আছে;—উদ্যমহীনতা ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাব দেখা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে সরকারী কর্মচারীদের সততা ও দক্ষতার উপর। যাবতীয় শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনা রাষ্ট্রের হাতে যাওয়ার মানেই সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সুবিধা ও অসুবিধা

প্রশ্নোত্তর

1. What are the various ways in which a typical Joint Stock Company raises its capital? (C. U., 1934) (৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Comment on the advantages and limitations of production by Joint Stock Companies. (C. U., 1939) (৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা দেখ)

3. (a) Describe the salient features of a Public Joint Stock Company. (৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা দেখ)

(b) State what advantages are enjoyed by such companies from the principle of limited liability and transferability of their shares.

(C. U., 1952)

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** দায় সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য লোকে বিনিয়োগ করিতে ভরসা পায়। ফলে যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা সহজ হয়। শেয়ার হস্তান্তরিত করিবার সুবিধা থাকায় লোকে টাকা একই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হয় না।]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাজার ও মূল্যতত্ত্ব

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা ভোগ ও উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ আলোচনা করিয়াছি। লোকে ভোগ্য দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে, অর্থাৎ বাজার হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দামে ক্রয় করিয়া, সংগ্রহ করে। কিভাবে বিনিময় পদ্ধতিতে জিনিসের দাম নির্ধারিত হয় তাহাই মূল্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা এবং সর্তসমূহ (Necessity for and Conditions of Exchange):

বিনিময়ে দুইটি পক্ষ থাকে। প্রত্যেক পক্ষ নিজের জিনিসের পরিবর্তে অপর পক্ষের কোন জিনিস সংগ্রহ করিতে চায়। আমরা দেখিয়াছি যে বিনিময়ের প্রাথমিক রূপ হইল প্রত্যক্ষ বিনিময়। প্রত্যক্ষ বিনিময়ের যুগে লোকে সরাসরি জিনিসের বিনিময়ে জিনিস সংগ্রহ করিত। কিন্তু বর্তমানে বিনিময় বলিতে বুঝায় টাকাকড়ির বিনিময়ে ক্রয় এবং, বিক্রয়।

বিনিময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই হইতে পারে

বিনিময়ের ফলে উভয় পক্ষই লাভবান হয়, কারণ প্রত্যেক পক্ষই যাহা তুলনায় কম প্রয়োজনীয় তাহার বিনিময়ে যাহা বেশী প্রয়োজনীয় তাহা সংগ্রহ করে। আজিকার দিনে কেহই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই কারণে প্রত্যেকেরই অপরের উৎপাদিত জিনিসের প্রয়োজন হয় এবং অপরের উৎপাদিত জিনিস সংগৃহীত হয় বিনিময়ের মাধ্যমে। বর্তমান-যুগে সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ প্রত্যেক মানুষকে অপরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে। তাই এখন আর আমরা বিনিময় ব্যতীত জীবনযাত্রার কথা চিন্তাই করিতে পারি না।

দুই পক্ষের প্রত্যেকের অপরের জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই বিনিময় সংঘটিত হয় না। প্রত্যেক পক্ষের কাছে নিজের জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা অপর পক্ষের জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ বেশী হওয়া চাই। ধরা যাউক, এক ব্যক্তি চাউলের পরিবর্তে কাপড় চায় এবং অপর এক ব্যক্তি কাপড়ের পরিবর্তে চাউল চায়। কিন্তু কতটা পরিমাণ চাউলের পরিবর্তে কতটা পরিমাণ কাপড় বিনিময় করা যাইতে পারে

বিনিময়ের সর্ত

এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষ একমত না হইলে বিনিময় সংঘটিত হইবে না। চাউল ও কাপড়ের মধ্যে বিনিময় তবেই সংঘটিত হইবে যদি চাউলের মালিক মনে করে যে চাউল বিনিময় করিয়া তাহার যে প্রান্তিক উপযোগ কমিবে তাহা অপেক্ষা কাপড় হইতে যে প্রান্তিক উপযোগ সে পাইবে তাহা বেশী, এবং কাপড়ের মালিকও যদি অনুরূপভাবে মনে করে যে চাউল হইতে সে যে উপযোগ পাইবে তাহা কাপড় বিনিময় করার দরুণ সে যে উপযোগ হারাইবে তাহা অপেক্ষা বেশী। বিনিময় হইলে প্রথম ব্যক্তির চাউলের পরিমাণ কমিবে ও কাপড়ের পরিমাণ বাড়িবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির কাপড়ের পরিমাণ কমিবে ও চাউলের পরিমাণ বাড়িবে। যে জিনিসের পরিমাণ বাড়ে তাহার প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকে এবং যে জিনিসের পরিমাণ কমে তাহার প্রান্তিক উপযোগ বাড়িতে থাকে। বিনিময় ততক্ষণ পর্যন্তই চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না এরূপ বাড়া-কমার ফলে উভয়ের নিকট চাউল ও কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ সমান হইলে বিনিময় আর অগ্রসর হইবে না।

শুধু প্রত্যক্ষ বিনিময়ের বেলায় নয়, পরোক্ষ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের বেলায়ও বিনিময়ের এই সর্তটি প্রযোজ্য। অনেক সময় আমরা দেখি যে লোকে দাম বেশী বলিয়া জিনিস কিনিতে গিয়া না কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ফিরিয়া আসিবার কারণ হইল, ঐ ব্যক্তি মনে করিয়াছে যে জিনিসটি কিনিলে যে টাকা তাহাকে দিতে হইবে তাহার প্রান্তিক উপযোগ জিনিসটি হইতে যে প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যাইতে পারে তাহা অপেক্ষা বেশী। সুতরাং সে লাভবান হইবে না। বিনিময়ের ফলে যদি উভয় পক্ষেরই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে বিনিময় সংঘটিত হয় না। টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিনিময় ততক্ষণ পর্যন্ত হইতে থাকে যতক্ষণ না টাকা ও জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময় হইলে দাম জিনিসের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

বিভিন্ন মূল্য ও দাম (Values and Prices) ঃ

মূল্য ও দামের পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। বর্তমান যুগ প্রত্যক্ষ বিনিময়ের যুগ নয়, পরোক্ষ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের যুগ। বর্তমানে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য টাকাকড়ির অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। টাকা-কড়ির অঙ্কে প্রকাশিত মূল্যকে দাম বলে। যদি আমরা বিভিন্ন দ্রব্যের দাম

জানিতে পারি তবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মূল্যও নিরূপণ করিয়া লইতে পারি। যদি ১ গজ কাগড়ের দাম ১ টাকা হয় এবং ১ সের চাউলের দাম ৮ আনা হয় তবে চাউলের অঙ্কে কাপড়ের মূল্য হইল ১ গজে ২ সের, অর্থাৎ—১ গজ কাপড়ের বিনিময়ে ২ সের চাউল পাওয়া যাইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন জিনিসের মূল্যের পরিবর্তন না ঘটিলেও দামের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কারণ সকল জিনিসের দাম একই সঙ্গে এক পরিমাণে বাড়িতে পারে। যুদ্ধ ইত্যাদির সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সকল জিনিসের দাম বাড়িয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন দ্রব্যের পরস্পরের মধ্যে বিনিময় সম্পর্ক বা মূল্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই। এক গজ কাপড়ের দাম যদি ১ টাকা হইতে ২ টাকা হয় এবং ১ সের চাউলের দাম যদি ৮ আনা হইতে ১ টাকা হয় তবে পূর্বের মতই ১ গজ কাপড়ের পরিবর্তে ২ সের চাউল পাওয়া যাইবে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা ঘটে না; দেখা যায় যে দামের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন জিনিসের পরস্পরের মধ্যে মূল্যও পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন জিনিসের পরস্পরের মধ্যে মূল্য তাহাদের দামের সাহায্যে নিরূপণ করা হয় বলিয়া কি ভাবে বিভিন্ন মূল্য নির্ধারিত হয় তাহা বুঝিবার সহজ উপায় হইল, কি ভাবে বাজারে এইসকল দাম নির্ধারিত হয় তাহা অনুসন্ধান করা।

দামের মাধ্যমেই মূল্যের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে

বাজার কাহাকে বলে? (What is a Market?)

বাজারে কিভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় তাহা আমরা অনুসন্ধান করিতে চাই। সুতরাং প্রথমেই জানা প্রয়োজন বাজার কাহাকে বলে।

অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে বাজার বসার জায়গা বুঝায় না। বাজারের জায়গায় নানা জিনিসের কেনা-বেচা চলে। কিন্তু অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে প্রত্যেক জিনিসের জন্য আলাদা বাজার বুঝায়; যেমন,—তুলার বাজার, পাটের বাজার, রূপার বাজার, ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজার, ইত্যাদি। এই বাজার কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বসে না। অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে স্থান বুঝায় না, পণ্য বুঝায়—যে দ্রব্যের বিক্রয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতারা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে। প্রতিযোগিতা না থাকিলে অর্থবিদ্যায় তাহাকে বাজার বলিয়া গণ্য করা হয় না। এক একটি পণ্যের বাজার ঐ পণ্যের সমস্ত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের

বাজার বলিতে স্থান বুঝায় না, জিনিস বুঝায়

লইয়া গঠিত হয়; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ প্রতিযোগিতা থাকে যে, সকলেই এক দামে জিনিস কেনা-বেচা করিতে বাধ্য হয়। কোন ক্রেতাই অন্য ক্রেতার চেয়ে কম দরে জিনিস কিনিতে পারে না, কোন বিক্রেতাই অন্য বিক্রেতার চেয়ে বেশী দরে জিনিস বেচিতে পারে না। কোন কোন জিনিসের বাজার খুব ছোট হইতে পারে, অর্থাৎ গ্রাম, সহর বা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। আবার অনেক জিনিসের বাজার এত বিরাট যে সমগ্র দেশ, এমন কি সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া তাহার প্রসার। বাজার প্রসারিত হওয়ার জন্য কোন জিনিসের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা দরকার।

বাজার প্রসারিত হওয়ার জন্য কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন

১। **স্থায়িত্ব (Durability)ঃ** দুধ, শাকসব্জী, মাছ প্রভৃতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাওয়ার মত জিনিসের বাজার সংকীর্ণ হইতে বাধ্য। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী জিনিসের বাজার সুপরিসর হয়। দুধ হইতে যদি গুঁড়াদুধ তৈয়ারী করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে উহার স্থায়িত্ব বাড়ে, কাজেই বাজারের প্রসারও বাড়ে।

২। **ব্যাপক চাহিদা (Wide Demand)ঃ** যে সব পণ্যের চাহিদা ব্যাপক তাহাদের বাজার, যে সব পণ্যের চাহিদা সংকীর্ণ, তাহাদের বাজারের চেয়ে বেশী পরিসর। সোনা ও রূপার চাহিদা সারা পৃথিবী জুড়িয়া, কাজেই তাহাদের বাজারও পৃথিবী-জোড়া।

৩। **সহজ বহনযোগ্যতা (Portability)ঃ** সুপরিসর বাজার পাইতে হইলে কোন জিনিস বহনযোগ্য হওয়া চাই। ওজনের তুলনায় মূল্য যত বেশী হইবে, জিনিসটির বহনযোগ্যতা ততই বাড়িবে। ইট, খড় প্রভৃতি অল্প মূল্যের ভারী জিনিস অন্যত্র লইয়া যাওয়ার খরচ পোষায় না বলিয়া, এইসব জিনিসের বাজার সংকীর্ণ। মূল্যবান ধাতু, কোম্পানীর কাগজ, সরকারী বণ্ড প্রভৃতির বহনযোগ্যতা খুবই বেশী। ফলে তাহাদের বাজারও অনেক বেশী প্রসারিত।

৪। **নমুনা ও গ্রেড চালু থাকা (Sampling and Grading)ঃ** সোনার গুণাগুণ বাঁধাধরা, সুনির্দিষ্ট। কাজেই সৎ ব্যবসায়ীর নিকট কিনিতে গিয়া পূর্বেই ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখার প্রয়োজন হয় না। সরকারী ও কোম্পানীর কাগজের বেলায়ও পরীক্ষা করিয়া কেনার প্রয়োজন হয় না। ক্রেতা চাক্ষুষ না দেখিয়াই ডাকে বা তারে এইসব জিনিসের ফরমায়েস স্বচ্ছন্দে পাঠাইতে পারে। কিন্তু পাট, তুলা, কয়লা প্রভৃতি কৃষিজাত ও খনিজ পণ্যের গুণাগুণের দিক দিয়া রীতিমত রকমফের আছে। চাক্ষুষ না দেখিলেও তুলার খরিদ্দারের

জানা দরকার সে কোন্ শ্রেণীর তুলা কিনিতেছে। নমুনা ও গ্রেড প্রবর্তনের প্রয়োজন এইখানেই। দূরবর্তী ক্রেতাদের কাছে নমুনা পাঠাইয়া জিনিসের ধারণা দেওয়া চলে। আর বিভিন্ন গ্রেড প্রবর্তনের সাহায্যে গুণানুসারে কোন পণ্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে সহজেই ভাগ করিয়া ফেলা যায়। তুলার একটি বিশেষ গ্রেডের দাম বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে কলিকাতার ব্যবসাদার বোম্বাইয়ের ব্যবসাদারের কাছে স্বচ্ছন্দে ঐ গ্রেডের উল্লেখ করিয়া যত খুশী তুলা না দেখিয়াই কিনিয়া রাখিতে পারিবে। এমন কি, এই কেনাবেচায় নমুনা দেখারও প্রয়োজন হইবে না, কারণ গ্রেডের উল্লেখ করিলেই ক্রেতার পণ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে।

পরিবহন ও সংযোগরক্ষার ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন জিনিসের বাজার দিন দিন প্রসারিত হইতেছে। বর্তমানে অল্প খরচে এবং শীঘ্র কোন জিনিস এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া সম্ভব হয় বলিয়া বাজার প্রসারিত হওয়ার জন্য জিনিসের স্থায়িত্ব ও সহজ বহনযোগ্যতা অনেক ক্ষেত্রে না থাকিলেও চলে। উপরন্তু প্রচারকার্য প্রভৃতির ফলে অপরিচিত জিনিসও বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিতেছে; ফলে, তাহাদের চাহিদাও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। এইসকল পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে এমন অনেক জিনিসের বেচাকেনা পৃথিবীর বাজারে হইবে, যাহাদের বাজার পূর্বে সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় ছিল।

বিভিন্ন জিনিসের বাজার দিন দিন প্রসারিত হইতেছে

বাজারে প্রতিযোগিতা (Competition in a Market) :

প্রত্যেক বাজারে দুইটি পক্ষ থাকে—চাহিদার দিকে কিছু বা বহুসংখ্যক ক্রেতা এবং যোগানের দিকে (একচেটিয়া কারবার না হইলে) কিছু বা বহুসংখ্যক বিক্রেতা। ক্রেতাদের প্রত্যেকে জিনিসটি পাইবার ঔৎসুক্যবশতঃ অপর সকলের সহিত প্রতিযোগিতা করে; অপর দিকে বিক্রেতারাও বিক্রয়ের ঔৎসুক্যবশতঃ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে। যদি ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হয় এবং বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র না হয় তবে জিনিসটির দাম বেশী হইবে। অপর-দিকে আবার বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হইলে এবং ক্রেতাদের মধ্যে তীব্র না হইলে জিনিসটির দাম কম হইবে। সুতরাং দাম কি হইবে তাহা নির্ভর করে দুইদিকের প্রতিযোগিতার তীব্রতার উপর। আবার প্রতিযোগিতার তীব্রতা সাধারণতঃ নির্ভর করে দুইদিকের প্রতিযোগীর সংখ্যার উপর। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে ক্রেতার সংখ্যা বহু, কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে

বহু নহে। ফলে চাহিদার দিকে অধিকাংশ সময় তীব্র প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হইলেও, যোগানের দিকে অনেক ক্ষেত্রে হয় না। সুতরাং আমরা অর্থনৈতিক বাজারকে যোগানের দিকে প্রতিযোগিতার তীব্রতা অনুসারে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইল সেইসকল জিনিসের বাজার যাহাদের বিক্রেতা বহুসংখ্যক এবং, অবশ্যই, ক্রেতাও বহুসংখ্যক। এইরূপ বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (perfectly competitive market) বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইল সেইসকল জিনিসের বাজার যাহাদের বিক্রেতা অল্পসংখ্যক বা মাত্র একজন। এইরূপ বাজারকে আংশিক প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া কারবারের বাজার (imperfectly competitive বা monopolistic market) বলা হয়। একচেটিয়া কারবারের বাজারেও ক্রেতা বহুসংখ্যক হয়।

পূর্ণ এবং আংশিক প্রতিযোগিতামূলক বাজার

এখন আমরা এই দুই প্রকার বাজারে কিভাবে মূল্য নির্ধারিত হয় তাহাই আলোচনা করিব।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by "market" in economics? What are the conditions that govern the test of a market? (C. U., 1940)

(১০৩-১০৫ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Distinguish between perfectly competitive market and imperfectly competitive market. (১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা দেখ)

চতুর্দশ অধ্যায়

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য

পূর্ণ প্রতিযোগিতার অর্থ (Meaning of Perfect Competition) :

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজারে যে কোন জিনিসের দাম সকল বিনিময়ের ক্ষেত্রে একই হইবে। ক্রেতাও সংখ্যায় অনেক, বিক্রেতারও সংখ্যা অনেক। ক্রেতারা পরস্পরের প্রতিযোগী। কাজেই, একজন ক্রেতা অন্যান্য ক্রেতার চেয়ে কম দামে কোন জিনিস পাইতে পারে না। বিক্রেতারাও পরস্পরের

প্রতিযোগী। কাজেই, কোন বিক্রেতাই অন্যান্য বিক্রেতার চেয়ে বেশী দামে কোন জিনিস বিক্রয় করিতে পারে না। তাহা ছাড়া প্রত্যেক ক্রেতা মোট বিক্রেয় জিনিসের অতি সামান্য অংশই কেনে। কাজেই সে তাহার ব্যক্তিগত ক্রয় কমাইয়া দিলেও জিনিসের দাম নামিয়া যাইবে না। প্রত্যেক বিক্রেতাও মোট বিক্রেয় জিনিসের অতি সামান্য অংশই নিজে বিক্রয় করে। কাজেই, সে তাহার নিজস্ব সরবরাহ কমাইয়া দিলেও জিনিসের দাম চড়িয়া যাইবে না। উপরন্তু প্রত্যেকেই জানে যে অপরে কি দামে বেচাকেনা করিতেছে। এইসকল কারণে বাজারে একই দাম হইতে বাধ্য।

প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে জিনিসের দাম সর্বত্র একই হয়

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজার দাম নির্ধারণ
(Determination of Market Price under Perfect Competition)

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে জিনিসের দাম একই হয়। ক্রেতারা উপযোগ আছে বলিয়া জিনিসটি কিনিতে চায় এবং কিনিবার সময় যত অল্প দামে কিনিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করে। যদি তাহাদের অনুমান অপেক্ষা দাম বেশী হয় তবে তাহারা জিনিসটি অল্প পরিমাণে কিনিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায় যে দাম যত বাড়িবে চাহিদা তত কমিবে এবং দাম যত কমিবে চাহিদা তত বাড়িবে। কোন জিনিস কোন এক সময়ে বিভিন্ন দামে কি কি পরিমাণে কেনা হইবে চাহিদার তালিকায় তাহা দেখানো হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কি ভাবে বাজার দাম নির্ধারিত হয়

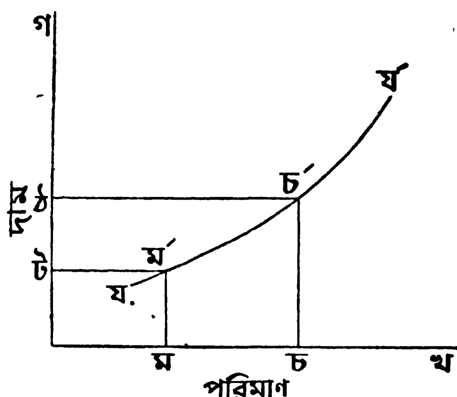
১। চাহিদার অবস্থা

চাহিদার মত যোগানের পরিমাণও দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। দাম কমিলে যোগান কমিবে, কারণ দাম কমা মানেই মুনাফা কম হওয়া; আর দাম বাড়িলে মুনাফাও বেশী হয় বলিয়া যোগান বাড়ে। ইহাকে যোগানের নিয়ম (Law of Supply) বলা হয়। এখন আমরা বিভিন্ন দামে কোন এক সময়ে কোন এক জিনিসের যে যে পরিমাণ যোগান হইবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি। এই তালিকাকে যোগানের তালিকা (Supply Schedule) বলা হয়।

২। যোগানের অবস্থা

দাম যদি ম র্ম বা ক ট হয় তবে ক ম পরিমাণ যোগান হইবে। দাম যদি বাড়িয়া ক ঠ পরিমাণ হয় তবে ক চ পরিমাণ যোগান হইবে। র্ম চ যোগ করিলে

যে রেখা পাওয়া যায় তাহা যোগান বা সরবরাহের রেখা। য র্য হইলে এই সরবরাহের রেখা। ইহার গতি উর্ধ্বাভিমুখী। ইহা দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে দাম বাড়িলে যোগান বা সরবরাহ বাড়ে।



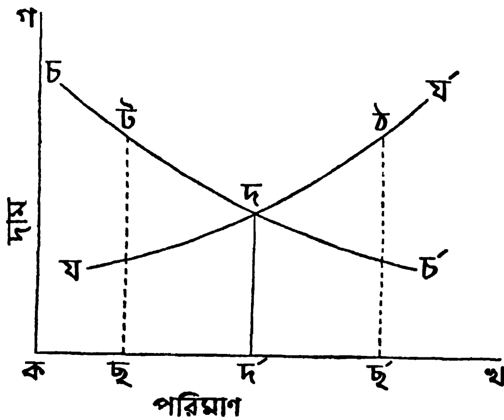
দেখা যাইতেছে যে দামের পরিবর্তন চাহিদা ও যোগানের উপর বিপরীতভাবে ক্রিয়া করে ; দামের বৃদ্ধি চাহিদার পরিমাণ কমায় কিন্তু যোগানের পরিমাণ বাড়ায় এবং দামের হ্রাস চাহিদার পরিমাণ বাড়ায় কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমায়। আমরা চাহিদার তালিকা হইতে চাহিদার অবস্থা এবং যোগানের তালিকা হইতে যোগানের অবস্থা জানিতে পারিলেও শুধু চাহিদার তালিকা বা শুধু যোগানের তালিকা হইতে বলিতে পারি না যে দাম কি হইবে। সুতরাং তালিকা দুইটিকে পাশাপাশি সাজানো প্রয়োজন। নিম্নে ইহাদের পাশাপাশি সাজানো হইল :

চিনির চাহিদা (মণ)	মণকরা চিনির দাম	চিনির যোগান (মণ)
২০০০	১০৲ টাকা	৪,০০০
৩০০০	৯৲ "	৩,০০০
৪০০০	৮৲ "	২,০০০

চিনির দাম যদি মণকরা ১০৲ টাকা হয় তাহা হইলে বিক্রেতারা ৪০০০ মণ চিনি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ক্রেতারা মাত্র ২০০৮ মণ কিনিতে রাজী। কাজেই, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে বিক্রেতারা দাম কমাইতে বাধ্য হইবে। আবার দাম যদি মণকরা ৮৲ টাকা হয় তবে ক্রেতারা কিনিতে রাজী ৪০০০ মণ, অথচ বিক্রেতারা মাত্র ২০০০ মণ বিক্রয় করিতে রাজী।

কাজেই, ক্রেতাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে দাম চড়িতে বাধ্য। অতএব দেখা যাইতেছে দাম খুব বেশী হইলে বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা ইহাকে বাড়াইয়া দিবে, এবং খুব কম হইলে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ইহাকে কমাইয়া দিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যখন প্রত্যেকেই জানে যে অপর সকলে কি দামে বেচাকেনা করিতেছে তখন বাজার দাম নির্ধারিত হইতে বেশী দেরী হয় না। এই বাজার দাম খুব বেশী বা খুব কম হইতে পারে না এবং ইহাতে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়। আমাদের উদাহরণে দাম যখন মণকরা ৯৲ টাকা, তখনই চাহিদা ও যোগান দুই-ই ৩০০০ মণ হইবে। এই দামের বাড়ার বা কমার দিকে কোন ঝোঁক থাকিবে না। অর্থাৎ মণকরা ৯৲ টাকাই হইবে চিনির বাজার দাম। এই দামে চিনির চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণের সমান। এইভাবে চাহিদা ও যোগান ভারসাম্য অবস্থায় (in equilibrium) আসে এবং দাম স্থিতিশীল হয়। এই স্থিতিশীল দামকে অস্থায়ী ভারসাম্য দাম বা অস্থায়ী স্থিত দাম (temporary equilibrium price) বলা হয়।

অস্থায়ী ভারসাম্য মূল্য



চ চ´ হইল চাহিদার রেখা এবং য য´ হইল যোগানের রেখা। রেখা দুইটি পরস্পরকে দ বিন্দুতে ছেদ করিল। দ দ´ অস্থায়ী ভারসাম্য মূল্যের পরিমাপ করে, অর্থাৎ দ দ´ মূল্যে ক্রেতারা যে পরিমাণ কিনিতে চাহিবে, বিক্রেতারা সেই পরিমাণই বিক্রয় করিতে চাহিবে। যদি বাজারে দাম ট ছ পরিমাণ হয় তবে ক্রেতারা ক ছ পরিমাণ জিনিস কিনিতে চাহিবে, কিন্তু বিক্রেতারা ক ছ´ পরিমাণ বিক্রয়

করিতে চাহিবে। সুতরাং বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দামকে আবার দ র্দ-তে লইয়া যাইবে।

চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়ার তিনটি সরল নিয়ম

দাম নিরূপণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে তিনটি সরল নিয়মে বিবৃত করা যায়।

১ম নিয়ম: যদি দাম এমন হয় যে চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশী হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে দামের বাড়ার দিকে ঝোঁক থাকিবে। আর সেই দামে যদি যোগান চাহিদার চেয়ে বেশী হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে দামের কমার দিকে ঝোঁক থাকিবে।

২য় নিয়ম: দাম বাড়িলে চাহিদা কমে ও যোগান বাড়ে; এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে ও যোগান কমে।

৩য় নিয়ম: এইভাবে দামের বাড়া-কমার মারফৎ চাহিদা ও সরবরাহ পরস্পরের নিকটবর্তী হয়। শেষ পর্যন্ত ঠিক সেই দামই প্রতিষ্ঠিত হইবে, যে দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান হয়।

বাজার দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ ও উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব (Influence of Marginal Utility and Cost of Production on Market Price):

কোন জিনিসের বাজার দাম নির্ধারণে কোন এক বিশেষ সময়ে ঐ জিনিসের চাহিদা ও যোগানের অবস্থা লইয়া আলোচনা করা হয়। ঐ সময়ে ঐ দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ যোগান হয়। কেন বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ যোগান হয়? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে কিভাবে যোগান নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ ইহা মনে হইতে পারে যে যোগান উৎপাদনের ব্যয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়। পূর্ববর্তী উদাহরণে কোন চিনির উৎপাদকের মণ-পিছু উৎপাদনের ব্যয় ১০৲ টাকা করিয়া পড়িয়া থাকিলে সে ১০৲ টাকার কমে বিক্রয় করিতে রাজী হইবে না, কারণ ইহার কমে বিক্রয় করিলে তাহার ক্ষতি হইবে। সে আশা করিতে পারে যে ভবিষ্যতে দাম বাড়িয়া অন্ততঃ ১০৲ টাকা হইবে এবং তখন বেচিলে অন্ততঃ লোকসান এড়ান যাইবে। কিন্তু চিনির দাম যে ভবিষ্যতে বাড়িবে তাহার কি কোন

বাজার দাম উৎপাদনের ব্যয়ের উপর নির্ভর করে না

যোগানের দিকে বাজার দাম নির্ভর করে—

নিশ্চয়তা আছে? দাম ১০৲ টাকা হওয়া ত' দূরের কথা, ভবিষ্যতে ৯৲ টাকারও কম হইতে পারে। তখন তাহার ক্ষতি আরও বেশী হইবে। সুতরাং কোন বুদ্ধিমান বিক্রেতাই 'যতক্ষণ না দাম উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হয় ততক্ষণ বেচিব না' বলিয়া বসিয়া থাকে না; যতক্ষণ পর্যন্ত দাম বাড়িবার সম্ভাবনা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে পারে মাত্র।

১। বিক্রেতাদের হাতে মজুত মালের উপর;

অনেক ক্ষেত্রে দাম ভবিষ্যতে বিশেষ বাড়িবার সম্ভাবনা থাকিলেও উৎপাদকের পক্ষে বিক্রয় না করিয়া বসিয়া থাকা সম্ভব হয় না। যদি তাহার নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজন থাকে তবে সে কম দামেও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তনের সম্ভাবনা দ্বারাই কোন এক বিশেষ সময়ে বিক্রেতারা* তাহাদের মজুত মাল হইতে কতটা যোগান দিবে তাহা নির্ধারিত হয়। উপরন্তু, নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তন সম্বন্ধে অনুমান বিভিন্ন বিক্রেতার নিকট বিভিন্ন রকম। ইহার ফলে কেহ বা কম দামে বিক্রয় করিতে রাজী হয়, কেহ বা বেশী দাম না পাইলে বিক্রয় করিতে রাজী হয় না। এই সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে যোগানের পরিমাণ কমিতে থাকে। এবং ইহা হইতেই আমরা যোগানের তালিকা প্রস্তুত করি।

২। নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তার উপর; এবং

৩। ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনার উপর

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে বাজারে যোগানের তালিকার উপর উৎপাদনের ব্যয়ের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই; এবং এই কারণে ইহার বাজার দাম বা অস্থায়ী ভারসাম্য মূল্যের উপরও কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। বাজার দাম অনেক সময়ে উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয়, অনেক সময় কমও হয়। ইহার ফলে উৎপাদকের অনেক সময় লাভ হয়, অনেক সময় ক্ষতি হয়।

চাহিদা সম্বন্ধে আমরা জানি যে বিভিন্ন দামে ক্রেতারা কোন জিনিসের বিভিন্ন পরিমাণ কিনিয়া থাকে। প্রত্যেক ক্রেতারই জিনিসটির উপযোগ সম্বন্ধে একটা

*মূল্যতত্ত্বের আলোচনায় উৎপাদক ও বিক্রেতা একই অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে। বিক্রেতারাও উৎপাদক, তাহারা স্থানগত ও কাল বা সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করে। যে কোন প্রকার উপযোগ-সৃষ্টিকারীকে উৎপাদক বলা যায়।

ধারণা থাকে এবং প্রত্যেকের বেলায়ই ক্রীত জিনিসের পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উপযোগ দাম অপেক্ষা বেশী থাকে ততক্ষণ ক্রেতা কিনিয়া যায় এবং দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হইলে কেনা বন্ধ করে। অবশ্য ক্রেতা কখনই অল্প অল্প করিয়া কেনে না; সে বাজার দামে যতটা কেনা উচিত বলিয়া মনে করে এক সঙ্গে ততটা পরিমাণই কেনে। কিন্তু ক্রেতা অল্পই কিনুক আর বেশীই কিনুক সে ততটা পরিমাণই কেনে যাহার প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হয়। এইভাবে, যদি চায়ের বাজার দাম পাউণ্ড প্রতি ২৲ টাকা হয় এবং বাজারে যদি ১০০০ পাউণ্ড চা বিক্রীত হয় তবে কোন একজন ক্রেতা মাত্র ২ পাউণ্ড কিনিতে পারে। সে কম বেশী না কিনিয়া ২ পাউণ্ডই কিনিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হইল যে ঐ ক্রেতার নিকট দ্বিতীয় পাউণ্ড চায়ের উপযোগ ২৲ টাকার মতন। ঐ ২৲ টাকা দামেই অপর একজন ক্রেতা ৫ পাউণ্ড চা কিনিতে পারে। এই দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট দ্বিতীয় পাউণ্ড চায়ের উপযোগ প্রথম ক্রেতার নিকট যে উপযোগ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট চায়ের প্রান্তিক উপযোগ যতক্ষণ না সে ৫ পাউণ্ড কেনে ততক্ষণ দামের সমান হয় না। সুতরাং প্রত্যেক ক্রেতার নিকট কোন জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ সমান নয়। পূর্ববর্তী উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে ২৲ দামে ১০০০ পাউণ্ড চা বিক্রয় হয়। ইহা হইতে ইহা বলা চলে না যে ১০০০ পাউণ্ড চায়ের প্রান্তিক উপযোগ ২৲ টাকা, কারণ চায়ের উপযোগ সকল ক্রেতার বেলায় এক রকম নয়। অতএব, কোন জিনিসের বাজার দাম উহার বাজারে মোট বিক্রীত পরিমাণের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় না, প্রত্যেক ক্রেতার নিকট ঐ জিনিসের যে প্রান্তিক উপযোগ তাহার সমান হয় মাত্র।

চাহিদার দিকে বাজার দাম প্রত্যেক ক্রেতার নিকট জিনিসটির প্রান্তিক উপযোগের সমান

স্বাভাবিক দাম: উৎপাদনের ব্যয়ের প্রভাব
(Normal Price : The influence of Cost of Production):

আমরা দেখিলাম যে কোন জিনিসের বাজার দাম উহার উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হইতে পারে, নাও হইতে পারে। উৎপাদক এই আশায় উৎপাদন করে যে অন্ততঃ উৎপাদনের ব্যয়ের সমান দামে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। যদি ইহা সম্ভব হয়, অর্থাৎ যদি উৎপাদক অন্ততঃ উৎপাদনের ব্যয়ের সমান দামে জিনিস

বিক্রয় করিতে পারে, তবে সে পূর্বের মতই উৎপাদন করিয়া চলে। কিন্তু দাম যদি উৎপাদনের ব্যয়ের সমান না হয়, অর্থাৎ যদি কম বেশী হয়, তবে অবস্থাটা অন্য রকম দাঁড়ায়। যদি দাম উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয় তবে বিক্রেতারা যাহা আশা করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বেশী মুনাফা লাভ করে; এবং দাম কিছুদিন ধরিয়া না কমিলে তাহারা বেশী উৎপাদন করিয়া আরও বেশী মুনাফা লাভ করিতে পারে। অপর দিকে, বাজার দাম যদি উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তবে বিক্রেতাদের লোকসান হয় এবং ফলে তাহারা পূর্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে উৎপাদন করিতে থাকে। এইরূপ করার কারণ হইল এই যে উৎপন্নের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং এই হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের সূত্র অনুসারে হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদন যতই বাড়ানো হয় উৎপাদকের ব্যয় ততই বাড়িতে থাকে এবং উৎপাদন যতই কমানো হয় উৎপাদকের ব্যয় ততই কমিতে থাকে। যখন বলা হয় যে দাম উৎপাদনের ব্যয়ের সমান বা সমান নয় তখন শেষ 'এককে'র উৎপাদনের ব্যয় বা উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয়েরই উল্লেখ করা হয়, কারণ যদি বিক্রেতা আশা না করিত যে এই শেষ 'একক' উৎপাদনের ব্যয় দামের সমান হইবে তবে সে ইহা উৎপাদন করিত না। অতএব, দেখা যাইতেছে যে একজন উৎপাদক কতটা পরিমাণ উৎপাদন করিবে তাহা নির্ভর করে সে বাজারে জিনিসটির কি দাম আশা করে তাহার উপর। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় সে যে দাম আশা করে তাহার কম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন করিয়া যাইবে। আর যদি সে যে দাম আশা করে তাহা অপেক্ষা এবং প্রান্তিক উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা বাজার দাম কম হয় তবে সে উৎপাদন কমাইয়া উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় কমাইতে সচেষ্ট হইবে। সে উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় কমাইয়া এমন অবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিবে যাহাতে ইহা বর্তমানের কম দামের সমান হয়।

উৎপাদক উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় কমাইয়া ও বাড়াইয়া এমন অবস্থায় আনে যাহাতে ইহা বাজার দামের সমান হয়

দেখা যাইতেছে, বাজার দাম ভবিষ্যতে উৎপন্নের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করে। উৎপন্নের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণও পরিবর্তিত হয়। আবার বাজার দাম যোগানের উপর নির্ভর করে বলিয়া ভবিষ্যতে যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যৎ বাজার দামেরও পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে বাজার দামের পরিবর্তন ও উৎপন্নের পরিবেশনের পরিবর্তন বাজার দাম ও

উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয়কে পরস্পরের কাছাকাছি লইয়া আসিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলে কিছুদিন পরে তাহারা সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে পারে। যদি তাহারা সম্পূর্ণ এক হইয়া যায়, অর্থাৎ বাজার দাম উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় এবং প্রত্যেক উৎপাদক যে মুনাফা আশা করে তাহাই লাভ করে, তবে যে

প্রকৃত ভারসাম্যের অবস্থা

অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে প্রকৃত ভারসাম্যের অবস্থা (True Equilibrium Situation) বলা হয়। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়া উৎপন্ন ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের দিকে কোন ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় না। প্রকৃত ভারসাম্য দাম (True

প্রকৃত ভারসাম্য দাম

Equilibrium Price) একদিকে প্রান্তিক উপযোগ এবং অপরদিকে প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। ইহাকে স্বাভাবিক দাম (Normal Price) বলিয়া অভিহিত করা হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া যদি উৎপাদন ও চাহিদার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তবে বাজার দাম স্বাভাবিক

বাজার দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে সম্বন্ধ

দামের সমান হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ চাহিদা ও যোগানের (উৎপাদনের) অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে না। ফলে বাজার দামের স্বাভাবিক দামের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা গেলেও ইহারা সমান হয় না। তবুও স্বাভাবিক দামের আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব আছে, কারণ স্বাভাবিক দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান বলিয়া সর্বদাই বাজার দামকে নিজের দিকে টানে।

একচেটিয়া কারবারের আওতায় মূল্য (Value under Monopoly) ঃ

যখন একজন মাত্র উৎপাদক কিংবা সমস্ত উৎপাদক সংঘবদ্ধ হইয়া কোন জিনিসের মোট যোগান নিয়ন্ত্রণ করে তাহাকে Monopoly বা একচেটিয়া কারবার বলে। নানা কারণে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইতে পারে। ইহার মধ্যে অবশ্য দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র যদি কোন আবিষ্কারককে তাহার আবিষ্কারের উপর 'পেটেণ্ট' দেয় তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদকগণ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াও একচেটিয়া কারবারের প্রতিষ্ঠা করে।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উৎপাদকের সংখ্যা অজস্র; প্রত্যেকেই মোট

উৎপাদনের অতি সামান্য অংশ মাত্র উৎপাদন করে। প্রত্যেক উৎপাদকই জানে যে তাহার নিজের মোট উৎপাদন বাড়ানো-কমানোর ফলে বাজার দাম একটুও প্রভাবিত হইবে না। কাজেই, সে নিজের উৎপাদন-খরচ যতদূর সম্ভব কমাইয়া এবং যে পর্যন্ত না প্রান্তিক ব্যয় দামের সমান হয় সে পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াইয়া, মোট মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করে।

কিন্তু যখন একচেটিয়া কারবারী কোন জিনিসের একমাত্র উৎপাদক তখন সে যদি বেশী উৎপাদন করে তাহা হইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত কম দামে বেচিতে হইবে এবং সে যদি কম উৎপাদন করে তাহা হইলে সে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে বেচিতে পারিবে। তাই একচেটিয়া কারবারী ইচ্ছামত দামকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে দামে সর্বাধিক মুনাফা হইবে, সেই দামেই সে জিনিস বিক্রয় করে।

একচেটিয়া কারবারী দামকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে

একচেটিয়া কারবারের মুনাফা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) প্রান্তিক ব্যয় অর্থাৎ উৎপাদিত শেষ 'এককে'র ব্যয়; এবং (২) শেষ 'একক' বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় (marginal revenue)।

ধরা যাউক, একচেটিয়া কারবারী কোন জিনিসের ১০ 'একক' তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছে এবং প্রতি 'একক' ১৲ টাকা দামে বিক্রয় করিতেছে। ১৲ টাকা হইল ১০ এককের প্রান্তিক উপযোগের পরিমাপ। কাজেই ১৲ টাকা দামেই ১০ 'একক' জিনিস বিক্রীত হইবে এবং কারবারীর মোট আয় হইবে ১০৲ টাকা। একচেটিয়া কারবারীর সম্মুখে সমস্যা এই যে আর একটি 'একক' উৎপাদিত করিয়া মুনাফা বাড়ানো সম্ভব কিনা। ১১ একক উৎপাদন করিলে দাম কমিয়া যাইবে; কারণ, ১০ 'এককে'র প্রান্তিক উপযোগের চেয়ে ১১ 'এককে'র প্রান্তিক উপযোগ কম হইবে। দাম যদি কমিয়া ১৫ আনায় দাঁড়ায় তাহা হইলে তাহার মোট আয় হইবে (১১ × ১৫) আনা অর্থাৎ ১০ টাকা ৫ আনা। কাজেই ১১শ 'একক' উৎপাদনের ফলে তাহার অতিরিক্ত আয় হইল ৫ আনা। এই ১১টি 'এককে'র প্রান্তিক ব্যয় অর্থাৎ একাদশ 'একক' তৈয়ারীর খরচ যদি ৫ আনার কম হয়, তাহা হইলে ১১শ 'একক' উৎপাদনের দরুণ কিছু বাড়তি মুনাফা হইবে। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক ব্যয় প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়ের সমান না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যোগান বাড়াইয়াই চলিবে। এই সমতার বিন্দুতেই তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে। ইহার পর যোগান আরও বাড়াইয়া দিলে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে কম হইবে, ফলে লোকসান হইবে।

পূর্ববর্তী উদাহরণ হইতে দেখা গিয়াছে যে, একচেটিয়া কারবারীর তৈয়ারী জিনিসের দাম, ঐ জিনিসের শেষ 'একক' বিক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত আয় হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী। এখন এই শেষ 'একক' বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত আয় বা প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় বলিয়া একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম সর্বদা প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয়।

একচেটিয়া কারবারের কুফল

একচেটিয়া কারবারীর তৈয়ারী জিনিসের দামের, প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে তৈয়ারী জিনিসের দামের চেয়ে বেশী হওয়ার দিকে ঝোঁক আছে। যে উৎপাদক সব সময়ে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন, দামের উপর তাহার কোন হাত নাই। কাজেই সে চেষ্টা করে, যতদূর সম্ভব খরচের হ্রাস ও উৎপাদনের বৃদ্ধি করিয়া কি ভাবে মোট মুনাফা বাড়ানো যায়। কিন্তু একচেটিয়া কারবারী যোগান সংকুচিত করিয়া এবং দাম বাড়াইয়া নিজের মুনাফা বেশী করিতে পারে। এইভাবে একচেটিয়া কারবার কায়েম থাকিলে ভোগী (Consumer) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য একচেটিয়া কারবারীরা কখনও কখনও বিভিন্ন ক্রেতার নিকট একই জিনিস বিভিন্ন দামে বিক্রয় করে। কলিকাতা ইলেকট্রিক্ সাপ্লাই করপোরেশন কলকারখানার নিকট কম দামে এবং গৃহস্থের নিকট বেশী দামে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে। ইহাকে মূল্য পার্থক্যকরণ (Price Discrimination) বলা হয়। কখনও কখনও প্রতিযোগীকে সরিয়া যাইতে বাধ্য করার জন্য একচেটিয়া কারবারী প্রথমে দাম খুব কমাইয়া দেয় এবং উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর আবার বাড়াইয়া দেয়। এই সব কারণে একচেটিয়া কারবারকে সুনজরে দেখা হয় না।

একচেটিয়া কারবারী যত ইচ্ছা দাম বাড়াইতে পারে, বাস্তব জীবনে ইহা বড় একটা সম্ভব হয় না। দাম অত্যন্ত বাড়াইলে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইতে পারেন; লোকে অন্য জিনিস ব্যবহার করিতে পারে,—যেমন বিদ্যুতের দাম অত্যন্ত বাড়াইলে লোকে গ্যাস ব্যবহার করিতে পারে, ইত্যাদি। এই সকল কারণে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দাম বাড়াইবার পূর্ণ ক্ষমতা নাই।

প্রশ্নোত্তর

1. Show that price depends on the inter-action of the forces of demand and supply. (C. U., 1928, 1945)

2. Explain how market value is determined under condition of competition. (C. U., 1946, 1952) (১০৭-১১০ পৃষ্ঠা দেখ)

3. "The equilibrium or market price measures at the given time and place both the marginal utility to those just induced to buy and the cost of production to the marginal sellers." (Penson).—Elucidate the statement. (C. U., 1947)

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** উপরের উদ্ধৃতিতে দেখা যায় যে অধ্যাপক পেনসন বাজার দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব, তিনি এখানে ভুল করিয়াছেন। স্বাভাবিক দামই উৎপাদকের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়; বাজার দাম সমান না-ও হইতে পারে। বাজাব দাম অস্থায়ী ভারসাম্য দাম; অল্প সময়ের মধ্যে ইহা নির্ধারিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে নির্ধারিত হয় বলিয়া যোগানের পরিমাণকে বাড়াইয়া বা কমাইয়া ইহাকে চাহিদার সমান করা যায় না। কিন্তু স্বাভাবিক দাম বহুদিন ধরিয়া নির্ধারিত হয় বলিয়া চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইতে পারে।]

4. The normal price of a commodity, under conditions of perfect competition, tends to be equal to its marginal cost of production. Explain. (C. U., 1951) (১০৭-১১০ পৃষ্ঠা দেখ)

5. Distinguish between market price and normal price. Explain how market price of a commodity is determined. (C. U., 1950)
(১১০-১১৪ পৃষ্ঠা দেখ)

6. What is a monopoly ? (C. U., 1952). How is monopoly price determined ? (C. U., 1939, 1952) (১১৪-১১৬ পৃষ্ঠা দেখ)

পঞ্চদশ অধ্যায়

টাকাকড়ি ও বিনিময়

বিনিময়ের উপযোগিতা এবং সর্তসমূহ (Conditions and Utility of Exchange) ঃ

শ্রমবিভাগের ফলে বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা যায়। একটিমাত্র জিনিস তৈয়ারী করিতে যে শিখিয়াছে সে দ্রব্য বিনিময়ের সাহায্যেই অন্যান্য অভাব মোচনের উপযোগী জিনিস সংগ্রহ করিতে পারে। যে কৃষক শুধু ধান উৎপাদন করে সে ধানের বদলে লবণ, কাপড়, লাঙ্গল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারে। একটি জিনিসের পরিবর্তে আর একটি জিনিস যখন সোজাসুজিভাবে সংগ্রহ করা হয় তখন তাহাকে প্রত্যক্ষ বিনিময় বলে। আজকাল প্রত্যেক উৎপাদক নিজের জিনিস বিক্রয় করিয়া টাকাকড়ি বা অর্থ সংগ্রহ করে। এই আর্থিক আয়ের সাহায্যেই সে ইচ্ছামত অন্যান্য জিনিস কিনিতে পারে। ইহা হইল পরোক্ষ বিনিময়।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিনিময়

প্রথমে প্রত্যক্ষ বিনিময় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। ধরা যাউক, 'ক'-এর একটি ছুরি আছে এবং 'খ'-এর একটি তোয়ালে আছে। ইহাদের মধ্যে বিনিময় সম্ভবপর হওয়ার জন্য তিনটি অবস্থার অস্তিত্ব প্রয়োজন: (১) 'ক' তোয়ালের জন্য এবং 'খ' ছুরির জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখিবে। অর্থাৎ দুইজনের প্রত্যেকে অপরের জিনিসটি পাইতে চাহিবে। (২) প্রত্যেকে অপরের জিনিসের জন্য কেবল আকাঙ্ক্ষাবোধই করিবে না, উহা পাওয়ার জন্য কিছু ত্যাগ করিতেও রাজী থাকিবে। তোয়ালে পাওয়ার জন্য ছুরি ত্যাগ করিতে 'ক'-এর রাজী থাকা চাই এবং ছুরি পাওয়ার জন্য তোয়ালে ত্যাগ করিতে 'খ'-এর রাজী থাকা চাই। (৩) 'ক'-এর নিকট তোয়ালের উপযোগিতা ছুরির উপযোগিতার চেয়ে বেশী হইবে এবং 'খ'-এর নিকট ছুরির উপযোগিতা তোয়ালের উপযোগিতার চেয়ে বেশী হইবে।

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের সর্তসমূহ

দেখা যাইতেছে যে এইভাবে বিনিময় উভয়ের পক্ষেই সুবিধাজনক হইবে। 'ক' ও 'খ' উভয়েই বিনিময়ের দরুণ বাড়তি উপযোগিতা লাভ করিবে। উপযোগিতার সৃষ্টিকেই উৎপাদন বলে। কাজেই বিনিময় সমাজের উৎপাদন-প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ।

বিনিময়ের অসুবিধা (Difficulties of Barter):

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অনেক অসুবিধা আছে। একে অন্যের অভাব মিটাইতে পারে,—এইরূপ দুইজনের মধ্যে দেখা হইলেই শুধু বিনিময় সম্ভবপর হয়। ধরা যাউক, একজন টুপিওয়ালার ক্ষুধা মিটানোর জন্য মাংসের প্রয়োজন। তাহাকে টুপির বিনিময়ে মাংস সংগ্রহ করিতে হইবে। খুব কাছেই হয়ত একজন কসাই আছে, কিন্তু তাহার টুপির কোন প্রয়োজন নাই। কাজেই ক্ষুধার্ত টুপি-ওয়ালাকে একজন টুপিহীন কসাইকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহা হইলেই বিনিময় সম্ভব হইয়া উঠিবে।

১। বিভিন্ন বিনিময়কারীর অভাবসমূহের সামঞ্জস্য সকল সময় দেখা যায় না

দ্বিতীয়তঃ, অনেক জিনিস ইচ্ছামত বিভাজ্য নয় বলিয়াও প্রত্যক্ষ বিনিময় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কোন লোককে যদি একটি ঘোড়ার বদলে তৈল, লবণ, ধান, ডাল এবং কাপড় সংগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে এমন একজন লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহার ঘোড়ার দরকার আছে এবং বিনিময়ে ঘোড়াওয়ালার দরকারের সবগুলি জিনিস দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

২। অনেক জিনিস ইচ্ছামত বিভাজ্য নয় বলিয়াও বিনিময়ের অসুবিধা হয়

কিন্তু এমন মিল মত লোক পাওয়া খুবই কঠিন। তৈল, লবণ, ধান, ডাল ও কাপড় আলাদা আলাদা করিয়াও সংগ্রহ করার জো নাই, কারণ ঘোড়াকে ত আর টুক্‌রা টুক্‌রা করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ বিনিময়ের কোন সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম নাই। ফলে, একটি জিনিসের মূল্য আর একটি জিনিসের মাপকাঠিতে প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া প্রত্যেক জিনিসের অসংখ্য বিনিময় হার থাকে এবং ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য অনেক সময়েই থাকে না। এইভাবে পারস্পরিক মাপকাঠিতে বিভিন্ন জিনিসের মূল্য ঠিকমত প্রতিফলিত হয় না। হয়ত ১ সের চাউলের বদলে ২ সের লবণ, ১০ সের লবণের বদলে ½ সের তেল, ১ সের তেলের বদলে ১০টি আম এবং ৫টি আমের বদলে ১৩টি আপেল পাওয়া যায়। কিন্তু ১ সের চাউলের বদলে কয়টি আপেল পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। উপরোক্ত হিসাবের ভিত্তিতে ১ সের চাউলের বদলে যতগুলি আপেল পাওয়া উচিত, প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করিতে গেলে হয়ত তাহার চেয়ে কম সংখ্যক আপেল পাওয়া যাইবে। উচিত সংখ্যক আপেল পাইতে হইলে যাহার চাউল আছে তাহাকে প্রথমে চাউলের বিনিময়ে লবণ, পরে লবণের বিনিময়ে তৈল, তৈলের বিনিময়ে আম ও আমের বিনিময়ে আপেল লইতে হইবে।

৩। সর্বজনগ্রাহ্য কোন মাধ্যম নাই

টাকাকড়ির উপযোগিতা (Utility of Money) :

টাকাকড়ির প্রচলনের ফলে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে। টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম (common medium)। টাকাকড়ি প্রচলিত হওয়ায় লোকে জিনিস বিক্রয় করিয়া মূল্য হিসাবে টাকাকড়ি গ্রহণ করে এবং এই টাকাকড়ির সাহায্যে যখন খুসী ইচ্ছামত পরিমাণে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে। টাকাকড়ির সাহায্যে জিনিস কেনাবেচার জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। ক্ষুধার্ত টুপিওয়ালাকে টুপিহীন কসাই-এর সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। টুপিওয়ালা টুপি বিক্রয় করিয়া টাকা লইবে এবং টাকার সাহায্যে বাজার হইতে যখন খুসী মাংস কিনিবে। টাকাকড়ির চাহিদা সর্বজনীন; টাকাকড়ির বিনিময়ে জিনিস বিক্রয় করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। তাহা ছাড়া টাকাকড়ি ইচ্ছামত ছোট অংশে বিভাজ্য।

টাকাকড়ি প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা দূর করে

একটি দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা, টাকা ভাঙ্গাইয়া আনা এবং আনা ভাঙ্গাইয়া পয়সা করা যায়। আমাদের পূর্বোক্ত ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া বেচিয়া টাকাকড়ি সংগ্রহ করিতে পারে। এই টাকাকড়ি ইচ্ছামত ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া সে তাহাদের সাহায্যে বাজার হইতে খুসীমত পরিমাণে জিনিস কিনিতে পারে। সকল জিনিসের মূল্যই টাকাকড়ির মাপকাঠিতে প্রকাশিত হয় বলিয়া বিনিময়-হারের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায় এবং বিভিন্ন বিনিময়-হারের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

টাকাকড়ি কি ? (What is Money ?)

টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম। টাকাকড়ির মাধ্যমে বা মারফতে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে বিনিময় সম্ভব হয়। চাউলের উৎপাদক চাউল বিক্রয় করিয়া প্রথমে টাকাকড়ি সংগ্রহ করে এবং ঐ টাকাকড়ির বদলে আবার হয়ত লবণ সংগ্রহ করে। এইভাবে টাকাকড়ির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে চাউল ও লবণের বিনিময় সাধিত হয়। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্যকর হইতে হইলে টাকাকড়ি সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন। লবণ-উৎপাদক যদি প্রচলিত টাকাকড়ি লইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে চাউল-উৎপাদকের পক্ষেও চাউলের বদলে টাকা লইতে ইতস্ততঃ করা স্বাভাবিক। টাকাকড়ির স্বকীয় কোন উপযোগিতা নাই। ইহার সাহায্যে অভাব-মোচনের উপযোগী নানারকম জিনিস কেনা যায় বলিয়াই ইহা আমাদের কাজে লাগে।

কিন্তু টাকাকড়ি যদি সর্বজনগ্রাহ্য না হয় তাহা হইলে অভাব পরিতৃপ্তির জন্য ইহা ব্যবহার করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। সেরূপ ক্ষেত্রে টাকাকড়ি নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। টাকাকড়ির সর্বজনীন গ্রাহ্যতা নির্ভর করে দেশাচার বা আইনের উপর। আজকাল টাকাকড়ি বলিতে কাগজের নোট আর ধাতুর মুদ্রা বুঝায়। দেশের আইন দেশের মধ্যে সকলকেই প্রচলিত এইরূপ টাকাকড়ি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। তাই এইরূপ টাকাকড়িকে বলা হয় বিহিত অর্থ বা বিহিত মুদ্রা (legal tender)। পূর্বকালে বিহিত মুদ্রা বলিয়া কিছু ছিল না। টাকাকড়ির সর্বজনীন গ্রাহ্যতার ভিত্তি ছিল দেশাচার। নিছক দেশাচারের জোরের উপর ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন যুগে চামড়া, গরু, কড়ি, তামা, রূপা ও সোনা টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এখন টাকাকড়ির গ্রাহ্যতার ভিত্তি

বিহিত অর্থ বা বিহিত মুদ্রা

নিছক আইনের জোর নয়, জনসাধারণের ইচ্ছার আনুকূল্যের উপরেও ইহা প্রতিষ্ঠিত।

কোন লোক যে পরিমাণ টাকাকড়ি রোজগার করে, তাহার সবটাই সে একবারে ব্যয় করে না। কিছু টাকাকড়ি সে জমাইয়া রাখে ভবিষ্যতে অভাব মিটাইবার জন্য। তাহার জমানো টাকার এক অংশ সে লোককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারও দিতে পারে। ভবিষ্যতে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ের অনেক লেনদেন চলে। কাজেই এই সব লেনদেন সম্পূর্ণরূপে চুকিয়া যাইতে সময়ের দরকার। টাকাকড়ি প্রচলিত থাকার দরুণ এই সব লেনদেন হইতে উদ্ভূত ঋণের যথাযথ পরিমাপ ও পরিশোধ সম্ভবপর হইয়াছে।

টাকাকড়ির সংজ্ঞা

এইবার আমরা টাকাকড়ির একটি সংজ্ঞা দিতে পারি। পণ্যের মূল্য, কাজের মজুরী এবং ঋণশোধের ব্যাপারে যাহা কিছু সর্বসাধারণের গ্রাহ্য তাহাই টাকাকড়ি।

টাকাকড়ির কার্যাবলী (Functions of Money):

ইংরেজীতে একটা কথা প্রচলিত আছে, "Money is as money does"। এই কথার অর্থ দুইটি। প্রথমতঃ, টাকাকড়ি বলিতে আইনের অনুশাসনে লোকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যাহা কিছু গ্রহণ করে শুধুমাত্র তাহাই বুঝায় না। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যাহা কিছু কার্যতঃ চালু আছে এবং যাহা মোটামুটিভাবে সকলের গ্রাহ্য তাহাকেই টাকাকড়ি বলা যায়। আমেরিকার ডলার যদি জার্মানীতে সকলেই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে, তাহা হইলে জার্মানীতে ইহা টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত উক্তিটির আর একটি অর্থ হইল এই যে টাকাকড়ির কার্যাবলীর মধ্যেই ইহার 'টাকাকড়িত্বটুকু' নিহিত আছে।

কার্যাবলী

টাকাকড়ির কার্যাবলী সংখ্যায় বহু। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলি নীচে আলোচিত হইল।

১। বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange): টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। টাকাকড়ির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্য ইহাই। লোকে প্রথমে পণ্যের বিনিময়ে টাকাকড়ি পায় এবং টাকাকড়ির বিনিময়ে আবার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিয়া লয়। এইভাবে টাকাকড়ির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় সংঘটিত হয়।

২। **মূল্যের পরিমাপ (Measure of Value) :** সকল জিনিসের মূল্যই টাকাকড়ির মাপকাঠিতে পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়। আমরা যখন বলি যে চাউলের মূল্য মণকরা ১৬৲ টাকা, তখন চাউলের ওজন মাপার জন্য 'মণ' এবং মূল্য মাপার জন্য 'টাকা' ব্যবহৃত হয়। মূল্য পরিমাপের জন্য প্রত্যেক দেশেই নিজস্ব একক ঠিক করা আছে। ভারতে টাকা, ব্রিটেনে পাউণ্ড এবং আমেরিকায় ডলার এইরূপ একক। এইসব আর্থিক একক হইল মূল্যের মান বা হিসাবনিকাশের একক (standard of value or unit of account)। ইহা মূল্য প্রকাশের সাধারণ মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে।

অনেক সময় দেখা যায় যে লোকে সরকারী কাগজী নোটে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু এই কাগজী নোটের কোন পরিবর্ত না থাকায় বাধ্য হইয়া বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ইহাই ব্যবহার করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় লোকে ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক চুক্তি ইত্যাদি কোন বিদেশী আর্থিক একক বা সোনার মাপকাঠিতে করে। এইরূপ ঘটিলে সরকারী কাগজী নোটগুলি মাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে, মূল্যের পরিমাপ হিসাবে নহে। ইহা অবশ্য ঘোরতর আর্থিক সংকটের লক্ষণ; এইরূপ অবস্থা বেশীদিন বর্তমান থাকিতে পারে না।

৩। **মূল্যের ভাণ্ডার বা সঞ্চয়ের বাহন (Store of Value) :** লোকে যখন নিজের পণ্য বিক্রয় করে তখন তাহার টাকাকড়ির আকারে কিছু না কিছু আয় হয়। এই আয় কখনও একসঙ্গে ব্যয়িত হয় না। ইহার এক অংশ সঞ্চিত থাকে ভবিষ্যতের ব্যয় মিটানোর জন্য। এইভাবে টাকাকড়ি বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুর কাজ করে। বর্তমান কাজের ফলে যে আর্থিক আয় উপার্জিত হয়, তাহার সাহায্যে আমরা ভবিষ্যতের প্রয়োজনগুলিও মিটাইতে চাই। এই উদ্দেশ্যে আমাদের সঞ্চয় জিনিসপত্রের আকারে মজুত না রাখিয়া টাকাকড়ির আকারে মজুত রাখা অনেক বেশী সুবিধাজনক। কারণ বেশীদিন সঞ্চিত থাকিলে জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া যায় বা বিকৃত হয়, কিন্তু টাকাকড়ি সহজে নষ্ট বা বিকৃত হয় না। তাহা ছাড়া টাকাকড়ির বহনযোগ্যতা (Portability) জিনিসপত্রের বহনযোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশী। অবশ্য সঞ্চিত টাকাকড়ির বিনিয়োগ না হইলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। টাকাকড়ির বিনিয়োগ না হওয়া মানেই উৎপাদন সংকুচিত হওয়া; এবং উৎপাদন সংকুচিত হইলে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটানোর উপযুক্ত জিনিসপত্রও তৈয়ারী হইবে না।

৪। **স্থগিত লেনদেনের মান বা দেনাপাওনার হিসাবনিকাশ (Standard of Deferred Payments):** ব্যবসায়ীরা, এমন কি সাধারণ লোকেও, প্রায় ঋণগ্রস্ত হয়। ঋণের উদ্ভব হয় দুইভাবে: (১) টাকাকড়ি ধার লইলে, এবং (২) ধারে জিনিস কিনিলে। এই সব ঋণের হিসাবনিকাশ আর্থিক এককের মাপকাঠিতেই করা হয়।

মূল্যের ভাণ্ডার এবং স্থগিত লেনদেনের মান হিসাবে ব্যবহৃত হইতে হইলে টাকাকড়ির মূল্য একরকম থাকা একান্ত প্রয়োজন। টাকাকড়ির মূল্য যদি হঠাৎ কমিয়া যায় তাহা হইলে যে টাকাকড়ি সঞ্চয় করিয়াছে বা অনেক ধার দিয়াছে তাহার ক্ষতি হইবে। আবার টাকাকড়ির মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া গেলে যে অন্য কাহাকেও নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত তাহার ক্ষতি হইবে। কাজেই টাকাকড়ির মূল্য স্থির থাকাই বাঞ্ছনীয়, এবং আমরা আশাও করি ইহাই। কিন্তু বাস্তব জগতে ঘন ঘনই টাকাকড়ির মূল্য ইতস্ততঃ পরিবর্তিত হয়।

উপরোক্ত মুখ্য চারিটি কাজ ছাড়াও টাকাকড়ির অনেকগুলি গৌণ কাজ আছে। তন্মধ্যে আমরা দুইটির উল্লেখ করিতে পারি: (১) ইহা শ্রমের নিয়োগে সাহায্য করে,—অর্থাৎ টাকার দ্বারাই শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া ব্যবসায়ীর মুনাফা হয়। টাকা না থাকিলে শ্রমিক নিয়োগ করিতে ব্যবসায়ীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। শ্রমিকের শ্রমের পরিবর্তে তাহাকে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে হইত। (২) টাকার দ্বারাই আমরা আমাদের ক্রীত বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতার মধ্যে সমতা সাধন করিতে পারি।

টাকাকড়ির দুইটি গৌণ কাজ

উৎকৃষ্ট টাকাকড়ির গুণাবলী (Qualities of Good Money):

কার্যাবলী যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য টাকাকড়ির কয়েকটি গুণ থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য জিনিসের তুলনায় সোনা ও রূপার এই সব গুণ অধিক সংখ্যায় আছে। এইজন্যই কড়ি, চামড়া, ব্রোঞ্জ ও তামাকে স্থানচ্যুত করিয়া সোনা ও রূপা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। উৎকৃষ্ট টাকাকড়ির এইসব গুণ থাকে:—

সোনা ও রূপা ভাল টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে

১। **স্থায়িত্ব (Durability):** টাকাকড়ির স্থায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। চাউল সহজেই পচিয়া যায় বা পোকায় কাটে বলিয়া টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত

হওয়ার যোগ্য নয়। অন্যান্য জিনিসের তুলনায় ধাতুর স্থায়িত্ব বেশী। ধাতুর মধ্যে আবার সোনা, রূপা এবং তামার স্থায়িত্ব লোহা বা সীসার চেয়ে বেশী। অল্প মূল্যের কাগজী নোট ঘন ঘন হাত বদলানোর ফলে সহজেই জীর্ণ ও মলিন হইয়া পড়ে,—যেমন আজকালকার ১৲ টাকার নোট। অবশ্য এইরূপ নোট সহজেই ব্যাঙ্ক বা সরকারের নিকট হইতে বদলাইয়া লওয়া চলে। কাগজী মুদ্রার আগুনে নষ্ট হইয়া যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

২। **সমজাতীয়তা (Homogeneity)**ঃ টাকাকড়ির সমজাতীয় হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ টাকাকড়ি হিসাবে যাহা ব্যবহৃত হইবে তাহার গুণ যেন সমানভাবে বিভিন্ন সমান অংশের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তুলা, গম, ছাগল, গরু প্রভৃতি সমজাতীয় (homogeneous) নয়। আসল সোনা বা রূপা সমজাতীয় বটে, কিন্তু আসলের সঙ্গে খাদ মিশানো থাকিতে পারে। আগেকার দিনে সোনা ও রূপা টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও, কোন জিনিসের মূল্য হিসাবে গ্রহণ করার সময় উহাদের ওজন ও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইত। টাকাকড়ির ওজন ও গুণ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টতা বিধানের জন্য আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই মুদ্রাঙ্কনের (Coinage) ব্যবস্থা হইয়াছে। আইনের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক মুদ্রাতেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা, রূপা বা তামা থাকে। ঘষিয়া ঘষিয়া ধাতু বাহির করা বন্ধ করার জন্য মুদ্রার কিনারা দিয়াও খাঁজ কাটা থাকে। সুষ্ঠু মুদ্রাঙ্কনের দৌলতে হাজার হাজার মুদ্রার প্রত্যেকটিই ঠিক একরকম হয়। সমজাতীয়তা বা সর্বাঙ্গীণ গুণসমতার দৃষ্টিকোণ হইতে, সকল প্রকার প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে কাগজী মুদ্রাই শ্রেষ্ঠ।

৩। **সহজে চেনার যোগ্যতা (Cognisability)**ঃ টাকাকড়ি হিসাবে এমন জিনিস ব্যবহৃত হওয়া উচিত, যাহা সহজেই চেনা যায়। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে—'যাহা কিছু চক্‌চক্ করে, তাহাই সোনা নয়'। সাধারণ লোক খাঁটি সোনা সহজে চিনিতে পারে না বলিয়াই এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের পক্ষে খাঁটি সোনা বা রূপা চিনিতে পারা কঠিন নয়। কিন্তু মুদ্রাঙ্কিত সোনা বা রূপা চিনিতে সাধারণ লোকেরও বেগ পাইতে হয় না, কারণ প্রত্যেক মুদ্রারই একটি বিশিষ্ট ছাঁচ আছে। একই কারণে কাগজী নোটও সহজেই চেনা যায়।

৪। **সহজ বহনযোগ্যতা (Portability)**ঃ টাকাকড়ি সহজেই বহনযোগ্য হওয়া চাই। কাজেই যে জিনিস মূল্যের তুলনায় বেশী ভারী তাহার

টাকাকড়ি হওয়ার যোগ্যতা নাই। সোনা ও রূপা সহজেই এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় বহিয়া লওয়া যায়, কারণ অনেক মূল্যের সোনারূপাও ওজনে অনেক হাল্‌কা হয়। মুদ্রার চেয়ে কাগজী নোট আরো সহজে বহনযোগ্য।

৫। **বিভাজ্যতা (Divisibility)ঃ** যে জিনিস টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইবে, তাহাকে যেন ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা চলে,—অর্থাৎ বিভক্ত করার ফলে ইহাদের মূল্যের যেন কোন হানি না হয়। সোনা বা রূপাকে ইচ্ছামত যত খুসী ভাগ করা চলে; তাহাতে উহাদের মূল্যের কোন হানি হয় না। কাজেই উহাদের সাহায্যে ছোটবড় সব রকমের কেনাবেচাই চলে। কিন্তু একটি হীরাকে কয়েক টুক্‌রায় ভাগ করা চলে না। এইরূপ করিতে হইলে হয় ইহা একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং একেবারে অকেজো হইয়া পড়িবে, না হয় ইহার মূল্যের বিশেষ হানি হইবে। সেজন্য হীরা টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার অযোগ্য। কাগজী মুদ্রা অল্প বা বহু যে কোন পরিমাণ টাকাকড়ির জন্য প্রচলন করা যায় বলিয়া ইহাও বিভাজ্য।

৬। **মূল্যবত্তা ও সর্বজনীন গ্রাহ্যতা (Valuability and General Acceptability)ঃ** যে জিনিস টাকাকড়ি হইবে তাহা সকলের গ্রাহ্য হওয়া চাই। সোনা এবং রূপার নিজস্ব মূল্য আছে, কারণ সোনা ও রূপা হিসাবেও লোকের কাছে ইহাদের ব্যবহার-মূল্য আছে। সেজন্যই সোনা ও রূপা সকলের গ্রাহ্য। কাগজী টাকাও সকলেই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে। কিন্তু ইহার নিজস্ব কোন উপযোগিতা বা মূল্য নাই।

৭। **দ্রবণীয়তা ও ঘাতসহনীয়তা (Malleability)ঃ** আমরা ভাল টাকাকড়ির গুণ আলোচনা করিতে গিয়া ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি যে সোনা এবং রূপাই ভাল টাকা হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ভাল টাকা হইতে হইলে সোনা এবং রূপাকে মুদ্রায় অঙ্কিত করা প্রয়োজন। মুদ্রাঙ্কনের জন্য গলান প্রয়োজন। গলানর পর ছাপ দিতে হইবে। সুতরাং দ্রবণীয়তা ও ঘাতসহনীয়তা ভাল টাকার আর দুইটি গুণ। দ্রবণীয়তার জন্যই সোনা ও রূপার টাকাকে গলাইয়া ধাতুতে পরিণত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা যায়। এইজন্যই ইহারা সর্বজনগ্রাহ্য।

ভাল টাকাকড়ির লক্ষণ বা গুণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধাতব মুদ্রা বা সোনারূপার মুদ্রা সকল দিক বিচার করিয়া শ্রেষ্ঠ টাকাকড়ি বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহা আদর্শ টাকাকড়ি নহে। আমরা দেখিয়াছি যে সোনা-

রূপার মুদ্রা ভাল টাকাকড়ি হিসাবে পরিগণিত হওয়ার একটি কারণ হইল ইহার মূল্যবত্তা ও সর্বজনীন গ্রাহ্যতা। এই কারণেই ইহা আদর্শ টাকাকড়ি হইতে পারে নাই। লোকে সোনারূপার মুদ্রা (বিশেষ করিয়া সোনারূপা মূল্যবান বলিয়া) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে লয়। সোনারূপার মুদ্রার ধাতব মূল্য আছে বলিয়া লোকে বিনিময়ে ইহা ব্যবহার না-ও করিতে পারে। কিন্তু টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্য বিনিময়ে মধ্যস্থতা করা। এই দিক দিয়া কাগজী মুদ্রা যে কোন ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

টাকাকড়ির বিভিন্ন রূপ (Different forms of Money) :

প্রথমতঃ, টাকাকড়িকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—(১) খাতাপত্রে, হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি (money of account), এবং (২) বাস্তব টাকাকড়ি (actual money)। ভারতে হিসাবনিকাশের একক হইল টাকা (Rupee)। ইহাই মূল্যের মান। হিসাবের সুবিধার জন্য একটি কাল্পনিক এককে 'টাকা' নাম দিয়া তাহারই বিভিন্ন সংখ্যার সাহায্যে সকল মূল্য প্রকাশ করা হয়। 'এই বইটির দাম ১০৲ টাকা'—এই কথার মানে হইল এই যে বইটির মূল্য একটি টাকার মূল্যের ১০ গুণ। এখানে 'টাকা' আমাদের মনে ধরিয়া লওয়া একটি হিসাবের একক মাত্র। কিন্তু বইটি যখন কিনিয়া ফেলিব, তখনই বাস্তব টাকাকড়ির অর্থাৎ নোট, মুদ্রা প্রভৃতির প্রয়োজন হইবে। বাস্তব টাকাকড়ি বলিতে লেনদেন চুকাইয়া দেওয়ার বাস্তব উপায় অর্থাৎ বিভিন্ন মূল্যের নোট ও মুদ্রা বুঝায়। বাস্তব টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের মাধ্যম। বাস্তব টাকাকড়ি রূপে বা গুণে পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু হিসাবনিকাশে ব্যবহৃত টাকা একই থাকে। আমাদের দেশে টাকায় পূর্বে অনেক পরিমাণে রূপা থাকিত, বর্তমানে টাকা সম্পূর্ণ নিকেলের। কিন্তু হিসাবের একক হিসাবে টাকা একই আছে।

হিসাবনিকাশে ব্যবহৃত টাকাকড়ি ও বাস্তব টাকাকড়ি

বাস্তব টাকাকড়িকে আবার দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) রাষ্ট্রীয় টাকাকড়ি বা কারেন্সি (State Money or Currency) এবং (২) ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট টাকাকড়ি (Bank Money)। কারেন্সি বলিতে প্রচলিত মুদ্রা ও নোট বুঝায়। মুদ্রা আবার দুই রকমের, প্রামাণিক বা আদর্শ মুদ্রা (Standard

রাষ্ট্রীয় টাকাকড়ি বা কারেন্সি এবং ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট টাকাকড়ি

Money) এবং প্রতীক বা নিদর্শন মুদ্রা (Token Money)। কারেন্সির এক অংশকে সরকার অসীম বিহিত মুদ্রা (Unlimited Legal Tender) বলিয়া ঘোষণা করে। কারেন্সির বাকী অংশ হইল সসীম বিহিত মুদ্রা (Limited Legal Tender)। ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বলিতে ব্যাঙ্ক নোট ও চেক বুঝায়। ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বিহিত অর্থ নয়।

প্রতীক বা নিদর্শন মুদ্রা বিহিত মুদ্রা

বিহিত মুদ্রা (Legal Tender) :

লোকে আইনের অনুশাসনে প্রচলিত টাকাকড়ি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে ইহাকে বিহিত মুদ্রা (Legal Tender) বলা হয়। লেনদেন মিটানোর জন্য ইহা আইনতঃ ব্যবহৃত হইতে পারে। যে টাকাকড়ি যত খুসী পরিমাণে জিনিসের দাম বা ঋণ শোধ করার জন্য আইনতঃ দেওয়া যাইতে পারে তাহাকে অসীম বিহিত মুদ্রা (Unlimited Legal Tender) বলা হয়। এক টাকার নোট, রূপার টাকা, রূপার আধুলি প্রভৃতি হইল অসীম বিহিত মুদ্রার উদাহরণ। কোটির অধিক প্রাপ্য টাকাও যদি শুধু এক টাকার নোট, রূপার টাকা ও রূপার আধুলি দিয়া শোধ করা হয় তাহা হইলেও গ্রহীতার আইনতঃ আপত্তি করার কোন অধিকার থাকিবে না। যে সব মুদ্রা আইনতঃ শুধু নিদিষ্ট পরিমাণেই গ্রাহ্য তাহাদিগকে সসীম বিহিত মুদ্রা (Limited Legal Tender) বলা হয়। ভারতে সিকি, দু'আনি এবং আনি আইনতঃ কেবল মোট এক টাকা পর্যন্ত গ্রাহ্য। একজন লোকের দেনা শোধ করিতে গিয়া যদি চারিটির বেশী সিকি দেওয়া হয় তাহা হইলে সে আইনতঃ তাহা গ্রহণ না-ও করিতে পারে। ইংলণ্ডে ৪০টির বেশী শিলিং দিলে লোকে আইনতঃ গ্রহণ না-ও করিতে পারে। শিলিং হইল সে দেশে সসীম বিহিত মুদ্রা।

সসীম ও অসীম বিহিত মুদ্রা

মুদ্রা (Coins) :

প্রথমে সোনা ও রূপা 'বুলিয়ন' বা পিণ্ড বা তালের আকারেই টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইত। জিনিসের দাম হিসাবে সোনা-রূপার তাল বা বাট হস্তান্তরিত হইত এবং প্রতিবারেই ইহার ওজন ও বিশুদ্ধতা যাচাই করিয়া লওয়া হইত। লেনদেন চুকাইয়া দেওয়ার এই পদ্ধতি অসুবিধাজনক হওয়ায় প্রত্যেক দেশেই মুদ্রাঙ্কন (Coinage) প্রচলিত হইল।

মুদ্রাঙ্কনের সুবিধা

মুদ্রাঙ্কনের ফলে টাকাকড়ির সমজাতীয়তা সম্ভব হইয়াছে এবং টাকাকড়ি সহজে চেনাও সম্ভব হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কনের অধিকার সরকারের একচেটিয়া। নানা মূল্যের মুদ্রা অঙ্কিত করা হয়। প্রত্যেক মুদ্রাতেই নির্দিষ্ট ওজনের ধাতু এবং বিশিষ্ট একটি ছাঁচ থাকে। সরকার কখনো কখনো মুদ্রাঙ্কন হইতে মুনাফা করে। মুদ্রায় অঙ্কিত মূল্য এবং মুদ্রায় নিহিত ধাতুর মূল্যের মধ্যে যতটা বেশী পার্থক্য হইবে, মুনাফাও হইবে তত বেশী। যখন অঙ্কিত মূল্য এবং অন্তর্নিহিত ধাতু-মূল্যের পার্থক্য মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ের সমান হয়, তখন ইহাকে ব্রাসেজ্ (Brassage) বলা হয়। আর এই পার্থক্য যখন মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ের চেয়ে বেশী হয় তখন ইহাকে সিনিওরেজ্ (Seigniorage) বলা হয়। 'সিনিওরেজ্'-এর দ্বারাই মুদ্রাঙ্কনের নীট মুনাফা পরিমাপ করা যায়। 'সিনিওরেজ্' কথার অর্থ অবশ্য মুদ্রানির্মাণের বানি।

ব্রাসেজ্ ও সিনিওরেজ্

অবাধ মুদ্রাঙ্কন কাহাকে বলে? (What is Free Coinage ?)

লোকে যদি ইচ্ছামত টাঁকশালে সোনা বা রূপা লইয়া গিয়া সমান মূল্যের মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থাকে অবাধ মুদ্রাঙ্কন বলা হয়। এই ব্যবস্থায়, যে পরিমাণ সোনা লইয়া যাওয়া হইবে ঠিক সেই পরিমাণ সোনাই মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অবাধ মুদ্রাঙ্কন ব্যবস্থা চালু থাকিলে মুদ্রা তৈয়ারীর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে না এবং মুদ্রার উপরে অঙ্কিত মূল্য অন্তর্নিহিত ধাতু-মূল্যের ঠিক সমান হয়। মুদ্রায় অঙ্কিত মূল্য যদি অন্তর্নিহিত ধাতু-মূল্যের চেয়ে বেশী হইত তাহা হইলে অবাধ মুদ্রাঙ্কনের সুযোগ লইয়া সকলেই টাঁকশালে সোনা লইয়া গিয়া বেশী মূল্যের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া লইত; আর যদি অন্তর্নিহিত ধাতুমূল্য অঙ্কিত মূল্যের চেয়ে বেশী হইত তাহা হইলে মুদ্রা গলাইয়া লাভ করার হিড়িক পড়িয়া যাইত।

রূপার বেলায়ও অবাধ মুদ্রাঙ্কন সম্ভব। রূপার অবাধ মুদ্রাঙ্কন চালু থাকিলেও রৌপ্যমুদ্রার উপর অঙ্কিত মূল্য উহার অন্তর্নিহিত ধাতু-মূল্যের সমান হইতেই হইবে।

যখন কেবলমাত্র সোনার বেলায়ই অবাধ মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত থাকে, তখন দেশের কারেন্সি ব্যবস্থাকে একধাতু স্বর্ণমান (Monometallic Gold Standard) বলা হয়।

স্বর্ণমান ও রৌপ্যমান

যখন কেবলমাত্র রূপার বেলায়ই অবাধ মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত থাকে, তখন দেশের কারেন্সি ব্যবস্থাকে একধাতু রৌপ্যমান (Monometallic Silver Standard) বলা হয়।

দ্বিধাতুমান

আর যখন সোনা ও রূপা উভয় ধাতুরই মুদ্রাঙ্কন অবাধে হয় তখন দেশের কারেন্সি ব্যবস্থাকে দ্বিধাতুমান (Bimetallism) বলা হয়।

প্রামাণিক মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা (Standard Money and Token Money) :

সিকি, দু'আনি, আনি, শিলিং প্রভৃতির মত সসীম বিহিত মুদ্রা সাধারণতঃ দস্তা, নিকেল প্রভৃতি মিশ্র ধাতু দ্বারা তৈয়ারী হয়। এই সকল মুদ্রার উপর উচ্চহারে সিনিওরেজ্ ধার্য করা হয় বলিয়া সরকার ইহাদের মুদ্রাঙ্কন হইতে প্রভূত মুনাফা লাভ করে। যে সকল মুদ্রার উপর সিনিওরেজের পরিমাণ খুব বেশী এবং যাহারা সসীম বিহিত মুদ্রা তাহাদের প্রতীক বা নিদর্শনমুদ্রা (Token Money) বলা হয়। প্রতীক মুদ্রার সম্পূর্ণ বিপরীত এমন মুদ্রা থাকিতে পারে যাহাদের উপর ব্রাসেজ্ থাকিলেও সিনিওরেজ থাকে না। ফলে, ব্রাসেজ্ বাদ দিলে, এই সকল মুদ্রার উপরে অঙ্কিত মূল্য ইহাদের অন্তর্নিহিত ধাতুমূল্যের সমান হয়। যদি কোন দেশের প্রধান মুদ্রা হিসাবে এই ধরণের মুদ্রা প্রচলিত থাকে তবে তাহাকে প্রামাণিক বা আদর্শ মুদ্রা (Standard Money) বলা হয়। পূর্বে এই ধরণের প্রামাণিক মুদ্রা অনেক দেশেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের প্রধান মুদ্রা টাকা (Rupee) প্রতীক মুদ্রা মাত্র।

কাগজী কারেন্সি মুদ্রা-ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ (Forms of Paper Currency) :

কাগজী কারেন্সি বলিতে নোট বুঝায়। সরকার কিংবা সরকার নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইসব নোট ছাপাইয়া বাহির করে। আমাদের দেশে আগে ভারত সরকার নোট ছাপাইয়া বাহির করিত, কিন্তু আজকাল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতেই নোট বাহির করার ভার অর্পিত আছে। কাগজী কারেন্সি তিন রকমের : (১) প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকাকড়ি (Representative Paper Money); (২) পরিবর্তনীয় কাগজী টাকাকড়ি (Convertible Paper Money); এবং

তিন প্রকারের কাগজী কারেন্সি

(৩) অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকাকড়ি (Inconvertible Paper Money)। সাধারণতঃ, যখন কাগজী কারেন্সি বাহির করা হয় তখন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ইহার পশ্চাতে কিছু পরিমাণ সোনা বা রূপা জমা (Reserve) রাখা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকাকড়ির ক্ষেত্রে মোট যত কারেন্সি বাহির করা হয় তাহার দরুণ শতকরা ১০০ ভাগ ধাতুই জমা রাখা হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রচলিত স্বর্ণ-দাবীপত্র (Gold Certificate) এইরূপ প্রতিনিধিত্ব-মূলক কাগজী মুদ্রা ছিল।

দাবী করা মাত্র যে সব নোটের বদলে সোনা বা রূপা দেওয়ার বিধি আছে, সেই সব নোট লইয়াই পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা গঠিত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেহ দাবী করা মাত্র রূপান্তরযোগ্য নোটের বদলে সম মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা, সোনার তাল বা রৌপ্যমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত থাকে। এই উদ্দেশ্যে অবশ্য ১০০%এর চেয়েও অনেক কম পরিমাণ ধাতু 'জমা' হিসাবে রাখিলেই চলে। ভারতে কাগজের নোট রূপা বা নিকেলের টাকায় পরিবর্তনযোগ্য। অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকাকড়ি বলিতে সেই সব নোট বুঝায়, যাহার বদলে সম মূল্যের সোনা বা রূপা দেওয়ার কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না। বিলাতের পাউণ্ড নোট এইরূপ কাগজী মুদ্রা।

কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Paper Currency) :

১। **সুবিধা :** উৎকৃষ্ট টাকাকড়ির প্রায় সব গুণই কাগজী কারেন্সির মধ্যে আছে। ইহা অতি সহজে বহন করিয়া লওয়া যায়। নোটের আকারে লক্ষ টাকা পকেটে ফেলিয়া স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করা সম্ভব। নোট চিনিয়া লওয়াও সহজ। বেশী, কম—নানারকম মূল্যের নোটই ছাপানো চলে। নোটের সাহায্যে লেনদেন চুকাইয়া দেওয়াও সুবিধাজনক। লোকে প্রত্যেকটি ধাতব মুদ্রা গোণা ও পরীক্ষা করার অসুবিধা হইতে বাঁচে।

কাগজী মুদ্রার গুণ : উৎকৃষ্ট টাকাকড়ির প্রায় সকল গুণই ইহার আছে

ব্যয়সংক্ষেপের দৃষ্টিকোণ হইতেও কাগজী কারেন্সি ধাতুমুদ্রার চেয়ে বেশী বাঞ্ছনীয়। কাগজী টাকাকড়ি ছাপানোর খরচ অতি নগণ্য। সুতরাং কাগজী কারেন্সির প্রচলনের ফলে সোনা বা রূপা কেনার বিরাট ব্যয় বাঁচিয়া যায়। ধাতব মুদ্রা ব্যবহারের ফলে ক্ষয়জনিত যে জাতীয় ক্ষতি হয় তাহাও হয় না। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা

ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হয়

প্রচলিত থাকিলে হস্তান্তরের ফলে ঘষাঘষিতে অনেক ক্ষয় হয়। ইহা জাতীয় ক্ষতি।

কাগজী কারেন্সির প্রচলনের ফলে টাকাকড়ির যোগানের পরিবর্তনশীলতা অনেক বাড়িয়াছে। টাকাকড়ির চাহিদা বাড়িলেই ইহার যোগান সহজেই বাড়ানো যায়। কিন্তু দেশের কারেন্সি বলিতে যদি শুধু ধাতু-মুদ্রাই প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে ইহার যোগান খনিজ সোনা ও রূপার যোগানের উপর নির্ভরশীল হইবে। কিন্তু সোনা ও রূপার যোগান সীমাবদ্ধ। কাজেই খনি হইতে সোনার উৎপাদন যথেষ্ট না হইলে, কারেন্সির চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও, স্বর্ণমুদ্রার যোগান বাড়ানো সম্ভব হইবে না। কিন্তু কাগজী টাকাকড়ির যোগান চাহিদা মাফিক যত খুসী বাড়ানো চলে। নোটের সহিত ধাতুর 'রিজার্ভ' রাখা হইলেও, এই 'রিজার্ভে'র পরিমাণ ১০০%এর চেয়ে কম লাগে। কাজেই ধাতুমুদ্রার চেয়ে কাগজী মুদ্রায় যোগান অনেক বেশী পরিবর্তনশীল। কাগজী কারেন্সি প্রচলিত থাকিলে দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা অতিপরিবর্তনশীল হয়।

ইহা দেশের মুদ্রাব্যবস্থাকে অতিপরিবর্তনশীল করে

২। **অসুবিধাঃ** কাগজী কারেন্সির কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গলদ আছে। সরকার যুদ্ধ বা বিপ্লবের সময়ে অত্যধিক পরিমাণে কাগজী কারেন্সি ছাপাইতে প্রলুব্ধ হয়। দিস্তা দিস্তা কাগজের নোট ছাপাইয়া সরকারী ব্যয় মিটানোর ব্যবস্থা খুবই সোজা বলিয়া মনে হয়। ফলে নোটের অত্যধিক প্রচলনের দরুণ মুদ্রাস্ফীতি (inflation) দেখা দেয় এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। কাগজী কারেন্সি পরিমাণে অতিরিক্ত হইয়া পড়িলে সরকার আর লোকের দাবী মত নোটকে সোনা বা রূপায় রূপান্তরিত করিতে পারে না। পরিবর্তনীয় নোটের পশ্চাতে যে ধাতু জমা থাকে তাহা নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়; ফলে, নোট অপরিবর্তনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতে হয়। নোটের রূপান্তরের দায়িত্ব না থাকার অর্থই অবাধে কাগজী কারেন্সির পরিমাণ বাড়াইয়া যাওয়ার পথে সকল অসুবিধা দূর করা। কাজেই মুদ্রাস্ফীতি চরমে পৌছায়। নোটের মূল্য ভয়ানক ভাবে পড়িয়া যায়।

অতিপরিবর্তনশীলতাই এই প্রকার মুদ্রাব্যবস্থার বিশেষ ত্রুটি

শান্তির সময়ে যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি অবাধে নোট বাহির করিতে থাকে, তাহা হইলেও মুদ্রাস্ফীতি ও দাম বৃদ্ধি দেখা দিবে। কাগজী কারেন্সির ইহাই প্রধান অসুবিধা।

ইহাতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে

আরও একটি অসুবিধা এই যে, কাগজী কারেন্সি কেবলমাত্র দেশেই চলে; বিদেশীদের কাছে ইহা গ্রাহ্য নয়। কিন্তু সোনা লইতে বিদেশীরা আপত্তি করে না। সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যে কাগজী কারেন্সি অচল; এই দিক দিয়া কাগজী কারেন্সি ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

বৈদেশিক বাণিজ্যে কাগজী কারেন্সি অচল

কাগজের নোট আগুনে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া কিংবা ব্যবহারের ফলে ছিঁড়িয়া গিয়া নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।

গ্রেশামের নিয়ম বা বিধি (Gresham's Law):

"নিকৃষ্ট টাকাকড়ি উৎকৃষ্ট টাকাকড়িকে দূরে সরাইয়া দেয়" ("Bad money drives out good money")—ইহাই গ্রেশামের নিয়ম নামে খ্যাত। রাণী এলিজাবেথের আমলে স্যর্ টমাস গ্রেশাম নামে একজন ব্যবসায়ী ব্রিটিশ সরকারের এজেণ্ট ছিলেন। তিনিই লণ্ডন রয়েল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রেশামের নিয়মের প্রকৃত আবিষ্কারক অবশ্য তিনি নহেন। তাঁহার বহু পূর্ব হইতেই এই নিয়ম জানা ছিল।

নিকৃষ্ট টাকাকড়ি কাহাকে বলে

এখন দেখিতে হইবে নিকৃষ্ট টাকাকড়ি কাহাকে বলে। নিকৃষ্ট টাকাকড়ি দুই রকমের:

প্রথমতঃ, আইনানুসারে কোন মুদ্রায় যে পরিমাণ ধাতু-মূল্য থাকা উচিত তাহার চেয়ে কম থাকিলে ঐ মুদ্রা নিকৃষ্ট পর্যায়ে পড়ে। টাঁকশাল হইতে সদ্য সদ্য বাহির হওয়া মুদ্রায় আইন নির্ধারিত পরিমাণে সোনা ও রূপা থাকে। কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এই মুদ্রা অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও জীর্ণ হইয়া পড়ে, কারণ ইহার ওজন ঘর্ষণের দরুণ কিছুটা কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, আগেকার দিনের মুদ্রায় কিনারে ভালোভাবে খাঁজ-কাটা থাকিত না এবং আকারেরও সুনির্দিষ্ট গড়ন থাকিত না। ফলে, অসৎ লোকেরা ঘষিয়া ধাতু বাহির করিয়া লইয়া কিংবা অতি সূক্ষ্মভাবে টুক্‌রা কাটিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিত। এই অসদুপায় অবলম্বনের দরুণ মুদ্রার ওজন হাল্কা হইয়া পড়িত। ব্যবহারের ফলে জীর্ণ মুদ্রা এবং ঘষিয়া-লওয়া মুদ্রা—দুই-ই নিকৃষ্ট টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিধাতুমানের (bimetallism) আওতায় যখন কোন সোনার বা রূপার মুদ্রার বিহিত বা আইননির্দিষ্ট বিনিময়-মূল্য উহার অন্তর্নিহিত

ধাতুর বাজার-মূল্যের চেয়ে বেশী হইয়া পড়ে, তখন ঐ মুদ্রা নিকৃষ্ট টাকাকড়ি রূপে গণ্য হয়। দ্বিধাতুমান প্রচলিত থাকিলে দুইরকমের আদর্শ বা প্রামাণিক মুদ্রার প্রচলন থাকে,—সোনার এবং রূপার। সরকার সোনা ও রূপার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার বাঁধিয়া দেয়। ধরা যাউক, সরকারী হার অনুসারে এক আউন্স সোনা ১৬ আউন্স রূপাবিশিষ্ট মুদ্রার সঙ্গে বিনিময়যোগ্য। তাহা হইলে সোনা ও রূপার সরকারী বিনিময়-হার হইল ১ : ১৬। এখন যদি সোনা ও রূপার মধ্যে বাজার-চল্‌তি বিনিময়-হার হঠাৎ ১ : ১৭ হয়, তাহা হইলে সরকারী কারেন্সির অন্তর্গত রূপার মুদ্রা সোনার তুলনায় অধিক মূল্যের হইয়া দাঁড়াইবে। এক্ষেত্রে রূপার মুদ্রা হইবে নিকৃষ্ট টাকাকড়ি আর সোনার মুদ্রা হইবে উৎকৃষ্ট টাকাকড়ি। আর যদি বাজার-চল্‌তি বিনিময় হার ১ : ১৫ হইত তাহা হইলে রূপার মুদ্রার তুলনায় সোনার মুদ্রাই অধিক মূল্যের হইত। সে ক্ষেত্রে সোনার মুদ্রা হইত নিকৃষ্ট টাকাকড়ি, আর রূপার মুদ্রা হইত উৎকৃষ্ট টাকাকড়ি।

দ্বিধাতুমানের আওতায় নিকৃষ্ট টাকাকড়ি কাহাকে বলে

চল্‌তি অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট টাকাকড়ি কিভাবে অন্তর্হিত হয়?

১। **জমানো** (**Hoarding**)ঃ লোকে স্বভাবতঃই সদ্য বাহির হওয়া পূরা ওজনের মুদ্রা জমাইয়া রাখে এবং পুরাতন, জীর্ণ ও ঘষা মুদ্রা চালায়।

২। **গলানো** (**Melting**)ঃ কারেন্সির নিয়ম অনুযায়ী, মুদ্রার যে মূল্য তাহার চেয়ে অন্তর্নিহিত ধাতু-মূল্য একটু বেশী হইলেই লোকে গলাইয়া বিক্রয় করে। গত যুদ্ধের সময়ে ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডোয়ার্ড প্রভৃতি অঙ্কিত টাকা ও তামার পয়সা এই কারণেই বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া দ্বিধাতুমানের আওতায় সময় বুঝিয়া উৎকৃষ্ট মুদ্রা গলানো রীতিমত লাভজনক ব্যাপার। ধরা যাউক, সোনা ও রূপার সরকারী বিনিময় হার ১ : ১৬ এবং বাজার-চল্‌তি হার ১ : ১৭। এক্ষেত্রে, সোনার মুদ্রা উন মূল্যের এবং রূপার মুদ্রা অধিক মূল্যের হইয়া পড়িল। সোনার মুদ্রা হইল উৎকৃষ্ট এবং রূপার মুদ্রা নিকৃষ্ট টাকাকড়ি। এক আউন্স ওজনের একটি স্বর্ণমুদ্রা গলাইয়া বিক্রয় করিলে বাজারে যে কোন লোক ১৭ আউন্স রূপা পাইবে; ইহার ভিতর ১৬ আউন্স রূপা টাঁকশালে লইয়া গেলেই সে বিনিময়ে ১ আউন্সের একটি স্বর্ণ-মুদ্রা পাইবে। তাহা হইলে তাহার নীট মুনাফা দাঁড়াইবে ১ আউন্স রূপা।

দ্বিধাতুমানের আওতায় ভাল মুদ্রা কি করিয়া অন্তর্হিত হয়

ঐ এক আউন্সের স্বর্ণমুদ্রাটি গলাইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া সে পুনরায় ১৭ আউন্স রূপা পাইবে। এইরূপ অনবরত গলাইতে থাকার ফলে বাজার হইতে সমস্ত সোনার মুদ্রা অন্তর্হিত হইবে। ঠিক এই ভাবে সোনার মুদ্রা অধিক মূল্যের হইয়া পড়িলেও ইহা নিকৃষ্ট টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য হইবে এবং সমস্ত রূপার মুদ্রা বাজার হইতে অন্তর্হিত হইবে।

৩। **বিদেশী রপ্তানী (Export to foreign countries) ঃ** এক দেশের মুদ্রা আর এক দেশের বিহিত মুদ্রা (legal tender) নয়। কাজেই বিদেশীরা মুদ্রাকে মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ না করিয়া, নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে। ইহার ফলে, দেশের নিকৃষ্ট মুদ্রা দেশের মধ্যে চলিত থাকে আর উৎকৃষ্ট মুদ্রা (অর্থাৎ যাহাদের ধাতুমূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক) ধাতুর পিণ্ড বা 'বুলিয়ন' হিসাবে বিদেশে চলিয়া যায়। বিশেষ করিয়া দ্বিধাতুমান প্রচলিত থাকিলেই এইরূপ হয়—কারণ এক দেশে যে ধাতু সরকারী ব্যবস্থায় উন মূল্যের, অন্য দেশে সে ধাতুর মূল্য স্বভাবতঃই বেশী।

গ্রেশামের নিয়ম বা বিধির সীমাবদ্ধতা (Limitations on Gresham's Law) ঃ

নিম্নলিখিত অবস্থার মধ্যে গ্রেশামের নিয়ম কার্যকর হয় না :—(১) লোকে যদি নিকৃষ্ট টাকাকড়ি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ইহা আর হাতে হাতে ঘুরিতে থাকিবে না ; ফলে উৎকৃষ্ট টাকাকড়ি বিতাড়িত হইবে না। (২) নিকৃষ্ট টাকাকড়ি এবং উৎকৃষ্ট টাকাকড়ি, উভয়ের মিলিত পরিমাণ যদি টাকাকড়ির মোট চাহিদার চেয়ে কম হয়, তাহা হইলেও নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট—উভয় টাকাকড়িই পাশাপাশি চালু থাকিবে।

পূর্বে যখন অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তখন প্রামাণিক মুদ্রা বাজারে চালু থাকিত বলিয়া সরকারকে অনেক সময় গ্রেশামের বিধির কার্যকারিতার ফলে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। সরকার যখনই নূতন মুদ্রা বাজারে চালু করিত বা দ্বিধাতুমানের আওতায় যখনই কোন ধাতুর বিহিত মূল্যে ও বাজার মূল্যে পার্থক্য দেখা দিত তখনই উৎকৃষ্ট টাকাকড়ি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বাজার হইতে অন্তর্হিত হইত। বর্তমানে অবশ্য প্রামাণিক টাকাকড়ি বাজারে চালু না থাকায় এই বিধির প্রভাব একমাত্র প্রতীক মুদ্রার বেলায়ই দেখা যায়। ফলে ইহার গুরুত্বও কমিয়া গিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the functions of money. How is production facilitated by the use of money ? (C. U., 1928, 1935, 1938, 1941).

[**উত্তরের কাঠামো** ঃ টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানতঃ সংখ্যায় চারিটি। ইহা বিনিময়ের মাধ্যম। টাকাকড়িব মাধ্যমে জিনিসে জিনিসে পরোক্ষ বিনিময় হয়। টাকাকড়ির 'এককে'র অঙ্কেই সকল জিনিসের মূল্য মাপা হয় ও প্রকাশিত করা হয়। কাজেই, টাকাকড়ির 'একক' মূল্যের মান অর্থাৎ হিসাবনিকাশের 'একক'ও বটে। টাকাকড়ি মূল্যের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। লোকে যে টাকাকড়ি রোজগার করে তাহার একটি অংশ ভবিষ্যতের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সঞ্চিত রাখে। উপরন্তু, টাকাকড়ি স্থগিত লেনদেনের মান হিসাবে নির্দেশিত হইয়া থাকে। সকল রকমের দেনাপাওনা মিটানোর ব্যাপারেও টাকাকড়ি ব্যবহৃত হয়।

টাকাকড়ির প্রচলন বাজারকে সম্প্রসারিত করিয়া এবং শ্রমবিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিয়া উৎপাদনের সহায়তা করে। টাকাকড়ি না থাকিলে, অধুনা প্রচলিত বৃহদায়তনে উৎপাদন এবং ইহার আনুষঙ্গিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ কখনই সম্ভবপর হইত না। উপরন্তু, টাকাকড়ি আছে বলিয়া নিয়োগ ব্যাপারে ব্যবসায়ী বা সংগঠককে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ইহাতেও উৎপাদন-ব্যবস্থার সুপরিচালনা সম্ভবপর হয়।]

2. Distinguish between standard money and token money. Illustrate your answer with examples. (C. U., 1928, 1937). [১২৯ পৃষ্ঠা দেখ]

3. Describe the merits and demerits of paper money. (C. U., 1936, 1943, 1947). [১৩০-১৩২ পৃষ্ঠা দেখ]

4. State and explain Gresham's Law. "Bad money drives out good money". Explain. (C. U., 1939, 1943, 1947, 1950) [১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ]

ষোড়শ অধ্যায়

মুদ্রা (বা টাকাকড়ি) ও দাম

মুদ্রা বা টাকাকড়ির মূল্য (Value of Money) ঃ

টাকাকড়ির মূল্য বলিতে টাকাকড়ির এক 'এককে'র সাহায্যে সাধারণভাবে কতখানি জিনিস পাওয়া যায় তাহাই বুঝায়। ভারতবর্ষে টাকাকড়ির 'একক' হইল 'টাকা'। কাজেই ভারতবর্ষে টাকাকড়ির মূল্য হইল এক টাকার ক্রয়শক্তি। অর্থাৎ টাকাকড়ির মূল্য বলিতে চাউল, গম, লবণ, কেরোসিন, লোহা,

তুলা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এক টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণে পাওয়া যায় তাহাই বুঝায়। এই সব জিনিসের দাম বাড়িয়া গেলে টাকার মূল্য কমিয়া যায়, কারণ এক টাকার বদলে সব জিনিসই কম করিয়া পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় হইতে ভারতবর্ষে টাকার ক্রয়শক্তি বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, সব জিনিসের দাম কমিয়া গেলে টাকার মূল্য আবার স্বভাবতঃই বাড়িয়া যাইবে। টাকাকড়ির মূল্য মূল্য-স্তরের (Price level) সূচক। মূল্য-স্তর বলিতে সাধারণ দাম বুঝায়। জিনিসের দাম সাধারণ ভাবে বাড়িয়া গেলে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া যাইবে; আর জিনিসের দাম সাধারণ ভাবে কমিয়া গেলে, টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া যাইবে। টাকাকড়ির মূল্য সাধারণ মূল্য-স্তরের ঠিক বিপরীত।

টাকাকড়ির মূল্য এক 'একক' বা টাকার ক্রয়শক্তি

টাকাকড়ির মূল্য সাধারণ মূল্য-স্তরের ঠিক বিপরীত

সূচক সংখ্যা (Index Number):

টাকাকড়ির মূল্য কতটা বৃদ্ধি বা হ্রাস হইল তাহা আমরা কিভাবে ঠিক করিতে পারি? বিভিন্ন সময়ে গড়পড়তা দামের মধ্যে তুলনা করিয়া তাহা আমরা বুঝিতে পারি। জিনিসের গড়পড়তা দামকে মূল্য-স্তর (Price level) এবং মূল্য-স্তরের শ্রেণীকে সূচক সংখ্যা (Index Number) বলা হয়। সূচক সংখ্যা তাহা হইলে হইল কয়েকটি মূল্য-স্তর যাহাদিগকে গড়পড়তা দামের পরিবর্তন নির্দেশ করিবার জন্য বিশেষভাবে সাজান হইয়াছে। যদি মূল্য-স্তরের বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়াছে, কারণ একই পরিমাণ টাকা দিয়া কম পরিমাণ জিনিস পাওয়া যাইবে। অপরদিকে যদি মূল্য-স্তর পড়িয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়াছে।

সূচক সংখ্যার সাহায্যে আমরা টাকাকড়ির মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করিতে পারি

সূচক সংখ্যা কাহাকে বলে

একটি সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করিবার সময় কোন বিশেষ বৎসরকে ভিত্তি হিসাবে (Base period) ধরা হয়। এই বৎসরে লোকে সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য কেনে তাহাদের দামের একটি গড় নির্ণয় করা হয়। আবার পরবর্তী কোন বৎসরে ঐ জিনিসগুলির দামের গড় নির্ণয় করা হয়। যে বৎসরকে ভিত্তি

সূচক সংখ্যা কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়

হিসাবে লওয়া হইয়াছে সেই বৎসরের গড় দামের তুলনায় পরবর্তী ঐ বৎসরের গড় দাম যদি বেশী হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, টাকাকড়ির মূল্য কমিয়াছে। আবার পরবর্তী ঐ বৎসরের গড় দাম যদি কম হয়, তবে টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়াছে বলিতে হইবে। এইভাবে সূচক সংখ্যার সাহায্যে টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন নির্ধারণ করা যায়।

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব: সাধারণ দাম কেন উঠা-নামা করে? (Quantity Theory of Money: Why general prices rise and fall?)

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব সাধারণ দামের হ্রাসবৃদ্ধি বা সাধারণ দামের বিপরীত দিক টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে। বিভিন্ন সময়ে টাকাকড়ির মূল্য কেন পরিবর্তিত হয়? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল যে, যে সকল কার্যকারকের উপর টাকাকড়ির মূল্য নির্ভর করে তাহারা পরিবর্তিত হয় বলিয়া টাকাকড়ির মূল্যও পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ মনে করিতেন যে একটি মাত্র কার্যকারক টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন সাধন করে। ইহা হইল 'অর্থের পরিমাণ'। এইরূপ ধারণার ফলে যে তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে অর্থের পরিমাণতত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে টাকাকড়ির পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ানো হইবে, মূল্যস্তরও ঠিক সেই অনুপাতে বাড়িবে। ইহার কারণ হইল যে আমরা টাকাকড়িকে টাকাকড়ি হিসাবে চাই না, জিনিসপত্র কিনিবার জন্যই চাই। যদি টাকাকড়ির পরিমাণ হঠাৎ কিছুটা বাড়িয়া যায় তবে জিনিসপত্র কিনিবার জন্য টাকাকড়ির যোগানও ঠিক সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। টাকাকড়ির যোগান হঠাৎ বাড়িলেও জিনিসপত্রের যোগান হঠাৎ বাড়ে না; কোন এক বিশেষ সময়ে ইহা অপরিবর্তিতই থাকে। বিক্রয়ের জন্য বাজারে যে জিনিসপত্রের যোগান দেওয়া হয় তাহা হইতেই টাকাকড়ির চাহিদা সৃষ্ট হয়। এই জিনিসের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া টাকাকড়ির চাহিদাও অপরিবর্তিত থাকে। ফলে টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণ হঠাৎ বাড়িলে টাকাকড়ির মূল্যের বিপরীত দিকে পরিবর্তন দেখা যায়—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্যের হ্রাস হয়। টাকাকড়ির মূল্যহ্রাসের অর্থ

অর্থের পরিমাণতত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা

তত্ত্বটি এই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে টাকাকড়ির চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে

মূল্যান্তর বা সাধারণ দামের বৃদ্ধি। সুতরাং টাকাকড়ির পরিমাণের হঠাৎ বৃদ্ধি সমানুপাতিকভাবে সাধারণ দামকে বাড়াইয়া দেয়, কারণ বর্ধিত টাকাকড়ির পরিমাণ সেই পূর্বের মত একই পরিমাণ জিনিসপত্র কেনায় ব্যবহৃত হয়।

অর্থের পরিমাণতত্ত্বের উপরোক্ত সহজ ব্যাখ্যার বর্তমানে পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে, কারণ 'টাকাকড়ির যোগান' আর 'টাকাকড়ির পরিমাণ' এক জিনিস নহে।

টাকাকড়ির যোগান

টাকাকড়ির পরিমাণের কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকেও ইহার যোগান পরিবর্তিত হইয়া ইহার মূল্যকে পরিবর্তিত করিতে পারে। টাকাকড়ির যোগান বলিতে মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তি (total available purchasing power) বুঝায়।

বর্তমান কালে মানুষ চেক্ ইত্যাদি ঋণপত্র দিয়াও জিনিসপত্র কেনে। সুতরাং টাকাকড়ির যোগান বা টাকাকড়ির মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তি শুধু ধাতব ও কাগজী মুদ্রার উপর নির্ভর করে না। মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তি নির্ধারণে ধাতব ও কাগজী মুদ্রার সহিত যে পরিমাণ ঋণপত্র ব্যবহৃত হয় তাহাও যোগ দিতে হইবে। ইহা ছাড়া শুধু টাকাকড়ির বেলাতেও ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে একটি মুদ্রা বহুবার হস্তান্তরিত হইয়া বহু বেচা-কেনার কার্য সম্পন্ন করিতে পারে। কোন এক বিশেষ সময়ের মধ্যে একটি মুদ্রা যতবার হস্তান্তরিত হয় তাহাকে ইহার প্রচলনগতি বলে। আমরা টাকাকড়ির সকল এককের গড় নির্ধারণ করিয়া মোট টাকাকড়ির প্রচলনগতি বাহির করিতে পারি। মোট টাকাকড়ির পরিমাণকে যদি ইহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করা হয় তাহা হইলে যে অঙ্ক পাওয়া যাইবে তাহা ঐ সময়ে টাকাকড়ির মোট যোগানের এক অংশ। ঋণের মোট পরিমাণকে ঋণের প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে টাকাকড়ির যোগানের অপর অংশ পাওয়া যাইবে। এখন এই দুই অংশ যোগ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যাইবে তাহাই টাকাকড়ির যোগান বা মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তি। অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুসারে—এই যোগানের উপরই টাকাকড়ির মূল্য নির্ভর করে।

টাকাকড়ির প্রচলনগতি

আমেরিকার বিখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক ফিসার অর্থের পরিমাণতত্ত্বের এই পরিবর্তিত ব্যাখ্যাকে একটি সমীকরণের রূপ দিয়াছেন। যদি M বলিতে মোট টাকাকড়ির পরিমাণ, V বলিতে ইহার প্রচলনগতি, M' বলিতে মোট ঋণের পরিমাণ,

ফিসারের সমীকরণ

V′ বলিতে ঋণের প্রচলনগতি, T বলিতে যে জিনিসপত্র বেচাকেনা হয় তাহার পরিমাণ, এবং P বলিতে মূল্যস্তর বুঝায় তবে সমীকরণটি বলে,

$$PT = MV + M'V'.$$

এখানে PT জিনিসপত্র বেচিয়া যে মোট দাম পাওয়া যায় তাহাকে বুঝাইতেছে; MV বলিতে বুঝাইতেছে মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তির সেই পরিমাণ যাহা টাকাকড়ি রূপে আছে, এবং M′V′ বলিতে বুঝাইতেছে মোট ক্রয়শক্তির যোগানের অপর অংশ যাহা ঋণ রূপে আছে। সুতরাং MV+M′V′ হইল মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তির পরিমাণ বা মোট যে দাম দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ। বিক্রেতারা মোট যে দাম পায় তাহা মোট যে দাম দেওয়া হয় তাহার সমান বলিয়া সমীকরণটি শুদ্ধ না হইয়া পারে না। এই সমীকরণ হইতে আমরা নিম্নলিখিত সমীকরণটি বাহির করিতে পারি,

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

T অর্থাৎ মোট বেচাকেনার পরিমাণ যাহা টাকাকড়ির চাহিদার সৃষ্টি করে তাহা অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুসারে অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং MV+M′V′তে, অর্থাৎ টাকাকড়ির যোগানে কোন পরিবর্তন ঠিক সেই অনুপাতেই মূল্যস্তর বা Pতে পরিবর্তন ঘটাইবে।

দামের পরিবর্ত্তনের ফলাফল (Effects of changes in Prices):

সাধারণভাবে দামের বৃদ্ধি ঘটিলে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া যায়; অর্থবিদ্যার ভাষায়, টাকাকড়ির মূল্যের অবনতি বা অবচয় (depreciation) ঘটে। আর যদি দাম ক্রমাগত চড়িতে চড়িতে খুব উঁচু স্তরে গিয়া পৌঁছায়, তাহা হইলে যে অবস্থা সৃষ্ট হয় তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি (inflation) বলে। সাধারণ দাম কমিয়া যাওয়ার অর্থ টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া যাওয়া। অর্থাৎ, অর্থবিদ্যার ভাষায়, টাকাকড়ির মূল্যের উন্নতি বা উপচয় (appreciation) ঘটে। দাম যদি ক্রমাগত কমিতে কমিতে খুব নীচু স্তরে গিয়া পৌঁছায় তাহা হইলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাকে মুদ্রা-সঙ্কোচন (deflation) বলে। টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য ও নিয়োগের প্রসার মুদ্রাস্ফীতির আনুষঙ্গিক। আর টাকাকড়ির পরিমাণ হ্রাস এবং বাণিজ্য ও নিয়োগের যথেষ্ট সংকোচন মুদ্রা সংকোচনের আনুষঙ্গিক। অর্থের পরিমাণ-

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা-সঙ্কোচন

তত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে টাকাকড়ির মূল্য উহার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন-বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে যদি টাকাকড়ির চাহিদা বাড়ে, অথচ প্রয়োজন মত যোগান না বাড়ে, তাহা হইলে টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জিনিসের দাম কমিয়া যাইবে। আবার উৎপাদন ইত্যাদি যদি অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে এবং টাকাকড়ির যোগান কমিয়া যায়, তাহা হইলেও সাধারণ ভাবে দাম কমিয়া যাইবে। অপর দিকে, যদি অর্থের যোগান বাড়ে বা জিনিসপত্রের পরিমাণ কমিয়া যায় তবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। যুদ্ধের সময় সরকার বেশী করিয়া কাগজী মুদ্রা বাজারে চালু করে, কিন্তু নানা কারণে দ্রব্যাদির যোগান হ্রাস পায়। ফলে দাম ভীষণ বাড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতিতে গিয়া দাঁড়ায়। সাধারণ দামের হ্রাসবৃদ্ধি সমাজের উপর সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

উঠ্‌তি দামের ফলাফল ঃ দাম বাড়িলে দেনাদারেরা লাভবান হয় ও পাওনাদারেরা ঠকে। কারণ দেনাদার পূর্বের চুক্তি অনুযায়ীই টাকা দিয়া দেন। শোধ করে, অথচ এই টাকায় পূর্বের চেয়ে বর্তমানে অনেক কম জিনিস পাওয়া যায়। শিল্পপতিরা লাভবান হয়, কারণ মুনাফা বাড়িয়া যায়। শিল্পপতিদের মুনাফা নানা কারণে বাড়ে, যেমন—তাহারা কাঁচা মাল কম দামে কেনে এবং সেই মালে জিনিস তৈয়ারী করিয়া বেশী দামে বেচে ; তৈয়ারী জিনিসের দাম যে হারে বাড়ে, মজুরী ইত্যাদি সে হারে বাড়ে না। আর জিনিসের দাম বেশী হইয়া পড়ায় সাধারণ লোক বা ভোগীরা (consumers) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেতনভোগীরা এবং বাঁধা মজুরীর শ্রমজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ জিনিসের দাম যে হারে বাড়িয়া চলে বেতন ও মজুরী সে হারে বাড়ে না। ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও অধিকতর নিয়োগ সম্ভব হইয়া উঠে বলিয়া শ্রমজীবীরা শ্রেণী হিসাবে লাভবান হয়। যাহারা পেন্সন পায় এবং সরকারী ঋণপত্রের উপর সুদ পায় তাহাদের ক্ষতি হয়, কারণ তাহাদের আয় বাঁধাধরা। পক্ষান্তরে, কৃষকেরা দেনাদার হিসাবে এবং জিনিসের উৎপাদক হিসাবে,—দুই ভাবেই লাভবান হয়। তাহাদের যে খাজনা (rent) ও সুদ (interest) দিতে হয় তাহা একই থাকে, অথচ আয় বাড়িয়া যায়।

উঠ্‌তি দামের অর্থ কিছু লোকের লাভ এবং বাকি সকলের ক্ষতি

পড়ন্ত দামের ফলাফল ঃ দাম কমিলে পাওনাদারদের লাভ হয় ও দেনাদারদের ক্ষতি হয়। পাওনাদার যত টাকা ধার দিয়াছিল তাহাই পায় ;

অথচ পূর্বের চেয়ে বর্তমানে এই টাকার বিনিময়ে অনেক বেশী জিনিস পাওয়া যায়। মুনাফা কমিয়া যাওয়ার দরুণ, এমন কি অদৃশ্য হওয়ার দরুণ, শিল্পপতিরা রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফা নানা কারণে কমে। তাহারা বেশী দরে কাঁচা মাল ইত্যাদি কেনে এবং সেই মাল দিয়া জিনিস তৈয়ারী করিয়া কম দামে বেচিতে বাধ্য হয়। জিনিসপত্রের দাম যে হারে পড়ে, মজুরী ইত্যাদি সে হারে পড়ে না! ইহাও উৎপাদকের মুনাফা কমিয়া যাওয়ার অন্যতম কারণ। জিনিসপত্র সস্তা বলিয়া সাধারণ লোকের লাভ হয়। চাকুরী বজায় রাখিতে পারিলে বেতনভোগীদের এবং বাঁধা মজুরীর শ্রমজীবীদেরও লাভ হয়; কারণ, দাম যে হারে কমিয়া যাইতে থাকে বেতন ও মজুরী তার চেয়ে কম হারে কমে। কিন্তু বেকার সমস্যা (Unemployment) দারুণভাবে দেখা দেয়। ফলে শ্রমজীবীরা শ্রেণী হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেন্সনভোগী, খাজনাভোগী এবং সরকারী বণ্ডের সুদভোগীরা বাঁধাধরা আয়ের মালিক হিসাবে লাভবান হয়। দাম খুব বেশীরকম পড়িয়া গেলে কৃষকদের সর্বনাশ হয়। তাহাদের উপর খাজনা ও সুদের বোঝা আগের মতই থাকে, অথচ আয় ভয়ানক কমিয়া যায়। মুদ্রা সংকোচনের ফলে, শিল্পজাত জিনিসের চেয়ে কৃষিজাত জিনিসের দাম অনেক বেশী পরিমাণে ও অনেক দ্রুত গতিতে কমিয়া যায়।

পড়ন্ত দামের ফল হিসাবেও কিছু লোকের লাভ ও অন্য সকলের ক্ষতি হয়

প্রশ্নোত্তর

1. State and explain the Quantity Theory of Money. (C. U., 1945)

(১৩৭-১৩৯ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Explain why general prices rise and fall within the country. (C. U., 1942) (১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ)

3. What is meant by the value of money? Explain the causes of variations in the value of money in a country. (C. U., 1946)

[**উত্তরের কাঠামো** ঃ টাকাকড়ির মূল্য মূল্য-স্তরের ঠিক বিপরীত। সাধারণ দামের দ্বারা ইহা সূচিত হয়। সাধারণ দাম বাড়িলে, টাকাকড়ির মূল্য কমে। আর সাধারণ দাম কমিলে, টাকাকড়ির মূল্য বাড়ে।

টাকাকড়ির মূল্য* এবং টাকাকড়ির পরিমাণ ঠিক বিপরীত হারে (in inverse ratio) পরিবর্তিত হয়। অর্থের পরিমাণতত্ত্বে এই কথাই বিবৃত হইয়াছে। টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ করা হইলে সাধারণ দাম দ্বিগুণ হইয়া যাইবে এবং টাকাকড়ির মূল্য অর্ধেক হইবে। আর টাকাকড়ির পরিমাণ অর্ধেক করা হইলে সাধারণ মূল্য-স্তর অর্ধেক হইয়া যাইবে এবং টাকাকড়ির মূল্য দ্বিগুণ হইবে।

অধ্যাপক ফিসার অর্থের পরিমাণতত্ত্বকে একটি সমীকরণে রূপ দিয়াছেন।]

(১৩৫-১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ)

4. What is meant by the term 'value of money'? "The value of money is determined by the demand for and supply of money." Explain. (C. U., 1951) (১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ)

5. Examine the causes of rise and fall of general prices. How are businessmen and wage-earners affected by rising and falling prices? (C. U., 1949) (১৩৭-১৪১ পৃষ্ঠা দেখ)

6. What exactly do you mean by inflation of currency? Examine the effects of inflation upon the following classes of people in a country :— businessmen, wage-earners, pensioners and salaried people. (C. U., 1952)

(১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠা দেখ)

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যাঙ্কিং ও ঋণ

ব্যাঙ্কিং-এর উদ্ভব (Origin of Banking) :

পূর্বকালে লোকে চোর-ডাকাতের ভয়ে সঞ্চিত টাকাকড়ি নিজের কাছে রাখিতে ইতস্ততঃ করিত। তাহারা নিরাপত্তার জন্য স্বর্ণকারদের কাছে সঞ্চিত টাকাকড়ি রাখিত। প্রথম প্রথম স্বর্ণকারেরা এই নিরাপত্তার মূল্য হিসাবে সামান্য কিছু লইত। আস্তে আস্তে তাহারা যখন আবিষ্কার করিল যে সারা বৎসরে মোট আমানতের অতি সামান্য অংশই আমানতকারীরা উঠাইয়া লয়, তখন তাহারা গচ্ছিত আমানতের অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের নিকট সুদে ধার দেওয়া সুরু করিল। ফলে আমানতকারীর নিকট হইতে গচ্ছিত টাকার নিরাপত্তার মূল্য বাবদ কিছু আদায় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। বরং স্বর্ণকারদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে তাহারা আমানতকারীদেরই সুদ বাবদ কিছু কিছু করিয়া দিতে বাধ্য হইল। যে স্বর্ণকারের মাথায় সর্বপ্রথম এই বুদ্ধি খেলিয়াছিল তাহাকেই ব্যাঙ্কিং-এর আবিষ্কর্তা বলা চলে।

ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে? (What is a Bank ?)

যে প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের আমানত গচ্ছিত রাখে এবং ঋণগ্রহণেচ্ছু

লোকদের কাছে এই আমানত স্থদে ধার দেয়, তাহাকেই ব্যাঙ্ক বলে। কাজেই, ব্যাঙ্ক মধ্যস্থের কাজ করে। যাহারা সঞ্চয় করিয়াছে এবং যাহারা ব্যবসায়গত বা অন্য কোন প্রয়োজনে এই সঞ্চয় ধার লইতে চায়,—তাহাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক ঋণ লইয়া কারবার করে। প্রথমে, শোধ করিয়া দেওয়ার চুক্তিতে ইহা জনসাধারণের নিকট হইতে আমানতের আকারে ধার লয় এবং পরে আবার এই আমানতই আর একটু বেশী স্থদে ঋণপ্রার্থীদের কাছে ধার দেয়। এইভাবে ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজকর্মই ঋণঘটিত কাজকর্ম (credit operations)।

ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারী ও ঋণপ্রার্থীদের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করে

ক্রেডিটের অন্যতম বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হইল বিশ্বাস। বলা যায় যে ব্যাঙ্ক বিশ্বাসের কারবার করে। যাহারা ব্যাঙ্কের নিকট আমানত গচ্ছিত রাখে তাহাদের নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কের প্রতি বিশ্বাস আছে; আর ব্যাঙ্ক যাহাদের টাকা ধার দেয় তাহাদের প্রতিও ব্যাঙ্কের আস্থা আছে।

ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of Banks):

১। **আমানত (Deposits):** জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করা এবং এই আমানতকে ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য। আমানত প্রধানতঃ দুই রকমের: (১) চলতি হিসাবে আমানত (current account), ও (২) স্থায়ী আমানত (fixed deposit)। চলতি হিসাবে আমানত বা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট্‌কে চাহিদা আমানতও (Demand Deposit) বলে। এই চাহিদা আমানত হইতে যখন খুসী চেক কাটিয়া টাকা উঠানো চলে। কিন্তু স্থায়ী আমানত তুলিতে হইলে পূর্বনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান রাখিয়া নোটিশ দিতে হয়। স্থায়ী আমানতের উপর বেশ উচ্চ হারে স্থদ দেওয়া হয়, কিন্তু চলতি আমানতের উপর সামান্য মাত্র স্থদ দেওয়া হয় কিংবা একেবারে স্থদ দেওয়া হয় না। আর এক প্রকারের আমানত হইতে পারে। তাহাকে বলে সঞ্চয় হিসাবে আমানত (Savings Account)। এই প্রকার আমানত হইতে সপ্তাহে একবার বা দুইবার করিয়া চেক কাটিয়া টাকা তুলিতে দেওয়া হয়। এই প্রকার আমানতের স্থদ স্থায়ী আমানতের স্থদের চেয়ে কম।

বিভিন্ন প্রকারের আমানত

২। **বাট্টা, ধার ও বিনিয়োগ (Discounts, Loans and Investments):** গচ্ছিত আমানত ধার দেওয়া কিংবা বিনিয়োগ করা

ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কার্য। ইহাকে ব্যাঙ্কের প্রধান ব্যবসায়ও বলা যায়। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে দুইভাবে টাকা ধার দেয়: (১) বিল ও ঋণপত্র ডিস্‌কাউণ্ট করিয়া (অর্থাৎ ভাঙাইয়া), এবং (২) সরাসরি টাকা ধার দিয়া ও আগাম (Advances) হিসাবে দিয়া। ধার দেওয়া হয় ব্যক্তিগত সুনামকে জামিন হিসাবে গণ্য করিয়া কিংবা সোনা, জিনিসপত্র, কোম্পানীর কাগজ, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি জামিন রাখিয়া। বিল ডিস্‌কাউণ্ট করিয়াও ব্যাঙ্ক সুদ পায়। বিলের প্রাপ্য যদি ১০০০৲ টাকা হয় এবং ইহা পাইতে যদি তিন মাস দেরী থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ৩ মাসের সুদ কাটিয়া রাখিয়া বাকী টাকাটা বিলের মালিককে দিয়া দিবে। ইহাকেই বিল ডিস্‌কাউণ্ট করা বা বিল ভাঙানো বলে। ধার ও আগাম দিয়াও ব্যাঙ্ক সুদ পায়। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্ক নিজেই অগ্রণী হইয়া নির্দিষ্ট সুদের সরকারী ঋণপত্র কেনে। সরকারী ঋণপত্র কেনাকে ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ (investment) বলা হয়।

৩। **টাকাকড়ির সৃজন (Creation of money):** আগেকার দিনে ব্যাঙ্কগুলি নিজেরাই নোট ছাপাইয়া টাকাকড়ির সৃষ্টি করিত। আজকাল সাধারণ ব্যাঙ্ক আর নোট ছাপায় না, কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নোট ছাপায়; কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি অন্যভাবে টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে। যখন কেহ ঋণের জন্য আবেদন করে তখন ব্যাঙ্ক তাহার হিসাবে ঋণের পরিমাণ টাকা আমানতের ঘরে জমা দেখায়—যাহাতে দেনাদার ইচ্ছামত চেক কাটিয়া ঐ হিসাব হইতে টাকা উঠাইতে পারে। ঋণকারী টাকাটা সত্যই আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখে নাই। ইহা তাহার সঞ্চয়ের অংশ নয়। ব্যাঙ্ক তাহার হিসাবে ঐ টাকা আমানত দেখাইয়াছে মাত্র। সুতরাং ব্যাঙ্কের এই কার্যের দ্বারা ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া গেল। এইভাবে ধার দেওয়াকে আমানত সৃজন করা (to create a deposit) বলে।

৪। **অন্যান্য কার্য:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে স্বদেশী টাকাকড়ির বিনিময়ে বিদেশী টাকাকড়ি কেনাবেচা করার ব্যাপারে আধুনিক ব্যাঙ্কগুলি উল্লেখযোগ্য কাজ করে। ব্যাঙ্কের মারফৎ এক স্থান হইতে আর এক স্থানে খুব কম ব্যয়ে টাকাকড়ি পাঠানো যায়। গ্রাহকদের এজেণ্ট বা প্রতিনিধি হইয়া খাজনা আদায়, ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম পাঠাইয়া দেওয়া, শেয়ার কেনাবেচা করা প্রভৃতি নানা কাজ ব্যাঙ্কগুলি করিয়া দেয়। মূল্যবান জিনিস ও দলিলপত্র ব্যাঙ্কের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা যায়।

ব্যাঙ্কের সুবিধা বা উপযোগিতা: ব্যাঙ্ক কি ভাবে ব্যবসায় ও শিল্পের সহায়তা করে (Advantages of Banks : How Banks help Trade and Industry) :

ব্যাঙ্ক নানাভাবে সমাজের উপকারে লাগে এবং নানাভাবে শিল্প ও কৃষির সহায়তা করে। তাহারা সর্বসাধারণের সঞ্চয় একত্রিত করিয়া ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কাছে ধার দেয়। এইভাবে ব্যাঙ্কের সাহায্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দুই-ই সম্প্রসারিত হয়। ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্ক হইতেই চলতি মূলধনের অংশ সংগ্রহ করে। বিল ডিস্কাউণ্ট করিয়া, আগাম ও ওভারড্রাফট্ বা জমাতিরিক্ত টাকা ধার হিসাবে লইয়া ব্যবসায়ীরা চলতি মূলধন যোগাড় করে। ভাল ব্যাঙ্কার উদীয়মান ব্যবসায়ীদের উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা হিসাবেও কাজ করে। বাণিজ্যিক বা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ ব্যবসায়ীদের শুধু অল্প সময়ের জন্য ধার দেয়। কিন্তু শিল্পব্যাঙ্ক (Industrial Bank) ব্যবসায়ীদের দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ধার দিয়া থাকে। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্ক নূতন টাকাকড়ির সৃষ্টি করিয়াও শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেয়। ব্যাঙ্কগুলি টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে বলিয়াই টাকাকড়ির যোগান অতিপরিবর্তনশীল। বৈদেশিক হুণ্ডি কেনাবেচা করিয়া এবং বিভিন্ন কারেন্সি ভাঙাইয়া ব্যাঙ্কগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও সাহায্য করে। ব্যাঙ্ক মূল্যবান জিনিস রক্ষণাবেক্ষণের নিরাপদ স্থান। তাহা ছাড়া, ব্যাঙ্কার আমানতকারীদের বিশ্বস্ত বন্ধু ও উপদেষ্টা এবং তাহাদের এজেণ্ট বা ট্রাষ্টি হিসাবে কাজ করে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতিতে সহায়তা করে

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank) :

প্রত্যেক সভ্য দেশেই বর্তমানে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা দেশের অন্য সমস্ত ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মালিকানা সাধারণতঃ সরকারের হয় এবং ইহা সরকার কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরুত্ব

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী

(১) ইহা দেশের টাকাকড়ি ও ঋণের (Credit) পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সাধারণতঃ কাগজী মুদ্রা চালু করিবার একচেটিয়া অধিকার

দেওয়া হয়। ইহা এই একচেটিয়া অধিকার ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর কর্তৃত্ব বলে টাকাকড়ির পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা অন্যান্য ব্যাঙ্ককে ঋণদান বিষয়ে ইহার নির্দেশ অবলম্বন করিতেও বাধ্য করে।

(২) ইহা সরকারের ব্যাঙ্ক। সরকারের নগদ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই জমা থাকে। প্রয়োজন হইলে ইহা সরকারকে অল্পমেয়াদী ঋণও দেয়। সরকারী ঋণের (Public Debt) পরিচালনা ভারও ইহার উপর।

(৩) ইহা অন্য সমস্ত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক। দেশের অন্য সমস্ত ব্যাঙ্কের একটি করিয়া হিসাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে থাকে। তাহারা তাহাদের নিকট গচ্ছিত আমানতের কিয়দংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে বাধ্য। কত পরিমাণ জমা রাখিবে তাহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে। ইহার পরিবর্তে অন্যান্য ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কতকগুলি সুবিধা (যেমন, আবশ্যক ঋণ) পায়। দেশের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ভালমন্দের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই দায়ী।

(৪) বৈদেশিক মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার রক্ষা করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই কার্য। ভারতে বিদেশীর পাওনা মিটান সংক্রান্ত সকল কাজই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ হয়।

ঋণ কি? (What is Credit?)

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বিশ্বাস বা আস্থাই ঋণের মূল ভিত্তি। আমি যদি সারা মাসের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গ্রাম্য মুদীর নিকট হইতে ধারে কিনি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মুদী আমার মাসকাবারে দাম চুকাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস রাখে। এ ক্ষেত্রে দাম চুকাইয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মৌখিক। কিন্তু আমি যদি কিস্তিবন্দী খরিদ প্রথায় একটি সিঙ্গার সেলাইকল বা একটি রেমিংটন টাইপ-রাইটার কিনি, তাহা হইলে আমাকে দাম শোধের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই জিনিসটি কেনা হয় তখন-তখনই, কিন্তু দাম দিতে হয় পরবর্তী কোন সময়ে। এই ভাবে ক্রেতা তাহার ভবিষ্যৎ আয়ের অংশ বর্তমানে জিনিসপত্র কেনার জন্য ব্যবহার করিতে পারে। ভোগ্য জিনিসের ক্রেতাদের পক্ষে এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা একটি বিরাট সুবিধা।

ঋণের সুবিধা:
১। ভবিষ্যৎ আয় দ্বারা বর্তমানে জিনিসপত্র কেনা যায়

ঋণ ব্যবস্থার আর একটি সুবিধা হইল এই যে টাকাপয়সার নগদ লেনদেন

যতদূর সম্ভব কমিয়া যায়; এমন কি, কখনও কখনও একেবারে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ধারে কারবারের তিনটি উপায় বা তিন ধরণের ঋণপত্র এইরূপ সুবিধার সৃষ্টি করে। সেগুলি হইল: (১) ব্যাঙ্ক নোট, (২) চেক, (৩) হুণ্ডি (bill of exchange)। চাওয়া মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের প্রতিশ্রুতি-পত্রকে ব্যাঙ্ক নোট বলে। ধরা যাউক, ব্যাঙ্ক ১০৲ টাকার নোট বাজারে ছাড়িয়াছে। ললিতা ইহা পাইয়া সুকুমারকে দিল; সুকুমার কাপুরকে দিল; কাপুর মেহ্‌তাকে দিল এবং মেহ্‌তা ঐ ব্যাঙ্কে ইহা উপস্থিত করিয়া ভাঙাইয়া লইল। ফলে ১০৲ টাকার সাহায্যে ৩০৲ টাকার লেনদেন সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হইল।

২। টাকাপয়সার নগদ লেনদেন কমিয়া যায়

বিভিন্ন প্রকারের ঋণপত্র

চেক ব্যবহারের দ্বারাও টাকাপয়সার নগদ লেনদেন সংক্ষিপ্ত করা যায়। ললিতা, সুকুমার, কাপুর এবং মেহ্‌তা—প্রত্যেকের যদি একই ব্যাঙ্কে হিসাব (account) থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রাপ্য মিটানোর সময় নগদ টাকা দেওয়ার বদলে চেক দিবে, এবং তাহাদের যে কেউ চেক পাইলেই আপন ব্যাঙ্কে জমা দিবে। ফলে, নিজেদের মধ্যে নগদ টাকাকড়ি ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই হইবে না। কখনো কখনো টাকাকড়ি উঠানোর বা চেক ভাঙানোর প্রয়োজন হইবে বটে; কিন্তু এই প্রয়োজন সব গ্রাহকের একই সঙ্গে হইবে না।

হুণ্ডি ব্যবহারের দ্বারাও নগদ টাকার ব্যবহার কমিয়া যায়। 'ক', 'খ'-এর নিকট হইতে ১০০৲ টাকার জিনিস ধারে কিনিল। 'খ' ধার্য তারিখে ১০০৲ টাকা দিয়া দেওয়ার জন্য 'ক'-এর উপর একটি বিল লিখিয়া লইবে। 'খ' আবার যদি 'গ'-এর নিকট ১০০৲ টাকা ঋণী থাকে তাহা হইলে 'খ' 'গ'-কে এই বিল দিতে পারে এবং 'গ', 'ক'-এর নিকট হইতে বিলের টাকা আদায় করিতে পারে। এই ভাবে, প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া, মোট দুইটি লেনদেন নগদ মাত্র ১০০৲ টাকা দিয়াই চুকাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল।

ঋণ ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়াতেই বর্তমান যুগের বৃহদায়তনে উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। বৃহদায়তনে উৎপাদনের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ পদ্ধতির দ্বারা চলতি মূলধন সরবরাহ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে। ইহার জন্যই যাহাদের সঙ্গতি

৩। ইহা বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি

নাই, অথচ সংগঠনী শক্তি আছে, তাহারা ব্যবসায়ে নামিতে পারে। ঋণ ব্যবস্থা বর্তমান সভ্যসমাজের অপরিহার্য অঙ্গ।

চেক (Cheques) :

চেক হইল চাওয়া মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়া দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কারের উপর হুকুমনামা। নিজের নামে যেখানে আমানত আছে—এমন ব্যাঙ্কের উপরই কোন লোক চেক কাটিতে পারে। ব্যাঙ্কের খাতায় যে পরিমাণ আমানত কাহারও নামে জমা থাকে, সেই পরিমাণ টাকা পর্যন্তই চেক কাটা চলে। লেনদেনে চেক গ্রহণ করিতে কেউ আইনতঃ বাধ্য নয়; কারণ চেক বিনিময়ের বিহিত মাধ্যম (legal tender) নয়। চেক গ্রহণের জন্য দ্বৈত আস্থার প্রয়োজন হয়: (১) যে ব্যক্তি চেক কাটিয়াছে তাহার উপর চেক গ্রহণকারীর আস্থা রাখিতে হইবে। তাহার এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে অন্ততঃ পক্ষে চেকে উল্লিখিত পরিমাণের টাকা চেক প্রদানকারীর নামে ব্যাঙ্কে জমা আছে। (২) দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা ও সততার উপরেও তাহার আস্থা রাখিতে হইবে।

বিশ্বাসই চেকের সাহায্যে বিনিময়ের ভিত্তি

চেক মারফৎ লেনদেনের সুবিধা : ব্রিটেন এবং আমেরিকায় চেক মারফৎ লেনদেন খুব জনপ্রিয়। চেকে লেনদেনের অনেকগুলি সুবিধা আছে বলিয়া ভারতেও চেক ব্যবহারের অভ্যাস ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে। (১) চেক মারফৎ লেনদেন চলিলে হাতে অনেক নগদ টাকা রাখার দরকার পড়ে না। (২) চেক বই-এর চেকমুড়ি (counterfoil) সকল ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করে। (৩) চেক খুব অনায়াসে বহনযোগ্য; একটি মাত্র চেক কাটিয়া বিরাট অঙ্কের টাকাকড়ি হস্তান্তরিত করা চলে। (৪) ভগ্নাংশসমেত প্রাপ্য মিটানোর জন্যও চেক কাটা যায়। অর্থাৎ, ১০২৪৸৶১০ পাইও একটি চেকের সাহায্যে হস্তান্তরিত করা চলে। (৫) কলিকাতার ব্যাঙ্কে যাহার হিসাব আছে বোম্বাই-এর ব্যাঙ্কের উপর কাটা কোন চেক সে লইতে পারে। এক্ষেত্রে সে কলিকাতার ব্যাঙ্কেই চেকটি জমা দিবে এবং কলিকাতার ব্যাঙ্ক বোম্বাই-এর ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আদায় করিবে। (৬) চেকের উপর একটি 'ক্রশ' চিহ্ন দিয়া কিংবা 'হস্তান্তরের অযোগ্য' (non-negotiable) লিখিয়া দিয়া চেককে আরও নিরাপদ করা চলে। ব্যাঙ্কে

চেকের সাহায্যে বিনিময় বিশেষ সুবিধাজনক

যাহার হিসাব আছে একমাত্র সে-ই ক্রশ চেক (Crossed cheque) ভাঙাইতে পারে। ক্রশ চেক হারাইয়া গেলে উহার মালিক তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ্কে জানাইয়া দিবে; ফলে, আর কেহ উহা ভাঙাইতে আসিলে ধরা পড়িবে।

'ক্রশ' চেক বিশেষ নিরাপদ

চেক কি টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য হইতে পারে? (Is a cheque money ?)

চেক যে টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য হইতে পারে না, তাহা প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। (১) ইহা বিহিত বিনিময়ের বাহন নয়, কেউ ইহা লইতে বাধ্য নয়। (২) ইহা হাতে হাতে বেশীদূর ঘোরে না, কারণ ইহার কোন সর্বজনীন গ্রাহ্যতা নাই। (৩) কেবল মাত্র আস্থা থাকিলেই চেক গ্রাহ্য হয়, কিন্তু টাকাকড়ির বেলায় আস্থার কোন প্রশ্ন উঠে না। (৪) চেকের সাহায্যে দাম চুকাইয়া দেওয়াতেই কোন লেনদেন সম্পূর্ণভাবে শেষ হইয়া যায় না। ইহার পরও ব্যাঙ্কারের কাছে চেকটি ভাঙাইয়া লওয়া বাকী থাকে।

চেক টাকাকড়ি হিসাবে কেন গণ্য হইতে পারে না

কাজেই চেক টাকাকড়ি নয়। ইহা একজনের কাছ হইতে আর একজনের কাছে টাকাকড়ি হস্তান্তরিত করার হুকুমনামা মাত্র। চেক টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য হইতে পারে না; ব্যাঙ্কের আমানতই টাকাকড়ির পর্যায়ভুক্ত। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণের অধিকাংশের মত ইহাই।

হুণ্ডি (Bill of Exchange):

জিনিসের মূল্য হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার্য তারিখে হুণ্ডির বাহক বা হুণ্ডিতে উল্লিখিত ব্যক্তির হাতে দিয়া দেওয়ার জন্য বিক্রেতা ক্রেতার নামে যে নির্দেশনামা লিখিয়া দেয় তাহাকেই হুণ্ডি বলা হয়। হুণ্ডির নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি উল্লেখযোগ্য :—হুণ্ডিটি জারি করিতে হয় বিক্রেতাকে এবং হুণ্ডিতে উল্লিখিত টাকা মিটাইয়া দিতে হয় ক্রেতাকে। বিক্রীত জিনিসের মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া হুণ্ডি জারি করা হয়। ক্রেতা দাম চুকাইয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া জিনিস কেনে এবং বিক্রেতা এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তাহার উপর নির্দেশনামা লিখিয়া দেয়। এই নির্দেশনামা বা হুণ্ডি ধারে কারবারের একটি উপায়। চাওয়ামাত্র

হুণ্ডির বৈশিষ্ট্য

হুণ্ডির টাকা পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেই হুণ্ডির প্রাপ্য মিটানো হয়।

হুণ্ডি দুই রকমের হইতে পারে: (১) আভ্যন্তরীণ—ইহার সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে কেনাবেচা চলে; এবং (২) বৈদেশিক—বৈদেশিক বাণিজ্য ইহার সাহায্যে সহজ হইয়া উঠে।

হুণ্ডি কি করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা করে

প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদ্ভূত লেনদেন চুকাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে হুণ্ডির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে হুণ্ডির কাজ বুঝাইয়া দেওয়া চলে। ধরা যাউক, একজন ভারতীয় রপ্তানীকারক **ক** একজন ইংরেজ আমদানীকারক **খ**-এর নিকট ১০০০ পাউণ্ড মূল্যের জিনিস বিক্রয় করিয়াছে। একই সময়ে ভারতীয় আমদানীকারক **গ** ইংরেজ রপ্তানীকারক **ঘ**-এর নিকট হইতে ১০০০ পাউণ্ড মূল্যের জিনিস কিনিয়াছে। এই দুইটি লেনদেন কিভাবে চুকাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই প্রশ্ন। **খ** অবশ্য **ক**-এর নিকট ১০০০ পাউণ্ড মূল্যের নোট পাঠাইয়া দিতে পারে; কিন্তু **ক** ঐ নোট গ্রহণ করিতে রাজী নয়, কারণ পাউণ্ড নোট ভারতে বিহিত মুদ্রা নয়। **গ**-ও ১০০০ পাউণ্ডের সম-মূল্যের ভারতীয় টাকার নোট **ঘ**-এর নিকট পাঠাইতে পারে, কিন্তু টাকার নোট ইংলণ্ডে আইন-চল্‌তি নয় বলিয়া **ঘ** উহা গ্রহণ করিবে না। অবশ্য, **খ** ভারতে এবং **গ** ইংলণ্ডে ১০০০ পাউণ্ডের সম-মূল্যের সোনা পাঠাইয়া দাম চুকাইয়া দিতে পারে। ইহার ফলে, ভারত হইতে ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ড হইতে ভারতে সোনা পাঠানোর দরুণ স্থানান্তর খরচ দুইবারই লাগিবে। কিন্তু হুণ্ডি ব্যবহার করিলে সোনা আদৌ পাঠাইতেই হইবে না।

হুণ্ডির সাহায্যে কি ভাবে আন্তর্জাতিক লেনদেন হয়

ক, **খ**-এর উপর ১০০০ পাউণ্ড দাবীর হুণ্ডি কাটিয়া **গ**-এর নিকট বিক্রয় করিতে পারে। **গ**-এর ইংলণ্ডে ১০০০ পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে বলিয়া সে সানন্দে ইহা কিনিবে। সে **ক**-কে ১০০০ পাউণ্ডের সম-মূল্যের নগদ টাকা দিয়া হুণ্ডিটি কিনিবে এবং তাহার ইংরেজ পাওনাদার **ঘ**-এর নিকট উহা পাঠাইয়া দিবে। **ঘ** এই হুণ্ডিটি নির্দিষ্ট সময়ে **খ**-এর নিকট উপস্থিত করিলেই নগদ ১০০০ পাউণ্ড পাইয়া যাইবে।

পর পৃষ্ঠার ছকটি হইতে আমাদের উদাহরণ আরও পরিষ্কার হইবে।

ভারতবর্ষ		ইংলণ্ড
(ভারতীয় রপ্তানীকারক)	ক, খ এর উপর	(ইংরেজ আমদানীকারক)
ক	১০০০ পাউণ্ডের	খ
	হুণ্ডি কাটিল	

ক, গ-এর নিকট হুণ্ডিটি বেচিয়া ১০০০ পাউণ্ডের সম মূল্যের টাকা পাইল।



ঘ হুণ্ডিটি খ এর কাছে উপস্থিত করিল। খ ইহা গ্রহণ করিয়া ঘ-কে নির্দিষ্ট ১০০০ পাউণ্ড নির্দিষ্ট তারিখে দিয়া দিল।

(ভারতীয় আমদানীকারক)	গ, ঘ এর নিকট	(ইংরেজ রপ্তানীকারক)
গ	হুণ্ডিটি পাঠাইল।	ঘ

হুণ্ডির সুবিধা ঃ হুণ্ডি ব্যবহারের সুবিধা অনেক। ইহার ব্যবহারের দ্বারা দুইটি দেশের মধ্যে দুই তরফা সোনা পাঠানোর ব্যয় বাঁচিয়া যায়। রপ্তানীকারক স্বদেশের কারেন্সি বা মুদ্রাতেই প্রাপ্য পাইতে পারে। আমদানীকারকের পক্ষেও জিনিস বিক্রয় শেষ করিয়া দাম শোধ করার সুযোগে ধারে জিনিস আমদানী করা সম্ভব হয়। হুণ্ডির মালিক প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেও হুণ্ডিটি ব্যাঙ্কে ভাঙাইয়া লইয়া টাকা পাইতে পারে। হুণ্ডি ডিস্‌কাউন্ট করা ব্যাঙ্কের পক্ষে লাভজনক ও নিরাপদ বিনিয়োগ।

চেক এবং হুণ্ডির মধ্যে পার্থক্য (Disti ction between a Cheque and a Bill of Exchange) ঃ

চেক এবং হুণ্ডি হইল ঋণপত্রের দুইটি বিভিন্ন রূপ। হুণ্ডি যে কোন ব্যক্তির উপর জারি করা যায়, কিন্তু চেক কাটিতে হয় মাত্র ব্যাঙ্কের উপরে। চেকের টাকা চাহিবামাত্র দিতে হয়, কিন্তু হুণ্ডির টাকা চাহিবামাত্র দেওয়া হয় না। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেই হুণ্ডির প্রাপ্য মিটানো হয়। পরিশেষে, হুণ্ডি ডিস্‌কাউন্ট করা যায়, চেক ডিস্‌কাউন্ট করা যায় না।

প্রশ্নোত্তর

1 What are the functions of banks? (C U, 1935, 19[illegible])
[[illegible] পৃষ্ঠা দেখ]

2 'Banks are dispensers of credit' Discuss this statement.
([illegible])

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** ঋণ (credit) মানেই বিশ্বাস স্থাপন। কোন জিনিসের দাম নগদ চুকাইয়া দিলে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু ভবিষ্যতে দাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে কেহ কোন জিনিস কিনিলে, বিক্রেতা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই তাহাকে ধারে জিনিস দেয়। কাজেই, ঋণ গ্রহণ এই হিসাবে ধার শোধ করার প্রতিশ্রুতি। আজকাল অধিকাংশ কারবারই এইরূপ প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে চলে। শোধ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক হইতে ধার পায়। অধিকাংশ সময় এই ধার নগদ টাকায় দেওয়া হয় না। ব্যাঙ্ক ঋণ-প্রার্থীর নামে ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় ঋণের টাকা আমানত আছে বলিয়া লিখিয়া লয়। ব্যাঙ্কের উপর লোকের যে বিশ্বাস আছে, এক হিসাবে তাহাই ব্যাঙ্ক ঋণপ্রার্থীকে ধার দেয়। ইংরাজীতে credit শব্দের মূল অর্থ হইল কাহারও সততায় বা ক্ষমতায় বিশ্বাস। ব্যাঙ্কের উপর লোকের যে বিশ্বাস তাহা ঋণপ্রার্থীদের ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের কাজ বলিয়া ব্যাঙ্ককে ইংরেজীতে "dispenser of credit" বলা হয়।]

3. Show how a good banking system can further the economic well-being of a country. (C. U., 1939, 1942)

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** যে দেশে সকলেই যথাযোগ্য কাজে নিযুক্ত, ধন উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং জাতীয় আয় উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই দেশই সমৃদ্ধ। উন্নত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা জনসাধারণের সঞ্চয় একত্রিত করিয়া ব্যবসায়ীদের কাছে ধার দেয়। এই ধার দেওয়ার টাকাকড়ি ধন-উৎপাদনের কাজে খাটে এবং দেশের সমস্ত লোক একটা না একটা কাজ পায়। লোকের নিয়োগ যত ব্যাপক হইবে, জাতীয় ধন ও জাতীয় আয়ও ততই বাড়িয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক হইতে ধার পাওয়ার সুযোগ যত বেশী ও ব্যাপক হইবে, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষিতে ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতার পরিধিও ততই বড় হইবে। ভাল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকাকড়ি ও ঋণ সৃষ্টি করিয়া দেশের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধন করে।]

4. What is a cheque ? "A cheque is not money." Explain. Give an account of the functions and utility of cheques. (C. U., 1935, 1940)

[১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠা দেখ]

5. Describe the advantages of a bill of exchange as used in foreign trade. (C. U., 1946) [১৫০-১৫১ পৃষ্ঠা দেখ]

6. Discuss the functions and utility of the following credit instruments : (a) bill of exchange, (b) cheque (C. U., 1948) [১৪৮-১৫১ পৃষ্ঠা দেখ]

7. Distinguish between a cheque and a bill of exchange. Explain how a bill of exchange operates as a means of making foreign payments. (C. U., 1950) [১৪৯-১৫১ পৃষ্ঠা দেখ]

8. What is a Central Bank ? What are its functions ? (C. U., 1949, 1950) [১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ]

———

অষ্টাদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি (Nature of International Trade) :

আজকাল কোন জাতিই নিজের দেশের মধ্যে সব কিছু তৈয়ারী করে না। প্রত্যেক জাতিই বিদেশ হইতে কতকগুলি পণ্য আমদানী করে এবং বিদেশে কতকগুলি পণ্য রপ্তানী করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই পারস্পরিক বাণিজ্যের ভিত্তি কি? বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের স্বাভাবিক সুবিধার মে পার্থক্য রহিয়াছে তাহাই ইহার ভিত্তি। ইংলণ্ডের মাটি পাট বা আঙুর উৎপা উপযুক্ত নয়। পাট বা আঙুর উৎপাদন করিতে যাওয়া ইংলণ্ডের পক্ষে পাগলামি। পাট বা আঙুর উৎপাদন একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু যে বিপুল খরচের দরকার তাহা কোনক্রমে সমর্থনীয় নয়। কাজেই ইংলণ্ড ভারত হইতে পাট এবং ফ্রান্স হইতে আঙুরের মদ আমদানী করিয়াই সং থাকে। ভারতে আবার টিন বা পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করা সম্ভব নয়, কারণ এ দেশে টিনের খনি নাই এবং পেট্রোলিয়াম যৎসামান্য পাওয়া যায়। কাজেই ভারতে মালয় হইতে টিন এবং ইরাক ও অন্যান্য দেশ হইতে পেট্রোলিয়াম আমদানী করিতে হয়।

আন্তর্জাতিক ব'
বিভিন্ন দেশের মধ্যেহার্দ্যেরও
ও র সহায়ক

কিন্তু সময়ে সময়ে কোন দেশ এমন জিনিস আমদানী করে, যে জিনিসের উৎপাদন ব্যাপারে ঐ দেশের দক্ষতা অন্য কোন দেশের চেয়ে কম নয়। ইহার কারণ এই যে, আর একটি জিনিস উৎপাদনে ঐ দেশের দক্ষতা আরও বেশী। কাজেই ঐ দেশ এই জিনিসটি তৈয়ারী করিয়া রপ্তানী করে এবং অন্য জিনিসটি দক্ষভাবে তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইলেও বিদেশ হইতে আমদানী করে। একটি জিনিস উৎপাদনে এইরূপ বিশেষভাবে দক্ষতা লাভ করাকে বিশেষীকরণ (specialisation) বলা যায়। একটি উদাহরণ হইতে এই বিশেষীকরণের প্রকৃতি আরও সুস্পষ্ট হইবে। ধরা যাউক, একজন নিপুণ উকীল টাইপিষ্ট হিসাবেও নিপুণ। সে কি নিজের টাইপ করার কাজ নিজেই করিয়া লইবে? না, সে

বরং একজন টাইপিষ্ট্ নিযুক্ত করিবে। হয়ত নিযুক্ত টাইপিষ্ট্ ঐ উকীলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ টাইপ করে। কিন্তু তবুও সমস্ত সময় ওকালতিতে নিয়োজিত করাই ঐ উকীলের পক্ষে বেশী লাভজনক। কারণ তাহার উকীল হিসাবে যে দক্ষতা আছে, টাইপিষ্ট্ হিসাবে যে দক্ষতা তাহার চেয়ে বেশী। কাজেই, সে নিজে ওকালতিতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করে এবং একজন টাইপিষ্ট্‌কে নিজের টাইপ করার কাজ চালাইবার জন্য নিযুক্ত করে। ঠিক এইভাবে প্রত্যেক জাতি এমন কতকগুলি জিনিসের উৎপাদনে ব্যাপৃত হয় যেগুলির উৎপাদনে উহার আপেক্ষিক দক্ষতা সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ যে সকল জিনিস সর্বনিম্ন আপেক্ষিক ব্যয়ে (least comparative cost) উৎপাদন করা যায়। প্রত্যেক জাতি এইসব জিনিস উৎপাদন করে এবং অন্যান্য জিনিস বিদেশ হইতে আমদানী করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই নিয়মকে আপেক্ষিক ব্যয়ের নিয়ম (law of comparative costs) বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আপেক্ষিক ব্যয়ের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়

দেওয়াব গেল যে প্রত্যেক দেশ মাত্র কয়েকটি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং বাকি লোকের বহির্বাণিজ্যের মারফৎ বিদেশ হইতে আনাইয়া লয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক হইতে বাণিজ্যরত দেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় ছাড়া আর কিছুই নয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা (Advantages of International Trade) :

বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমের বিশেষীকরণের সুবিধাগুলি হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধাগুলি উদ্ভূত। প্রত্যেক দেশেরই কতকগুলি জিনিস উৎপাদনের অনুকূল স্বাভাবিক সুবিধা রহিয়াছে। কাজেই যে সব জিনিস উৎপাদনের পক্ষে কোন দেশের জমি, জলবায়ু এবং ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল, সেই দেশের সেই সব জিনিসের উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাট উৎপাদনে ভারত ও পাকিস্তানের, তুলা উৎপাদনে মিশরের, পশম উৎপাদনে অষ্ট্রেলিয়ার এবং মদ উৎপাদনে [illegible] সুবিধা রহিয়াছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক [illegible] আর এক দেশের নিকট হইতে, যে সব জিনিস উৎপাদন করা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে [illegible] দেশের মধ্যে শ্রমের [illegible] সুবিধাগুলি

উহার পক্ষে অসম্ভব কিংবা ভয়ানক ব্যয়সাপেক্ষ—সেগুলি আমদানী করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধাগুলি দুই প্রকারের : (১) যে সব জিনিসের উৎপাদনে কোন দেশের সর্বাধিক আপেক্ষিক সুবিধা রহিয়াছে ঐ দেশের শ্রম ও মূলধন সেই সব জিনিস উৎপাদন করার জন্যই শুধু নিয়োজিত হয়। এইরূপ শ্রমবিভাগের ফলে সারা বিশ্বের ধনোৎপাদন সর্বাধিক হয়। (২) প্রত্যেক দেশই আমদানী করা জিনিস যে দামে পায়, নিজে ঐ জিনিস তৈয়ারী করিতে গেলে তাহার চেয়ে বেশী দাম পড়িত বা ঐ জিনিস তৈয়ারী করিতে হইলে এমন একটি জিনিস তৈয়ারী করিতে পারিত না যাহার উৎপাদন তাহার পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইত। এইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মারফৎ প্রত্যেক দেশের আয় ও জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াত হয়। ইহাতে ভাব ও সংস্কৃতির আদানপ্রদান হয়। ফলে আন্তর্জাতিক মানসিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহা আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যেরও সহায়ক

বাণিজ্য-'উদ্বৃত্ত' (Balance of Trade) :

আমদানী ও রপ্তানীর পারস্পরিক বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। দেশের আমদানীর মূল্য এবং রপ্তানীর মূল্যের মধ্যে অনেক সময়েই সমতা না থাকিয়া বরং পার্থক্য থাকিতে পারে। এই পার্থক্যকে বাণিজ্য-'উদ্বৃত্ত' (Balance of Trade) বলা হয়। আমদানীর চেয়ে রপ্তানী বেশী হইলে ধনাত্মক বা অনুকূল বাণিজ্য-'উদ্বৃত্ত' (positive or favourable balance of trade) এবং রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বেশী হইলে ঋণাত্মক বা প্রতিকূল (negative or unfavourable) বাণিজ্য-'উদ্বৃত্ত' দেখা দেয়।

আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যের পার্থক্যকে বাণিজ্য-'উদ্বৃত্ত' বলে

যাহা বিক্রয় করিয়া বিদেশীদের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায় তাহাকেই কোন দেশের রপ্তানী বলে। আর যাহা কিছু বিক্রয় করিয়া বিদেশীদের হাতে দাম চুকাইয়া দিতে হয় তাহাকে দেশের আমদানী বলা হয়। জিনিসপত্রের রপ্তানীকে দৃশ্য রপ্তানী (visible exports) এবং জিনিসপত্রের আমদানীকে

দৃশ্য আমদানী (visible imports) নামে অভিহিত করা হয়। কেবল আমদানী করা জিনিসপত্রের মূল্য হিসাবেই নয়, কখনও কখনও অন্যান্য কারণেও এক দেশ হইতে আর এক দেশে টাকাকড়ি যায়। যেমন—(১) বিদেশীদিগকে কাজে নিযুক্ত করিলে তাহাদের বেতন ও পেন্সন বাবদ বিদেশে টাকা পাঠাইতে হয়; (২) বিদেশীদের জাহাজ, ব্যাঙ্ক এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সেবামূলক সুবিধা গ্রহণ করিলে তাহাদের কাজের দাম বাবদ টাকা পাঠাইতে হয়; (৩) বিদেশ হইতে ঋণ হিসাবে গৃহীত মূলধনের উপর সুদ দিতে হয়; এবং (৪) ভ্রমণ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়া দেশের লোকেরা টাকাকড়ি ব্যয় করে। এই ধরণের খাতে যে লেনদেন হয় তাহা, যে দেশ ব্যয় করে তাহার পক্ষে অদৃশ্য আমদানী (invisible import) এবং যে দেশ গ্রহণ করে তাহার পক্ষে অদৃশ্য রপ্তানী (invisible export) হয়। আমরা যদি কোন দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রপ্তানীর দরুণ দাম হিসাবে প্রাপ্ত মোট টাকা একদিকে যোগ করি এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আমদানীর দাম হিসাবে প্রদত্ত মোট টাকা একদিকে যোগ করি, তাহা হইলে এই দুই যোগফলের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাকে লেনদেনের 'ব্যাল্যান্স' বা 'উদ্বৃত্ত' (Balance of payment) বলা হয়। কোন দেশ বিদেশকে যত টাকা দেয় তাহার চেয়ে যদি বেশী টাকা বিদেশ হইতে পায় তাহা হইলে লেন-দেনের 'উদ্বৃত্ত' অনুকূল হইল। আর যদি বিদেশকে দেয় টাকা বিদেশ হইতে প্রাপ্য টাকার চেয়ে বেশী হয় তাহা হইলে লেনদেনের 'উদ্বৃত্ত' প্রতিকূল হইল।

প্রত্যক্ষ আমদানী ও রপ্তানী

পরোক্ষ আমদানী ও রপ্তানী

লেনদেনের উদ্বৃত্ত

কোন দেশের লেনদেনের 'উদ্বৃত্ত' যখন অনুকূল তখন অন্যান্য দেশ হইতে ঐ দেশে সোনা আমদানী হয়। আর কোন দেশের লেনদেনের 'উদ্বৃত্ত' যখন প্রতিকূল তখন ঐ দেশই অন্যান্য দেশে সোনা রপ্তানী করে। যখন অনুকূল 'উদ্বৃত্তে'র ফলে সোনা আমদানী হয় তখন টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে জিনিসপত্রের দামও বাড়িয়া যায়। যে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছে সেই দেশে রপ্তানী করা বিশেষ লাভজনক। কিন্তু সেই দেশ হইতে আমদানী করা মোটেই লাভজনক নহে। ফলে ঐ দেশের রপ্তানী কমিতে ও আমদানী বাড়িতে থাকে।

অপর পক্ষে, যদি প্রতিকূল 'উদ্বৃত্তে'র ফলে ঐ দেশ সোনা রপ্তানী করে তবে ঐ দেশে টাকাকড়ির পরিমাণ কমিবে এবং ফলে দামও পড়িয়া যাইবে। তখন

ঐ দেশে রপ্তানী করা অপেক্ষা ঐ দেশ হইতে আমদানী করা লাভজনক। সুতরাং ঐ দেশের রপ্তানী বাড়িবে ও আমদানী কমিবে।

সুতরাং দূর ভবিষ্যৎ ধরিয়া আমরা বলিতে পারি যে কোন দেশ রপ্তানী করিয়াই আমদানীর দাম মিটায় বা রপ্তানীর দরুণ প্রাপ্য আমদানী করিয়াই আদায় করে। এইজন্যই বলা হয় যে 'দূর ভবিষ্যৎ ধরিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যক্ষ বিনিময়েরই একটি রূপ'।

শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যক্ষ বিনিময়েরই একটি রূপ

দূর ভবিষ্যতে বিদেশ হইতে প্রাপ্য টাকা এবং বিদেশকে দেয় টাকা পরস্পরের সমান হইতে চেষ্টা করে। এইরূপ সমতার ক্ষেত্রে লেনদেনের 'উদ্বৃত্ত' অনুকূলও নয়, প্রতিকূলও নয়, অর্থাৎ উদ্বৃত্তই থাকে না।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (Free Trade and Protection) :

যখন কোন দেশ বিদেশী জিনিসের আমদানী বন্ধ বা সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের উপর কোনরূপ শুল্ক ধার্য করে না, তখনই ঐ দেশে অবাধ বাণিজ্য (free trade) চালু আছে বলা হয়। সংরক্ষণের (protection) অর্থ দেশের বাজারে বিদেশী জিনিসের প্রবেশ কঠিনতর করিয়া তুলিয়া দেশে ঐ জিনিসের উৎপাদনকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের উপর শুল্ক বা কর বসানো। ভারতে চিনি এবং অন্যান্য কোন কোন জিনিসের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এই সমস্ত জিনিসের উপর বিভিন্ন সময়ে সংরক্ষণী শুল্ক (protective duty) বসাইয়াছে।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Free Trade) :

অবাধ বাণিজ্য চালু থাকিলে বিদেশ হইতে জিনিসপত্র সস্তায় আমদানী করা যায়। কাজেই, বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্বদেশী উৎপাদকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও দেশের লোকেরা সস্তায় জিনিসপত্র পাইয়া লাভবান হয় বিশেষ বিশেষ জিনিস উৎপাদনে বিদেশীদের আপেক্ষিক দক্ষতা বেশী বলিয়াই তাহারা ঐ সব জিনিস স্বদেশী উৎপাদনকারীর অপেক্ষা সস্তা দরে দিতে পারে। যে দেশ যে জিনিস অপেক্ষাকৃত বেশী দক্ষ ভাবে উৎপাদন করিতে

অবাধ বাণিজ্য চালু থাকিলে লোকে অল্প দামে জিনিসপত্র পায়

পারে, সে দেশ যদি বিশেষ করিয়া শুধু সেই জিনিসই উৎপাদন করে তাহা হইলে ইহাই পৃথিবীর পক্ষে সবচেয়ে কল্যাণকর ব্যবস্থা হইবে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই শ্রমবিভাগ পরিপূর্ণভাবে তখনই সম্ভব যখন ঐ সব দেশের আমদানী রপ্তানী খোলা বাজারে অবাধে চলে। যদি কোন' জাতি বিদেশী জিনিস কিনিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপ শ্রমবিভাগের অস্তিত্ব অসম্ভব। বিশেষীকরণের সমস্ত সুবিধা তাহা হইলে অন্তর্হিত হইবে। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশ ইহার শ্রম ও মূলধন এমন সব জিনিসের উৎপাদনে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবে, যে সব জিনিস উৎপাদনের যোগ্যতা ইহার নাই।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমবিভাগ সম্ভব করিয়া অবাধ বাণিজ্য পৃথিবীর ধনবৃদ্ধি করে

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Protection): দেশের পক্ষে সংরক্ষণ যে কল্যাণকর, তাহা দেখানোর জন্য অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করা হয়। অবশ্য এই সব যুক্তির কতকগুলি ভ্রান্ত। কিন্তু বাকী যুক্তিগুলি বিশেষভাবে বিচার্য।

প্রথমতঃ, সংরক্ষণ অধিকমাত্রায় নিয়োগ সম্ভব করে। সংরক্ষণের ছত্রছায়ায় দেশে নূতন নূতন শিল্প সংগঠিত হয়। ফলে দেশে বেশী বেশী লোকের চাকুরীর সংস্থান হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে আমদানী সংকুচিত হইলে রপ্তানীও সংকুচিত হইতে বাধ্য। ফলে, রপ্তানীর জিনিসের শিল্পে নিয়োগ কমিবে। এই কমাবাড়ায় দেশের পক্ষে কতটা মোট লাভ বা ক্ষতি হইবে তাহা নির্ধারণ করা কঠিন।

(১) ইহা অধিক মাত্রায় নিয়োগ সম্ভব করে

দ্বিতীয়তঃ, সংরক্ষণের দরুণ দেশের টাকা দেশেই থাকে। আমরা বিদেশী জিনিস না কিনিলে দেশের টাকা দেশেই থাকিবে এবং দেশজাত জিনিসের কেনাবেচা বাড়িবে—এইরূপ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু টাকাকড়িই ধন নয়। টাকাকড়ি খাওয়াও যায় না, পান করাও যায় না; অন্য জিনিস কেনার জন্যই ইহার প্রয়োজন। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরা জিনিস রপ্তানী করিয়াই বিদেশ হইতে জিনিস আমদানী করি—টাকা রপ্তানী করিয়া নয়। উপরন্তু, যদি আমরা সস্তা বিদেশী জিনিসের পরিবর্তে দামী স্বদেশী জিনিস কিনিতে বাধ্য হই, তবে ভোগকারী হিসাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হইব।

(২) ইহার ফলে দেশের টাকা দেশেই থাকে

শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি (Infant Industries Argument) হইল তৃতীয় যুক্তি। এই যুক্তির সারবত্তা আছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশে শিল্পায়ন বহু পূর্বেই স্বরু হইয়াছিল বলিয়া এই সব দেশ স্বদক্ষ ভাবে জিনিস তৈয়ারী করিতে পারে। ভারতবর্ষ ও চীনের মত কৃষিপ্রধান দেশে অনেক শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্বাভাবিক স্ববিধা থাকা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথম প্রথম উৎপাদন খুব স্বদক্ষ হয় না। বর্তমানে এই সব দেশের শিল্পের শৈশব অবস্থা; কাজেই উন্নত দেশের শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব। শিশু শিল্পগুলি সংরক্ষণের সাহায্য পাইলে অতি দ্রুত উন্নতি করিতে পারিবে এবং অভিজ্ঞতা ও শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিয়া নিকট ভবিষ্যতে সংরক্ষণের সাহায্য ছাড়াই অন্যান্য উন্নত দেশের শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে।

(৩) শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি

চতুর্থতঃ, শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি সংরক্ষণের অন্যতম যুক্তি। প্রত্যেক দেশের অর্থনীতিতেই সর্বতোমুখী ভারসাম্য বা 'ব্যাল্যান্স' থাকা প্রয়োজন। কৃষির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ক্ষতিকর। প্রত্যেক দেশেই নানা রকমের শিল্প থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহার ফলে, জাতীয় অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষিত হইবে এবং দেশের লোকের বিচিত্র প্রতিভা ও কর্মকৌশল বিকাশ লাভ করার যথেষ্ট স্বযোগ পাইবে।

(৪) ইহার ফলে জাতীয় অর্থ-নীতিতে ভারসাম্য রক্ষিত হয়

জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে সংরক্ষণ আবশ্যক। যুদ্ধের সময়ে জাতির আত্মরক্ষার জন্য যে সব শিল্পের একান্ত প্রয়োজন, অন্ততঃ পক্ষে সেই সব শিল্পগুলি দেশের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। লোহা ও ইস্পাত শিল্পের মত মৌলিক শিল্পের এবং সাল্‌ফিউরিক এসিড ও খাদ্যের মত প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়।

(৫) ইহা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন

সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Protection) :

সংরক্ষণের বিপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা প্রধানতঃ অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি। বলা হয় যে সংরক্ষণের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ব্যাহত হয় এবং ইহার ফলে সামগ্রিক ভাবে পৃথিবীর ধনোৎপাদন এবং প্রত্যেক

দেশের জাতীয় আয় কমিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সংরক্ষণ আমদানী দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দেয় বলিয়া ভোগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়তঃ, সংরক্ষণের ফলে যদি আমদানী বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয় তবে সরকার আমদানী বাণিজ্য হইতে যে শুল্ক পাইত তাহাও বিশেষ কমিয়া যাইবে। উপরন্তু, সংরক্ষণের পক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয় অর্থনীতির দিক দিয়া বিচার করিলে দূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের কোনটিই বিশেষ শক্তিশালী নয়। এমন কি, শিশুশিল্প সংরক্ষণের যুক্তিও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, কারণ সকল সময় ইহা সঠিক নির্ধারণ করা যায় না যে কোন্ শিল্পটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ইহাও অনেক সময় দেখা গিয়াছে শিশু শিশুই থাকিতে চায়, অর্থাৎ একবার সংরক্ষণ দিলে তাহা প্রত্যাহার করা বিশেষ কঠিন।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the advantages which a country derives from foreign trade? (C. U., 1937, 1942, 1945)

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে, দেশের লোকেরা, দেশে যে সব জিনিস উৎপাদিত করা যায় না, তাহাও ভোগ করিতে পারে। বিদেশ হইতে অনেক জিনিসই অপেক্ষাকৃত সস্তায় কেনা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মানেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমবিভাগ। প্রত্যেক দেশ সেই সব জিনিসই উৎপাদিত করে, যে সব জিনিসের উৎপাদনে উহার সর্বাধিক আপেক্ষিক দক্ষতা (greatest comparative efficiency) রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশের শ্রম ও মূলধনেরও যথাসম্ভব যোগ্যতম ব্যবহার হয়।]

2. What is meant by 'balance of trade'? (C. U., 1937, 1942, 1945)

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** কোন দেশের আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাহাই বাণিজ্য-'উদ্বৃত্ত' (balance of trade)। জিনিসপত্রের রপ্তানীকে দৃশ্য (visible) রপ্তানী বলে। আর জিনিস রপ্তানী বাবদ ছাড়াও অন্যান্য খাতে কোন দেশ বিদেশ হইতে যে প্রাপ্য টাকাকড়ি পায় তাহাকে অদৃশ্য (invisible) রপ্তানী বলা হয়। জিনিসপত্রের আমদানীকে দৃশ্য আমদানী বলে। জিনিস আমদানী বাবদ ছাড়াও অন্যান্য খাতে বিদেশকে যে টাকাকড়ি দিতে হয়, তাহাকে অদৃশ্য আমদানী বলা হয়। ভারতবর্ষের পরোক্ষ আমদানী নিম্নরূপ :—(১) বিদেশ হইতে গৃহীত ঋণের উপর সুদ প্রদান; (২) ভারতে নিযুক্ত বিদেশী অফিসারদের বেতন ও পেন্সন প্রদান, (৩) বিদেশী জাহাজ কোম্পানী এবং ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর প্রাপ্য প্রদান; (৪) শিক্ষা ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের ব্যয়, (৫) ভারতে বিদেশী বিনিয়োগ-কারীদের ব্যবসায়ের লভ্যাংশ প্রদান; (৬) বিদেশে কূটনৈতিক দূতাবাস পরিচালনার জন্য ব্যয়। কোন দেশের বিদেশের কাছে মোট প্রাপ্য এবং মোট দেয়ের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তাহাকে লেনদেনের চলতি 'উদ্বৃত্ত' (balance of current payments) বলে। মোট প্রাপ্য মোট

দেয়ের চেয়ে বেশী হইলে লেনদেনের 'উদ্বৃত্ত' অনুকূল (favourable) এবং মোট দেয় মোট প্রাপ্যের চেয়ে বেশী হইলে লেনদেনের 'উদ্বৃত্ত' প্রতিকূল (unfavourable) বলা হয়। দূর ভবিষ্যৎ ধরিলে রপ্তানী আমদানীর সমান হওয়ার চেষ্টা করে এবং দেশের প্রাপ্য দেশের দেয় টাকাকড়ির সমান হওয়ার চেষ্টা করে।]

3. What are the arguments in favour of protection? State the infant industry argument for protection. [১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ]

4. "International trade is in the last analysis a kind of barter." Elucidate. (C. U., 1948)। [১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠা দেখ]

ঊনবিংশ অধ্যায়

বণ্টন

বণ্টন কাহাকে বলে ? (What is Distribution ?)

বণ্টনের অর্থ

উৎপাদনের উপাদানগুলি (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠননৈপুণ্য) পারস্পরিক সহযোগিতায় সক্রিয় হইয়া প্রত্যেক দেশেই একটি নীট বার্ষিক আয় (net annual income) সৃষ্টি করে। এই আয়কেই জাতীয় লভ্যাংশ (National Dividend) বলা হয়। বণ্টন মানেই চারিটি উপাদানের মধ্যে এই জাতীয় লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া দেওয়া। ভূমির মালিক তাহার অংশ হিসাবে খাজনা (rent) পায়, পুঁজিপতি সুদ (interest) পায়, শ্রমজীবী মজুরী (wages) পায় এবং সংগঠক বা কর্মকর্তা মুনাফা (profits) পায়।

জাতীয় লভ্যাংশ (National Dividend) :

জাতীয় লভ্যাংশের অর্থ

জাতীয় লভ্যাংশ হিসাব করা হয় নিম্নলিখিত উপায়ে : চারিটি উপাদানের দ্বারা সম্মিলিত ভাবে উৎপাদিত মোট বার্ষিক আয় হইতে কাঁচা মালের খরচ এবং স্থায়ী (fixed) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য ধার্য বার্ষিক খরচ (annual replacement cost) বাদ দিলে বাকি যাহা থাকে তাহাই জাতীয় লভ্যাংশ। ইহাকেই উপাদানগুলির উৎপাদিত নীট বার্ষিক আয় বলা হয়। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য ধার্য

বার্ষিক খরচকে ক্ষয়পূর্তি বা অবচয় খরচ বলা হয়। যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থাবর বা স্থায়ী মূলধন ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে জীর্ণ হইয়া যায়; কাজেই ভবিষ্যতে এগুলি বদলাইয়া ফেলা প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সেজন্য প্রত্যেক বৎসর মোট আয় হইতে কিছু টাকাকড়ি এই উদ্দেশ্যে সরাইয়া রাখা হয়। সঞ্চিত টাকাকেই ক্ষয়পূর্তি ভাণ্ডার বা অবচয় ভাণ্ডার (depreciation fund) বলা হয়।

বণ্টনতত্ত্ব (Theory of Distribution) :

প্রত্যেক উপাদানের সহযোগিতার দাম কি কি নীতির ভিত্তিতে নিরূপিত হয় বণ্টনতত্ত্ব তাহাই ব্যাখ্যা করে। অন্যান্য দাম যে ভাবে নিরূপিত হয় উপাদানের কাজের দামও ঠিক সেই ভাবেই নিরূপিত হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রত্যেক উপাদানের যে দান, তাহার দাম নিরূপণের বেলায়ও মূল্যের সাধারণ তত্ত্বের সাহায্য লইলেই চলে। দামের উপর দুইটি দিকেরই প্রভাব আছে : (১) যোগানের দিক, এবং (২) চাহিদার দিক।

কোন উপাদানের সহযোগিতার মূল্য সেই উপাদানের চাহিদা যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়

যোগানের দিক হইতে দেখা যায় যে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে 'ভূমির' যোগান স্বাভাবিকভাবে সীমাবদ্ধ। 'শ্রমের' যোগান জনসংখ্যা ও শ্রমিকের দক্ষতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। মূলধনের যোগান নির্ভর করে সঞ্চয়ের পরিমাণ ও সঞ্চয়কারীদের ধার দেওয়ার ইচ্ছার উপর। ব্যবসায় সংগঠকের যোগান নির্ভর করে ঝুঁকি লওয়ার ইচ্ছার উপর। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উৎপাদনের উপাদানের যোগান সম্বন্ধে কোন নীতিই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

কিন্তু চাহিদা সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে বিভিন্ন দামের কোন উপাদানের চাহিদা বিভিন্ন পরিমাণে হয়। উপাদানের যোগান নির্দিষ্ট থাকিলে, ইহার প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের উপরই ইহার দাম নির্ভর করিবে। যদি শ্রমিকের নির্দিষ্ট সংখ্যা ১০০০ হয় তাহা হইলে ১০০০ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন ৯৯৯ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদনের চেয়ে যতখানি বেশী হইবে ততখানিই হইল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ১০০০ জন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন যদি ৩০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে ১০০০ জন শ্রমিককেই চাকুরীতে রাখিতে হইলে, নিয়োগকর্তা কাহাকেও ৩০৲ টাকার বেশী মজুরী দিতে পারে না। যদি ভূমি, মূলধন এবং সংগঠনৈপুণ্যের

উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের উপরই উহার চাহিদা নির্ভর করে

যোগান অপরিবর্তিত থাকে এবং নিয়োগকর্তা শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির দরুণ শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমাগত কমিতে থাকিবে। শ্রমের দাম কম হইলে অনেক শ্রমিকের জন্য, এবং শ্রমের দাম বেশী হইলে অপেক্ষাকৃত কম শ্রমিকের জন্য চাহিদা থাকিবে। ঠিক এইভাবে, অপেক্ষাকৃত কম সুদে অনেক বেশী মূলধনের এবং চড়া সুদে অল্প মূলধনের চাহিদা থাকিবে। কাজেই, আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি—উপাদানের দাম যত বেশী হইবে, ইহার চাহিদা তত কম হইবে এবং উপাদানের দাম যত কম হইবে, ইহার চাহিদা তত বেশী হইবে।

ভারসাম্য অবস্থায়, প্রত্যেক উপাদানের দাম ঠিক এমন হইবে যাহাতে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়। ইহাই বণ্টনের সাধারণ তত্ত্ব। ইহা চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Explain what is meant by Distribution and National Dividend. (C. U., 1929) [১৬১-১৬২ পৃষ্ঠা দেখ]

2. What are the general principles of determining the rate of remuneration for the services of a factor ? (C. U., 1933) [১৬২-১৬৩ পৃষ্ঠা দেখ]

বিংশ অধ্যায়

খাজনা

চুক্তি অনুযায়ী খাজনা এবং অর্থনৈতিক খাজনা (Contract Rent and Economic Rent) :

জমির বন্দোবস্ত লওয়ার সময়ে জমির মালিককে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে হয়। এই দেয় অর্থকেই চুক্তি অনুযায়ী খাজনা (contract rent) বলা হয়। অর্থবিদ্যায় চুক্তি অনুযায়ী খাজনা লইয়া আলোচনা করা হয় না। অর্থনৈতিক খাজনা বলিতে যে কোন উপাদানের সীমাবদ্ধতার দরুণ যে আয় হয় তাহাকে বুঝায়। 'ভূমি'ই অবশ্য এইরূপ উপাদানের

চুক্তি অনুযায়ী খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে পার্থক্য

শ্রেষ্ঠ উদাহরণ; ভূমির যোগান স্বাভাবিক ভাবে সীমাবদ্ধ। প্রতিভাবান ব্যক্তির যোগানও স্বাভাবিক ভাবে সীমাবদ্ধ। সুতরাং শ্রমের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হইতে পারে; অন্যান্য উপাদানের বেলায়ও হইতে পারে। জমির ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতা চালু থাকিলে, জমির স্বাভাবিক উৎকর্ষকে কাজে লাগানোর জন্য জমির মালিককে বার্ষিক যে অর্থ দিতে হইত তাহাকে অর্থনৈতিক খাজনা (economic rent) বলা হয়। জমির সঙ্গে জমির মালিকের তৈয়ারী ঘরবাড়ী, জলসেচের জন্য খাল প্রভৃতি ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ চুক্তি অনুযায়ী খাজনার অন্তর্ভুক্ত। এই ঘরবাড়ী, জলসেচের জন্য খাল প্রভৃতিকে অর্থবিদ্যায় জমিতে নিযুক্ত মূলধন হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং ইহাদের জন্য দেয় অর্থকে সুদ হিসাবে ধরিতে হইবে। প্রতিযোগিতার ফলে চুক্তি অনুযায়ী খাজনা অর্থনৈতিক খাজনার চেয়ে বেশীও হইতে পারে, কমও হইতে পারে। উপরন্তু, চুক্তি অনুযায়ী খাজনা একেবারে কয়েক বৎসরের জন্য নির্ধারিত হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক খাজনা বৎসরে বৎসরে পরিবর্তিত হইতে পারে।

অর্থনৈতিক খাজনা হইল উৎপাদকের উদ্বৃত্ত
(Economic Rent is Producer's Surplus):

ধরা যাউক, প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষ করিলে ১ একর জমি হইতে ১০০ মণ শস্য পাওয়া যায়। শস্যের দাম যদি মণকরা ১০৲ টাকা হয় তাহা হইলে আয় মোট ১০০০৲ টাকা হইবে। ধরা যাউক, ২৫০৲ টাকা মোট চাষ খরচ অর্থাৎ বীজ ও সারের দাম, ধার করা মূলধনের সুদ, লাঙ্গল ও বলদের ক্ষয়পূর্তির জন্য সঞ্চয়, ক্ষেত মজুরের মজুরী, ইত্যাদি। ধরা যাউক, নিজস্ব শ্রমের মজুরী হিসাবে চাষী ৫০০৲ টাকা ধরিয়াছে; পরিবার পালন করার জন্য ৫০০৲ টাকা তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার উপর উদ্যোগের ও তত্ত্বাবধানের পুরস্কার হিসাবে চাষী ১০০৲ টাকা মুনাফা আশা করে। তাহা হইলে, শস্যের মোট উৎপাদন খরচ দাঁড়াইল (২৫০+৫০০+১০০) টাকা বা ৮৫০৲ টাকা। কিন্তু শস্য হইতে প্রাপ্ত মোট আয় ১০০০৲ টাকা। ইহা হইতে মোট উৎপাদন খরচ বাদ দিলে উদ্বৃত্ত ১৫০৲ টাকা থাকে। ইহাই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত (producer's surplus)। সুতরাং উল্লিখিত ১ একর জমির অর্থনৈতিক খাজনা ১৫০৲ টাকা। রায়ত ইহা মজুরীর অংশ বলিয়াও দাবী

উৎপাদকের উদ্বৃত্ত কাহাকে বলে

করিতে পারে না, মুনাফার অংশ বলিয়াও দাবী করিতে পারে না। প্রতিযোগিতার দরুণ উৎপাদকের উদ্বৃত্তের সমগ্র অংশই জমির মালিক খাজনা হিসাবে পাইবে। কোন রায়ত সবখানি দিতে অস্বীকার করিলে, অন্য রায়তেরা সবখানি দিতে স্বীকার করিয়া জমির বন্দোবস্ত লইবে। জমির বন্দোবস্ত লওয়ার জন্য জমিহীন রায়তদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা বর্তমান।

উৎপাদকের উদ্বৃত্ত কেন অর্থনৈতিক খাজনার সমান

রায়তেরা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত খাজনা হিসাবে দিতে রাজী না থাকিলে, জমির মালিক নিজেই নিজের জমি মজুরের সাহায্যে খাসে চাষ করিবে; ফলে, সমস্ত উদ্বৃত্তটুকুই তাহার হইবে।

জমির মালিকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া, কোন জমির মালিক উৎপাদকের উদ্বৃত্তের চেয়ে বেশী খাজনা চাহিতে পারে না; চাহিলে তাহার রায়তদের হারাইবে। এই রায়তেরা অন্য জমির মালিকদের নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লইবে।

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব (Ricardo's Theory of Rent):

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব কি কি বিষয় ব্যাখ্যা করে

ইংরেজ অর্থবিদ্যাবিদ্ ডেভিড রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে: (১) খাজনার প্রয়োজন উদ্ভূত হয় কেন; (২) জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে সম্পর্ক; (৩) দাম ও খাজনার মধ্যে সম্পর্ক; (৪) খাজনার পরিমাণ নিরূপিত হয় কি ভাবে; এবং (৫) খাজনার প্রকৃতি।

১। খাজনার প্রয়োজন উদ্ভূত হয় কেন?—একদল ঔপনিবেশিক যখন প্রথম কোন নূতন দেশে বসতি স্থাপন করে তখন তাহারা চাষের জন্য সরেস জমিই বাছিয়া লওয়ার সুযোগ পায়। সরেস জমির যোগান প্রচুর থাকে। ধরিয়া লওয়া যাউক যে একজন লোক এক একর জমির চাষ করে; যদি প্রত্যেকে ১০০ দিন খাটিয়া ১০০ মণ শস্য পায়, তাহা হইলে শস্যের মণকরা মূল্য হইবে ১ দিনের শ্রম, অর্থাৎ ১ মণ শস্যের উৎপাদন খরচ।

নূতন নূতন ঔপনিবেশিক দলের আগমন এবং নূতন নূতন শিশুর জন্মগ্রহণের ফলে জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলে। ফলে শস্যের চাহিদাও বাড়িয়া যায় এবং উপনিবেশ অঞ্চলের সমস্ত সরেস জমিই কর্ষণাধীন হয়। ইহার পরেও যদি

জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিরেস জমিও কর্ষণাধীন হইবে, কারণ শস্যের চাহিদা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ১০০ দিনের পরিশ্রমে ৭৫ মণ শস্য উৎপাদিত হয়। তাহা হইলে, শস্যের মণকরা মূল্য মণকরা উৎপাদন খরচের অর্থাৎ ১⅓ দিনের শ্রমের সমান হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমিতে ১০০ দিনের পরিশ্রমে ১০০মণ শস্য উৎপাদিত হয়। এরূপ অবস্থায়, প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা খাজনা হিসাবে ২৫ মণ শস্য পাওয়া যায়—এইরূপ বলিতে হইবে। আমরা ধরিয়া লইয়াছি, ১ একর জমি ১ জনে চাষ করে। শস্যের চাহিদা থাকায় প্রথম শ্রেণীর ১ একর জমিতে যদি অতিরিক্ত আর একজন শ্রমিক নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেও হয়ত ১০০ দিন পরিশ্রম করিয়া ৭৫ মণের বেশী শস্য উৎপাদিত করিতে পারিবে না। কারণ ইতিমধ্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হইবে। অর্থাৎ, প্রথম শ্রেণীর জমিতে বেশী করিয়া শ্রম নিয়োজিত করিতে থাকিলে, শস্যের মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং খাজনাও বাড়িয়া যাইবে। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু না হইলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় শস্যই প্রথম শ্রেণীর জমি হইতেই উৎপাদিত করা সম্ভব হইত; ইহাতে খরচ একটুও বাড়িত না। ফলে, শস্যের দামও বিন্দুমাত্র বাড়িত না, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কর্ষণাধীন করারও প্রয়োজন হইত না এবং প্রথম শ্রেণীর জমির জন্যও খাজনা লাগিত না।

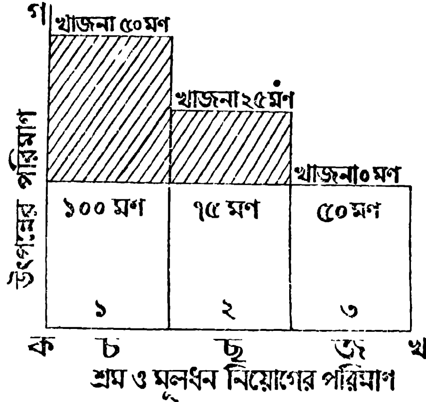
রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদাহরণ

জনসংখ্যা আরও বাড়িয়া গেলে তৃতীয় শ্রেণীর নিরেস জমিও কর্ষণাধীন হইবে। ফলে, শস্যের দাম আরও বাড়িয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া দেখা দিবে এবং খাজনা উদ্ভূত হইবে। ইতিমধ্যে প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা আরো বাড়িয়া যাইবে।

সুতরাং, খাজনার উদ্ভব হয় দুইটি কারণে:—(১) জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুণ নিরেস জমি কর্ষণাধীন হওয়ায় শস্যের উৎপাদন-খরচ এবং মূল্য বাড়িয়া যায়; (২) সরেস জমির যোগান স্বভাবতঃ সীমাবদ্ধ বলিয়া সরেস জমিতে কিছুকালের মধ্যেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হয়। এজন্য শস্যের উৎপাদন-খরচ ও মূল্য বাড়িয়া যায়।

খাজনার উদ্ভব হয় দুইটি কারণে

চ, ছ, জ হইল তিনখানি বিভিন্ন উৎকর্ষের জমি। উহাদের একই শ্রম ও মূলধন দিয়া চাষ করা হইল। চ জমিতে উৎপন্নের পরিমাণ হইল ১০০ মণ,



ছ জমিতে ৭৫ এবং জ জমিতে ৫০। সুতরাং চ-তে ৫০ মণ এবং ছ-তে ২৫ মণ খাজনা উদ্ভূত হইবে। জ-তে উৎপন্নের মূল্য ঠিক চাষের খরচের সমান হয় বলিয়া উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না; সুতরাং খাজনাও উদ্ভূত হয় না।

২। জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে সম্পর্ক: জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শস্যের চাহিদাও বাড়িয়া যায়। প্রকৃতির দেওয়া সরেস জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া সরেস জমিতে বেশী বেশী শস্য উৎপাদনের প্রচেষ্টার ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হয়। একই পরিমাণ শ্রম একই জমিতে ক্রমশঃ কম কম শস্য উৎপাদিত করিতে থাকে। নিরেস জমি কর্ষণাধীন করিলেও উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যায়। শস্য উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ শস্যের দামও বাড়িয়া যায়। যে ক্ষেত্রেই উৎপন্ন হউক না কেন শস্যের বাজার দাম একই হয় বলিয়া শস্যের যে অংশ অপেক্ষাকৃত কম প্রান্তিক খরচে সরেস জমিতে উৎপাদিত হয়, তাহা হইতে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা খাজনা পাওয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাজনারও বৃদ্ধির দিকেই ঝোঁক দেখা যায়।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাজনাও বৃদ্ধি পায়

ভূম্যধিকারীর অনুপার্জিত আয়

জনসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে, শস্যের দামও ততই বাড়িয়া যায় এবং সরেস জমির ভাগ্যবান মালিকও ততই ধনী হইতে থাকে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, খাজনা হইল অনুপার্জিত আয় (unearned increment)।

৩। **দাম এবং খাজনার মধ্যে সম্পর্ক :** খাজনা দামের অঙ্গীভূত হয় না (Rent does not enter into price)। দাম নিয়ন্ত্রিত হয় প্রান্তিক খরচের দ্বারা। চাষ করিয়া কেবলমাত্র চাষের খরচটুকু উশুল হয় এইরূপ জমিতে, অর্থাৎ কর্ষণাধীন সবচেয়ে নিরেস জমিতে, শস্য উৎপাদনের যে খরচ তাহাই মোট শস্য উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ। প্রান্তিক জমিতে—অর্থাৎ যে জমিতে শুধু চাষের খরচটুকু কোনমতে উঠে—কোন খাজনা দিতে হয় না। কাজেই, খাজনা দামের অঙ্গীভূত হয় না। শস্যের যোগান এবং চাহিদা অনুসারে প্রথমে বাজার দাম নিরূপিত হয় এবং তারপর খাজনার প্রশ্ন উঠে। সুতরাং, খাজনাই দামের উপর নির্ভরশীল, দাম খাজনার উপর নির্ভরশীল নয়।

খাজনা দামের অঙ্গীভূত হয় না

৪। **খাজনার পরিমাণ নিরূপিত হয় কি ভাবে?**—কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে বলিয়া দেওয়া যায়, কর্ষণাধীন জমির কোন্ অংশ হইতে খাজনা পাওয়া সম্ভব নয়। এই বিনা খাজনার (no-rent) জমিকেই প্রান্তিক জমি বলা হয়। বিনা খাজনার জমিতে কোনমতে চাষের খরচটুকু উঠে। সরেস জমি ও প্রান্তিক জমির মধ্যে উর্বরতা ও অবস্থান-মূল্যের যে তারতম্য তাহার দ্বারাই সরেস জমির খাজনা নিরূপিত হয়। সরেস জমি ও প্রান্তিক জমি দুই-ই যদি একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের সাহায্যে সুদক্ষভাবে কর্ষিত হয়, তাহা হইলে, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদিত শস্যের চেয়ে সরেস জমিতে যে পরিমাণ অতিরিক্ত শস্য উৎপাদিত হয় তাহাই খাজনার পরিমাপ।

উর্বরতা ও অবস্থান মূল্যের তারতম্য দ্বারাই ভাল জমির খাজনা নিরূপিত হয়

৫। **খাজনার প্রকৃতি :** রিকার্ডো বলেন, জমির মৌলিক এবং অবিনশ্বর উৎপাদিকা-শক্তি ব্যবহারের মূল্য হিসাবে খাজনা দেওয়া হয়। অনবরত ব্যবহারের ফলে জমির যে শক্তি ক্ষয় হয়, খাজনা তাহার দাম হিসাবে দেওয়া হয় না। জমির যে সব গুণ বা শক্তি মানুষের প্রচেষ্টা-প্রসূত তাহা জমি হিসাবে নয়, মূলধন হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। জমির উন্নতির দরুণ যাহা দিতে হয় তাহা সুদ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত।

খাজনা, মূলধন ও সুদের মধ্যে পার্থক্য

অবস্থান খাজনা (Site Rent) :

চাষের জমির খাজনা যে নীতিতে নিরূপিত হয়, বাড়ীঘরের অবস্থানের পক্ষে উপযুক্ত জমির খাজনাও সেই একই নীতিতে নিরূপিত হয়। প্রধানতঃ,

উর্বরতার তারতম্যের উপরেই চাষের জমির খাজনা নির্ভর করে। আর বাড়ীঘর তৈয়ারীর পক্ষে উপযুক্ত জমির খাজনা সম্পূর্ণরূপে অবস্থানের তারতম্য অনুসারেই নিরূপিত হয়। কোন কোন জমির অবস্থান অন্যান্য জমির অবস্থানের চেয়ে সুবিধাজনক। কাজেই, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে বলিয়া দেওয়া যায় যে বিশেষ ধরণের অবস্থানের দরুণ কোন জমি হইতে খাজনা পাওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থানযুক্ত জায়গায় বাড়ী তুলিলে মালিক ভাড়াটিয়াদের নিকট হইতে নিছক বাড়ীভাড়াটুকু পাইবে; অর্থাৎ এই বাড়ীভাড়া বাড়ী তৈয়ারীর জন্য যত টাকা মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করা হইয়াছিল তাহার সুদের সমান হইবে। কাজেই, এক্ষেত্রে বাড়ীভাড়া আদৌ অর্থনৈতিক খাজনা নয়; ইহা সুদ মাত্র। অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানের জায়গায় বাড়ী তুলিলে বাড়ীভাড়া বাবদ যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা তৈয়ারী করায় নিযুক্ত মূলধনের সুদের চেয়ে বেশী হইবে। এই উদ্বৃত্তই অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানের জমির খাজনা। কোন রায়ত বা ভাড়াটিয়া যদি এই জমি ব্যবহার করে, তাহা হইলে উদ্ভূত উদ্বৃত্তের সমস্তটুকুই জমির মালিককে দিতে হইবে।

অবস্থান খাজনা কি ভাবে নিরূপিত হয়

প্রশ্নোত্তর

1. Define economic rent. (C. U., 1930, 1943) (১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Explain Ricardo's theory of rent. What is the effect of the pressure of population on rent? (C. U., 1939, 1945, 1952)

(১৬৫-১৬৭ পৃষ্ঠা দেখ)

3. "The price paid for the use of land tends to approximate to the producer's surplus, *i.e.*, to the economic rent." Explain. (C. U., 1935, 1946)

(১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Discuss the origin and significance of rent. (C. U., 1953)

(১৬৫-১৬৯ পৃষ্ঠা দেখ)

একবিংশ অধ্যায়

সুদ

সুদ কাহাকে বলে ? (What is Interest ?)

অর্থবিদ্যায় মূলধন ব্যবহারের জন্য যে দাম তাহাকে সুদ বলে ; এবং মূলধন বলিতে বুঝায় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদকের দ্রব্য। ইহার ফলে কিছুটা গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ দেখা যায় যে একই দামে কেনা বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি বিভিন্ন হারে ভাড়া পাওয়া যায়। যাহাতে এইরূপ গোলমালের সৃষ্টি না হয় সেইজন্য আমরা সুদ সম্পর্কে মূলধন বলিতে বিনিয়োগযোগ্য টাকা-কড়িই বুঝিব, উৎপাদকের দ্রব্য নহে।

মোট সুদ এবং নীট সুদ (Gross Interest and Net Interest) :

কোন লোক আর একজনকে টাকা ধার দিলে, খাতক কেবল আসল শোধ দিতেই প্রতিশ্রুত হয় না, বৎসর পিছু আরো কিছু অতিরিক্ত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত থাকে। এই অতিরিক্ত টাকাই সুদ। যে আসল ধার দেওয়া হয়, তাহারই বাৎসরিক শতকরা হার হিসাবে সুদের হিসাব করা হয়।

খাতক ঋণদাতাকে চুক্তি অনুযায়ী যাহা দেয় তাহাকে মোট সুদ বলা হয়। অর্থবিদ্যায় অবশ্য সুদ বলিতে খাঁটি সুদ বা নীট সুদ বুঝায়। অর্থবিদ্যা মোট সুদ লইয়া কারবার করে না। (১) আসল ও সুদ আদায়ের হাঙ্গামা ও খরচের দরুণ বাড়্‌তি দেয় এবং (২) খাতকের মৃত্যু, দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা প্রভৃতি অনিশ্চয়তার ঝুঁকি লওয়ার দেয়—নীট সুদের মধ্যে ধরা হয়। আদায়পত্রের খরচ এবং ঝুঁকির জন্য দেয় বে-নীট সুদ হইতে বাদ দিলে নীট সুদ পাওয়া যায়।

সুদের হার নিরূপণ (Determination of the Rate of Interest) :

মূলধন ব্যবহারের দাম বাবদ যাহা দেওয়া হয় তাহাই সুদ। কাজেই দুইটি শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ইহা নিরূপিত হয় : (১) মূলধনের যোগান, এবং (২) মূলধনের চাহিদা।

সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নিরূপিত হয়

মূলধনের যোগানঃ মূলধনের যোগান মানেই সঞ্চয়ের পরিমাণ। লোকের সঞ্চয়ই খাতকদের কাছে ধার দেওয়া হয়। লোককে সঞ্চয় করিতে প্রলুব্ধ করার জন্য সুদ দেওয়া হয়। লোকে আয় করে অভাব মোচনের জন্য। ব্যয় এবং ভোগের মারফৎ বর্তমান অভাব দূর হয়। ভবিষ্যৎ অভাব মোচনের জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। কিন্তু খুব কম লোকই বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে সমান চোখে দেখে। অধিকাংশ লোকই ভবিষ্যৎ অভাবের চেয়ে বর্তমান অভাব মিটানোর প্রয়োজনীয়তা বেশী করিয়া অনুভব করে। কাজেই তাহাদের কাছে বর্তমান জিনিসের দাম ভবিষ্যৎ জিনিসের দামের চেয়ে বেশী। কাজেই ভবিষ্যতে অধিকতর পরিমাণে জিনিস পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে অধিকাংশ লোক বর্তমান জিনিস ভোগ মুলতুবী রাখিয়া সঞ্চয় করিতে চাহিবে না। ১০০৲ টাকার বর্তমান জিনিসের তুলনায় ভবিষ্যতে অতিরিক্ত যতখানি জিনিস দিতে খাতক রাজী তাহাই সুদ। আজ ১০০৲ টাকা লইয়া খাতক যদি এক বছর পরে ১০৫৲ টাকা দিতে রাজী থাকে, তাহা হইলে সুদের হার হইল ৫%। সঞ্চয়ের ফলে সঞ্চয়ীদের হাতে বর্তমান জিনিসের যোগান সঙ্কুচিত হয়। কাজেই সঞ্চয় যতই বাড়িতে থাকিবে ততই সঞ্চয়ীরা বর্তমান জিনিস ভোগের গুরুত্ব বেশী করিয়া উপলব্ধি করিবে। ফলে লোককে সঞ্চয় করিতে প্রলুব্ধ করার জন্য সুদের হারও ক্রমশঃ চড়াইতে হইবে। সুদের হার যত চড়া হইবে, ততই বেশী পরিমাণ টাকাকড়ি সঞ্চিত হইবে; আর সুদের হার যত কম হইবে, সঞ্চিত টাকাকড়িও পরিমাণে ততই কম হইবে।

সুদের হার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ

মূলধনের চাহিদাঃ নির্দিষ্ট সুদের হার চালু থাকিলে ঋণপ্রার্থীদের বর্তমানে যে পরিমাণ জিনিসপত্রের চাহিদা থাকে, তাহাই মূলধনের চাহিদা। ব্যবসায়ীরা ধার করিয়া যে মূলধন সংগ্রহ করে তাহা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। তাহাদের ব্যবসায়ে অধিকতর মূলধন ব্যবহৃত হইলে অধিকতর উৎপাদন বা আয় সৃষ্ট হয়। যদি কোন ব্যবসায়ী ১০০০৲ টাকা মূলধন নিয়োজিত করিয়া বার্ষিক ৫০৲ টাকা আয় লাভ করে এবং ১১০০৲ টাকা মূলধন নিয়োজিত করিয়া এই আয়কে বার্ষিক ৫৫৲ টাকায় উন্নীত করে, তাহা হইলে নিয়োজিত মূলধনের শেষ ১০০৲ টাকা হইতে প্রাপ্ত আয় হইল বার্ষিক ৫৲ টাকা। ইহাই ১১০০৲ টাকা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন। ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ আরও বাড়াইলে, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের

বিধির ক্রিয়ার দরুণ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কমিয়া যায়। ১৫০০৲ টাকা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা যদি বার্ষিক ৩৲ টাকা হয়, তাহা হইলে ঋণপ্রার্থীদের কাছে সেই পরিমাণ মূলধনেরই চাহিদা হইবে, যাহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা প্রচলিত সুদের হারের সমান। সুদের হার যত বেশী চড়া হইবে, মূলধনের চাহিদা ততই কম হইবে; আর সুদের হার যত কম হইবে মূলধনের চাহিদা ততই বেশী হইবে।

সুদের হার ও মূলধনের চাহিদা

কোন নির্দিষ্ট সুদের হারে মূলধনের চাহিদা যদি যোগানের চেয়ে বেশী হয় তাহা হইলে সুদের হার বাড়িয়া যাইবে; ফলে, যতক্ষণ চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান না হয়, ততক্ষণ চাহিদা কমিতে থাকিবে এবং যোগান বাড়িতে থাকিবে। আর মূলধনের যোগান যদি চাহিদার চেয়ে বেশী হয়, তাহা হইলে সুদের হার কমিয়া যাইবে; ফলে যতক্ষণ চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান না হয় ততক্ষণ চাহিদা বাড়িতে থাকিবে এবং যোগান কমিতে থাকিবে। ভারসাম্য অবস্থায় সুদের হার এমন হয় যাহাতে মূলধনের চাহিদা ইহার যোগানের সমান হয়।

ভারসাম্য অবস্থায় সুদের হার এমন হয় যাহাতে মূলধনের চাহিদা ইহার যোগানের সমান হয়

সুদের হারের তারতম্য (Differences in Rates of Interest):

চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে একই সময়ে একই জায়গায় একই ধরণের ঋণের সুদের হার একই রকম হয়। কিন্তু ঋণেরও শ্রেণীভেদ আছে। প্রত্যেক রকমের ঋণ বা ধারের জন্য বাজার আলাদা এবং সুদের হারও আলাদা। ঋণের বিভিন্নতার জন্যই সুদের হারেও তারতম্য দেখা দেয়। ইহার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী :—

সকল প্রকারের ঋণের সুদের হার এক নয়

(১) ঋণের স্থায়িত্ব: যে সময়ের জন্য ধার দেওয়া হয় তাহা যত দীর্ঘ হইবে সুদের হারও ততই বেশী হইবে। আর ধারের সময় যত কম হইবে, সুদের হারও সাধারণতঃ ততই কম হইবে।

সুদের হারের পার্থক্যের কারণ: ১। ঋণের স্থায়িত্ব

(২) আনুষঙ্গিক ঝুঁকি: খাতক ধার শোধ দিতে অসমর্থ হইলে আসল মারা যাইবে। দারিদ্র্য, ব্যয়বাহুল্য, অসাধুতা প্রভৃতি নানা কারণেই খাতক টাকা শোধ দিতে অসমর্থ হইতে পারে। কখনো কখনো ধার করার সময়ে খাতককে জামিন বা বন্ধক দিতে হয়। সে ক্ষেত্রে ধারের নিরাপত্তা জামিনের মূল্যের উপর নির্ভরশীল। ঝুঁকি যত বেশী হইবে সুদের হারও ততই বেশী হইবে। আর আনুষঙ্গিক ঝুঁকি যত কম হইবে সুদের হার ততই কম হইবে। সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রে সরকারকে ধার দেওয়ার ঝুঁকি নাই বলিলেই চলে। ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হইতে অল্প সময়ের জন্য যে ধার লয় তাহা বেশ নিরাপদ জামিনের ভিত্তিতে লইতে হয়। কাজেই সরকারী বণ্ডের এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হইতে লওয়া ধারের সুদ খুব কম হয়। কৃষকদের কাছে সাধারণতঃ খুব চড়া সুদে ধার দেওয়া হয়, কারণ এই ধার দীর্ঘদিনের জন্য দিতে হয় এবং ইহার ঝুঁকিও বেশী।

২। আনুষঙ্গিক ঝুঁকি

(৩) আদায়ের হাঙ্গামা: সুদ এবং আসল আদায় করার জন্য কিছুটা খাটিতে এবং হাঙ্গামা পোহাইতে হয়। আদায়ের পরিশ্রম এবং হাঙ্গামা বেশী হইলে সুদের হার স্বভাবতঃই চড়া হইবে। কৃষককে দেওয়া ধারের বেলায় আদায়ের পরিশ্রম ও হাঙ্গামা বেশী বলিয়াই সুদের হার বেশী।

৩। আদায়ের হাঙ্গামা

প্রশ্নোত্তর

1. What is interest? Distinguish between gross interest and net interest. (C. U., 1941, 1951) (১৭০ পৃষ্ঠা দেখ)

2. How is interest determined? (C. U., 1941, 1942, 1950)
(১৭০-১৭২ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Account for the fact that while the Govt. of India is able to borrow at 3 p.c. the peasant of the rural areas has to pay much higher rates of interest. (C. U., 1942)

[**উত্তরের কাঠামো:** সরকারের ধার শোধের ক্ষমতার উপর পাওনাদারের আস্থা থাকে বলিয়াই সরকার ৩% সুদে ধার পায়। এইরূপ ধার দেওয়ার ঝুঁকি নাই বলিলেই চলে। উপরন্তু, সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া সুদ আদায় করিতে মোটেই কষ্ট করিতে বা হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না।

ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌ এবং ট্রাষ্টিরা আইন এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সরকারী ঋণপত্রে টাকা খাটাইতে বাধ্য হয়। কাজেই সরকারী ঋণপত্রের বিনিয়োগের বেলায় সঞ্চিত

টাকাকড়ির যোগান প্রচুর। তাহা ছাড়া সরকার ইচ্ছা করিলেই টাকাকড়ির যোগান পরিমাণে বাড়াইয়া দিতে পারে; ফলে সরকারী ঋণপত্রের সুদের হার কমিয়া যায়।

গ্রামের কৃষকদের মূলধনের চাহিদা প্রচুর, কিন্তু তাহাদের জন্য মূলধনের যোগান সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ, একমাত্র গ্রাম্য মহাজনের কাছেই সে ধার পাইতে পারে। কৃষকেরা দরিদ্র, তাহা ছাড়া কৃষিজাত জিনিসের দামও খুব দ্রুত উঠানামা করে। সেজন্য কৃষকদের ধার দেওয়া মানেই বেশী পরিমাণে ঝুঁকি বহন করা। সমবায় সমিতি, মর্টগেজ ব্যাঙ্ক প্রভৃতির মারফৎ মূলধনের যোগান বাড়াইয়া দিলে কৃষকদের পক্ষে অল্প সুদে ধার পাওয়া সম্ভব হইবে। কৃষকের মিতব্যয় এবং সততাও সুদের হার কমাইতে সাহায্য করিবে।]

4. Account for the variations in the rates of interests borne by different types of loans. (C. U., 1951) (১৭০-১৭২ পৃষ্ঠা দেখ)

5. How do you account for the high rates of interests charged by village money lenders as compared to the rates charged by the city banks in India? (C. U., 1950)

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** গ্রাম্য মহাজনেরা সাধারণতঃ কৃষকশ্রেণীকে ধার দেয়। কৃষকশ্রেণীকে ধার দেওয়ায় অনেক ঝুঁকি ও হাঙ্গামা আছে। প্রথমতঃ, তাহারা কোনরূপ বন্ধক ইত্যাদি দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আসল ও সুদের টাকা আদায় ফসলের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তৃতীয়তঃ, কৃষকদের নিকট হইতে টাকা আদায় করার অনেক হাঙ্গামা আছে। অপরদিকে, শহরের ব্যাঙ্কগুলি জামিন বা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেয়। জামিন বা বন্ধক থাকার জন্য টাকা আদায় করিতে বিশেষ হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। উপরন্তু, ব্যাঙ্কগুলি যে শ্রেণীকে টাকা ধার দেয় তাহাদের আয় কৃষকদের ন্যায় অনিশ্চিত নয়। এই সকল কারণে গ্রাম্য মহাজন যে হারে টাকা ধার দেয় তাহা শহরের ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার অপেক্ষা অনেক বেশী।]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আর্থিক মজুরী ও আসল মজুরী (Money wages and Real wages) ঃ

নিয়োগকর্তা শ্রমিককে তাহার শ্রমের বিনিময়ে দিন, সপ্তাহ বা মাসশেষে কিছু টাকা দেয়। ইহাই হইল শ্রমিকের আর্থিক মজুরী। অন্যভাবে বলিতে

গেলে, নির্দিষ্টকাল শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে অর্থ বা টাকাকড়ি পায় তাহাই হইল তাহার আর্থিক মজুরী। এই টাকা দিয়া শ্রমিক তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনে। এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই হইল শ্রমের আসল মজুরী। অতএব, আসল মজুরী হইল সেই সকল প্রয়োজনীয়, আরামপ্রদ ও বিলাস-সামগ্রী যাহা শ্রমিক তাহার আর্থিক মজুরীর বিনিময়ে কিনিতে পারে।

আর্থিক মজুরী ও আসল মজুরী

শ্রমিকের আসল মজুরী বা প্রকৃত আয় স্থির করিতে হইলে কেবলমাত্র তাহার আর্থিক মজুরী জানিলে চলিবে না, আরও কয়েকটি বিষয় জানা প্রয়োজন। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে তাহার কাজ স্থায়ী না অস্থায়ী, নিয়মিত না অনিয়মিত। স্থায়ী বা নিয়মিত কাজে আর্থিক মজুরী কম হইলেও মোট মজুরী বেশী হইতে পারে। মোট মজুরী বেশী হইলে আসল মজুরীও বেশী হইবে।

আসল মজুরী নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে

দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে যে কাজে উপরি আয়ের সম্ভাবনা এবং অন্যান্য সুবিধা আছে কিনা। উপরি আয় ও অন্যান্য সুবিধা থাকিলে শ্রমিকের ভোগ্য জিনিসের পরিমাণ বাড়িবে। সুতরাং আসল মজুরীও বাড়িবে। একজন সওদাগরী আফিসের টাইপিষ্ট উপরি সময় বা অন্যত্র খাটিয়া অধিক উপার্জন করিতে পারে। সুতরাং তাহার আসল মজুরী নির্ধারণ করিবার সময় ইহাও হিসাবে ধরিতে হইবে। শ্রমিকেরা অনেক সময় অল্পমূল্যে রেশন পায়; রেল কর্মচারীরা রেলের পাশ পায়; অনেক চাকুরীতে বিনা বা অল্প ভাড়ায় বাসস্থান দেওয়া হয়। এই সুবিধাগুলি হিসাবে ধরিয়াই আসল মজুরী নির্ধারণ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, আসল মজুরী মূল্য-স্তরের উপর নির্ভর করে। আর্থিক মজুরী অপরিবর্তিত থাকিতে পারে, কিন্তু মূল্য-স্তরের পরিবর্তনের জন্য আসল মজুরী কমিতে বা বাড়িতে পারে। জিনিসপত্রের দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে আর্থিক মজুরী অপরিবর্তিত থাকিলে আসল মজুরী কমিবে; জিনিসপত্রের দাম যদি কমিয়া যায় তবে আর্থিক মজুরী অপরিবর্তিত থাকিলে আসল মজুরী বাড়িবে।

আর্থিক মজুরী অপরিবর্তিত থাকিলেও মূল্য-স্তরের পরিবর্তনের ফলে আসল মজুরী পরিবর্তিত হইতে পারে

শ্রমিককে উপযুক্ত মজুরী দেওয়া হইতেছে কিনা—তাহা তাহার আর্থিক মজুরীর উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আসল মজুরীর উপর। জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইলে শ্রমিকের আসল মজুরী কমিয়া যায়। এই জন্যই মাগ্‌গি ভাতা দেওয়া হয়।

শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরী

মজুরীর হার নিরূপণ (Determination of the rate of wages) ঃ

ধরা যাউক, শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট এবং গুণের বিচারে সকল শ্রমিক একই পর্যায়ে পড়ে। সমানগুণবিশিষ্ট ১০০০ শ্রমিক থাকিলে সকলকেই কাজে নিয়োজিত করার মত মজুরীর হার কি হইবে? ইহাই সমস্যা। সকলকে যদি একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সংগঠককে নিম্নরূপ হিসাব করিতে হইবে ঃ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়ার দরুণ যতই বেশী সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োজিত হইবে ততই শেষ শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত অতিরিক্ত উৎপাদন কমিয়া যাইবে। ব্যবসায়ী অতিরিক্ত একজন শ্রমিককে নিযুক্ত করিয়া অতিরিক্ত যে উৎপাদন লাভ করে তাহাকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয়। ৯৯৯ জন শ্রমিক লইয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত ব্যবসায়ীর সম্মুখে যখন এই সমস্যা উপস্থিত হয় যে, অতিরিক্ত আর একজন শ্রমিকের নিয়োগ লাভজনক হইবে কিনা, তখন সমস্যার সমাধানের জন্য তাহাকে নির্ণয় করিতে হইবে—১০০০-তম শ্রমিকটির জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন কতখানি হইতে পারে। ১০০০ জনের মোট উৎপাদন হইতে ৯৯৯ জনের মোট উৎপাদন বাদ দিলেই ১০০০-তম শ্রমিকের উৎপাদন পাওয়া যাইবে। এইভাবে নির্ণীত প্রান্তিক উৎপাদন যদি ৩০৲ টাকা হয় এবং মজুরীও যদি ৩০৲ টাকার বেশী না হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ী ১০০০ জন শ্রমিকই নিয়োজিত করিবে। মজুরী ৩০৲ টাকার বেশী হইলে ১০০০-তম শ্রমিকটিকে সে নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

মজুরী সম্বন্ধে প্রান্তিক উৎপাদন-তত্ত্ব

শ্রমিকদের নিয়োগকর্তার সংখ্যা অনেক। প্রত্যেকেই তাহার নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হারে মজুরী দেয়। কোন একটি শিল্পের যদি অন্য আর একটি শিল্প হইতে মজুরী বেশী হয়, তাহা হইলে শ্রমিকেরা কম মজুরীর শিল্প হইতে চলিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী মজুরীর

সকল শিল্পে মজুরীর হারের একই হইবার দিকে ঝোঁক

শিল্পে কাজ করিতে চাহিবে। এইভাবে মজুরীর হার বিভিন্ন শিল্পে সমতালাভের চেষ্টা করে। প্রত্যেক শিল্পের মজুরীর হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে।

যদি কোন কোন শ্রমিক অন্যান্যদের তুলনায় বেশী দক্ষ হয়, তাহা হইলে তাহারা অবশ্য দক্ষতার অনুপাতেই বেশী মজুরী পাইবে।

জীবনযাত্রার ব্যয় এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কীয় তত্ত্ব (Cost of Living and Standard of Living Theories) :

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণের মতে, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বা জীবনযাত্রার মানের সমান হওয়ার দিকেই মজুরীর ঝোঁক। জীবনধারণের ব্যয়ের চেয়ে মজুরী যদি বেশী হয়, তাহা হইলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়িয়া যাইবে; ফলে মজুরীও কমিতে থাকিবে—যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা জীবনধারণের ব্যয়ের সমান হয়। আর মজুরী যদি জীবনধারণের ব্যয়ের চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে জনসংখ্যা কমিয়া যাইবে, শ্রমের যোগানও কমিয়া যাইবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরী জীবনধারণের ব্যয়ের সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা বাড়িয়াই চলিবে। কিন্তু মজুরী যে কোনমতে জীবনধারণ করার উপযুক্ত ব্যয়ের সমান হইবে, তাহা নয়। শ্রমিকেরা যদি জীবনযাত্রার কোন নির্দিষ্ট মানে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহারা এমন কোন মজুরীতে কাজ করিতে রাজী হইবে না, যাহার ফলে তাহাদের জীবনযাত্রার মান নীচু হইয়া পড়িতে বাধ্য। এরূপ ক্ষেত্রে মজুরী জীবনযাত্রার মানের সমান হইবে এবং জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান এমন হইবে যাহাতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন জীবনযাত্রার মানের সমান হয়। সুতরাং, আমরা বলিতে পারি যে ভারসাম্য অবস্থায় মজুরীর হার একদিকে জীবনযাত্রার মান এবং অন্যদিকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে। এইরূপ মজুরীর হার চালু থাকিলে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগানও পরস্পরের সমান হইবে।

পুরাতন তত্ত্ব: শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সমান হওয়ার দিকেই মজুরীর ঝোঁক

মজুরীর পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যা কতখানি পরিবর্তিত হয় তাহা অবশ্য সঠিক জানা যায় না। মজুরীর হার বাড়িলে জনসংখ্যা না বাড়িয়া জীবনযাত্রার মানই হয়ত বাড়িয়া যায়। জীবনযাত্রার মান হইল মজুরীর নিম্নতম সীমারেখা; ইহার চেয়ে কম মজুরী লইতে শ্রমিকেরা অস্বীকার করিবে। আর শ্রমের

প্রান্তিক উৎপাদন হইল মজুরীর উচ্চতম সীমারেখা; ইহার চেয়ে বেশী মজুরী কোন মালিকই দিতে রাজী হইবে না। প্রচলিত মজুরীর হার এই দুই সীমারেখার মধ্যে উঠানামা করে। মালিক ও মজুরদের দরকষাকষির মারফৎ মজুরীর হার নির্ধারিত হয়।

মজুরীর হারের তারতম্য (Differences in wages):

শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা থাকিলে, শিল্পক্ষেত্রের সর্বত্র সকল শ্রমিকের মজুরীর হার সমান হওয়ার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। যদি কোন একটি বিশেষ শিল্পে অন্য শিল্পের তুলনায় মজুরীর হার বেশী হয় তাহা হইলে শ্রমিকেরা অন্যান্য শিল্পে কাজ করা ছাড়িয়া দিয়া ঐ শিল্পে ভিড় করিবে। শ্রমের গতিশীলতা (mobility of labour) বিভিন্ন শিল্পে মজুরীর হারে সমতা আনয়ন করে। কিন্তু যখন দুইটি শিল্পের মধ্যে শ্রমের অবাধ চলাচল চালু আছে, তখনও নিম্নলিখিত কারণে মজুরীর তারতম্য হয়:

মজুরীর হারের তারতম্যের কারণ

(১) প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর কাজ: কাজ যতই অপ্রীতিকর হইবে মজুরী ততই বেশী হইবে, কারণ তাহা না হইলে লোকে অপ্রীতিকর কাজ করিতে রাজী হইবে না। ঘাতক ও মেথরের কাজ খুবই অপ্রীতিকর; সেইজন্য তাহার কাজের তুলনায় পারিশ্রমিক অত্যন্ত বেশী।

(২) সহজ বা কঠিন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা: যে কাজ সহজে শেখা যায় তাহার মজুরী, যে কাজ শেখা বিশেষ কঠিন তাহার অপেক্ষা কম হইবে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির বেলায় দীর্ঘ সময়ব্যাপী ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং সাধারণ কেরাণীর অপেক্ষা তাহাদের পারিশ্রমিক বেশী হইবে।

(৩) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা: যে কাজ স্থায়ী এবং যাহাতে নিশ্চয়তা আছে তাহার মজুরী অস্থায়ী ও অনিশ্চিত কাজের মজুরী অপেক্ষা কম হইবে। রাজমিস্ত্রীর মজুরী, কারখানার সাধারণ দক্ষ শ্রমিকের অপেক্ষা অধিক, কারণ রাজমিস্ত্রীকে বৎসরে অনেকদিন বসিয়া থাকিতে হয় এবং কবে সে কাজ পাইবে বা কাজ কতদিন চলিবে তাহা সে জানে না। কাজ অনিয়মিত হইলে মজুরী বেশী হইবেই।

(৪) দায়িত্বশীল বা দায়িত্বশূন্য কাজ: কাজে যতই দায়িত্ব থাকিবে

মজুরী ততই বেশী হইবে। কাজে কোন দায়িত্ব না থাকিলে মজুরী কম হইবে। স্বর্ণকার প্রভৃতির পারিশ্রমিক বেশী, কারণ স্বর্ণকারের কাজে বিশেষ দায়িত্ব আছে।

(৫) সফলতার সম্ভাবনা: যে কাজে সফলতার সম্ভাবনা বিশেষ কম তাহাতে মজুরী বেশী হইবেই। আইন ব্যবসায়ে অতি অল্প লোকই সফলতা লাভ করে। যাহারা সফল হয় তাহাদের পারিশ্রমিক বিশেষ অধিক।

আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে শ্রম বিশেষ ভাবে গতিশীল। অর্থাৎ লোকে ইচ্ছা করিলে একটি কাজ ছাড়িয়া আর একটি কাজ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। বিভিন্ন শিল্প ও কাজের মধ্যে শ্রমের অবাধ চলাচল নাই। ইহার কারণ অনেকগুলি। সকলে উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না। সকলে কাজ জোগাড় করিবার জন্য স্থানান্তরেও যাইতে পারে না। ধনবান পিতার পুত্র উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া বেশী বেতন পাইতে পারে, কিন্তু দরিদ্রের পুত্রকে সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া অল্প বেতনেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। শিক্ষালাভের সুযোগ অধিকাংশ লোকের নাই বলিয়া বুদ্ধিজীবী শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং দৈহিক পরিশ্রমী শ্রমিকের সংখ্যা বিশেষ অধিক। এইজন্যই বুদ্ধিজীবী শ্রমিকের মজুরী বেশী এবং দৈহিক পরিশ্রমী শ্রমিকের মজুরী অপেক্ষাকৃত কম।

শ্রমিক সংঘ এবং মজুরী (Trade Unions and wages):

ট্রেড ইউনিয়নকে বাঙ্গালায় শ্রমিক সংঘ বলা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল যৌথ প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা। শ্রমিকেরা সংখ্যায় অনেক এবং সকলেই দরিদ্র। তাহাদিগকে জমির, কারখানার ও খনির মালিকদের উপর নিয়োগের জন্য নির্ভর করিতে হয়। প্রত্যেক শ্রমিক যদি সকলের সঙ্গে না মিলিয়া নিজের ইচ্ছামত চলে তাহা হইলে নিয়োগকর্তা বরখাস্ত করিবার ভয় দেখাইয়া সকল শ্রমিককেই কম মজুরী লইতে বাধ্য করিতে পারিবে। শ্রমিকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে সব শ্রমিককেই কম মজুরী লইতে হইবে। ফলে মজুরীর সাধারণ হার কমিয়া যাইবে। ইউনিয়ন গঠিত হইলে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয়। সকল শ্রমিকের প্রতিনিধি হিসাবে সংঘ নিয়োগকর্তার সঙ্গে যৌথ বা সামগ্রিক দরাদরি (collective bargaining) করে। শ্রমিকেরা বিচ্ছিন্নভাবে সকলেই দরিদ্র, দুর্বল এবং

শ্রমিক সংঘ কাহাকে বলে

নিঃসহায়। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইলে ইহারা যৌথ দরাদরি করিবার সুযোগ পায় এবং ইহাদের দরকষাকষির সামর্থ্য বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী

ট্রেড ইউনিয়নের মারফৎ যৌথ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য অনেক: (১) অধিক মজুরী এবং উপযুক্ত মাগ্‌গি ভাতা লাভ করা; (২) পরিশ্রমের সময় কমানো; (৩) কারখানায় কাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি করা; (৪) শ্রমিকের শ্রম-লাঘবকারী নূতন যন্ত্র বা নূতন প্রক্রিয়া প্রচলিত করার জন্য আন্দোলন করা; (৫) শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে শাস্তিদান ও বরখাস্ত করা বন্ধ করা; (৬) সরকারের উপর চাপ দিয়া কারখানা আইন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, নিম্নতম মজুরী আইন প্রভৃতি শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি বিধায়ক নানাবিধ আইন পাশ করানো; (৭) শ্রমিকদের শিক্ষিত করিয়া তোলা; (৮) ধর্মঘটের সময় আর্থিক সাহায্য দেওয়া এবং বেকার অবস্থায় ও অসুস্থতার সময়ে ভাতা দেওয়া, ইত্যাদি।

শ্রমিক সংঘের হাতিয়ার

যৌথ বা সামগ্রিক দরাদরির সাফল্যের জন্য শ্রমিক সংঘ নিম্নলিখিত হাতিয়ার-গুলির উপর নির্ভরশীল: (১) সুকৌশলে কথাবার্তা চালানো (skilful negotiation); (২) জনমতের উপর আস্থা স্থাপন; (৩) সরকার বা যথোচিতভাবে সংগঠিত কমিটির চেষ্টায় আপোষ (conciliation); (৪) সালিশী (arbitration) এবং (৫) ধর্মঘট (strike)। ধর্মঘট হইল শ্রমিকদের শেষ অস্ত্র। ধর্মঘট মানে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা।

যদিও মজুরীর ঝোঁক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সঙ্গে সমান হওয়ার দিকে, তাহা হইলেও মালিকেরা সব সময়েই শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের পূর্ণ মূল্যের চেয়ে কম মজুরী দেওয়ার চেষ্টা করে। দরিদ্র ও বিচ্ছিন্ন শ্রমিকেরা শ্রমের বাজারে একাকী চেষ্টা করিয়া তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের পূর্ণ মূল্য মজুরী হিসাবে আদায় করিতে পারে না। সেইজন্যই ট্রেড ইউনিয়নের মারফৎ যৌথ বা সামগ্রিক দরাদরির এত প্রয়োজন। একমাত্র যৌথ দরাদরির মারফৎই মজুরীকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের পূর্ণ মূল্যের সমান করা সম্ভব। তাহা ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের কর্মদক্ষতাও বাড়াইয়া দেয়। ফলে, শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িয়া যায় এবং মজুরীর আয়ও বাড়িয়া যাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্ট হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between money wages and real wages. Indicate the main factors which determine real wages in a country. (C. U., 1936, 1947)
(১৭৪-১৭৭ পৃষ্ঠা দেখ)

2. "The labourer is rich or poor, is well or ill rewarded in proportion to the real, not the nominal wages of his labour." Elucidate the statement. (C. U., 1940) (১৭৪-১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Show how the real wages are determined. (C. U., 1940)
(১৭৫-১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Explain why there are differences in wage rates between different occupations. (C. U., 1937) (১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠা দেখ)

5. What is a trade union ? What are its aims and methods ? How do trade unions influence wages ? (C. U., 1933, 1934) (১৭৯-১৮০ পৃষ্ঠা দেখ)

6. Examine the effect of an increase of population on (a) wages and (b) rent of land. (C. U., 1952)

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। শ্রমের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকিলে, যোগানবৃদ্ধির ফলে মজুরী কমিয়া যায়। শ্রমের চাহিদা কিন্তু অপরিবর্তিত না-ও থাকিতে পারে। শ্রমের চাহিদা বাড়িবে কিনা, তাহা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। দেশে মূলধন নিয়োগের হার যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়াইয়া যায় তবে মজুরী না কমিয়া বাড়িতেই থাকিবে। মজুরী অবশ্য অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া বাড়িতে পারে না। জনসংখ্যা এক সময় না এক সময় 'কাম্য' সীমা অতিক্রম করিবে। তখন হইতে মজুরী কমিতেই থাকিবে।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের জন্য ১৬৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মুনাফা

মুনাফার প্রকৃতি (Nature of Profit) ঃ

Entrepreneur বা সংগঠক উৎপাদনক্ষেত্রে পরিচালনা ও ঝুঁকিবহন—এই দ্বিবিধ কাজের জন্য যে পুরস্কার পায় তাহাকেই মুনাফা বলা হয়। ভূমি, শ্রম এবং মূলধন—এই তিনটি উপাদানের প্রাপ্য চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে। উদ্যোক্তা বা সংগঠক বাঁধাধরা হারে খাজনা, মজুরী ও সুদ মিটাইয়া দিতে চুক্তিবদ্ধ থাকে। কাজেই এই সব আয়ের পরিমাণ

মুনাফার বৈশিষ্ট্য ঃ
১। ইহা কখনও চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে না

বাঁধাধরা। কিন্তু উদ্যোক্তার কোন বাঁধাধরা আয় নাই। উৎপাদিত জিনিসের মূল্য হইতে তাহাকে খাজনা, মজুরী, সুদ ও অন্যান্য উৎপাদন-খরচ চুকাইয়া দিতে হয়। তারপর বাদবাকী যাহা থাকে তাহাই মুনাফা। মুনাফার পরিমাণ ব্যবসায়ের সাধারণ অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোন কোন বৎসরে প্রচুর মুনাফা থাকে, কোন বৎসরে লোকসান হয়। কিন্তু কয়েক বৎসরের হিসাব একত্র করিয়া দেখিলে দেখা যায়, উদ্যোগী সংগঠকের কিছু না কিছু মুনাফা থাকেই ; তাহা না হইলে সে ব্যবসায় বন্ধই করিয়া দিত।

২। মুনাফা শূন্যও হইতে পারে ; লোকসানও হইতে পারে

৩। মুনাফার হারের ভীষণ পরিবর্তন হয়

মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা (Gross Profit and Net Profit) :

উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে খাজনা, মজুরী ও সুদ দেওয়ার পর উদ্যোক্তার হাতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইল মোট মুনাফা। উদ্যোক্তা বা সংগঠক যদি নিজের জমি ও মূলধন নিয়োগ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার মোট মুনাফার মধ্যে এই জমির খাজনা ও এই মূলধনের সুদ আছে। এই খাজনা ও সুদ মোট মুনাফা হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই প্রকৃত ও নীট মুনাফা।

মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা

মুনাফার উপাদানসমূহ (Elements of Profit) :

উদ্যোগী সংগঠকের নীট মুনাফা নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সমষ্টি :

(১) **পরিচালনার দরুণ প্রাপ্য :** পরিচালনার কাজের জন্য অর্থাৎ পরিশ্রম করিয়া দেখা-শোনা করার জন্য উদ্যোক্তা একটা নির্দিষ্ট আয় আশা করে। বেতনভুক্ ম্যানেজার হিসাবে অন্যত্র কাজ করিলে তাহার যে প্রাপ্তি হইত অন্ততঃ সেইটুকু সে এক্ষেত্রেও আশা করে। এই আয়কেই পরিচালনার মজুরী বা পরিচালনার দরুণ প্রাপ্য বলা হয়।

(২) **ঝুঁকিবহনের পুরস্কার :** উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি ও নানা অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়। সেইজন্য পরিচালনার মজুরী ছাড়াও সে আরও কিছু পাওয়ার আশা রাখে। এই অতিরিক্ত পুরস্কার হইল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের ক্ষতিপূরণ।

(৩) **একচেটিয়া কারবারের লাভ :** উদ্যোক্তার ব্যবসায় যদি আংশিকভাবে

বা সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া হয় তাহা হইলে সে পরিচালনা ও ঝুঁকি বহনের দরুণ প্রাপ্যের উপরেও অতিরিক্ত একচেটিয়া মুনাফা রাখে।

(৪) আকস্মিক লাভঃ কখনো কখনো আকস্মিক কারণে উদ্যোক্তার আশাতিরিক্ত মুনাফা থাকিয়া যায়।

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit):

স্থায়ী অর্থনৈতিক পরিবেশে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উদ্যোক্তা যে মুনাফা আশা করে তাহাকেই স্বাভাবিক (normal) মুনাফা বলা হয়। অতএব, একচেটিয়া কারবারের দরুণ অতিরিক্ত লাভ কিংবা আকস্মিক অতিরিক্ত লাভ স্বাভাবিক মুনাফার অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বাভাবিক মুনাফার শুধু দুইটি উপাদান আছেঃ (১) পরিচালনার দরুণ প্রাপ্য, এবং (২) ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হিসাব করার সময় উদ্যোক্তা বা সংগঠকের নিজস্ব মূলধনের উপর প্রাপ্য সুদও স্বাভাবিক মুনাফার মধ্যে ধরা হয়। যে কারবার হইতে স্বাভাবিক মুনাফা পর্যন্ত পাওয়া যায় না, তাহা বেশীদিন চলিতে পারে না। কাজেই, উৎপন্ন জিনিসের বাজার দাম এমন হইতে হইবে যাহাতে শুধু যে খাজনা, মজুরী ও সুদ মিটানো যায় তাহাই নয়, স্বাভাবিক মুনাফাও পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক মুনাফা কাহাকে বলে

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the different elements in profit. (C. U., 1943)

(১৮২-১৮৩ পৃষ্ঠা দেখ)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

জাতীয় অর্থব্যবস্থা

জাতীয় অর্থব্যবস্থা বিজ্ঞান (Science of Public Finance):

জাতীয় অর্থব্যবস্থা (Public Finance) রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য বহুবিধ—দেশরক্ষা, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, শিক্ষা বিস্তার, বেকার সমস্যার সমাধান, বৃদ্ধ ও অপারক ইত্যাদির তত্ত্বাবধান প্রভৃতি।

আধুনিক রাষ্ট্রের কাজের পরিধি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য রাষ্ট্রের আয় থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আয়ের পরিমাণ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা আয় অনুযায়ী ব্যয়ের ব্যবস্থা করি, কিন্তু রাষ্ট্র ব্যয় অনুযায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্রের আয়কে রাজস্ব বলা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল, ব্যয় আয়ের উপর নির্ভরশীল নহে

রাজস্বের উৎস (Sources of Revenue) :

বিভিন্ন সূত্র হইতে রাষ্ট্রের আয় বা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ইহা সাধারণ ব্যবসায়ীর মতই কোন ব্যবসায় চালাইয়া জিনিস ও সেবামূলক কাজের দাম বাবদ টাকা লইতে পারে। রাষ্ট্র জিনিসের বা সেবামূলক কাজের দাম হিসাবে যাহা গ্রহণ করে তাহাকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (non-tax revenue) বলা হয়। জলসেচের খাল, রেলপথ, ডাকঘর ও রক্ষিত বন হইতে সরকারের যে আয় হয় তাহা এই পর্যায়ে পড়ে।

কর-সাপেক্ষ ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব

কিন্তু রাষ্ট্রীয় আয়ের সবচেয়ে বড় অংশ পাওয়া যায় নির্ধারিত কর হইতে। আমরা একটি পোষ্টকার্ড কিনিলে রাষ্ট্রের কিছু আয় হইতে পারে, কিন্তু পোষ্টকার্ড কিনিতে আমরা বাধ্য নই। কাজেই, নির্দিষ্ট দামে পোষ্টকার্ড কেনা না কেনা সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাধীন ব্যাপার, কিন্তু কর (tax) বাধ্যতামূলক ; ইহা দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বিক্রয়-কর চালু থাকিলে, জিনিস কিনিতে হইলেই এই কর দিতে হইবে। আয়-কর প্রবর্তিত থাকিলে একটি নির্দিষ্ট আয়ের বেশী হইলেই আয়-কর দিতে হইবে। আবার, পোষ্টকার্ডের দাম দেওয়া হয় রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পাদিত বিশেষ একটি কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে। কাজেই, যতটুকু কাজ বা সুবিধা পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে দামের আনুপাতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু বিক্রয়-কর দেওয়ার সময়ে রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পাদিত বিশেষ একটি কাজের দাম হিসাবে ইহা দেওয়া হয় না।

কর কাহাকে বলে ?

সুতরাং রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট সুবিধা বা কল্যাণ বা কাজের সঙ্গে দেয় করের কোন আনুপাতিক সম্বন্ধ নাই। রাষ্ট্রের সাধারণ প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির

করের সংজ্ঞা

বা সমষ্টির নিকট হইতে যে বাধ্যতামূলক দেয় আদায় করে তাহাকেই কর (tax) বলা হয়।

করনির্ধারণের সূত্র (Canons of Taxation):

অ্যাডাম স্মিথ উত্তম কর নির্ধারণের চারিটি সূত্র নির্ধারণ করিয়াছেন:

১। সমতার সূত্র (Canon of Equality):

রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী, অর্থাৎ রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে সে যে আয় করিতে সমর্থ হয় তাহার অনুপাতে, সরকারের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে সাহায্য করা, অর্থাৎ কর দেওয়া উচিত। সামর্থ্যের মাপকাঠি আয়। সকল নাগরিকেরই নিজ নিজ আয় হইতে সমান অনুপাতে কর দেওয়া উচিত। ক-এর আয় যদি ১০০০৲ টাকা হয় আর খ-এর আয় ১০০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে খ ১০৲ টাকা কর দিলে ক-এর অন্ততঃ ১০০৲ টাকা কর দেওয়া উচিত।

১। কর আয়ের অনুপাতে নির্ধারিত হওয়া উচিত

২। নিশ্চয়তার সূত্র (Canon of Certainty):

প্রত্যেক নাগরিকের বাধ্যতামূলক ভাবে যে কর দিতে হয় তাহা সব দিক দিয়া সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত; কর প্রদানের সময় করের পরিমাণ প্রভৃতি করদাতার পক্ষে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। কর দেওয়া হইল রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তির ত্যাগের উপলব্ধি। কর সম্পর্কিত সকল খুঁটিনাটির পরিষ্কার ধারণা পূর্বাহ্নে না থাকিলে এই ত্যাগের উপলব্ধি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তাহা ছাড়া ভবিষ্যৎ কর অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত থাকিলে করদাতার পক্ষে ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান হিসাব করা কঠিন হইয়া পড়ে; ফলে, আয় অনুযায়ী ব্যয়ের ব্যবস্থা করার পথে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

২। কর সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত

৩। সুবিধার সূত্র (Canon of Convenience):

প্রত্যেক কর এমন সময়ে ও এমনভাবে আদায় করা উচিত যাহাতে ইহা করদাতার পক্ষে যতদূর সম্ভব সুবিধাজনক হয়। কর দিতে নিশ্চয়ই কাহারো খুব ভাল লাগে না, কারণ ইহাতে ত্যাগের প্রয়োজন হয়। করদাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সরকারের এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে কর আদায়ের সময় করদাতাদের অসুবিধা ও হাঙ্গামা সর্বাপেক্ষা কম হয়।

৩। কর দাতার পক্ষে সুবিধাজনক হওয়া উচিত

৪। ব্যয়সংক্ষেপের সূত্র (Canon of Economy):

কর এমন ভাবে বসানো উচিত যে লোকের নিকট হইতে কর হিসাবে যাহা লওয়া হইল তাহার যতদূর সম্ভব বেশী অংশই রাষ্ট্রীয় ধনাগারে স্থানলাভ করে। অর্থাৎ কর আদায় যথাসম্ভব স্বল্প ব্যয়ে করিতে হইবে। যে কর আদায়ের খরচ খুব বেশী তাহা সমর্থনযোগ্য নহে।

৪। কর আদায় যথাসম্ভব স্বল্প ব্যয়ে করিতে হইবে

অ্যাডাম স্মিথের চারিটি সূত্রের সঙ্গে আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ আরও দুইটি সূত্র যোগ করিয়া দিয়াছেন।

৫। পরিবর্তনশীলতা সূত্র (Canon of Elasticity):

কর অতিপরির্তনশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে প্রয়োজনের সময়ে সরকার করের হার বাড়াইয়া দিয়া আয় বাড়াইয়া লইতে পারিবে।

৫। কর পরিবর্তনশীল হওয়া উচিত

৬। উৎপাদনশীলতার সূত্র (Canon of Productivity):

যে কর বসানো হয় তাহা হইতে যথেষ্ট অর্থ আদায় হওয়া উচিত; অর্থাৎ, অর্থবিদ্যার ভাষায়, কর যথেষ্ট উৎপাদনশীল হওয়া উচিত। প্রচুর উৎপাদনশীলতা আছে—কেবলমাত্র এইরূপ কয়েকটি বাছাই করা কর থাকা উচিত। প্রত্যেকটি হইতে সামান্য আয় হয় এইরূপ বহু কর থাকা অবাঞ্ছনীয়।

কর উৎপাদনশীল হওয়া উচিত

সমানুপাতিক বা গতিশীল কর নির্ধারণ (Proportional or Progressive Taxation):

অ্যাডাম স্মিথের মতে, ন্যায্য কর নির্ধারণ মানেই সমানুপাতিক কর নির্ধারণ। ন্যায়বিচারের অর্থ এই যে প্রত্যেক নাগরিক নিজের আয়ের অনুপাতে কর দিবে। কিন্তু আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণের মত এই যে কর নির্ধারণ গতিশীলতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কর গতিশীল হওয়ার মানে গরীবেরা আয়ের যে অনুপাতে কর দিবে ধনীরা তাহার চেয়ে বেশী অনুপাতে কর দিবে। আয় যে হারে বাড়ে সেই অনুপাতে কর প্রদানের সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত বেশী হারে বাড়ে। এই সূত্র টাকার প্রান্তিক উপযোগিতার সূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

কর নির্ধারণে 'ন্যায় বিচার'

কর নির্ধারণে সমতার নীতি মানিয়া চলা মানেই ত্যাগের সমতা (equality of sacrifice) প্রতিষ্ঠা করা। একজনের আয় ১০০০৲ টাকা এবং আর একজনের আয় ১০০৲ হইলে সমানুপাতিক কর নির্ধারণ (Proportional taxation) নীতি অনুসারে প্রথম জনকে ১০০৲ টাকা ও দ্বিতীয় জনকে ১০৲ টাকা কর হিসাবে দিতে হয়। ফলে কিন্তু, প্রথম জনের ত্যাগ দ্বিতীয় জনের তুলনায় কমই হয়। ত্যাগসমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথম জনের উপর ১০০৲ টাকার অধিক কর ধার্য করা উচিত। অর্থাৎ ন্যায়বিচার করিতে হইলে করনির্ধারণ গতিশীল হওয়া উচিত।

ধনীদের উপর দরিদ্র অপেক্ষা আয়ের অনুপাতে অধিক কর স্থাপন করা উচিত

কিন্তু সকল করকেই গতিশীল করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র আয়-কর, মৃত্যু-কর, ভূমি-কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর গতিশীল করা যায়। আর পরোক্ষ কর অধোগতিশীল (regressive)। পরোক্ষ করের ভার ধনীর চেয়ে গরীবের উপরে বেশী পড়ে। আধুনিক সরকার যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ করের উপর নির্ভরশীল হউক—ইহাই বাঞ্ছনীয়।

পরোক্ষ কর অধোগতিশীল, সুতরাং ন্যায় বিচারের সহায়ক নয়

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর (Direct and Indirect Taxes):

কর দুই শ্রেণীর—প্রত্যক্ষ (direct) এবং পরোক্ষ (indirect)। প্রত্যক্ষ করের বোঝা অন্য কাহারও ঘাড়ে স্থানান্তরিত করা যায় না। যাহার উপর এই কর বসানো হয়, এই করের সমস্ত ভার শেষ পর্যন্ত তাহার উপরেই পড়ে। আয়-কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যে ব্যক্তিকে আয়-কর দিতে হয় সে তাহা নিয়োগকর্তা, কর্মচারী বা গ্রাহক—কাহারো নিকট হইতেই উশুল করিতে পারে না। করের ভার (incidence) শেষ পর্যন্ত যে সরকারের নিকট নির্দিষ্ট কর প্রদানের জন্য দায়ী,—তাহারই উপর পড়ে। পরোক্ষ করের বোঝা স্থানান্তরিত করা সম্ভব। বিক্রয়-কর এইরূপ একটি পরোক্ষ কর। সরকার এই কর দোকানদারের কাছ হইতে আদায় করে, কিন্তু দোকানদারেরা বিক্রীত জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে এই কর যোগ করিয়া দিয়া গ্রাহকদের নিকট হইতে কর বাবদ দেয় টাকা তুলিয়া লয়। এইভাবে বিক্রয়-করের ভার (incidence) ক্রেতাদের উপর চাপানো হয়।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য

১। **প্রত্যক্ষ করের সুবিধা ঃ** (১) প্রত্যক্ষ করকে (যেমন আয়-কর) গতিশীল (progressive) করিয়া তোলা চলে। যাহাদের বেশী আয় তাহাদের উপর বেশী হারে এবং যাহাদের কম আয় তাহাদের উপর কম হারে এই কর বসানো সম্ভব। আবার, যাহারা খুব গরীব তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করের আওতা হইতে বাদ দেওয়া চলে। প্রত্যক্ষ কর সাধারণতঃ ন্যায্য কর। (২) প্রত্যক্ষ কর সুনির্দিষ্ট থাকে। (৩) এই কর অতিপরিবর্তনশীল। যুদ্ধ প্রভৃতি আকস্মিক প্রয়োজনের সময়ে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইয়া দিয়া রাষ্ট্রের মোট আয় স্বচ্ছন্দে বাড়াইয়া দেওয়া যায়। (৪) ইহা যথেষ্ট উৎপাদনশীল। সকল আধুনিক দেশেই আয়-কর রাষ্ট্রের আয়ের একটি প্রধান উৎস। (৫) ইহা ব্যয়-সংক্ষেপের অনুকূল, কারণ আদায়ের খরচ খুবই কম। (৬) ইহা পৌর-চেতনা উদ্বুদ্ধ করে। করদাতা কর দিতেছে জানিয়াই কর দেয়। ফলে, সে রাষ্ট্রীয় সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতে উৎসাহিত বোধ করে।

২। **প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা ঃ** (১) প্রত্যক্ষ কর জনপ্রিয় নয়। করদাতা কত কর দিতেছে তাহা জানে বলিয়াই অনেক সময়ে করভারে পীড়িত বোধ করে ; সুতরাং সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্ট হয়। (২) ফাঁকি ও শঠতার সাহায্যে প্রত্যক্ষ কর হইতে নিস্তার পাওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ। যাহারা আয়-কর দেয় তাহারা অনেক সময়েই প্রকৃত আয় প্রকাশ না করিয়া আয়ের মিথ্যা হিসাব দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ কর রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য নয়। যে সব শ্রেণী খুব গরীব, সরকার প্রত্যক্ষ করের মারফত তাহাদের নিকট হইতে কিছুই আদায় করিতে পারে না।

৩। **পরোক্ষ করের সুবিধা ঃ** (১) পরোক্ষ করের অপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা কম। করদাতা যে এই কর দিতেছে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। ইহা ঠিক চিনির আস্তরণে ঢাকা তিক্ত বটিকার মত। (২) ইহা অনেক সময়ে যথেষ্ট উৎপাদনশীল হয়। (৩) ইহা বেশ কিছু পরিমাণে পরিবর্তনশীলও বটে। করের হার অতিরিক্ত বেশী হইয়া না পড়িলে এই হার কিছুটা বাড়াইয়া রাষ্ট্রের আয় বাড়ানো চলে ; ইহাতে উৎপাদনের কোন ক্ষতি হয় না। (৪) ইহা সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট হইতেই আদায়যোগ্য। পরোক্ষ কর গরীবকেও স্পর্শ করে। (৫) মদ, ভাঙ্, গাঁজা প্রভৃতি নেশার জিনিসের উপর পরোক্ষ কর বসাইয়া এই সব ক্ষতিকর জিনিসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা যায় ; ফলে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়।

৪। **পরোক্ষ করের অসুবিধাঃ** (১) ইহা সাম্য নীতির বিরোধী (inequitable)। সাধারণতঃ, ধনীদের চেয়ে গরীবদের উপরেই পরোক্ষ করের ভার বেশী পড়ে। (২) ইহা পৌর-চেতনা বৃদ্ধির সহায়তা করে না। (৩) করদাতা কর দিতেছে বলিয়া সচেতন থাকে না। ফলে সরকার খুব বেশী করিয়া কর ধার্য করিলেও সে সরকারের সমালোচনা করে না। (৪) পরোক্ষ কর আদায় করার খরচ প্রায়ই খুব বেশী হইয়া পড়ে।

জাতীয় ঋণ (Public Debt)ঃ

রাষ্ট্র প্রায়ই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। সরকারের ঋণকে জাতীয় ঋণ (Public Debt) বলা হয়। জাতীয় ঋণ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক (internal and external), দুইই হইতে পারে। সরকার যখন আপন দেশের লোকের নিকট ধার করে, তখন এই জাতীয় ঋণ আভ্যন্তরীণ। আর সরকার যখন বিদেশের লোকের নিকট ধার করে, তখন এই জাতীয় ঋণ বাহ্যিক। যখন এই জাতীয় ঋণ রেলপথ, সেচপ্রণালী প্রভৃতি সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসের নির্মাণে ব্যয়িত হয় তখন এই রাষ্ট্রীয় ঋণকে উৎপাদনশীল (productive) বলা হয়। জাতীয় ঋণ উৎপাদনশীল হওয়া মানেই নূতন আয় স্মষ্টির ব্যবস্থা হওয়া; এই আয় হইতে ঋণের সুদ এবং অবশেষে আসল মিটাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হয়। যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনে, বাজেটের ঘাটতি মিটানোর জন্য রাষ্ট্র যে ঋণ লয়, তাহাকে অনুৎপাদনশীল (unproductive) বলা হয়।

জাতীয় ঋণের শ্রেণীবিভাগ

রাষ্ট্র নানাবিধ প্রয়োজনে ধার লয়ঃ—(১) সাময়িকভাবে অর্থের অভাব মিটানোর জন্য। কর আদায় করিতে সময়ের দরকার হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যয় বন্ধ রাখা যায় না। কাজেই, এই ঋণ লইতেই হয়। কর আদায় করার পর এই ঋণ শোধ করা চলে। (২) কখনো কখনো সংগৃহীত রাজস্ব মোট ব্যয়ের চেয়ে পরিমাণে কম হয়। ফলে ঘাট্তি বাজেট দেখা দেয়। ঋণ করিয়া বাজেটের ঘাট্তি মিটাইতে হয়। (৩) যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষের দরুণ অতিরিক্ত বিশেষ ব্যয় ঋণ করিয়া মিটাইতে হয়। (৪) রাষ্ট্র যখন রেলপথ, খাল প্রভৃতি নির্মাণের কাজে হাত দেয়, তখনও রাষ্ট্রকে ঋণ লইতে হয়। এই ঋণ উৎপাদনশীল।

জাতীয় ঋণের উদ্দেশ্য

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between direct and indirect tax. Give some examples of each of them from the Indian system. (C. U., 1930, 1935, 1938, 1940, 1945). (১৮৭ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Consider the merits and defects of direct and indirect taxes.
(C. U., 1938, 1945) (১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Define a tax. Explain the characteristics of a good tax.
(C. U., 1951). (১৮৪-১৮৬ পৃষ্ঠা দেখ)

4. What is equity in taxation? Should the rich pay more in taxes than the poor? (C.U., 1941). (১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা দেখ)

5. Distinguish between a progressive and a proportional tax. Why is the principle of progression preferred to that of proportion in the tax system of a modern community? (C. U., 1950). (১৮৬-১৮৮ পৃষ্ঠা দেখ)

6. What are taxes? How should the burden of taxes be distributed among the different sections of society? (C. U., 1953). (১৮৪-১৮৭ পৃষ্ঠা দেখ)

ভারতীয়
অর্থবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় অর্থবিদ্যার ভূমিকা

'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটি একটু নূতন ধরণের লাগিতে পারে। ভারতীয় অর্থবিদ্যা বা অর্থনীতি আবার কি বস্তু? ব্রিটিশ অর্থবিদ্যা, আমেরিকান অর্থবিদ্যা বলিয়া ত' কিছু নাই। অর্থবিদ্যা যখন একটি বিজ্ঞান তখন ইহার মূলসূত্রগুলি সকল দেশেই প্রযোজ্য। মানুষের মূল প্রকৃতি সকল দেশেই সমান; কৃষিপ্রধান সমাজে বা শিল্পোন্নত সমাজে ধনোৎপাদনের নিয়মাবলী মূলতঃ একই। এই দিক দিয়া দেখিলে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিয়া পৃথক কোন শাস্ত্র থাকিতে পারে না। ভারত ত' আর সৃষ্টিবহির্ভূত দেশ নয়!

উপরোক্ত যুক্তি যেমন সত্য, ইহাও আবার তেমনি সত্য যে দেশভেদে অর্থনৈতিক সমস্যারও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এই পার্থক্য যদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে সম্পূর্ণভাবে সাধারণ অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাগুলির বিচার, বিশ্লেষণ এবং সমাধান করিবার চেষ্টা করিলে ভুল করা হইবে।

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভারতীয় অর্থবিদ্যা নামক শাস্ত্রের উদ্ভব

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই কারণেই ভারতীয় অর্থবিদ্যা নামক শাস্ত্রের উৎপত্তি।

আমেরিকা বা ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সমস্যা ও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা এক ও অভিন্ন নহে। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা একান্তভাবে ভারতীয়। ভারত অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ। জমিদারী প্রথা ও সামন্ততন্ত্রের অবশেষ এখনও এখানে আছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণে ভারত এখনও বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই; বৃহদায়তনে উৎপাদন এখানে সামান্যই প্রসার লাভ করিয়াছে। সুতরাং এক কথায় ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান সমস্যা হইল কি করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করা যায়। ব্রিটেন ও আমেরিকার অর্থনৈতিক সমস্যা ঠিক এই ধরণের নয়। তাহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। কি করিয়া এই উন্নত ব্যবস্থাকে চালু রাখা যায় তাহাই তাহাদের সমস্যা। আমাদের প্রধান সমস্যা হইল উন্নয়ন করার, তাহাদের প্রধান সমস্যা বজায় রাখার।

ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা

উপরন্তু ভারতের সামাজিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ

প্রভৃতির মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় যাহার জন্য ভারতীয় অর্থবিদ্যাকে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করিয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়।

ভারতের আর্থিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করিয়া বিচারক রানাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বহু ভারতীয় মনীষী ভারতের অর্থনীতিকে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল গবেষণা হইতে ভারতীয় অর্থবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে।

বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য :

এক কথায় ভারতীয় অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইল দারিদ্র্য সমস্যার আলোচনা। আমাদের ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক পরিবেশ, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা প্রভৃতির উদ্দেশ্যমূলক আলোচনা করিতে হইবে। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে—অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যে আমাদের ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সংখ্যা ও তথ্যাদির বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং অর্থবিদ্যার সাধারণ বিধিগুলিকে ভারতের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণের পথনির্দেশ করিতে হইবে। পথনির্দেশই যথেষ্ট নয়, ব্যক্তিগত ভাবে নির্দিষ্ট পথ দিয়া চলিবারও চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতীয় অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইল ভারতের দারিদ্র্য সমস্যার আলোচনা

নাগরিকগণের সমৃদ্ধির উপরই দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। নাগরিককে যদি উদরান্নের চিন্তায় সকল সময় ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তবে তাহার পক্ষে সুসভ্য জীবন যাপন করা কোন মতেই সম্ভব হয় না। দরিদ্র জনসাধারণকে লইয়া দেশ কখনই শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ভারতীয় অর্থবিদ্যা দেশের দারিদ্র্যমোচনের পথ নির্দেশ করিবে। সেই পথ দিয়া চলিয়া যখন মানুষের মত বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে তখন সার্থক জীবনযাত্রার পথে লইয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত দিবে। এই সার্থক জীবনযাত্রায় ভারতের নিজের সমৃদ্ধি ছাড়াও থাকিবে বিশ্বের সমৃদ্ধি ও বিশ্বশান্তি। সুতরাং ভারতীয় অর্থবিদ্যা আলোচনার চরম লক্ষ্য হইল মানবতার সেবা।

অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের পথ নির্দেশ করিতে হইবে

ভারতীয় অর্থবিদ্যা আলোচনার চরম লক্ষ্য হইল মানবতার সেবা

ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপাদান ঃ

পূর্বে আমরা ভারত বলিতে বুঝিতাম হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, এবং আরব সাগর হইতে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ব্যাপ্ত অখণ্ড ভারতবর্ষ। এখন ভারত বলিতে বুঝি ভারতীয় 'ইউনিয়নে'র ভৌগোলিক অঞ্চল। পাকিস্তান অঞ্চল ভারতের বহির্ভূত। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করার সময় প্রধানতঃ ভারতীয় 'ইউনিয়নে'র আর্থিক অবস্থার ও সমস্যার আলোচনা করা হইবে।

ভৌগোলিক ভারতবর্ষ

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া ভারত অতিশয় সমৃদ্ধিশালী দেশ। উত্তরে হিমালয় পর্বতের বিশাল প্রাচীর ভারতকে এশিয়া মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রের গর্ভে প্রবেশ করিয়া ভারতকে একটি স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্য দান করিয়াছে। এই হিমালয়ই ভারতকে উষ্ণতা ও উর্বরতা দান করিয়াছে। হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী উত্তর ভারতের বিশাল সমতলভূমিকে প্লাবিত করিয়া 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা' করিয়া তুলিয়াছে। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণের মালভূমি ভেদ করিয়া বহু নদী উর্বর উপত্যকা সৃষ্টি করিয়াছে। প্রতি বৎসর মৌসুমী বায়ু ভারতের বুকের উপর চক্রাকারে আবর্তিত হইয়া ভারতের মাটিকে বৃষ্টিধারায় স্নিগ্ধ ও শ্যামল করিয়া তোলে। লোহা, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, বক্সাইট্, জিপ্‌সাম, প্রভৃতি খনিজ সম্পদ ভারতে প্রচুর পরিমাণে আছে। চীনকে বাদ দিলে ভারতই পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ। ভারতের মানুষ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। দীর্ঘদিনের সভ্যতার ঐতিহ্য ভারতে আছে। মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নির্মাণে ও উদ্ভাবনে বংশপরম্পরায় ভারতের মানুষ যে কারুদক্ষতা অর্জন করিয়াছিল তাহা একদিন পৃথিবীর নিকট বিস্ময়ের বিষয় ছিল। ইংরাজদের আগমনের পূর্বে ভারতই ছিল সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশ। আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সভ্যতা আয়ত্ত করিয়া ভারতের মানুষ নূতন করিয়া দেশ গড়িতে সর্বপ্রকারেই সক্ষম, একথা আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী রাজা রামমোহন রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

প্রাকৃতিক সম্পদে ভারত বিশেষ সমৃদ্ধ

অথচ ভারত অতিশয় দরিদ্র দেশ। ইহাই ভারতের সমস্যা, ভারতের দুর্ভাগ্য। প্রকৃতি ভারতকে সমৃদ্ধিশালী হিসাবে দেখিতে চায়, কিন্তু মানুষ

তাহাকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। মাথাপিছু ভারতের বাৎসরিক জাতীয় আয় ১৯৪২-৪৩ সালে ছিল মাত্র ৬৯৲ টাকা এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল ২৫৫৲ টাকা। মধ্যবর্তী ছয় বৎসরে জিনিসপত্রের দাম চার গুণ বাড়িয়াছিল। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ভারতের মাথা পিছু জাতীয় আয় যুদ্ধের গোড়ার দিকে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে। ভারতে সাধারণ সময়ে বহু সংখ্যক লোক বেকার অবস্থায় থাকে। দুর্ভিক্ষ ভারতে লাগিয়াই আছে, খাদ্যের জন্য এদেশ বিদেশের উপর নির্ভরশীল। মাথাপিছু বস্ত্রের ব্যবহার যুদ্ধের পূর্বে ছিল ১৫ হইতে ১৬ গজ, এখন তাহা কমিয়া হইয়াছে ১৩৪ গজ। কোটি কোটি মানুষ অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় দুর্ভিক্ষের দ্বারদেশে বাস করে। কোনমতে খুপরিতে মাথা গুঁজিয়া অথবা গোয়াল ঘরের অপেক্ষাও অধম একটা নীচু চালার মধ্যে অসংখ্য মানুষ স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করে। বস্তিতে বা কুলি-ধাওড়ায় এক একটি ঘরে বহু শ্রমিক পরিবার গাদাগাদি করিয়া জন্তু-জানোয়ারের মত জীবন নির্বাহ করে। শহরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায়, জেটিতে, পার্কে শুইয়া থাকে। সর্বত্র ভিখারীর আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া, প্লেগ, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতিতে দেশে প্রতি বৎসর অসংখ্য লোক মারা যায়। জীবনে কোন নিশ্চয়তা নাই। ভবিষ্যতের কোন আশা ভারতের মানুষ দেখিতে পায় না। প্রায় শতকরা নব্বই জন লোক নিরক্ষর এবং তাহারা এই সভ্যজগতে থাকিয়াও এই জগৎ হইতে নির্বাসিত হইয়া এক প্রাচীন অন্ধবিশ্বাসের যুগে ভয়াচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করে। ইহাই আমাদের ভারত। ইহাই আমাদের সমস্যা।

প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ হইয়াও ভারত অতিশয় দরিদ্র দেশ

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

(Other special features of Indian Economy):

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 'বৈচিত্র্য' সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশে—যথা, ভূগঠন, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, খনিজ সম্পদ, বনসম্পদ প্রভৃতির মধ্যে—বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই দেশের ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির মধ্যেও বিশেষ বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্যের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ও শ্রেণীর অর্থনৈতিক সমস্যা অভিন্ন হইতে পারে নাই।

বৈচিত্র্য

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয়েরা আধ্যাত্মিক ভাবকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। এখানে ধর্ম, রীতিনীতি, পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মত্যাগের আদর্শ প্রভৃতি অধিকাংশের জীবনকে এখনও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। যাহা অর্থনৈতিক উন্নতির মূল, পাশ্চাত্ত্য জগৎ যাহাকে অর্থনৈতিক কাজকর্ম বলিয়া বর্ণনা করে, ভারতে তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। অবশ্য, ইহা সত্য যে দিন দিন এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিতেছে।

আধ্যাত্মিক ভাব

পূর্বে ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল এবং এই সকল অঞ্চলের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত। ইংরাজ আমলে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পরিবহন ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত হওয়ায় এই প্রকার পার্থক্যের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। স্বাধীনতার পর এই ঐক্যসাধন আরও দ্রুতভাবে অনুসৃত হইতেছে। ফলে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী, প্রাচীন জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটিতেছে। সমগ্র ভারত ঐক্যবদ্ধভাবে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং আশার আলো দেখা দিয়াছে। বলা যায় যে ভারতে এখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের যুগ।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিবেশ

(The Natural Environment)

প্রথমেই আমরা ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব, কারণ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। প্রকৃতির দানকে নিজের শ্রম দ্বারা রূপান্তরিত বা স্থানান্তরিত করিয়া মানুষ তাহার অভাব মিটায়।

মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক

ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের আলোচনাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) ভৌগোলিক অবস্থান; (২) ভূগঠন ও মাটি; (৩) জলবায়ু ও

বৃষ্টিপাত ; (৪) খনিজ সম্পদ ; (৫) বনসম্পদ ও জীবজন্তু ; এবং (৬) প্রাকৃতিক শক্তিসম্পদ।

ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Situation) :

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট যাহা পূর্বে পৃথিবীতে ভারতবর্ষ বা ইণ্ডিয়া বলিয়া পরিচিত ছিল তাহা দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে যাহাকে ভারত বা ভারতীয় 'ইউনিয়ন' বলা হয় তাহা পূর্বের অখণ্ড ভারতবর্ষ নয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে আমরা প্রধানতঃ ভারতীয় 'ইউনিয়নে'র অর্থবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আলোচনা কালে 'ভারত' শব্দটি বর্তমানের 'ভারতীয় ইউনিয়নে'র অর্থে এবং 'ভারতবর্ষ' শব্দটি ভৌগোলিক ভারতবর্ষ বা পূর্বের অখণ্ড ভারতবর্ষের অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

ভারত ও ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের (ভারত ও পাকিস্তানের) মোট আয়তন ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার বর্গমাইল। এই বিরাট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক ঐক্য লক্ষণীয়। উত্তরে ইহা হিমালয় পর্বতমালার দ্বারা এশিয়ার বাকী অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বাকী তিন দিকেই ইহা সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। কাজেই ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে 'ভারতবর্ষ' একটি উপমহাদেশ।

ভারতীয় ইউনিয়নের আয়তন ১২ লক্ষ ১৮ হাজার বর্গমাইল। ইহা উত্তরে হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান

ভারতের উত্তরার্ধ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এবং দক্ষিণার্ধ উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ইহার উপকূল-রেখা অত্যন্ত দীর্ঘ, কিন্তু উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অতি অল্প। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্—ভারতে এই চারিটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় আছে। পাকিস্তানের প্রধান বন্দর হইল করাচী, চট্টগ্রাম ও নবনির্মিত চালনা। এশিয়া মহাদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া ভারতের পক্ষে একদিকে পূর্বাঞ্চলের পূর্ব পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এবং পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান, ইরাণ, মিশর, কেনিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য চালান বিশেষ সুবিধাজনক।

অবস্থানের জন্য ভারতের পক্ষে বহির্বাণিজ্যের সুবিধা

প্রাকৃতিক বিভাগ ঃ

ভূ-প্রকৃতি হিসাবে ভারতকে চারিটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায় ঃ

১। **উত্তরে হিমালয় পর্বত-প্রাচীর ঃ** হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনে হিমালয়ের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। সিন্ধু ও গঙ্গার মত নিত্যবহ নদীগুলি হিমালয়ের তুষার দ্বারাই পরিপুষ্ট। হিমালয়ই ভারতবর্ষের জলবায়ুব নিয়ামক। হিমালয়ের দ্বারা মৌসুমী বায়ুর গতিপথ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। হিমালয় অঞ্চল জীবজন্তু ও বনসম্পদে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ।

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে হিমালয়ের গুরুত্ব

২। **উত্তরাপথের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ঃ** উত্তরে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের নিম্নদেশ ও তাহাদের শাখা-প্রশাখা দ্বারা সমৃদ্ধ। এই তিনটি নদীর পলিমাটি দিয়াই এই অঞ্চলের ভূমি গঠিত হইয়াছে। কাজেই এই অঞ্চল খুব উর্বর। এই অঞ্চলেই ভারতের কৃষি সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ।

৩। **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ঃ** পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঢালু এই বিরাট মালভূমি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভূখণ্ড। এই অঞ্চল বিশেষভাবে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশ কৃষ্ণ মৃত্তিকায় গঠিত বলিয়া সেখানে প্রচুর কার্পাস তুলা উৎপন্ন হয়।

৪। **উপকূল-ভূমি ঃ** দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দুইটি সরু ও দীর্ঘ উপকূল অঞ্চল রহিয়াছে। পূর্বোপকূল, পূর্বঘাট ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী এবং পশ্চিমোপকূল, পশ্চিমঘাট ও আরব সাগবের মধ্যবর্তী নিম্ন সমতলভূমি। এই সকল স্থান পলিমাটি দ্বারা গঠিত এবং কৃষির উপযোগী।

ভারতের ভূগঠন ও মাটি (Soils of India) ঃ

ভারতের মাটিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) পলিমাটি (Alluvial Soil) :—বিভিন্ন নদীর গতিপথে যুগ যুগ ধরিয়া তলানি সঞ্চিত হইয়া যে মাটি গঠিত হয় তাহাকে পলিমাটি বলে; পলিমাটি প্রধানতঃ সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত সমতল অঞ্চলে পাওয়া যায়। উপকূল ভূমিতেও ইহা পাওয়া যায়। এই মাটি নানা রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধ। পরিমিত এবং সু-বন্টিত বৃষ্টিপাত হইলে এই জমিতে ধান্য, গম, ডাল, ইক্ষু, তৈলবীজ, পাট প্রভৃতি নানাবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়। ইহা ছাড়া এইরূপ জমিতে সহজেই সেচের

ব্যবস্থা করা যায়। (২) কৃষ্ণমৃত্তিকা (Black Cotton Soil) :—দাক্ষিণাত্যে গলিত লাভা জমিয়া এই মাটি গঠিত হইয়াছে। কার্পাসের চাষের পক্ষে এই মাটি বিশেষ উপযোগী। এই মাটি আঠালো; কাজেই আর্দ্রতাকে ধারণ করিয়া রাখে। জোয়ার, বাজরা, গম প্রভৃতি শস্যও এই মাটিতে প্রচুর উৎপন্ন হয়। (৩) গেরুয়া দানাদার মাটি (Red Crystalline Soil) :—এই মাটি পাথুরে প্রকৃতির এবং ইহার রঙ গেরুয়া। মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর এবং বোম্বাই-এর অংশবিশেষে এই মাটি পাওয়া যায়। রাসায়নিক গুণের দিক দিয়া এই মাটি অতি নীরস। ইহা আর্দ্রতার ধারক নয়, অর্থাৎ খুব শুষ্ক। প্রচুর জল সরবরাহ করিতে পারিলে এই মাটিতে ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপন্ন করা সম্ভব।

জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত : মৌসুমী বায়ু (Climate and Rainfall : The Monsoons) :

ভারতের জলবায়ুকে উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী জলবায়ু বলা হয়। সচরাচর বলা হয় যে ভারতে ছয় ঋতু, কিন্তু ভারতে তিনটি ঋতুই প্রধান : (১) শুষ্ক শীত ঋতু, (২) শুষ্ক গ্রীষ্ম ঋতু এবং (৩) বর্ষা ঋতু। গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে; ফলে, ভূ-ভাগের উপরিস্থ বায়ুর চাপ খুব কমিয়া যায়। যে সব অঞ্চলে বায়ুর চাপ কমিয়া যায়, সেইদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে বেগে বাতাস বহিতে থাকে। এই বায়ুস্রোত সাগরের উপর দিয়া আসার সময়ে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া আর্দ্র হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত এই আর্দ্র, বৃষ্টিবাহী বায়ুস্রোতকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বলা হয়। এই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দুইটি স্রোত রহিয়াছে : (১) আরব সাগর হইতে প্রবাহিত স্রোত; (২) বঙ্গোপসাগর হইতে প্রবাহিত স্রোত। আরব সাগর হইতে প্রবাহিত মৌসুমী বায়ু পশ্চিম-ঘাট পর্বতশ্রেণীতে ঘা খাইয়া উত্তর-পূর্ব দিক অভিমুখে প্রবাহিত হয়। বঙ্গোপ-সাগরের মৌসুমী জলবায়ু প্রথমে আসামের পর্বতমালার দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেখান হইতে আসাম, পশ্চিম-বঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। ১৫ই জুনের কাছাকাছি সময় হইতে সুরু হইয়া অক্টোবর পর্যন্ত মৌসুমী বায়ু বহিতে থাকে। অক্টোবরের মাঝামাঝি এই

ভারতের জলবায়ুকে উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী জলবায়ু বলা হয়

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু

বায়ুপ্রবাহ মোড় ফেরে। ফিরিয়া আসিবার সময়ে এই বায়ুপ্রবাহ মাদ্রাজের উপকূল অঞ্চলে প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি করে এবং নভেম্বর-ডিসেম্বরে ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু নামে অভিহিত আর একটি বায়ুস্রোত উদ্ভূত হয়। এই বায়ুস্রোত শুষ্ক বলিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শীতকালে কদাচিৎ বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া দাক্ষিণাত্যে আসার সময় এই বায়ুস্রোত প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এবং মাদ্রাজের দক্ষিণ-পূর্ব জেলাগুলিতে শীতকালীন বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু ভারতের বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হইতে পাওয়া যায়।

উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু ও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গুরুত্ব

মৌসুমী বায়ু ভারতের সকল অঞ্চলেই সমানভাবে বৃষ্টিপাত ঘটায় না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভারতের এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতকে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

(১) আর্দ্র অঞ্চল—এই অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৮০ ইঞ্চি অপেক্ষা অধিক হয়। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টির জায়গা চেরাপুঞ্জিতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৫০ হইতে ৭০০ ইঞ্চি।

(২) নাতি-আর্দ্র অঞ্চল—এই অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৪০ হইতে ৮০ ইঞ্চির মধ্যে। বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(৩) শুষ্ক অঞ্চল—এই অঞ্চলে ৪০ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়। রাজপুতানা এবং পঞ্জাবের কিছু অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের বণ্টন যে শুধু অসমান তাহাই নয়; বৃষ্টিপাত অনিয়মিত এবং অনিশ্চিতও বটে। মৌসুমী বায়ু অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বা দেরীতে আসিতে পারে। কোন কোন বৎসরে অতিরিক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইতে পারে। আবার কোন কোন বৎসরে সাধারণ গড় অপেক্ষা অনেক কম বৃষ্টি হইতে পারে। ভারতের কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া, বৃষ্টি না হইলে কিংবা দেরীতে বৃষ্টি হইলে শস্য নষ্ট হইয়া যায়; ফলে দেশে দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অতিবৃষ্টির দরুণ বন্যা হইলেও শস্য নষ্ট হয় এবং ফলে কৃষকেরা এবং কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও দুর্দশায় পতিত হয়।

ভারতে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও অনিশ্চিত এবং ইহার বণ্টন অসমান

ভারতের অর্থনীতির উপর মৌসুমী বায়ুর প্রভাব (Economic Effects of Monsoons) :

ভারতের সমৃদ্ধি মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। এই কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শতকরা ৭০ জনেরও উপর লোক জীবিকার জন্য নির্ভর করে। ভারতের কৃষকের কাছে সোনার চেয়েও জলের দাম বেশী। ভারতের মাটি সাধারণতঃ শুষ্ক বলিয়া অধিকাংশ শস্য উৎপাদনের জন্যই প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। যে সব অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা নাই, সেখানে জলের জন্য বৃষ্টিপাতই একমাত্র ভরসা। যে সব অঞ্চলে স্বভাবতঃই কম বৃষ্টি হয়, সেখানে অনাবৃষ্টি হইলে শস্যের ভয়ানক ক্ষতি হয়। অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা হইলে বা বর্ষা আসিতে দেরী হইলে শস্যের ক্ষতি হয়। শস্যের ক্ষতি হইলে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের যোগান কমে। বর্তমানে ভারত খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে; প্রতি বৎসরই সরকারকে বাহির হইতে বহু পরিমাণে চাউল ও গম আমদানী করিতে হয়। যদি অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির ফলে ভারতে আভ্যন্তরীণ যোগানের পরিমাণ কমিয়া যায় তবে নানাস্থানে অনাহার, অর্ধাহার ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং তখন সরকারকে বাধ্য হইয়া বাহির হইতে আরও খাদ্য আমদানী করিতে হইবে। কাঁচামাল সম্পর্কে বক্তব্য হইল যে ভারতীয় শিল্পগুলির অধিকাংশ ভারতের কৃষিজাত কাঁচামালেব উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শস্যের ক্ষতি হইলে বস্ত্রশিল্প, পাটকল শিল্প, চিনি শিল্প, তৈল শিল্প প্রভৃতি কাঁচামালের অভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই সকল শিল্পকে চালু রাখার জন্য বাহির হইতে কাঁচামাল আমদানী করাও প্রয়োজন হইতে পারে।

আমাদের জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিজীবী। শস্যের ক্ষতি হইলে প্রথমেই শতকরা ৭০ জন কৃষকের আয় কমিয়া যায়। কৃষকের আয় কমিলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে; ফলে শিল্পপতি, শিল্পশ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের আয়ও কমে। শিল্পদ্রব্যের চাহিদা কমিলে যানবাহনের চাহিদাও কমে; ফলে যাহারা জীবিকার জন্য যানবাহনের উপর নির্ভরশীল তাহাদেরও আয় কমে। তাহা ছাড়া উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষকদেরও আয় কমে। এইভাবে কৃষিজীবীর আয় কমিলে সমাজের সকল শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শস্যের ক্ষতি হইলে রপ্তানীর পরিমাণও কমিয়া যায়, কারণ ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে কাঁচা পাট, চা, তৈলবীজ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার

করিয়া আছে। রপ্তানী কমিলে এই সূত্র হইতে আয়ও কমিয়া যায় এবং ফলে বিদেশ হইতে আমদানী করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়।

শস্যের ক্ষতি হইলে কর হইতে প্রাপ্য সরকারী আয়ও কমে। অপর দিকে লোকের দুর্দশায় বা দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিতে হওয়ায় সরকারী ব্যয় বাড়িয়া যায়। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির সরকারের বাজেট মৌসুমী বায়ুর খেয়ালের উপর এত বেশী নির্ভরশীল যে ভারতীয় বাজেটকে 'বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা লইয়া জুয়াখেলা' বলা হয়। ভারতের সমৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল। মৌসুমী বায়ুকে ভারতের 'অর্থনৈতিক জীবনের স্নায়ুমণ্ডলী' বলিয়া সঠিক বর্ণনাই করা হইয়াছে।

বৃষ্টির সম্ভাবনা লইয়া জুয়াখেলা'

মৌসুমী বায়ু ভারতের অর্থ-নৈতিক জীবনের স্নায়ুমণ্ডলী

উপরন্তু, মৌসুমী বায়ুই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব নির্ধারিত করিয়াছে। বৃষ্টিপাত প্রচুর হয় বলিয়াই পশ্চিম বঙ্গ প্রভৃতিতে লোকবসতি ঘন এবং অপ্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্যই রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চল জনবিরল।

লোকবসতি মৌসুমী বায়ুর দ্বারাই বণ্টিত হইয়াছে

মৌসুমী বায়ুর জন্যই ভারতের অধিবাসিগণের অদৃষ্টনির্ভরশীলতা—ইহাও বলা চলে। কৃষক দেখে যে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা অসময়ে বৃষ্টির ফলে তাহার সকল পরিশ্রমই পণ্ডশ্রম হইয়া গেল, ইহাতে তাহার কোন হাত নাই। আবার পর বৎসব যদি সুবৃষ্টি হয় তবে সে আশানুরূপ বা আশাতিরিক্ত ফসল পাইল। তাহার অদৃষ্ট যখন এইরূপভাবে প্রকৃতির খেয়ালের সহিত সংযুক্ত তখন সে অদৃষ্টবাদী হইতে বাধ্য। কৃষকের ভাগ্যের সহিত যখন আবার সকলের ভাগ্য জড়িত তখন বলা যায় যে অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ভারতবাসীকে অদৃষ্টের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হইতে শিখাইয়াছে।

অদৃষ্টনির্ভরশীলতা

ভারতের খনিজ সম্পদ (Mineral Resources of India) :

ভারতের খনিজ সম্পদকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) ধাতব খনিজ; (২) অ-ধাতব খনিজ; এবং (৩) জ্বালানি।

(১) ধাতব খনিজ (Metallic Minerals)—ধাতব খনিজগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত খনিজগুলিই প্রধান।

বিভিন্ন ধাতব খনিজ

লৌহ: লৌহ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধাতু। বিহারের সিংহভূম জেলায়, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, বোনাই ও কেওন্‌ঝর অঞ্চলে এবং মধ্য প্রদেশে সর্বোৎকৃষ্ট লৌহ-মাক্ষিক (Iron Ore) পাওয়া যায়। ভারতে অজস্র পরিমাণে লৌহ-মাক্ষিক রহিয়াছে। কিন্তু বৎসরে গড়ে মাত্র ২৯ লক্ষ টন লৌহ-মাক্ষিক খনি হইতে উত্তোলন করা হয়। জামসেদপুর, বার্ণপুর এবং মহীশূরে পিণ্ড লৌহ (Pig iron) ও ইস্পাত তৈয়ারী হয়। বর্তমানে পিণ্ড লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারীর পরিমাণ ১৩ লক্ষ টনের উপর। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে আশা করা যাইতেছে যে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ২০ লক্ষ টনেরও উপর পিণ্ড লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারী হইবে।

ম্যাঙ্গানীজ (Manganese): ম্যাঙ্গানীজে ভারত খুবই সমৃদ্ধ। বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, বিহারের সিংহভূম জেলা, উড়িষ্যার গাঙ্গপুর, কেওন্‌ঝর ও বোনাই অঞ্চলে এবং মাদ্রাজের বিশাখাপত্তনে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ সঞ্চিত আছে। বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ ভারতে উৎপন্ন হয়। ইস্পাত তৈয়ারীর খাদ হিসাবে ম্যাঙ্গানীজ ব্যবহৃত হয়। ভারতে উৎপন্ন ম্যাঙ্গানীজের অধিকাংশই বিদেশে চালান যায়।

বক্সাইট (Bauxite): বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী হয়। বোম্বাই, বিহার এবং মধ্য প্রদেশে বক্সাইট পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুরে এবং পশ্চিম বঙ্গে (আসানসোলের কাছে) বর্তমানে এলুমিনিয়াম নিষ্কাশিত করা হয়। বৎসরে প্রায় ১৪ হাজার টন বক্সাইট এবং প্রায় ৪ হাজার টন এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়।

তাম্র: সিংহভূম জেলায় এবং সিকিম ও গাড়োয়াল অঞ্চলে তাম্র পাওয়া যায়। ভারতে বৎসরে ৩ লক্ষ টনের অধিক তাম্র উৎপন্ন হয়।

স্বর্ণ: ভারতে উৎপন্ন স্বর্ণের প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ মহীশূরের কোলার স্বর্ণক্ষেত্র হইতে উত্তোলিত হয়।

(২) অ-ধাতব খনিজ (Non-Metallic Minerals)—অ-ধাতব খনিজগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত খনিজগুলিই প্রধান।

বিভিন্ন অ-ধাতব খনিজ

লবণ: অ-ধাতব খনিজগুলির মধ্যে লবণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া কাপড়-কাচা

সোডা, **কষ্টিক** সোডা প্রভৃতি রাসায়নিক জিনিস তৈয়ারী করিতেও লবণের প্রয়োজন হয়। ভারতে লবণ দুইটি উৎস হইতে পাওয়া যায়। (১) রাজস্থানের লবণাক্ত হ্রদের (সম্বর হ্রদ) জল হইতে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। (২) তাহা ছাড়া, বোম্বাই ও মাদ্রাজের উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া লবণ তৈয়ারী হয়।

কিছুদিন পূর্বেও ভারতে উৎপন্ন লবণ এ দেশের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই বৎসরে প্রায় ১ কোটি টাকার লবণ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। বর্তমানে ভারত লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে এবং রপ্তানীর যোগ্য উদ্বৃত্তও কিছু আছে।

অভ্র: বিহারে হাজারিবাগ ও গয়া জেলায় এবং মাদ্রাজে নেলোর জেলায় অভ্র পাওয়া যায়। ভারতই পৃথিবীর মধ্যে অভ্রের সর্বপ্রধান উৎপাদক। বিদ্যুৎ-শিল্পে অভ্র ব্যবহৃত হয়। বৎসরে প্রায় ৬'৫ হাজার টন অভ্র উৎপন্ন হয়। ভারতীয় অভ্রের প্রায় সমগ্র অংশই বিদেশে রপ্তানী হয়।

গন্ধক ও জিপ্‌সাম: গন্ধকাম্ল বা সালফিউরিক এসিড্‌ তৈয়ারী করিতে গন্ধকের প্রয়োজন হয়। জিপ্‌সামের মধ্যে গন্ধক থাকে এবং রাজপুতানায় ইহা পাওয়া যায়।

চুনাপাথর: চুনাপাথরের খণ্ড ইটের বদলে ঘরবাড়ীতে ব্যবহৃত হইতে পারে। চুন এবং সিমেণ্ট তৈয়ারী করিতে চুনাপাথরের প্রয়োজন হয়। ইহা পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মধ্যভারত, বিহার এবং মাদ্রাজে পাওয়া যায়।

গ্রাফাইট, ফস্ফেট, সোরা, চীনামাটি প্রভৃতি অন্যান্য অ-ধাতব খনিজও ভারতে পাওয়া যায়।

(৩) জ্বালানি খনিজ: জ্বালানি খনিজের মধ্যে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম প্রধান।

কয়লা: ভারতে কয়লাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্বালানি খনিজ। পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার রাজ্যের ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো এবং গিরিডির খনি অঞ্চল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পঞ্জাবে এবং আসামে অপেক্ষাকৃত নীরস কয়লা পাওয়া যায়। ভারতের ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৬,৫০০ কোটি টন বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে যেটুকু বাস্তবিকই আমরা

পাইতে পারি তাহার পরিমাণ ৪,২৮৭ কোটি টন। ইহার অধিকাংশই নিকৃষ্ট কয়লা। ভাল কয়লার পরিমাণ মাত্র ৭৫ কোটি টন বলিয়া ধরা হইয়াছে। 'কয়লাখনি কমিটির' (Coalfield Committee) মতে বর্তমান হারে ব্যবহার করিলে ইহা ৬০।৬৫ বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং 'কোক' কয়লা সুবিবেচনার সহিত ব্যবহার করা প্রয়োজন। ১৯৫০ সালে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভাল 'কোক'-কয়লার পরিমাণ অত্যন্ত কম। তাই ইহা সুবিবেচনার সহিত ব্যবহার করা প্রয়োজন

পেট্রোলিয়াম: ভারতের মধ্যে আসামের ডিগবয়ে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। ভারতে উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ খুবই সামান্য। বৎসরে ৬ কোটি গ্যালন বা পৃথিবীর মোট উৎপন্নের ০·১ অংশ ভারতে উৎপন্ন হয়। ইহা ভারতের প্রয়োজনের শতকরা ১½ ভাগ মাত্র।

১৯৫১ সালে ভারত সরকারের সহিত আমেরিকার স্টাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী (Standard Vacuum Oil Co.) এবং বার্মা শেল অয়েল কোম্পানীর (Burma Shell) দুইটি পৃথক চুক্তি দ্বারা বোম্বাই-এ দুইটি তৈল পরিশোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে সরকারী নীতি (India's Mineral Policy):

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে খনিজ দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে কোন নীতিই ছিল না—বলা চলে। বিদেশী পুঁজিবাদীরা এদেশে খনিজ দ্রব্য যথেচ্ছ উত্তোলন ও রপ্তানী করিত। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের দৃষ্টি এদিকে স্বভাবতঃই পড়ে। ১৯৪৮ সালে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে খনিজ পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই কমিটির নাম হইল ভারতীয় খনি সম্পর্কীয় ব্যুরো (Indian Bureau of Mines)। খনিজ পদার্থের সুবিবেচনার সহিত ব্যবহার ও রপ্তানী সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করাই এই কমিটির কাজ। ইহা ছাড়াও সরকার জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্ধারণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছে।

বনসম্পদ (Forest Resources):

ভারত বনসম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। দেশের মোট ভূভাগের শতকরা

১৮ ভাগ জুড়িয়া বন অঞ্চল রহিয়াছে। জলবায়ু, বৃষ্টিপাত এবং জমির উচ্চতার তারতম্য অনুসারে বনের প্রকারভেদ দেখা যায়।

(১) রাজপুতানায় যে বাবুল জাতীয় বৃক্ষ সম্বলিত গুল্মভূমি রহিয়াছে তাহাকে শুষ্কারণ্য (Arid Forests) বলা হয়।

(২) হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলে শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষের যে সতেজ বনভূমি রহিয়াছে তাহাকে পতনশীল বৃক্ষের অরণ্য (Deciduous Forests) বলা হয়।

(৩) যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রচুর, সেখানে বাঁশ, ফার্ণ, পাম প্রভৃতির চির-হরিৎ অরণ্য (Evergreen Forests) দেখা যায়।

(৪) হিমালয়ের উচ্চতম অঞ্চলে দেবদারু, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য (Hill Forests) দেখা যায়।

(৫) উপকূল অঞ্চলে লবণজল দ্বারা পুষ্ট অরণ্য (Tidal Forests) রহিয়াছে।

জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের খাতিরে বনভূমির সংরক্ষণ এবং নূতন বনের পত্তন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মোট ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ অরণ্য থাকা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু আমাদের দেশে ইহার পরিমাণ প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র। ভারতের বনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারত সরকারের বনবিভাগ নামে একটি আলাদা বিভাগ আছে। বনসম্পদের সংরক্ষণই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। সরকার বনগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) সংরক্ষিত বা "রিজার্ভ" বন—ইহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ। (২) রক্ষিত বন—জনসাধারণ কর্তৃক এইরূপ বনের ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত; লোককে সরকারী নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। (৩) মুক্ত বন—এইরূপ বনে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রায় নাই বলিলেই চলে।

নূতন বনভূমির পত্তন

ভারতের জাতীয় সরকার কিছুদিন হইতে নূতন বনভূমি পত্তনের দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়াছেন। বৎসর বৎসর সরকারী তত্ত্বাবধানে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা চলিতেছে। জনসাধারণের মধ্যে চারাগাছ বিক্রয় ও বিলি করা হয়। নূতন বনভূমি পত্তনে সরকারী উৎসাহ অপরিবর্তিত থাকিলে ভারত বনসম্পদে আরও সমৃদ্ধ হইবে। এই সম্পর্কে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনা কমিশনের মতে ভারতে বনভূমির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। কিন্তু বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার ব্যাপার। সুতরাং বর্তমানে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance of Forests) ঃ

ভারতবর্ষের বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বন হইতে জ্বালানি কাঠ এবং ঘরবাড়ী ও আসবাব তৈয়ারীর কাঠ পাওয়া যায়। বন হইতে বিভিন্ন শিল্পের মূল্যবান কাঁচামাল পাওয়া যায়—যেমন কাগজ শিল্পের জন্য বাঁশ ও সাবুই ঘাস, এবং দেশলাই ও নৌকা শিল্পের জন্য কাঠ। বন হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য কাঁচামাল হইতে চামড়া ট্যান করার উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, রজন, লাক্ষা এবং তার্পিন পাওয়া যায়। বন থাকিলেই কাঠুরিয়া, মিস্ত্রি, কাঠের কারবারী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। বনভূমি গোচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বনভূমি হইতে সরকারের প্রচুর আয় হয়।

বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতা

বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতাও কম নয়। জলবায়ু এবং ভূ-প্রকৃতির উপর বনভূমির বিপুল প্রভাব রহিয়াছে। বনভূমির প্রভাবে আবহাওয়া আর্দ্র থাকে এবং অধিকতর বৃষ্টিপাত হয়। বনভূমি জমির উৎপাদিকা শক্তির ক্ষয় নিবারণ করে, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং বন্যার সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। বনভূমির অস্তিত্ব মরুভূমির প্রসার বন্ধ করে। রাজপুতানার মরুভূমির চারিদিকে বনবেষ্টনী রোপণ করার পরিকল্পনা চলিতেছে।

প্রাণী সম্পদ (Animal Resources) ঃ

ভারত নানা বিচিত্র জীবজন্তুর বাসভূমি। গরু ও মহিষই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জন্তু। গো-মহিষের সংখ্যায় ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রধানতম দেশ; পৃথিবীর মোট গো-মহিষাদির প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভারতেই আছে। কিন্তু ভারতীয় গরু ও মহিষ উৎকৃষ্ট জাতের নয়। ভারতের গাধা ও ছাগলও সংখ্যায় অনেক। উট এবং ভেড়া তেমন প্রচুর নয়। উত্তর ভারতে ঘোড়া পাওয়া যায়। গরু ও মহিষের সাহায্যে হল কর্ষণ, জল-তোলা এবং ভার বহনের কাজ করানো হয়। দুধ, ঘি এবং মাংসও গো-মহিষ হইতে পাওয়া যায়।

ভারতে পশুপালন সমস্যা

ভারতে পশুপালন সমস্যা ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রধান কারণ গোচারণ ভূমি ও পশুর খাদ্যের অভাব। মানুষের খাদ্যের যখন একান্ত অভাব তখন পশুর খাদ্যের জন্য অধিক জমির ব্যবহার সম্ভব নয়। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের অন্যতম

নির্দেশমূলক নীতি হইল যাহারা দুগ্ধ দেয় এইরূপ গো-মহিষাদির হত্যা নিবারণ। পশু পালনের উন্নততর ব্যবস্থা করিতেও শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই নির্দেশ অনুসারে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশুপালনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬০টি গো-সদন প্রতিষ্ঠা, ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গো-মহিষাদির জাত উন্নত করা ও তাহাদের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা, গো-মহিষাদির খাদ্যের যোগান বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং ৬০০ নূতন পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে অধিক পরিমাণে উন্নততর পশম উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে।

মৎস্যের চাষ (Fisheries) ঃ

মাছ ভারতের পূর্বাঞ্চলের, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের, একটি প্রধান খাদ্য। ভারতে বহু নদ-নদী থাকায় ও ইহার তিন দিক সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় এখানে প্রচুর মাছ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সম্ভাবনার তুলনায় মাছের উৎপাদন খুবই কম। ১৯৫০-৫১ সালে উৎপন্ন মাছের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০ লক্ষ টন। ব্রহ্মদেশে বৎসরে মাথাপিছু মাছ পাওয়া যায় ৩৫ সের, সিংহলে ৮ সের, ইংলণ্ডে আধ মণ, আমেরিকায় ৭½ সের আর ভারতে এক পোয়ারও কম। জাপান ও ইউরোপের মত ভারতে মাছের চাষের ও মাছ ধরার কোন ব্যবস্থা নাই। তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে যদি কাজ হয় তবে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বাড়িয়া ১৫ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে আশা করা যাইতেছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই দিকে অগ্রণী হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে মাছের চাষ ও ট্রলারের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার পরিকল্পনাকে কাজে লাগান হইয়াছে।

সম্ভাবনার তুলনায় ভারতে মাছের উৎপাদন অতি সামান্য

প্রাকৃতিক শক্তিসম্পদ (Power Resources) ঃ

ভারতে প্রাকৃতিক শক্তিসম্পদের আলোচনায় প্রধানতঃ তিনটি জিনিসের উল্লেখ করিতে হয়ঃ (১) কয়লা, (২) খনিজ তৈল এবং (৩) বিদ্যুৎ। ভারতে কয়লা প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু কয়লার খনিগুলি পশ্চিম বঙ্গে ও বিহারে সীমাবদ্ধ বলিয়া অন্যান্য রাজ্যকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। খনিজ

তৈল আসামে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের নদী এবং জলপ্রপাতগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। মহীশূর, বোম্বাই, পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে এবং পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে উৎপন্ন জলবিদ্যুতের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩ লক্ষ কিলোওয়াট। ইহা ছাড়া কয়লা হইতে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ লক্ষ কিলোওয়াট। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে ভারতের নদীপ্রবাহ হইতে ৫০ লক্ষ কিলোওয়াটেরও অধিক পরিমাণ জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৫ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

শক্তির উৎস

ভবিষ্যতে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ

বিহার ও পশ্চিম বঙ্গে কয়লা হইতে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। কৃষি এবং গ্রাম্য কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য গ্রামাঞ্চলে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়লা হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুতের পরিমাণকে বাড়াইয়া ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াটে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. "The prosperity of India depends entirely on the monsoons." Elucidate this proposition. (C.U., 1937) (২০২-২০৩ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Describe the economic consequences of variations of rainfall in India. (C.U., 1939) (২০০-২০১ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Give a brief account of India's mineral resources, especially coal and iron resources. (C.U., 1936) (২০৩-২০৬ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Discuss the importance of forests in the economic life of India. (C.U., 1940) (২০৮ পৃষ্ঠা দেখ)

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের জনগণ

ভারতের জনসংখ্যা (Population of India) :

প্রকৃতি ও মানুষ,—আরও পরিষ্কার ভাবে বলিতে গেলে, জমি ও শ্রম—উৎপাদনের দুইটি প্রধান উপাদান। দেশের জনসংখ্যাই শ্রম সরবরাহের উৎস। সাধারণতঃ জনসংখ্যা যত বেশী হয় শ্রমের যোগান ততই বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা অধিক হইলে শ্রমবিভাগ এবং বৃহদায়তনে উৎপাদন প্রসার লাভ করে; জনসংখ্যা অধিক হইলে দেশের সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কাজেই জনসংখ্যা অধিক হইলে দেশ নানাভাবে লাভবান হয়। কিন্তু জনসংখ্যার আধিক্য সকল সময় কাম্য নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং অন্যান্য নানা জিনিসের চাহিদা বাড়িয়া যায়। খাদ্যের চাহিদাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া খাদ্যের সরবরাহ বাড়াইতে না পারিলে দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সমাজের কাছে একটি বিশেষ সমস্যা হইয়া উঠিতে পারে।

বৃহৎ জনসংখ্যার উপযোগিতা

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা তিন ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে: (১) জনসংখ্যার ঘনত্ব অর্থাৎ ভারতীয় জনসংখ্যার আঞ্চলিক বণ্টন; (২) বিভিন্ন উপজীবিকার মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন; এবং (৩) খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি ও ধন উৎপাদনের সাধারণ বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি।

বৃহৎ জনসংখ্যার ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা

লোকবসতির ঘনত্ব (Density of Population) :

১৯৪১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী অবিভক্ত ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ। অবিভক্ত ভারত বলিতে তদানীন্তন বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ—উভয়কেই বুঝান হইতেছে। দেশবিভাগের পর সর্দার প্যাটেলের হিসাব অনুসারে ভারতীয় 'ডোমিনিয়নে' জনসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি। ১৯৫১ সালের আদম সুমারীর চূড়ান্ত হিসাব বাহির হইলে দেখা গেল যে জম্মু ও কাশ্মীর

বাদে ভারতীয় 'ইউনিয়নে'র জনসংখ্যা ৩৫ কোটি ৫৬ লক্ষেরও উপরে দাঁড়াইয়াছে। সর্দার প্যাটেলের হিসাব মানিয়া লইলে এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৎসরে গড়ে ৬৪ লক্ষেরও অধিক করিয়া বাড়িয়াছে। ১৯৪১ সালের আদম সুমারীর হিসাব ধরিলে জনসংখ্যা ১৯৫১ সালে শতকরা ১২.৫ ভাগ (চূড়ান্ত হিসাব হইবার পূর্বে অনুমান করা হইয়াছিল ১৩.৪ ভাগ) বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের জনসংখ্যা

অবিভক্ত ভারতে লোকবসতির ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ২৪৫ জন; বর্তমানে ইহা ২৮১ জনে দাঁড়াইয়াছে। এই ঘনত্ব এক এক রাজ্যে এক এক রকম। পশ্চিম বঙ্গেই ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক ও রাজস্থানে সর্বাপেক্ষা কম। পশ্চিম বঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৮৪০ জন করিয়া লোক বাস করে; রাজস্থানে মাত্র ১১১ জন করিয়া।

পশ্চিম বঙ্গে লোকবসতির ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক

লোকবসতির ঘনত্ব নানা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। যে সব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেখানে স্বভাবতঃই ঘন বসতি এবং যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বিরল সেখানে বসতি ঘন নয়। নদীবিধৌত উর্বর ভূখণ্ডে বসতি ঘন, এবং বালুকাকীর্ণ অনুর্বর জায়গায় বসতি বিরল। আবার উপত্যকা অঞ্চলে বসবাসের জন্য লোকে যতটা আকৃষ্ট হয়, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস ততখানিই অপছন্দ করে। সেই জন্যই পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের নদীবিধৌত, সুজলা উপত্যকা অঞ্চলে লোকবসতি বিশেষ ঘন, এবং রাজস্থানের বালুকাময়, শুষ্ক অঞ্চলে লোকবসতি এত বিরল। পার্বত্য অঞ্চল বলিয়া সিকিমে লোকসংখ্যা খুবই কম। পঞ্জাবে সেচের খাল থাকার দরুণ জমির উর্বরতা বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। ফলে পঞ্জাবের সেচের খালগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠা উপনিবেশগুলিতে লোকবসতির ঘনত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। কোন অঞ্চলে শিল্পের প্রসার হইলেও জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বোম্বাই নগরী এবং জামসেদপুরে এইরূপ হইয়াছে। এইভাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারণে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়েরই সক্রিয় ভূমিকা রহিয়াছে।

যে সকল বিষয় দ্বারা লোকবসতির ঘনত্ব প্রভাবিত হয়:
(১) জলবায়ু
(২) জমির উচ্চতা
(৩) জমির উর্বরতা
(৪) শিল্পের প্রসার

উপজীবিকা অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টন (Occupational Distribution of Population) :

ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বড় বেশী এবং শিল্পবাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বড় কম। উপজীবিকা অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টনের ইহাই প্রধান বিশেষত্ব। ১৯৪৮ সালের জাতীয় আয় কমিটির হিসাব অনুসারে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ লোক কৃষিসংক্রান্ত কাজে ব্যাপৃত আছে। কিঞ্চিৎ ন্যূন শতকরা ১১ ভাগ শিল্পে নিযুক্ত আছে। কিন্তু সুসংহত ফ্যাক্টরী শিল্পসমূহে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১·৫ অংশ মাত্র নিযুক্ত আছে। ১৯৫১ সালের আদম সুমারী জাতীয় আয় কমিটির হিসাবকেই সমর্থন করিয়াছে। ভারতে লোক-বসতির বণ্টনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে ১৯৪১ সাল হইতে এ পর্যন্ত এবিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। উপরোক্ত তথ্যগুলি শিল্পে অনগ্রসরতা এবং কৃষির উপর অতিরিক্ত নির্ভর-শীলতার সূচক। বিভিন্ন উপজীবিকার মধ্যে জনসংখ্যার উন্নততর বণ্টনের সাহায্যে ভারতের জনসংখ্যার সমস্যার অনেকখানি সমাধান সম্ভবপর। আমাদের অর্থনীতিতে সামঞ্জস্য আনিবার জন্য কৃষি হইতে শিল্প ও উদার উপজীবিকাসমূহে লোকসংখ্যার স্থানান্তর বিশেষ প্রয়োজন।

কৃষিব উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতাই উপজীবিকা অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টনের বিশেষত্ব

কৃষি হইতে অন্যান্য উপজীবিকায় লোকসংখ্যার স্থানান্তর বিশেষ প্রয়োজন

জনসংখ্যার বৃদ্ধি : ভারতে কি জনাধিক্য ঘটিয়াছে ? (Growth of Population : Is India over-populated ?)

১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; ১৯৩১ হইতে ১৯৪১-এর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৫ ভাগ ; এবং ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা প্রায় ১২·৫ ভাগ। গত দশ বৎসরে বৃদ্ধির হার সামান্য কমিলেও গত পঞ্চাশ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগেরও উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ, মাদ্রাজ ও পঞ্জাবে বর্তমানে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা অধিক।

ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

ভারতে গড় জন্ম-হার হাজারে প্রায় ৩৪ জন। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জন্মের হার দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভারতে

তাহা হইতেছে না। ভারতে বিবাহবিমুখতা বিরল। ভিক্ষুকেরাও বিবাহ করে। অল্প বয়সে বিবাহের বহুল প্রচলন আছে। ভারতের দরিদ্রতম শ্রেণীগুলি জীবনযাত্রার উন্নত মান লইয়া মাথা ঘামায় না। তাহারা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনের উপযুক্ত উপার্জন সম্ভব হইবে কিনা তাহা চিন্তা না করিয়াই বিবাহ করে এবং সংসার বৃদ্ধি করিতে থাকে।

ভারতে উচ্চ জন্মহার

ভারতে জন্মের হার না কমিলেও হিসাবে দেখা গিয়াছে যে গত ৩০ বৎসরে মৃত্যুর হার অনেক কমিয়াছে। এই উচ্চ জন্মের হার প্রায় অপরিবর্তিত থাকায় ও মৃত্যুর হার কমিবার দরুণ ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে।

ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা কি অতিরিক্ত?—এই প্রশ্নের উত্তরে সচরাচর জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনা করা হয়। ১৯০১ হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িয়াছে, খাদ্যের উৎপাদন সেই হারে বাড়ে নাই। বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। এই কমিশনের সহিত প্রায় সকলেই একমত যে ভারতের জনসংখ্যা খাদ্য সরবরাহকে অনেকদিন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অনেক আধুনিক অর্থ-বিদ্যাবিদের মতে জনসংখ্যা খাদ্য সরবরাহকে অতিক্রম করিলেই দেশে যে জনাধিক্য ঘটিয়াছে ইহা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং ভারতের জনাধিক্য সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত আছে। এই বিভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) পুরাতন বা ম্যাল্‌থুসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী; (২) আধুনিক কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাসী; (৩) যাঁহারা এই দুইয়ের মধ্যপথ দিয়া চলেন।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি খাদ্যের উৎপাদনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে

ম্যাল্‌থাসের মতে জনসংখ্যা খাদ্য সরবরাহকে অতিক্রম করিয়া গেলেই দারিদ্র্য, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দেয়। ভারতে ম্যাল্‌থুসীয় তত্ত্বের অনেক সমর্থক মিলে। ভারতে মৃত্যু-হারও খুব উচ্চ—হাজার করা প্রায় ২৫ জন। ভারতে শিশু-মৃত্যুর হার বিশেষ উচ্চ। প্রজননশীল বয়সের মেয়েদের মধ্যেও মৃত্যুর হার ভারতে খুব উচ্চ। ভারতে প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে খাদ্য ঘাটতি হইতেছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু রাখা ও বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করা ছাড়া গত্যন্তর নাই বলিয়া মনে হয়। লোক-গণনা হইতে জানা যায় যে ভারতের জনসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা ছাড়া কলেরা, বসন্ত, আমাশয়, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবও

ম্যাল্‌থুসীয় তত্ত্ব

ভারতে দেখা যায়। জনসাধারণ অনাহার, অর্ধাহার ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। লক্ষ লক্ষ লোক অপুষ্টিজনিত পুরাতন ব্যাধিতে ভোগে।

এই সমস্তই জনাধিক্যের লক্ষণ হিসাবে গণ্য হয়। ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে ভারতে জনাধিক্যের লক্ষণ দেশের সর্বাঙ্গে পাওয়া যাইবে। অনেকের বিশ্বাস ভারতের পক্ষে এত বিরাট জনসংখ্যার ভরণপোষণ অসম্ভব ব্যাপার। লোকে যদি আগামী কালের সংস্থান সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়াই সংসার পাতিতে থাকে, তাহা হইলে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, রোগ এবং মহামারী মারফৎ প্রকৃতি তাহার পরিশোধ লইবেই। ভারতে বর্তমানে ইহাই ঘটিতেছে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

ম্যাল্‌থুসীয় তত্ত্ব একটি হতাশাব্যঞ্জক তত্ত্ব। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মতে হতাশার বাস্তবিক কোন কারণ নাই। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে সমগ্র উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত তুলনা করা হয়—মাত্র খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত নয়। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া ডক্টর পি. জে. টমাস প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ বলেন যে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই। দেশে শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং যে হারে সম্পদের সৃষ্টি হইতেছে তাহা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের অপেক্ষা কম নয়। এই ধরণের মত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা আরও বলেন যে ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্য প্রকৃতি-নির্দিষ্ট নয়। সেচ, সার ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাসের সাহায্যে ভারতবর্ষের জমির উৎপাদিকা-শক্তি বহু গুণে বাড়ানো সম্ভব। শিল্পোন্নতির দ্বারা জমির উপর জনসংখ্যার চাপ কমানো যাইবে এবং দেশের সম্পদ বাড়ানো যাইবে। বর্ধিত সম্পদের বিনিময়ে বিদেশ হইতে খাদ্যের আমদানী সম্ভব হইয়া উঠিবে। উৎপাদিত সম্পদ ন্যায্যভাবে বণ্টিত হইলে জনগণের দারিদ্র্য বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইবে। জনসংখ্যার সমস্যা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যার সমস্যা নয়, ইহা উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায্য বণ্টনের সমস্যা। ভারতে শিক্ষার যত প্রসার হইবে এবং জীবনযাত্রার মান যত উন্নত হইবে, এবং লোকের, বিশেষ করিয়া নারীর, বিবাহের বয়স যতই পিছাইয়া যাইবে জন্ম-হারও ততই কমিতে থাকিবে। ভারতে বর্তমাম জন্ম-হারের উচ্চতা দেখিয়া ভয় পাইবার কিছু নাই। অবশ্য পরিবার প্রতিপালনের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রত্যেকেরই বিবাহ না করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া উহাকে কার্যকরী করাও

রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য। এইভাবে ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যায়।

যাঁহারা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাসী অথচ ম্যাল্‌থুসীয় তত্ত্বকে পুরাপুরি অগ্রাহ্য করেন না তাঁহাদের মতে শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যারও পরিকল্পনা প্রয়োজন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে জনসংখ্যাও যেন মাত্রা না ছাড়াইয়া যায়। ইহা না হইলে কোনরূপ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারাই ভারতে জনসংখ্যা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করা সম্ভব হইবে না—ক্ষণস্থায়ী সমাধান হইতে পারে মাত্র।

উভয় তত্ত্বের সমন্বয়

ভারতের জাতীয় সরকার এই মধ্যপথ দিয়া চলিতেছে মনে হয়। সরকারী উদ্যোগে যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে হাসপাতাল ইত্যাদির মাধ্যমে ‘পরিবার পরিকল্পনা’র জ্ঞান বিতরণের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০-৫১ হইতে ৫ বৎসরের জন্য মোট ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the chief factors which influence the growth of population in India? (C. U., 1937)

[**উত্তরের কাঠামো**ঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধি জন্ম-হার, মৃত্যু-হার এবং দেশান্তরগমনের উপর নির্ভরশীল। ভারতের জন্ম-হার অস্বাভাবিক রকমের উচ্চ—হাজার করা প্রায় ৩৪ জন। সকলেই বিবাহ করে এবং অধিকাংশ অল্প বয়সেই বিবাহ করে বলিয়া জন্ম-হার এত উচ্চ। জনসাধারণ জীবনযাত্রার খুব নীচু মানে অভ্যস্ত বলিয়া, তাহারা পরিবার প্রতিপালনের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখে না। ধর্মভীরুতা ও সংস্কারও অল্পবয়সে বিবাহ করিতে প্রণোদিত করে। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার কোন বালাই নাই, অল্প বয়সেই তাহারা রোজগার করিতে সুরু করে। এই ভাবে দারিদ্র্য জন্ম-হার বৃদ্ধির সহায়ক হয়, এবং লোকসংখ্যা বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যও বাড়িয়া যায়। ইহাই ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাপচক্র।

দেশান্তরগমনের দ্বারা ভারতে জনসংখ্যার চাপ কমানোর সম্ভাবনা খুবই কম। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল, এমন কি ব্রহ্মদেশেও ভারতীয়দের পক্ষে গিয়া বসতিস্থাপন করা বর্তমানে আর সম্ভব নয়। উপরন্তু, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল হইতে অনেক উদ্বাস্তু আসিয়াছে; আরও আসিতে পারে। ফলে ভারতের জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।]

2. What are the signs of over-population in a country? Is India over-populated? (C. U., 1951)

[**ইঙ্গিত**ঃ ম্যাল্‌থাসের মতে দারিদ্র্য, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জনাধিক্যের লক্ষণ। আধুনিকগণের মতে লক্ষণগুলি হইল উচ্চ জন্ম ও নিম্ন মৃত্যুহার এবং মাথা পিছু আয় কমিয়া যাওয়া।]

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ-ব্যবস্থা

যে কোন দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন প্রাকৃতিক পরিবেশের মত সামাজিক পরিবেশ দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। ভারতবাসীদের সম্পর্কে এই নিয়ম বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য। এই জন্যই ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ করিয়া প্রয়োজন। ভারতীয় সামাজিক পরিবেশ বলিতে প্রধানতঃ ভারতের সমাজ-সংগঠনের চারিটি দিক বুঝায়, যথাঃ—(১) জাতিভেদ প্রথা, (২) একান্নবর্তী পরিবার, (৩) উত্তরাধিকার আইন, এবং (৪) ধর্মের প্রভাব। সুতরাং ইহাদের প্রভাব সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে হইবে।

সামাজিক পরিবেশও জাতির অর্থ নৈতিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করে

জাতিভেদ প্রথা (The Caste System)ঃ

পুরুষানুক্রমে একই উপজীবিকায় প্রতিষ্ঠিত পরিবারসমূহের সমষ্টিকে 'জাতি' (Casto) বলে। পূর্বে যাহার যে জাতির মধ্যে জন্ম তাহাকে সেই জাতিরই পেশা গ্রহণ করিতে হইত। জাতিভেদ প্রথার ইহাই প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল। বর্তমানে অবশ্য এইরূপ কঠোরতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। কিন্তু এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতির মধ্যেই বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকে।

বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে সরলভাবে বর্ণবিভাগের ফলে চারিটি জাতির উদ্ভব হয়। তখন বোধ হয় জাতি জন্মানুসারে নির্ধারিত হইত না, কর্মানুসারে হইত। কালক্রমে সমাজ-বন্ধন কঠিন হইয়া পড়িল এবং মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধ ও বৃত্তি জন্মানুসারেই নির্ধারিত হইতে লাগিল। কর্মবিভাগ জটিল ও সূক্ষ্ম হওয়ায় চারিটির স্থলে অসংখ্য জাতির উদ্ভব হইল।

জাতিভেদ প্রথার অর্থ নৈতিক ফলাফল

জাতিভেদ প্রথার সুবিধাঃ ইহা শ্রমবিভাগের একটি সরল রূপ। প্রত্যেক পরিবারের একটি বিশিষ্ট ব্যবসায় বা পেশা থাকে। ফলে, পেশা বাছিয়া

লওয়ার জন্য দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হয় না। সমাজের বিভিন্ন নাগরিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা থাকে না। লোকে অল্প বয়সেই পিতৃপুরুষের ব্যবসায় বা পেশা আয়ত্ত করিয়া ফেলে। পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতার ফলে শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সেই দক্ষতা বংশ-পরম্পরায় রক্ষিত হয়। পরিবার শিল্পবিদ্যালয় হইয়া দাঁড়ায় এবং পুত্র পিতার কাছে শিক্ষানবিশী করিতে পারে। পূর্বকালে প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব পেশাগত সংগঠন থাকিত। এই সংগঠন মহাজন ও শিক্ষানবিশ শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট করিয়া দিত এবং উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষের মান ও দাম ঠিক করিয়া দিত। এক জাতির লোকেদের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি হইত এবং তাহারা পরস্পরকে আপদে বিপদে সাহায্য করিত। জাতিভেদ প্রথা রক্তের বিশুদ্ধতাও বজায় রাখিতে কতকটা সাহায্য করিয়াছিল।

১। সুফল

জাতিভেদ প্রথার ত্রুটি ঃ ইহা বর্তমান কালের সঙ্গে খাপ খায় না। পুরুষানুক্রমিক শ্রমবিভাগে প্রতিভার অপচয় হয়। একজন প্রতিভাবান লোক জাতিতে তাঁতী হইতে পারে। জাতিভেদ মানিতে গেলে এই লোকটিকে তাঁতই বুনিতে হইবে; ফলে প্রতিভার অপচয় ঘটিবে। জাতিভেদ প্রথার বন্ধন কঠিন হওয়ার দরুণ, তাহার পক্ষে সেই বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অন্যত্র প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অন্বেষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। শ্রমের বিভিন্নমুখী গতি বা সচলতা (mobility of labour) রুদ্ধ করিয়া জাতিভেদ প্রথা সমাজকে প্রগতি-বিমুখ অচলায়তন করিয়া তোলে। এই প্রথা বজায় থাকিলে উচ্চাশা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, নূতন নূতন মতবাদ মাথা তুলিতে পারে না এবং কর্মোদ্যম ও উদ্যোগ নিরুৎসাহিত হয়। বৃহদায়তনে উৎপাদনও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিযোগিতা না থাকায় দক্ষতা বৃদ্ধির তাগিদ থাকে না। উঁচু জাতির লোকেরা দৈহিক পরিশ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখে। যে সব জাতি অপরিচ্ছন্ন, নীচু কাজ করে, তাহারা সমাজে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হয়। সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি প্রশ্রয় পায়। জাতীয় ঐক্যের চেতনা বড় দুর্বল হয়।

২। কুফল

আধুনিক ভারতে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ও গলদগুলিকে বহুল পরিমাণে দূর করিয়াছে। শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে আর অন্ধভাবে পিতৃপুরুষের পেশা আঁকড়াইয়া ধরে না। বিভিন্ন জাতির

মধ্যে সহভোজন ও সামাজিক মেলামেশার উপর যে সব বিধি-নিষেধ আছে তাহা বড় বড় শহরগুলিতে বহুল পরিমাণে শিথিল হইয়াছে। কিন্তু তবুও জাতিভেদ প্রথা এখন পর্যন্ত ভারতের পক্ষে একটি বিরাট অকল্যাণ স্বরূপ।

জাতিভেদ প্রথা ক্রমে ভাঙিয়া পড়িতেছে

একান্নবর্তী পরিবার (Joint Family):

ইউরোপে সাধারণতঃ স্বামী, স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানদের লইয়া একটি পরিবার গঠিত হয়। ছেলেরা উপযুক্ত হইয়া নিজস্ব পরিবার প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ভারতে পরিবারের আয়তন আরো বৃহৎ। বয়োজ্যেষ্ঠ যে সে-ই পরিবারের কর্তা হয়। তাহার পুত্র-পৌত্রেরা নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র সহ তাহার সঙ্গে বাস করে। কন্যা, ভগিনী ও মাতৃস্থানীয়া বিধবারা এবং অনেক ক্ষেত্রে সধবারাও এইরূপ পরিবারে আশ্রয় পায়। এইরূপ যৌথ পরিবারে সকলের উপার্জন একত্র করিয়া সংসার চালানো হয় এবং সকলেই একান্নবর্তী হয়। একান্নবর্তী পরিবারের সভ্যদের শুধু নিজেদের সন্তানের প্রতি নয়, ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতিও অর্থনৈতিক কর্তব্য থাকে।

যৌথ পরিবার প্রথার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

একান্নবর্তী পরিবারের সুবিধা: যৌথ পরিবারের আদর্শ সমবায় সমিতির আদর্শের সহিত তুলনা করা চলে। উপার্জন নির্বিশেষে সকলেই সমান সুবিধা পায় এবং আপদে বিপদে সমান সাহায্য ও যত্ন পায়। ভারতে রাষ্ট্র নাগরিকদের আপদে বিপদে সাহায্য করিবার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। অসুস্থতা ও বেকারত্বের দরুণ রাষ্ট্র হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের সভ্যেরা অসুস্থ, বেকার বা অঙ্গহানির দরুণ অকর্মণ্য হইয়া পড়িলে পরিবারের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারে। ইহার ফলে নিরাপত্তাবোধ জন্মে। প্রত্যেকেই জানে যে সে অসুস্থ হইলে, বেকার হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ নাই—পরিবারের আর সকলে তাহার ও তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের ভার লইবে। একান্নবর্তী পরিবারের মারফৎ এইভাবে সামাজিক নিরাপত্তা সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভবপর হয়। একান্নবর্তিতা পারস্পরিক সাহায্য, ত্যাগ ও সহযোগিতা শিক্ষা দেয়। একসঙ্গে কয়েক জন ভাই বা আত্মীয়-স্বজন মিলিয়া কারবার সুরু

যৌথ পরিবার প্রথার সুবিধা

করিলে যথেষ্ট সুবিধা হয়। লোকবল থাকায় কর্মচারী নিয়োগের খরচ বাঁচিয়া যায় এবং প্রথম দিকে বেশ কম খরচেই কারবারের পত্তন করা যায়। বহু লোক এক সঙ্গে বাস করে বলিয়া আহারাদির ব্যয় মাথাপিছু অনেক কম হয়। কৃষির দিক দিয়া একান্নবর্তী পরিবার প্রথা জোতের খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার পথে দাঁড়াইয়াছে।

একান্নবর্তী পরিবারের অসুবিধা : একান্নবর্তী পরিবারের ত্রুটিও বহু। মোটের উপর এই প্রথা ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগ ও উদ্যমকে নিরুৎসাহিত করে।

যৌথ পরিবার প্রথার অসুবিধা

পারিবারিক বন্ধন ও আনুগত্য প্রায়ই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদ্যমের পরিপন্থী হয়। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন অনেকেই কয়েকজন উপার্জনশীলের উপর নির্ভর করিয়া আলস্যে কাল কাটায়। এইরূপ বড় পরিবারে হিংসা, ঝগড়া প্রভৃতি নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। এইরূপ পরিবারে সঞ্চয় কঠিন হইয়া পড়ে, ফলে মূলধন গঠিত হয় না। মূলধন থাকিলেও লোকে পরিবারের দিকে চাহিয়া বিনিয়োগ করিতে ভয় পায়। ফলে দেশে উৎপাদন ব্যাহত হয়। একান্নবর্তী পরিবারে লোকে স্বাবলম্বী না হইয়াও বিবাহ করিতে ভরসা পায়, কারণ সে জানে যে পরিবার তাহার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবে। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইহাও একটি কারণ। আধুনিক যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রীতির চাপে পড়িয়া ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রভাবে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা দ্রুত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

উত্তরাধিকার আইন (Laws of Inheritance) :

ভারতে সাধারণতঃ পৈতৃক সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হয়। মিতাক্ষরা আইন অনুসারে জন্মমাত্র পুত্র পরিবারের অন্যান্যদের সমান অংশীদার হইয়া দাঁড়ায়। মুসলমানদের মধ্যে মেয়েরাও নির্দিষ্ট হারে সম্পত্তির অংশ পায়। হিন্দু-সংহিতা আইন পাশ হইলে হিন্দুদের মধ্যে মেয়েরাও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে।

উত্তরাধিকার আইনের অর্থনৈতিক ফলাফল

এইরূপ উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত থাকার ফলে একজনের হাতে সকল ধন কেন্দ্রীভূত হইতে পারে না। ফলে বৃহদায়তনে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এইরূপ উত্তরাধিকারের ফল কৃষির পক্ষেও শুভ নয়। চাষের জমি ক্রমাগত খণ্ডিত হইতে থাকায় কৃষি-খামারের 'একক' (Unit) জমিগুলি ক্ষুদ্র ও চাষের পক্ষে ব্যয়বহুল

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে খণ্ডিত ও অংশবদ্ধ জমি ভারতীয় কৃষির অন্যতম প্রধান সমস্যা। উত্তরাধিকার আইনের জন্য ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে মামলাপ্রীতি দেখা যায়। এই মামলাপ্রীতি কৃষকের জীবনের এক অভিশাপ স্বরূপ।

ধর্মের প্রভাব (Influence of Religion) :

পাশ্চাত্ত্য দেশীয়েরা অনেক সময়েই বলে যে ধর্মের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকার দরুণ ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। হিন্দু ধর্মের মতে ইহলোকে দুঃখ থাকিবেই এবং পরলোকে সুখের আশাই একমাত্র ভরসা। সেইজন্য হিন্দু ধর্ম ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা করিতে শিক্ষা দেয়। ধর্মের এইরূপ প্রভাবেই ভারতীয় জনগণ উচ্চশিক্ষাবিহীন এবং উদ্যমবিমুখ। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদের এইসব যুক্তি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত। সব ধর্মই, এমন কি খৃষ্টধর্মও মানুষকে বস্তুগত সুখ তুচ্ছ করিতে শিখায়। এইরূপ শিক্ষাদান শুধু মাত্র হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য নয়। ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা শিল্প-বাণিজ্যের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত। ভারতের ব্যবসায়ীদের উদ্যোগের অভাবের মূল কারণ হইল পরাধীনতা। বিদেশী শাসনই এতকাল যাবৎ শিল্পোন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ধর্মান্ধতা ও বদ্ধমূল সংস্কার বহুল পরিমাণে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছে।

হিন্দুধর্মের অর্থনৈতিক ফলাফল

সামাজিক প্রথা (Social Customs) :

ভারতে পিতৃদায়, মাতৃদায়, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ এবং ধর্ম সম্পর্কিত নানা রকম পূজাপার্বণ ও ব্রত অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। ইহার জন্য আত্মীয়, বন্ধু ও ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি করাইবারও পদ্ধতি আছে। এই সমস্ত পদ্ধতি ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ। কিন্তু ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের অধিবাসীদের পক্ষে এইরূপ ব্যয়বাহুল্যের জন্য ঋণের অঙ্ক না বাড়ানোই কাম্য। ইহার ফলে ভারতের অবনতি অনেকাংশে ঘটিয়াছে। সেইজন্য আজ উদার মতের সাহায্যে আড়ম্বর হইতে ভক্তির প্রাধান্য প্রচার করিবার দিন আসিয়াছে।

সামাজিক প্রথাসমূহের কুফল

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the economic aspects of the Joint Family and the Caste systems in India. (C. U., 1935) (২১৭-২২০ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Discuss the economic significance of the Caste system in India. (C. U., 1945) (২১৭-২১৯ পৃষ্ঠা দেখ)

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষি

ভারতের শস্য (Crops of India) :

ভারতবর্ষের ফসলকে মোটামুটি তুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : (১) খাদ্য-শস্য এবং (২) বাণিজ্যিক (Commercial) ফসল।

খাদ্য-শস্য (Food-Crops) :

খাদ্য-শস্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান।

ধান্য : অধিকাংশ ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ভাত, কাজেই ধানই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শস্য। মোট কর্ষিত জমির শতকরা প্রায় ৩৯ ভাগে ধান উৎপন্ন হয়। ১৯৫১ সালে মোট ধানের জমি ছিল ৭৫৪ লক্ষ একর এবং ২০৩ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। বন্যার জল আসিতে পারে এইরূপ নিম্ন ভূমিতেই ধান ভাল হয়। পলিমাটি ধান চাষের খুব উপযোগী। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ ও আসামে অধিকাংশ ধানের জমি রহিয়াছে। ধান উৎপাদনের দিক দিয়া ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। কিছুদিন পূর্বেও মোট উৎপন্ন ধানের শতকরা প্রায় ১ ভাগ সিংহল, আরব ও আফ্রিকায় রপ্তানী হইত। বর্তমানে ভারতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাতে ভারতেরই প্রয়োজন মিটে না।

গম : উত্তর ভারতের লোকের প্রধান খাদ্য গম। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মাটিতে গম ভাল হয়। গম একটি শীতকালীন ফসল এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ইহার পক্ষে প্রশস্ত। গমের চারা বড় হইবার সময় আবহাওয়া আর্দ্র ও শীতল থাকা চাই। কিন্তু চারা বড় হইলে রৌদ্রোজ্জ্বল, গরম আবহাওয়া ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই এবং মধ্যভারতে বেশী গম

চাষ হয়। ১৯৫০ সালে মোট গমের জমি ছিল ২৩৯ লক্ষ একর এবং মোট ৬৫ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে সাধারণতঃ উৎপন্ন গমের শতকরা প্রায় ৩ ভাগ প্রতি বৎসর বিদেশে চালান যাইত। বর্তমানে ভারতের জন্য বিদেশ হইতে গম আমদানী করিতে হয়।

বর্তমানে ভারতের জন্য বিদেশ হইতে চাউল ও গম আমদানী করিতে হয়।

অন্যান্য খাদ্য-শস্যের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, যব, ইক্ষু ও ভুট্টা উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই, হায়দরাবাদ এবং মাদ্রাজে জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। প্রায় ১০০ লক্ষ একর জমিতে জোয়ার, বাজরা ও ভুট্টা প্রভৃতির চাষ হয়। অত্যন্ত শুষ্ক জমিতেও জোয়ার ও বাজরার চাষ সম্ভবপর। যব শীতকালীন ফসল। ইহা প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পঞ্জাবে উৎপন্ন হয়। ভুট্টার চাষ হয় ভারতের প্রায় সর্বত্র, বিশেষভাবে উত্তর ভারতে। এই সকল খাদ্যশস্যের বাৎসরিক উৎপন্নের পরিমাণ প্রায ১৪০ লক্ষ টন।

ইক্ষু ঃ ইক্ষু চাযের জন্য প্রচুর জল ও গরম আবহাওয়ার প্রয়োজন। বিহার, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও পশ্চিম বঙ্গ ইক্ষু চাযের প্রধান কেন্দ্র। ভারত পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে ইক্ষুর বৃহত্তম উৎপাদক ; কিন্তু প্রতি একরে গড়ে যে পরিমাণ ইক্ষু পাওয়া যায় তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। ভারতের জমিতে প্রতি একরে ইক্ষু উৎপাদন যবদ্বীপের এক-যষ্ঠাংশ মাত্র। আজকাল উন্নততর শ্রেণীর ইক্ষুর চাষ ভারতে প্রবর্তিত হইতেছে। বর্তমানে উৎপন্ন ইক্ষুর পরিমাণ ৫৬ লক্ষ টন।

কারবারী বা বাণিজ্যিক ফসল ঃ

বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান।

তুলা ঃ তুলা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকায় তুলার ফসল খুব ভাল হয়। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পঞ্জাব ও মাদ্রাজে তুলা সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। ১৯৫১ সালে মোট তুলার জমি ছিল ১৩৮ লক্ষ একর এবং মোট ২৯ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতীয় তুলা সাধারণতঃ ছোট আঁশের। কিন্তু লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। পূর্বে ভারতবর্ষে উৎপন্ন তুলার অর্ধেকেরও উপর বিদেশে রপ্তানী হইত। গত যুদ্ধের জন্য তুলার জাপানী বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য তুলার চাষ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। আজকাল ভারতীয় ইউনিয়নে

উৎপন্ন তুলার সম্পূর্ণ অংশই ভারতের কলগুলিতে ব্যবহৃত হয়। ভারতকে বহু পরিমাণে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। পাকিস্তান হইতে ভারতকে যে তুলা আমদানী করিতে হয় তাহার বেশীর ভাগই লম্বা আঁশযুক্ত তুলা।

পাট ঃ ভারতবর্ষ পাটের একচেটিয়া উৎপাদক ছিল। ভারতীয় ইউনিয়নে ইহা প্রধানতঃ পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত অঞ্চলে এবং সামান্য পরিমাণে বিহারে ও উড়িষ্যায় উৎপন্ন হয়। আর্দ্র অথচ উষ্ণ জলবায়ু এবং পলিমাটি পাট চাষের উপযোগী। বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমিতে পাট উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্নের পরিমাণ প্রায় ৩৩ লক্ষ গাঁইট।

বর্তমানে মোট উৎপন্নের শতকরা ৭৩ ভাগ পাকিস্তানে ও শতকরা ২৭ ভাগ ভারতে হয়। পাটের কলগুলির অধিকাংশই কিন্তু ভারতে অবস্থিত। পাট প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। অবিভক্ত ভারতে বাংলা সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল। এইরূপ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল চাহিদার সঙ্গে যোগানের সমতা রক্ষা করা, যাহাতে দাম না পড়িয়া যায়। পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য লইয়া মাঝে মাঝে গোলযোগ হওয়ার জন্য এবং পাকিস্তানী পাটের দর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ভারতে পাট চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্যে আমেরিকা হইতে ভারতীয় পাট এবং পাট হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষ বাড়াতে পাট চাষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমেরিকার চাহিদার পরিমাণ কিছুদিন যাবৎ কমিয়া আসিয়াছে, ফলে পাটের দরও পড়িয়া গিয়াছে। চাহিদা কমা সত্ত্বেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে পাটের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে যে, ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৫৪ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

তৈলবীজ ঃ উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে তিসি, চিনাবাদাম এবং ভেরেণ্ডা বীজ প্রধান। বর্তমানে উৎপন্ন তৈলবীজের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টনেরও উপর। তিসি প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গে উৎপন্ন হয়। চিনাবাদাম প্রধানতঃ মাদ্রাজে উৎপন্ন হয়। ভেরেণ্ডা বীজ উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, পঞ্জাব ও উড়িষ্যায় উৎপন্ন হয়। তিলের চাষ হয় বোম্বাই এবং মাদ্রাজে। প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানী হয়।

চা ঃ পৃথিবীর মধ্যে ভারতই সম্ভবতঃ চায়ের সবচেয়ে বড় উৎপাদক ; এই বিষয়ে একমাত্র চীন ভারতের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী। সাধারণতঃ পার্বত্য এলাকায়

চায়ের চাষ হয়। সুজলা, অথচ জল দাঁড়াইতে পারে না, এইরূপ জমি চায়ের চাষের উপযোগী। তাহা ছাড়া জলবায়ু উষ্ণ হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম বঙ্গ ও আসামই চা উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল। ১৯৫১ সালে প্রায় ৮ লক্ষ একর জমিতে চায়ের চাষ হইয়াছিল এবং মোট ৬২২০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্তমান পাকিস্তানে উৎপন্নের পরিমাণ প্রায় ৫৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতীয় চায়ের শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী বিদেশে রপ্তানী হয়।

অন্যান্য ফসল ঃ ভারতবর্ষ তামাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক। প্রধানতঃ বিহার ও বোম্বাই প্রদেশে তামাক উৎপন্ন হয়। তামাকের বাৎসরিক গড় উৎপাদন প্রায় ৩ লক্ষ টন। মহীশূর, মাদ্রাজ, কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুরে কফি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন কফির অধিকাংশই বিদেশে চালান যায়। উত্তর প্রদেশে সরকারী লাইসেন্সের আওতায় আফিমের চাষ হয়। আজকাল আফিমের চাষ ভয়ানক ভাবে কমিয়া গিয়াছে। নীলগিরি এবং দার্জিলিং-এ সিন্‌কোনা চাষ হয়। সিন্‌কোনা চাষে সরকারের একচেটিয়া অধিকার। মাদ্রাজ, মহীশূর এবং কুর্গে রবার উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে উৎপন্ন রবারের মাত্র শতকরা ২ ভাগ ভারতে উৎপন্ন হয়। পরিমাণে কম হইলেও ভারতে উৎপন্ন রবার অতি উত্তম। এককালে ভারতে প্রচুর নীলের চাষ হইত। কিন্তু জার্মানীতে কৃত্রিম রাসায়নিক রঙ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে নীলের চাষ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখন প্রধানতঃ বিহারে নীলের চাষ হয়।

ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ (Defects of Indian Agriculture) ঃ

ভারতে কৃষির অনগ্রসরতা

ভারতে কৃষি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। ভারতের জমিতে প্রধান প্রধান ফসলের একর প্রতি উৎপাদনশীলতা অন্যান্য দেশের একর প্রতি উৎপাদনশীলতার সঙ্গে তুলনা করিলে এই পশ্চাৎপদ অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়। যবদ্বীপ ভারতের অপেক্ষা একর প্রতি ৬ গুণ বেশী ইক্ষু উৎপাদন করে। চীনে ও জাপানে একর প্রতি আমাদের অপেক্ষা তিন গুণ বেশী ধান উৎপন্ন হয়। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং সোভিয়েট রাশিয়াতে একর প্রতি গমের উৎপাদন ভারতের তুলনায় বহুগুণ বেশী।

নানা কারণে ভারতের কৃষি পশ্চাৎপদ। এই কারণগুলি জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—এই চার পর্যায়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়। প্রথমে জমির

দিক হইতে দেখা যাক। ভারতে জমি উন্নত ধরণের কৃষিকার্যের সহায়ক নয়। অনেক অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অল্প ও অনিশ্চিত এবং সেচের পর্যাপ্ত সুবিধা এখন পর্যন্ত নাই। ভারতে পর্যাপ্ত সার ব্যবহার করা হয় না। আজ পর্যন্ত ভারতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার একরকম অজ্ঞাত বলিলেই চলে। একমাত্র গোবরই সহজলভ্য সার; তাহাও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিয়া অপচয় করা হয়। ফলে ভারতীয় জমির উৎপাদিকা-শক্তি ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। কৃষিকার্য ক্ষুদ্রায়তনে করা হয়। জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার (sub-division and fragmentation) দরুণ নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। জমির উপর জনসংখ্যার চাপও অত্যন্ত বেশী। শ্রমিক বা কৃষকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই ভূমিস্বত্ব বিষয়ক আইনগুলির কথা মনে হয়। ভারতের ভূমিস্বত্ব বিষয়ক আইনসমূহ অবিবেচনা-প্রসূত। এই সব আইনের দৌলতে প্রকৃত চাষী অর্থনৈতিক ভাবে এমন একদল লোকের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা শুধু খাজনা আদায় করিয়াই কর্তব্য সম্পন্ন করে। কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং অজ্ঞতা রহিয়াছে। তাহারা মহাজনের কাছে ঋণে ডুবিয়া থাকে। আর কোন কাজ না থাকায় বৎসরের কয়েক মাস কৃষকদিগকে অলস থাকিতে হয়।

অনগ্রসরতার কারণ:

১। অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ও সেচের ব্যাপক ব্যবস্থার অভাব

২। জমির উর্বরতা হ্রাস এবং খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা

৩। ভূমিস্বত্ব বিষয়ক আইন

৪। কৃষকের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও ঋণ

তারপর আছে মূলধন ও সংগঠনের কথা। কৃষির সরঞ্জাম ও পদ্ধতি একেবারে আদিম। কৃষিকার্যে ব্যবহৃত মূলধনের পরিমাণ খুব কম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি প্রায় অজ্ঞাত। পিতৃপিতামহের যুগ হইতে সেই লাঙ্গল ও এক জোড়া বলদ দিয়া ভারতের চাষী চাষ করিয়া আসিতেছে। কৃষকদের ফসল বিক্রয় করিবার প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি ভয়ানক অসুবিধাজনক। কৃষকেরা ফসলের উপযুক্ত দাম পায় না। দারিদ্র্য ও ঋণের তাড়নায় তাহাদিগকে মাঠ হইতে ফসল ঘরে উঠিতে না উঠিতেই অপেক্ষাকৃত কম দামে মহাজন ও ফড়িয়াদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে হয়।

৫। পুরাতন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য

৬। ফসল বিক্রয়ে অব্যবস্থা

প্রতিবিধানঃ সস্তায় কৃষকদিগকে রাসায়নিক সার সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সরকারের 'ফার্টিলাইজার' শিল্প প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। সিন্ধ্রীতে সার তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করিয়া সরকার এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। তেলের কল শিল্প আরও প্রসারিত হইলে, কৃষকেরা সারের জন্য আরো বেশী খইল পাইতে পারিবে। জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিয়া গোবরের অপচয় করা উচিত নয়। এ বিষয় কৃষকদের বুঝাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের সস্তায় অন্য জ্বালানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন অধিকতর কয়লা ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছে। 'কম্‌পোষ্ট্‌' সার তৈয়ারীর চীনা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও সারের যোগান বাড়ানো যাইতে পারে। ব্যাপকভাবে সেচের খাল খনন করিতে হইবে এবং নলকূপ বসাইতে হইবে। রাষ্ট্রকেই উদ্যোগী হইয়া ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত, অসম্বদ্ধ ক্ষেত্রগুলিকে জোর করিয়া একত্রিত করিতে হইবে এবং সমবায়ের ভিত্তিতে যৌথ খামার সংগঠিত করিতে হইবে। পঞ্জাবের ন্যায় সমবায় ব্যবস্থা দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করা যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে অনুরূপ আইনও পাশ করিতে হইবে। রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ও সমবায় ঋণদান সমিতির মারফৎ কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সস্তায় ভাল বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি কিনিতে এবং ন্যায্য দামে ফসল বিক্রয় করিতে সাহায্য করার জন্য বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট (multi-purpose) সমবায় সমিতি গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই শ্রেণীর সমবায় সমিতির পক্ষে সম্ভব না হইলে সরকারকেই অগ্রণী হইয়া শস্যভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান প্রধান ফসলের নিম্নতম দাম বাঁধিয়া দেওয়া ও গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত বাজারের পত্তন করাও প্রয়োজন। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাষ্ট্রের উদ্যোগে কৃষিবিষয়ে গবেষণা চালাইতে হইবে এবং বক্তৃতা ও আদর্শ খামারের মারফৎ কৃষকদিগকে এই গবেষণার ফলাফল দেখাইয়া দিতে

প্রতিবিধান :

১। সার ব্যবহার দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি

২। সেচের ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন

৩। খণ্ড খণ্ড জমিকে একত্রীকরণ

৪। কৃষককে অল্প সুদে ঋণ-দানের ব্যবস্থা

৫। ফসল বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতি

৬। কৃষিবিষয়ক গবেষণা

হইবে। পরিশেষে, কৃষির উন্নতির জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতে হইবে।

৭। পরিকল্পনা

ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য রাষ্ট্র কি করিয়াছে (The State in relation to Indian Agriculture) :

যদিও কৃষি সম্বন্ধে অবলম্বিত সরকারী নীতি ভারতের কৃষির অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে কৃষির উন্নতির জন্য ইংরাজ আমল হইতে ভারত সরকার বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। সরকারের চেষ্টায় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সেচের ব্যবস্থা ভারতে নির্মিত হইয়াছে। অসম্বদ্ধ ক্ষেত্রগুলি একত্রিত করার অনুকূলে আইন পাশ হইয়াছে। পঞ্জাবের মত অনেক অঞ্চলে সরকার সমবায় সমিতিগুলির মারফৎ অসম্বদ্ধ ক্ষেত্রগুলি একত্রিত করার চেষ্টা করিয়াছে। সরকারী উদ্যোগে কৃষি স্কুল ও কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কৃষিমূলক গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর সভাপতিত্বে কৃষি সম্বন্ধীয় রাজকীয় কমিশনের অনুমোদনে দিল্লীতে 'Imperial Council of Agricultural Research' স্থাপিত হয়। এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে কৃষিমূলক গবেষণা চলে। পরিষদ কয়েকটি কমিটির মারফৎ গবেষণা কাজ চালায়। গবেষণার কল্যাণে নূতন ও উন্নততর শ্রেণীর ইক্ষু, পাট, গম প্রভৃতি ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যেই একটি কৃষি বিভাগ আছে। এই বিভাগের মারফৎ সাধারণের কাছে কৃষি গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা করা হয় এবং আদর্শ খামার পরীক্ষা কেন্দ্রে হাতে কলমে দেখাইয়া দেওয়া হয়। কৃষি বিভাগের মারফৎ উৎকৃষ্ট বীজ এবং সার বিক্রয় করা হয়। পশু-চিকিৎসা বিভাগ গো-মহিষের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখে। উন্নত প্রজনন ব্যবস্থার মারফৎ ভারতীয় গো-মহিষের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্যও সরকার সচেষ্ট হইয়াছে। কৃষকেরা যাহাতে অল্প সুদে টাকা ধার পায়, সেজন্য সরকার 'তাকাভি' ঋণ দেয়। সরকারের চেষ্টায় ব্যাপকভাবে জমিবন্ধকী

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে কৃষির উন্নতির জন্য রাষ্ট্র কি করিয়াছে :

১। সেচ-ব্যবস্থা

২। খণ্ড খণ্ড জোতগুলিকে একত্রীকরণের চেষ্টা

৩। কৃষি-বিষয়ক গবেষণা

৪। উৎকৃষ্ট বীজ ও সার সরবরাহ

৫। গো-মহিষের উৎকর্ষ বৃদ্ধি

৬। ঋণদানের ব্যবস্থা

ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ঋণদান সমিতি গঠিত হইয়াছে। ফসলের বাজার যাহাতে কৃষকের অনুকূল হয় সেজন্য সরকার তুলা ও গমের নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং কৃষিজ বিপণন বিভাগ (Agricultural Marketing Department) স্থাপন করিয়াছে। ইহা ছাড়াও ঋণদান আইন পাশ করিয়া, দুর্ভিক্ষ নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া, গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়া সরকার কৃষির উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে।

৭। কৃষিজ বিপণন বিভাগ

৮। কুটির শিল্পের উন্নতি

কিছুকাল আগে ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য খারেগাট্ প্ল্যান্ নামে এক পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার লক্ষ্য ছিল, দশ বৎসরের মধ্যে কৃষির উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ এবং ১৫ বৎসরের মধ্যে ১০০ ভাগ বর্ধিত করা। এই উদ্দেশ্যে সরকার এককালীন ১০০০ কোটি টাকা এবং ইহা ছাড়াও প্রতি বৎসর ২০ কোটি টাকা খরচ করার প্রস্তাব করিয়াছিল। জিনিসপত্রের যুদ্ধপূর্ব দামের ভিত্তিতে সরকারী পরিকল্পনায় এই খরচের হিসাব দাঁড় করানো হইয়াছিল। এই পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল: রাসায়নিক সারের উৎপাদন ও সরবরাহ; বীজের খামার স্থাপিত করিয়া বীজের উন্নতি সাধন; সেচ ও জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত; আবর্তন (rotation) পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন প্রচলন; জমির উর্বরতাক্ষয় নিবারণ; গো-মহিষের উন্নতি; পতিত জমি উদ্ধার এবং কৃষকদের ফসল বিক্রয়ের উন্নততর ব্যবস্থা।

খারেগাট্ পরিকল্পনা

এখন পর্যন্ত কৃষির উন্নতির জন্য সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। ভারতে কৃষির অনগ্রসরতার ইহাই অন্যতম কারণ। কৃষির উন্নতির জন্য ইংরাজ সরকার কখনো পূর্ণ উদ্যমের সহিত কাজ করে নাই। পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলেও পরিকল্পনাকে কার্যকর করা হয় নাই। খারেগাট্ পরিকল্পনা নিষ্ঠার সহিত কাজে পরিণত করিলে ভারতীয় কৃষকদের অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিত।

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের দৃষ্টি স্বভাবতঃই কৃষির দিকে পড়ে। জাতীয় সরকার কৃষির উন্নতির জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। এই পরিকল্পনার নাম হইল 'শস্য উৎপাদনের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা।' এই পরিকল্পনা

স্বাধীনতা লাভের পর কৃষির উন্নতির জন্য জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টা

অনুযায়ী ভারতে কৃষির উন্নতির বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলি হইল :

(ক) সার উৎপাদন : সিন্ত্রীতে সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানায় দৈনিক গড়ে ১০০০ টন করিয়া সার উৎপাদন করা সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। বর্তমানে ইহারও অধিক উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাস হইতে কারখানা চালু হইয়াছে।

(খ) বহু উদ্দেশ্যবিশিষ্ট নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা : জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই সকল পরিকল্পনাকে তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

(গ) বীমা : শস্য, গবাদি পশু ও গৃহাদি সংক্রান্ত বিষয়ে বীমাপ্রথা প্রবর্তন করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

(ঘ) অনাবাদী জমির পুনরুদ্ধার : বিভিন্ন হিসাব অনুসারে ভারতে ৬ কোটি হইতে ৯ কোটি একর অনাবাদী জমি আছে। ভারত সরকার সেগুলি আবাদী জমিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ব-ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৃষি সম্পর্কিত পরিকল্পনাকে দুই-ভাগে ভাগ করিয়া নিম্নে আলোচনা করা হইল : (১) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কৃষি, এবং (২) সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৃষি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কৃষি (First Five Year Plan in relation to Agriculture) :

পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে

বলা হইয়াছে যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার মোট ব্যয় প্রায় ২০৬৮ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে ৩৬০ কোটি টাকারও উপর বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে ৫৬১ কোটি টাকার উপর। পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৫-৫৬

সালের মধ্যে খাদ্যশস্য ও বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইবে। অনুমান করা হইয়াছে যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িবে শতকরা ১৪ ভাগ, তুলার শতকরা ৪২ ভাগ, পাটের শতকরা ৬৩ ভাগ, ইক্ষুর শতকরা ১২ ভাগ এবং তৈল-বীজের শতকরা ৮ ভাগ। এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে তাহার মধ্যে সেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা, কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি, অনাবাদী জমির পুনরুদ্ধার এবং কৃষি-বিষয়ক গবেষণার ফল ইত্যাদিকে কাজে লাগাইয়া উন্নততর পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বনসম্পদ ইত্যাদি প্রকৃতির দানকে সংরক্ষণের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। গবাদি পশু পালন ও দুগ্ধ ব্যবসায় প্রভৃতি ও গ্রাম্য-শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা দ্বারা কৃষিশিল্পের প্রসার ও ইহার নূতন রূপ দিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হইবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৃষি (Community Development Project in relation to Agriculture):

গ্রাম বা সমাজ উন্নয়নই হইল পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নই সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সমাজ উন্নয়নের মাধ্যমেই গ্রাম্য-জীবন সম্বন্ধে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে রূপ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে কতকগুলি অঞ্চল নির্বাচিত করা হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলে অনাবাদী জমির পুনরুদ্ধার, সেচের ব্যবস্থা, কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি, উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য প্রভৃতি প্রচলিত পন্থাসকল অবলম্বন দ্বারা কৃষির উন্নয়নের পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া হইতেছে। ১৯৫২ সাল হইতে সমাজ উন্নয়নের কাজ সুরু হইয়াছে এবং যে সকল অঞ্চলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাদের জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

কতকগুলি নির্বাচিত অঞ্চলে সমাজ উন্নয়নের কার্য সুরু হইয়াছে

জোত বা জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Sub-division and Fragmentation of Holdings):

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্যই হইল রীতি; কিন্তু ভারতের

কৃষি ক্ষুদ্রায়তনে সম্পন্ন হয়। কিছুদিন পূর্বের হিসাবে দেখা গিয়াছিল যে পরিবার হিসাবে জমির পরিমাণ পশ্চিম বঙ্গে ৩ একরের কিছু বেশী এবং মাদ্রাজে মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র এক 'একর'। ভারতীয় 'ইউনিয়নে' গড়ে প্রতি কৃষক-পরিবারের প্রায় ৪ একর করিয়া জমি আছে। তুলনায় ইংলণ্ডে এক জনের জমির আয়তন ৬০ একর এবং আমেরিকায় প্রায় ১৫০ একর। কৃষকের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্রদের মধ্যে ক্ষেতগুলি ভাগাভাগি হয়। ফলে যতই দিন যাইতেছে জনপ্রতি জমির পরিমাণ ততই কমিয়া যাইতেছে। ইহাকেই জমির খণ্ডীকরণ বলে। শুধু তাহাই নয়; কৃষকের সকল জমি একটি মাত্র ভূখণ্ডে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে না। ছোট ছোট খণ্ড হিসাবে ক্ষেতের জমি বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো থাকে। ইহাকেই জমির অসম্বদ্ধতা বলা হয়।

খণ্ডীকরণ কাহাকে বলে ?

অসম্বদ্ধতা কাহাকে বলে ?

কারণঃ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের সমস্ত প্রাচীন শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেজন্য বর্তমানে জনসংখ্যার অধিকাংশকে জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয়। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে জনপ্রতি জমির পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন অনুসারে পিতার মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার প্রসারের দরুণ আজকাল একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভাঙিয়া যাইতেছে। ভাইয়েরা আজকাল আর একপরিবারভুক্ত থাকিয়া একসঙ্গে চাষবাস করিতে চায় না। কাজেই, জমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়। নানা রকমের জমি থাকায় উত্তরাধিকারিগণ প্রত্যেক জমিরই অংশ দাবী করে। ইহার ফলেই জমির অসম্বদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

কারণ ঃ

১। জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ

২। উত্তরাধিকার আইন

৩। একান্নবর্তী পরিবার প্রথার বিলোপ

ফলাফলঃ জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। ক্ষেতগুলি আয়তনে এত ছোট হইয়া যায় যে পরিমিত খরচে ভালো করিয়া চাষ করা যায় না। জমির এক একটি খণ্ড কখনো কখনো এত ছোট হয় যে চাষের বলদকে ইহার মধ্যে ঘুরাইয়া লওয়া যায় না। সেচ এবং সার ব্যবহার কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কৃষির উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করাও শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। জমির

খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার কুফল

খণ্ড সংখ্যায় যত বেশী হয় ততই জমির আল তৈয়ারীর জন্য বা বেড়া দেওয়ার জন্য বেশী বেশী করিয়া জমি নষ্ট হয়। ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িয়া যায়। টুকরা টুকরা, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জমিতে চাষ করিতে হয় বলিয়া কৃষকের অনেক সময় নষ্ট হয়। অংশীকরণ ও অসম্বদ্ধতার দরুণ কৃষিকার্যে ব্যক্তিগত কর্মোদ্যমও ক্ষুণ্ণ হয়। কৃষক কোন প্রকার উন্নত পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে পারে না।

প্রতিবিধানঃ পারস্পরিক বোঝাপড়ার মারফৎ চাষীদের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ক্ষেতগুলির মধ্যে সুবিধাজনক বিনিময় করিয়া জমির সংহতি সাধন বা একত্রীকরণই শ্রেষ্ঠ প্রতিবিধান। পঞ্জাব, মধ্য-প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে জমির একত্রীকরণের জন্য আইন পাশ হইয়াছে। এইসব আইনের বলে প্রথমতঃ চেষ্টা করা হয় যাহাতে কৃষকেরা পারস্পরিক বিনিময়ের সাহায্যে স্বেচ্ছায় নিজ নিজ জমি সংহত করে। কোন একটি বিশেষ একত্রীকরণের পরিকল্পনা যদি অধিকাংশের গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে যাহাদের আপত্তি আছে তাহাদের উপরেও বাধ্যতামূলক ভাবে এই পরিকল্পনা চাপানো যায়। সমবায় সমিতির মারফৎও জমির সংহতি প্রতিষ্ঠিত করা যায়। পঞ্জাবে এইরূপ করা হইয়াছে। স্বেচ্ছায় একত্রীকরণ অতি ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া বহু বিভক্ত জমিকে শুধু একত্রে আনয়ন করিলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহদায়তনের কৃষিকার্য সম্ভব হইবে না। রাশিয়ার আদর্শে সমবায় যৌথ বা সামগ্রিক খামার ভারতেও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। একমাত্র যৌথ বা সামগ্রিক খামারের আদর্শে ভারতে উন্নততর বৃহদায়তনের কৃষি প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে জোতের খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা ভারতে কৃষির উন্নতির অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের মালিকদের পক্ষে পরস্পরের সহিত সমবায়ের ভিত্তিতে মিলিত হইয়া যৌথ খামারের প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে সমাজ বা গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অসম্বদ্ধ জোতগুলিকে একত্রীকরণের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

খণ্ড খণ্ড জমি একত্রীকরণের বিভিন্ন উপায়ঃ

১। আইন

২। সমবায় পদ্ধতি

৩। চাষীদের মধ্যে চুক্তি

গ্রামাঞ্চলে ঋণের পরিমাণ (Rural Indebtedness):

কৃষকশ্রেণী পুরুষানুক্রমে আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়া আছে। ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ ইহাই। পৃথিবীর সর্বত্রই চাষীদের পক্ষে ঋণ করার প্রয়োজন হয়। কাজেই, ভারতের চাষীরাও যদি সাময়িক ভাবে দেনাদারে পরিণত হইত, তাহা হইলে আশ্চর্যের কিছুই ছিল না। কিন্তু ভারতীয় কৃষকদের ঋণ সাময়িক নয়। ভারতে কৃষকেরা ঋণ লইয়া কখনো পুরাপুরি শোধ দেয় না। ফলে, জমিতে জমিতে ঋণের আয়তন ক্রমশঃ বিপুলতর হয় এবং দুর্বল কৃষকের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসে। ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির হিসাব অনুযায়ী এই ঋণভারের পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা। এক বঙ্গদেশেই কৃষকদের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। ১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে কৃষকের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮০০ কোটি টাকা। যুদ্ধকালে ফসলের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় এবং প্রচুর জমি হস্তান্তরিত হওয়ায় এই ঋণের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। কৃষকের ঋণকে গ্রামাঞ্চলের ঋণও (Rural Indebtedness) বলা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতে গ্রামাঞ্চলের ঋণ বর্তমানে আর পূর্বের মত গুরুতর সমস্যা নহে।

ভারতীয় কৃষকের বিপুল ঋণভার

গ্রামাঞ্চলে ঋণের বিপুলভার কারণ (Causes of Rural Indebtedness):

লোকের যখন আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয় তখনই সে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ভারতের কৃষকের ঋণের কারণ ঐ একই। তাহার আয় স্বল্প এবং আয়ের তুলনায় ব্যয় অত্যধিক। এক কথায় বলা চলে যে ভারতীয় কৃষকদের চরম দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলে ঋণের বিপুলতার প্রধান কারণ। ভারতের কৃষিজ উৎপাদনশীলতা খুবই কম। ইহার কারণ হইল অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা, মূলধনের অভাব এবং ফসল বিক্রয় করার উপযুক্ত বাজার সংগঠনের অভাব। কৃষির উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার দরুণ জীবনধারণের ব্যয় ও কৃষিকার্যের খরচ মিটানোর মত পর্যাপ্ত আয় কৃষকদের হয় না। আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, প্রতিবৎসর পরিবার প্রতিপালনের জন্য ও কৃষিকার্য

কারণ:

১। দারিদ্র্য

২। উৎপাদনশীলতার স্বল্পতা

চালানোর জন্য কৃষকদিগকে নূতন করিয়া ঋণ লইতে হয়। তাহারা বৎসরের কয়েক মাস মাত্র কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকে। বৎসরের বাকী সময় তাহাদিগকে অনিচ্ছা সহকারে আলস্যে কাটাইতে হয়, কারণ এই সময়ে করার মত আর কোন কাজ তাহাদের সামনে থাকে না। বন্যা ও অনাবৃষ্টির দরুণ কোন বৎসরে অজন্মা হইলে, তাহারা গরু-বাছুর ও অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে এবং অনেক সুদে মহাজনদের নিকট হইতে টাকা ধার লইতে বাধ্য হয়। ভালো ফসলের বৎসরে তাহারা শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে বেহিসাবী ব্যয় করে। ফলে মহাজনের ঋণ আর শোধ হয় না। অবশ্য সুদের হার এত বেশী যে সুবৎসরেও মহাজনের ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া অসম্ভব। তাহা ছাড়া, মহাজনেরা এখনও চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ গ্রহণ প্রভৃতি নানা অসৎ উপায়ে এই ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয় ও ইহাকে দীর্ঘস্থায়ী করে। মহাজনের বেড়াজালের বাহিরে আসিবার কোন উপায়ই কৃষকের সচবাচর থাকে না। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে ভারতীয় কৃষকেরা ঋণী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, ঋণী থাকিয়া জীবনধারণ করে এবং ঋণী হিসাবেই মরে।

৩। অন্যান্য উপজীবিকার অভাব

৪। কৃষকের অমিতব্যয়িতা

। মহাজনের বেড়াজাল

কৃষিগত ঋণের পরিমাণ হ্রাসের উপায় (Remedies of Agricultural Indebtedness) :

কৃষিগত ঋণের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, সেগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায় : (১) পুরাতন ঋণের পরিশোধ সম্ভবপর করিয়া তোলার জন্য সুদের হার হ্রাস; (২) পুরাতন ঋণের কিছুটা মকুব করা; (৩) ঋণ শোধের অসামর্থ্যের দরুণ জমি হস্তান্তর বন্ধ করা; (৪) সুদের হার এবং মহাজনদের শোষণ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আইন পাশ; (৫) কৃষকদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এবং পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্য অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া।

ঋণের পরিমাণ হ্রাসের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসকল

১৮৭৯ সালের 'দাক্ষিণাত্য কৃষকদের সাহায্য আইন' এবং ১৯১৮ সালের 'সুদ-খোরী ঋণ আইন' আদালতকে অতিরিক্ত ও অন্যায় সুদের হার কমাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা দিয়াছিল। অবশ্য এইসব আইন হইতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায় নাই। ১৯৩৪ সালে 'বঙ্গীয়

গ্রামাঞ্চলের ঋণ সংক্রান্ত আইন

চাষীখাতক আইন' পাশ হওয়ার পরে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও কিছুটা বাধ্যতার মারফৎ পুরাতন ঋণ আংশিক ভাবে মকুব করিয়া ঋণের পরিমাণ হ্রাসের জন্য গ্রামাঞ্চলে ঋণসালিশী বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, পঞ্জাব এবং মাদ্রাজে ঋণসালিশী আইন পাশ হইয়াছিল। দেনাদার বা পাওনাদার, যে কেউ বোর্ডের নিকট সালিশীর জন্য আবেদন করিতে পারিত। বোর্ড তখন উল্লিখিত ঋণ সম্বন্ধে খোঁজখবর করিয়া পাওনাদারকে অপেক্ষাকৃত কম লইতে রাজী করাইত। দেনাদারের শোধ দেওয়ার সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পাওনার পরিমাণ প্রয়োজনমত কমানোর চেষ্টা হইত। উভয় পক্ষ সম্মত হওয়ার পর কিংবা বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক ভাবে পাওনাদারের উপর চাপাইয়া দেওয়ার পর, বোর্ড কয়েক বৎসরের মধ্যে ঋণ শোধ করিয়া ফেলার জন্য বাৎসরিক কিস্তি ঠিক করিয়া দিত। ঋণসালিশী বোর্ডগুলি বহু পুরাতন ঋণের এইরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছে। ফলে, কৃষকদের যথেষ্ট উপকার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে, মহাজনেরা আতঙ্কিত হইয়াছে এবং সেজন্য গ্রামাঞ্চলে ঋণের সরবরাহে ঘাটতি দেখা গিয়াছে। বর্তমানে অধিকাংশ স্থানেই ঋণসালিশী বোর্ড উঠিয়া গিয়াছে।

কৃষক দেনাদারদের হাত হইতে অকৃষক পাওনাদারদের হাতে যাহাতে জমি চলিয়া না যায়, সেজন্য ১৯০১ সালে 'পঞ্জাব জমি হস্তান্তর আইন' পাশ হইয়াছিল। সুদের হার এবং মহাজনদের শোষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু মহাজনী আইন পাশ হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের 'বঙ্গীয় মহাজনী আইন' অনুসারে নিরাপদ ঋণের জন্য শতকরা ৮ এবং অ-নিরাপদ ঋণের জন্য শতকরা ১০ উচ্চতম সুদের হার নির্ধারিত হইয়াছে। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বে-আইনী করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, মহাজনী কারবার চালানোর জন্য সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স্ লইতে হইবে এবং দেনাদারেরা দাবী করিলে তাহাদের নিকট লিখিত হিসাব দাখিল করিতে হইবে।

মহাজনী আইন

অল্প সুদে অল্প সময়ের জন্য ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমবায় ঋণদান সমিতি আছে। পুরাতন ঋণ পরিশোধ ও জমির উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৮৩ সালের 'জমি উন্নয়ন ঋণ আইন' এবং ১৮৮৪ সালের 'কৃষি ঋণ আইন' অনুসারে কৃষকদিগের দুরবস্থার সময়ে 'তাকাভি' ঋণ দেওয়া হয়। কৃষকদিগকে অল্প সময়ে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা এখনো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ভারতে সমবায় ঋণদান সমিতি

অল্প সুদে কৃষককে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা

এবং জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা খুবই কম। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ কৃষকেরা যে ঋণ পায় তাহার দ্বারা কৃষকদের ঋণের প্রয়োজন মিটে না। 'তাকাভি' ঋণের সুদের হার খুব উচ্চ এবং এই ঋণের সংশ্লিষ্ট সর্তগুলি অনুদার।

বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে গ্রামাঞ্চলের ঋণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি অনুমান প্রস্তুত করা হইতেছে। এই অনুমান প্রস্তুত হইলে ঠিক হইবে কি-ভাবে গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহ করা যায়। ইহা ছাড়া 'অধিক খাদ্য ফলাও কমিটির' নির্দেশ অনুসারে সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকগণকে ১০০ কোটি টাকার মত অল্প মেয়াদী ঋণ দিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা (Agricultural Marketing in India) :

কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি

ভারতীয় কৃষকদের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হইল যে তাহারা ফসলের ন্যায্য দর পায় না। কৃষকদের ফসল বিক্রয়ের প্রচলিত ব্যবস্থা নানা গলদে পরিপূর্ণ। একটি হিসাবে দেখা যায় যে ভোক্তা বা ব্যবহারকারী যদি কৃষিজাত দ্রব্যের দাম হিসাবে এক টাকা দেয় তাহা হইলে উৎপাদনকারী কৃষক মাত্র ॥৫ পায়। কৃষক এবং ফসলের ভোক্তাদের মধ্যে লোক অর্থাৎ ব্যাপারী ও ফড়িয়াদের সংখ্যা অত্যধিক। ইহাদের পকেটেই বাকী ।৶১৫ যায়। গ্রামের বাজারগুলি যথোচিত ভাবে সংগঠিত নয়। দেশের মধ্যে নানা রকমের ওজন প্রচলিত আছে। গ্রামের বাজারে ফসলের ক্রেতারা কৃষকদিগকে নানাভাবে ঠকায়; ফাউ ইত্যাদি নানা আব্ওয়াব প্রচলিত আছে। গ্রামাঞ্চলে ভালো রাস্তা-ঘাট না থাকায়, কৃষকদের পক্ষে বাজারে ফসল আনিয়া বিক্রয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা দারিদ্র্য ও দেনার তাড়নায়, ন্যায্য দাম পাওয়ার আশায় বেশী দিন অপেক্ষা করিতে পারে না; ফসল কাটা শেষ হইতে না হইতেই, ফড়িয়া ও ব্যাপারীদের ইচ্ছা অনুযায়ী দামে ফসল বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং অপেক্ষা করিয়া থাকার অক্ষমতা কৃষকদিগকে ফড়িয়া ও ব্যাপারীদের কবলে পড়িতে বাধ্য করিয়াছে।

ফসলের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে:—ন্যায্য দামে ফসল বিক্রয়ের জন্য এবং ব্যাপারী ও ফড়িয়াদের

উচ্ছেদের জন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সর্বত্র এক রকমের ওজন প্রচলিত করিতে হইবে। সরকার ও জেলা বোর্ডকে উদ্যোগী হইয়া নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন করিতে হইবে। এই দিক দিয়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ অগ্রণী হইয়াছে। এই কয়টি রাজ্যে নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপিত হইয়াছে। ফসলের স্তর বা মান (Grade) নির্বাচন চালু করিতে হইবে। বেতারবার্তা মারফৎ গ্রামবাসীদিগকে প্রত্যহ বড় বড় শহরের দর জানাইতে হইবে। সম্প্রতি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। সরকার কৃষি-বিভাগ এবং কৃষিজ বিপণন বিভাগ খুলিয়াছে এবং এই দুই বিপণন বিভাগের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছে। এই সব বিভাগের চেষ্টায় প্রধান প্রধান ফসলগুলির বিক্রয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে এবং স্তর বা মান নির্বাচন চালু করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে আইনের দ্বারা ওজন নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই আইন যাহাতে ঠিকভাবে প্রবর্তিত হয় তাহা রাজ্য সরকারের দেখা উচিত। প্রয়োজন হইলে রাজ্য সরকার অনুরূপ অন্য আইনও পাশ করিতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থাকে কি করিয়া উন্নত করা যাইতে পারে

শস্য ভাণ্ডার স্থাপন কৃষিজাত দ্রব্যের সমস্যা সমাধানের আর একটি অঙ্গ। শস্য ভাণ্ডার থাকিলে নষ্ট হইবার ভয়ে কৃষককে তাড়াতাড়ি শস্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করিতে হয় না। শস্য ভাণ্ডারে রক্ষিত শস্যের জামিনের বিরুদ্ধে সে ঋণও পাইতে পারে। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই হয় নাই। সরকার এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য না দিলে কৃষির অন্যতম মূল সমস্যার সার্থক সমাধান কখনই সম্ভবপর হইবে না। এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের মত হইল যে, সমবায়ের ভিত্তিতেই শস্য ভাণ্ডার স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত।

শস্য ভাণ্ডার

ভারতে সেচ (Irrigation in India) :

ভারতের মাটি শুষ্ক। যথেষ্ট জল না পাওয়া গেলে শস্য হয় না। বিশেষভাবে ধান ও ইক্ষুর মত ফসলের জন্য প্রচুর জলের দরকার হয়। কোন কোন অঞ্চল স্বভাবতঃই প্রচুর বৃষ্টিপাতে সুজলা। কিন্তু এই সব অঞ্চলেও শীতের দিনে বৃষ্টি না হওয়ায় রবিশস্য উৎপাদনের জন্য সেচের প্রয়োজন হয়। রাজপুতানায় বৃষ্টি হয় না বলিলেই চলে। দক্ষিণ ভারতেও বৃষ্টিপাত স্বল্প।

ভারতে সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

সেইজন্য এই সব অঞ্চলে বারোমাসই সেচের প্রয়োজন। ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান শাসকেরা সেচ প্রণালী খনন করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সেচের ব্যবস্থা উপেক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতে থাকায় শেষদিকে ব্রিটিশ শাসকেরা সেচের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ফলে তাঁহারা সেচের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। ভারতবর্ষের সেচের খালগুলির একত্রিত দৈর্ঘ্য পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের খালের মোট দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশী। ইহা ব্রিটিশ সরকারেরই কীর্ত্তি। সেচের বন্দোবস্তের ফলে, সিন্ধু ও পঞ্জাবের মরু-সদৃশ ভূখণ্ড শস্যশ্যামল অঞ্চলে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেচ-ব্যবস্থার দরুণ ভারতীয় কৃষির উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। সেচের সুবন্দোবস্তের ফলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বহুলাংশে প্রতিহত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ বাবদ সাহায্য দানের ব্যয় কমিয়াছে এবং সরকারের কর আদায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সেচ-ব্যবস্থার ফল

অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রায় ৭ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত ছিল। দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় ইউনিয়নে শতকরা ৬৫ ভাগ সেচ সমন্বিত জমি পড়ে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ঐরূপ জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ কোটি একর। বর্তমানে সেচ-ব্যবস্থার ব্যাপকভাবে প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

বিভিন্ন রকমের সেচ-ব্যবস্থা (Forms of Irrigation Works):

কূপ: ভারতের সর্বত্র কূপ দৃষ্ট হয়। ভারতে প্রায় ২৫ লক্ষ কূপ আছে এবং কর্ষিত জমির শতকরা প্রায় ৫ ভাগ জমিতে কূপ হইতে জলসেচন করা হয়। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাবে বিদ্যুৎচালিত নলকূপ দ্বারা সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কূপখননের জন্য সরকার অনেক জায়গায় 'তাকাভি' ঋণ ও টেকনিক্যাল বোর্ডের পরামর্শ সরবরাহ করে। সাধারণ কূপ হইতে নিজের হাতে কিংবা বলদের সাহায্যে জল তোলা হয়। নালা কাটিয়া এই জল ক্ষেত পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। বিদ্যুৎ এবং পাম্প ব্যবহার করিলে নলকূপ দ্বারা জলসেচের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বিভিন্ন রকমের কূপ

পুষ্করিণী ঃ বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে পুকুর কাটিয়া সেচের বন্দোবস্ত আছে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই পুকুর আছে। মাদ্রাজেই সেচের পুকুরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী ; প্রায় ৩৫০০০ পুকুর মাদ্রাজ অঞ্চলে আছে।

খাল ঃ খালই সেচের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। কূপ ও পুকুর সাধারণতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগে খনিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রই সাধারণতঃ খাল খননের ব্যবস্থা করে। ভারতে তিন ধরণের খাল আছে ঃ (১) প্লাবন খাল (Inundation canal), (২) নিত্যবহ খাল (Perennial canal), এবং (৩) সঞ্চিত জলের খাল (Storage canal)। বর্ষাকালে, যখন নদীর জলবৃদ্ধি হয় তখন যে সব খালে জল প্রবেশ করে তাহাদিগকে প্লাবন খাল বলা হয়। গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে নদীর জল কমিয়া গেলে, প্লাবন খালগুলি শুকাইয়া যায়। কাজেই এই সব খালের সাহায্যে সারা বৎসর ধরিয়া জলসেচন চলে না। নিত্যবহ খালগুলিতে সারাবৎসর জল থাকে। নিত্যবহ খালগুলিতে যাহাতে সারাবৎসর জল থাকে সেজন্য অনেক নদীতে আড়াআড়িভাবে বাঁধ বাঁধা হয় এবং স্লুইস্ গেটের সাহায্যে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ভারতের প্রধান প্রধান খালগুলি নিত্যবহ। পঞ্জাবে শতদ্রু উপত্যকা পরিকল্পনা এবং উত্তরপ্রদেশের সর্দা খাল বারোমাস জল সরবরাহ করে। উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়া বৃষ্টির জল আট্‌কাইয়া, সঞ্চিত জলের খাল মারফৎও কৃষিক্ষেত্রে জল যোগানো হয়।

বিভিন্ন ধরণের খাল ঃ

প্লাবন খাল

নিত্যবহ খাল

সঞ্চিত জলের খাল

সরকার খালগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করে—উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল। উৎপাদনশীল খালগুলি হইতে সরকারের নীট আয় হয়, অর্থাৎ বিনিয়োজিত মূলধনের সুদ ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের চেয়েও বেশী প্রাপ্তি হয়। অনুৎপাদনশীল খাল হইতে সরকারের লোকসান হয়। এই সব খাল খনন করা হয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল খাল

বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা (Multi-Purpose River Valley Projects) ঃ

জলসেচের জন্য যখন খাল খনন করা হয় তখন জল সঞ্চয়ের জন্য উঁচু

জায়গাতে সাধারণতঃ একটি বাঁধ বা ড্যাম তৈয়ারী করিতে হয়। সঞ্চিত জল যখন নীচের দিকে যায় তখন ইহার বেগে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চক্রগুলি চালিত হইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এই জলবিদ্যুৎ বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইহার উৎপাদন ব্যয় স্বল্প। এই জন্য সস্তায় জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। জলবিদ্যুৎকে কাজে লাগাইয়া শহরে ও গ্রামাঞ্চলে নূতন নূতন শিল্পের পত্তন করা যাইতে পারে এবং পুরাতন শিল্পগুলির নূতন রূপ দান করা যাইতে পারে। এইরূপে জল সঞ্চয় করিয়া জলসেচ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা ছাড়াও বন্যা প্রতিরোধ, ষ্টিমার চলাচলের ব্যবস্থা প্রভৃতি উদ্দেশ্যও সাধন করা চলে। এইরূপ বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট পরিকল্পনাই বর্তমানে জগতে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। এইরূপ পরিকল্পনাকে কার্যে রূপান্তরিত করা ব্যয়সাধ্য হইলেও, ইহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতি সাধন করা যায়। এই জন্যই ইহা অনুন্নত দেশের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে।

বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা

এই ধরণের বহু পরিকল্পনাকে ভারতের জাতীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার উল্লেখই সর্বাগ্রে করিতে হয়। এই পরিকল্পনার কার্য চলিতেছে। ইহা সমাপ্ত হইলে বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের এক অংশের রূপ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। সমাপ্ত হইলে ১০ লক্ষ একরের উপরেও জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং ২ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং ১½ লক্ষ কিলোওয়াট থার্মাল শক্তি উৎপন্ন হইবে। ইহা ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সহজে জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থাও হইবে। এই পরিকল্পনার মোট ব্যয় ১০০ কোটি টাকারও উপর।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

দামোদরের পরে আছে হীরাকুঁদ পরিকল্পনা, তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা, পিপরি বাঁধ পরিকল্পনা, কুশী পরিকল্পনা প্রভৃতি। শুধু পশ্চিম বঙ্গ ধরিলে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাই বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয় ৭½ কোটি টাকা। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার দ্বারা ৩০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন এবং ৪ হাজার কিলোওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

অন্যান্য কয়েকটি পরিকল্পনা

বর্তমানে যে সকল বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ

চলিতেছে তাহাদের মোট ব্যয় ৭৬৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৫১৮ কোটি পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হইবে। এই ব্যয়ের ফলে ঐ সময়ের মধ্যে প্রায় ৮৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা এবং প্রায় ১১ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ভারতে খাদ্যসমস্যা (Food Problem in India):

ভারতবর্ষ অবিভক্ত অবস্থাতেও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের হিসাব অনুসারে ভারতবর্ষে যে বৎসরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ স্বাভাবিকই হইত সে বৎসরে শতকরা মাত্র ৮৮ জনের মত খাদ্য ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইত। বাকী অংশ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত।

অবিভক্ত অবস্থাতেও ভারতবর্ষ খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না

দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় 'ইউনিয়নে'র পক্ষে খাদ্যসমস্যা আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, কারণ খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলির বেশী অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের চাউল উৎপাদনের জমির শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ এবং গম উৎপাদনের জমির শতকরা ৩০ ভাগ পাকিস্তানে পড়িয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানের জনসংখ্যা অবিভক্ত ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা ২২ ভাগ মাত্র। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাথা পিছু প্রত্যেক দিন ১৪ আউন্স করিয়া প্রয়োজন ধরিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে ভারতে স্বাভাবিক পরিমাণ ফসল উৎপন্নের বৎসরে ৮৯ লক্ষ টন করিয়া খাদ্যের ঘাটতি পড়িবে। প্রয়োজন যদি ১৬ আউন্স করিয়া ধরা হয় তবে ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১৫৮ লক্ষ টন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি হইলে ঘাটতির পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে। এই খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়াছেন :—

দেশবিভাগের ফলে ভারতের পক্ষে খাদ্যসমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে

খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য অবলম্বিত বিভিন্ন ব্যবস্থা

(ক) বাহির হইতে খাদ্য আমদানী। ১৯৪৯ সালে ১৫০ কোটি এবং ১৯৫১ সালে প্রায় ১৮০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছিল। সমগ্র বিশ্বেই আজ খাদ্যসমস্যা; বাহির হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য আমদানী করিবার

বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী

মত অর্থও ভারতে নাই। সুতরাং আমদানী করিয়া খাদ্যসমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

(খ) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা হইল অবলম্বিত পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে যুগে প্রত্যেক সভ্যদেশেই খাদ্যের ঘাটতি সমস্যার সমাধান কল্পে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের দ্বারা অপচয় নিবারণ ও সকল শ্রেণীর মধ্যে ন্যায্য বণ্টন করা হয়।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা

(গ) ইহা সহজেই অনুমেয় যে বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া ও নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু রাখিয়া ভারতের পক্ষে খাদ্যসমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রয়োজন উন্নততর উপায়ে কৃষিকার্য সংগঠন। কৃষিকার্যের উন্নততর সংগঠনের সহিত শিল্প উন্নয়নেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষির উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তী এক অধ্যায়ে করা হইবে।

কৃষির উন্নতি

(ঘ) 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযান। এই অভিযানের গুরুত্বের জন্যই খাদ্যসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক্‌ভাবে ইহার আলোচনা করিতে হয়। 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানের জন্য ১৯৪৯ সালে এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০ লক্ষ একর জমির সংস্কার বা পুনরুদ্ধার এবং ৩০০০ নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা হয়। এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য কেন্দ্র হইতে প্রদেশসমূহকে সাহায্য ও ঋণদান করা হয় এবং প্রচারকার্যের জন্যও বিরাট ব্যয় করা হয়।

'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযান

পরিকল্পনা অনুসারে বিশেষ বিলম্ব হইলেও ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতের পক্ষে খাদ্যবিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার কথা। কিন্তু তাহা হয় নাই। পরিকল্পনাকারীদের প্রতিশ্রুতি মিথ্যায় পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের খাদ্যবিষয়ে পরনির্ভরশীলতা পূর্বাপেক্ষা বিশেষ কম নয়। 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানের ব্যর্থতা কোনরূপে ঢাকিয়া রাখা যায় না। ব্যর্থতার জন্যই এই অভিযানকে পরিবর্তিত আকারে চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

এই অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে

একমাত্র এই ধরণের অভিযানের দ্বারা ভারতের ন্যায় দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান করা যায় না। চূড়ান্ত সমাধানের জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনার—যে পরিকল্পনা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিকের উপরই প্রয়োজনমত গুরুত্ব আরোপ করিবে। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফলের দিকে এই জন্যই লোকে সাগ্রহে তাকাইয়া আছে।

খাদ্যসমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনার

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে বর্তমানে খাদ্য সম্পর্কে যে নীতি সরকার গ্রহণ করিয়াছে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হইল :—

১। কৃষির উন্নয়ন : এই উদ্দেশ্যে যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে তাহার মধ্যে বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, গ্রাম বা সমাজ উন্নয়ন, সার উৎপাদন প্রভৃতিই প্রধান।

২। বাহির হইতে খাদ্যের আমদানীকে সম্ভাব্যরূপে কমাইয়া দেওয়া।

৩। অনাবাদী জমির পুনরুদ্ধার।

৪। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সুপরিকল্পিত নীতি।

প্রশ্নোত্তর

1. Mention the principal food crops in India and indicate the areas in which they are grown. (C. U. 1948) (২২২-২২৩ পৃষ্ঠা দেখ)

2. What are the main drawbacks of Indian agriculture? Discuss some of the suggestions which have been made for the improvement of agriculture in India. (C. U., 1931, 1938, 1947)

[**উত্তরের কাঠামো :** ভারতীয় কৃষির প্রধান দোষত্রুটিগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল : ভারতবর্ষে জমির উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। ক্রমাগত উর্বরতা-ক্ষয় এবং সারের অভাবের জন্য ভারতীয় জমির উৎপাদনশক্তি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। সেচের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। জনসাধারণ অজ্ঞ ও নিরক্ষর। কৃষির কাজ ক্ষুদ্রায়তনে (Small scale) চলে। ব্যক্তিগত জমিগুলি আয়তনে ছোট এবং খণ্ডে খণ্ডে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ভারতে কৃষির পদ্ধতি এখনও আদিম। কৃষকদের নিজেদের মূলধন নাই এবং তাহারা মহাজনদের কাছে দেনায় ডুবিয়া থাকে। ভারতে কৃষি সুসংগঠিত নয়। ফসল বিক্রয়ের প্রচলিত ব্যবস্থায় নানা দোষত্রুটি থাকায় কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য দাম পায় না।

কৃষির অনগ্রসরতা দূর করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে : জমির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ততা, খণ্ডীকরণ দূর করিয়া জমির সংহতিসাধন ও একত্রীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষিগত গবেষণা চালাইয়া যাইতে হইবে এবং এই গবেষণার ফলাফল আদর্শ

খামারের মারফৎ সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। অল্প সুদে ঋণ পাওয়ার জন্য এবং ন্যায্য দামে ফসল বিক্রয়ের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করিতে হইবে। সার ব্যবহারের দ্বারা একর প্রতি উৎপাদন বাড়াইবার জন্য রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ডাঃ বার্ণস্ হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র সার ব্যবহারের দ্বারাই একর প্রতি ধানের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বাড়ানো যাইতে পারে। আর সার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সেচের সুবন্দোবস্ত হইলে তো কথাই নাই। নিয়ন্ত্রিত বাজারের পত্তন করিয়া এবং ফসলের নিম্নতম দাম বাঁধিয়া দিয়া কৃষিজাত পণ্যের ব্যবস্থাকে উন্নীত করিতে হইবে। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্য শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। অল্প সময়ের মধ্যে কৃষির সবিশেষ উন্নতির জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার।]

3. "One of the principal handicaps of Indian agriculture is the endless sub-division and fragmentation of land." Elucidate.

(C. U. 1941, 1951) (২৩১-২৩৩ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Briefly describe the various types of irrigation works in India and indicate their economic importance. (C. U., 1936, 1938, 1943)

(২৩৯-২৪২ পৃষ্ঠা দেখ)

5. What are the causes of agricultural indebtedness in India? Describe and comment upon the measures that have been adopted to check the indebtedness of the Indian cultivator. (C. U., 1935, 1937, 1942) (২৩৪-২৩৭ পৃষ্ঠা দেখ)

6. (a) Account for the present shortage of food supply in India.

(b) How is this shortage met at present? (C. U., 1952)

(২৪২-২৪৪ পৃষ্ঠা দেখ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমবায়

(Co-operation)

সমবায় কাহাকে বলে? (What is Co-operation ?)

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে দরিদ্রেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত ও অসহায়। তাহাদিগকে পুঁজিপতি শ্রেণীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়। এই দুর্দশা দূরীকরণের একটি পথ হইল বিপ্লবের সাহায্যে পুঁজিপতি শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা। আর একটি পথ হইল সমবায়ের পথ। দরিদ্রেরা যদি সংঘবদ্ধ হয়, নিজেদের চরিত্র উন্নত করে এবং ব্যবসায়িক

সমবায়ের সাহায্যে পুঁজিবাদী সমাজের গলদ অনেকাংশে দূর করা যায়

কর্মকৌশল আয়ত্ত করে তাহা হইলে তাহারা পুঁজিপতিদের একচেটিয়া বস্তুগত সুখ-সুবিধায় ভাগ বসাইতে পারিবে। ইহাকেই সমবায় বলা হয়। সংক্ষেপে, সমবায়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে: দরিদ্র জনসাধারণ কর্তৃক ঐক্য, পারস্পরিক সাহায্য, শিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতি প্রভৃতি নৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে সমবায় বলা হয়।

সমবায়ের সংজ্ঞা

সমবায়ের অন্তর্নিহিত নিম্নলিখিত মৌলিক নীতিগুলি উল্লেখযোগ্য:

(১) ঐক্য (Unity): একতাই শক্তি। সমবায় সমিতি গঠন করিয়া দরিদ্রেরা সুবিধাজনক দরে কেনাবেচা করিতে পারে, অল্প সুদে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে এবং ধনিকের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারে।

সমবায়ের নীতি

(২) সমষ্টিবোধ (Solidarity): সভ্যদিগকে দৃঢ়ভাবে পরস্পরের পাশে দাঁড়াইতে হইবে। প্রত্যেককে নিজস্ব স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থে বিলীন করিয়া দিতে হইবে।

(৩) স্বেচ্ছামূলক মিলন (Free Association): সমিতি গঠনের ভিত্তি হইবে স্বেচ্ছামূলক। কাহাকেও জোর করিয়া বাধ্য করা চলিবে না।

(৪) গণতন্ত্র (Democracy): সমিতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। প্রত্যেক সভ্যের একটি মাত্র ভোট থাকিবে। সকল সভ্যের মর্যাদা সমান হইবে।

(৫) সান্নিধ্য (Proximity): সমিতির সভ্যদের পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা থাকা প্রয়োজন এবং তাহারা কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দা হইলেই ভালো হয়।

(৬) সততা (Honesty): সভ্যদিগকে সৎ এবং সময়ানুবর্তী হইতে হইবে।

(৭) ব্যয়সংক্ষেপ (Economy): সমিতিকে ব্যবসায়ের ব্যাপারে মিতব্যয়ী হইতে হইবে। যতদূর সম্ভব কম খরচ করিতে হইবে এবং সভ্যদের দ্বারা খয়রাতি কাজ করাইয়া লইতে হইবে। মুনাফা হইতে "রিজার্ভ ফাণ্ড" বা সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিতে হইবে।

ভারতের সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India):

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মাদ্রাজের সিভিলিয়ান মিঃ ফ্রেডারিক

নিকল্‌সনকে ইউরোপের সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য ইউরোপে পাঠান হয়। জার্মান কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য রাফেজেন (Raiffeisen) প্রবর্তিত সমবায় সমিতিগুলিই বিশেষ ভাবে মিঃ নিকল্‌সনকে আকৃষ্ট করে। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে রাফেজেনের আদর্শে গ্রাম্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি অনুমোদন করা হয়। তিনি তাঁহার বিস্তারিত অনুমোদন সংক্ষেপে "Find Raiffeison" এই উক্তি দ্বারা বিবৃত করেন। নিকল্‌সনের রিপোর্টের ভিত্তিতে, ১৯০৪ সালে ভারত সরকার প্রথম সমবায় সমিতি আইন পাশ করে। এই আইন শুধুমাত্র প্রাথমিক ঋণদান সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯১২ সালে আর একটি সমবায় সমিতি আইন পাশ হয়। ইহার দ্বারা অন্যান্য প্রকার সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। অন্যান্য প্রকার সমিতি বলিতে অ-ঋণদান সমিতি (non-credit society) বুঝান হইতেছে। ১৯০৪ ও ১৯১২ সালের আইন দুইটি ভারতের সর্বত্র প্রযোজ্য ছিল। ১৯১৫ সালে ম্যাক্‌লেগান কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ভারতে সমবায় আন্দোলনের বিস্তৃতির মূলে এই রিপোর্টের গুরুত্ব যথেষ্ট। ১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে সমবায় একটি প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাদেশিক সমবায় সমিতি আইন পাশ হয়। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রেও সমবায়কে রাজ্যের (Stato) হস্তে রাখা হইয়াছে।

জার্মান আদর্শে সমবায় সমিতি

১৯০৪ ও ১৯১২ সালের আইন

প্রাদেশিক সমবায় সমিতি আইন

বিভিন্ন রকমের সমবায় সমিতি (Types of Co-operative Societies):

সমবায় সমিতিগুলিকে প্রথমতঃ দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: (১) প্রাথমিক, ও (২) কেন্দ্রীয়।

প্রাথমিক সমিতি কৃষিগত (বা গ্রাম্য) এবং অ-কৃষিগত, দুই-ই হইতে পারে। শ্রমিক বা মধ্যবিত্তদের লইয়া অ-কৃষিগত সমিতি গঠিত হয়। কৃষিগত সমিতিগুলিকে আবার কৃষিগত ঋণদান সমিতি ও কৃষিগত অ-ঋণদান সমিতি—এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। ফসল বিক্রয়; বীজ, হালের বলদ, সার প্রভৃতি

ক্রয়; গো-মহিষ বীমা; গো-প্রজনন; সেচ; জমির সংহতি সাধন প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে কৃষিগত অ-ঋণদান সমিতি গঠিত হয়। অ-কৃষিগত সমিতিও আবার ঋণদান সমিতি ও অ-ঋণদান সমিতি, দুই-ই হইতে পারে।

কেন্দ্রীয় সমিতি তিন রকমের: কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্যারান্টি-দাতা, ইউনিয়ন ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক (Provincial Co-operative Banks)। *

কিছুকাল যাবৎ অনেক বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট (multi-purpose) সমবায় সমিতি গঠিত হইতেছে। কৃষকদিগকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ দিবার জন্য অনেক জমিবন্ধকী সমবায় সমিতি বা ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইয়াছে।

কৃষিগত ও অ-কৃষিগত সমিতির প্রধান পার্থক্য

কৃষিগত ও অ-কৃষিগত সমিতিগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত সমিতিগুলিতে প্রত্যেক সভ্যের দায় সীমাহীন এবং শেষোক্ত সমিতিগুলিতে প্রত্যেক সভ্যের দায় সীমাবদ্ধ।

গ্রাম্য ঋণদান সমিতি (Rural Credit Society):

ভারতের সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল প্রাথমিক কৃষিগত ঋণদান সমিতি। ভারতের অধিকাংশ সমবায় সমিতিই এই পর্যায়ের। কৃষকদিগকে ঋণ সরবরাহ করাই এ পর্যন্ত ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

গ্রাম্য ঋণদান সমিতির সংগঠন

দশ বা ততোধিক কৃষক একত্রে মিলিয়া গ্রাম্য ঋণদান সমিতি গঠন করিতে পারে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনাশোনা থাকা প্রয়োজন। তাহারা এক গ্রামের বা পাশাপাশি গ্রামের লোক হইলে ভালো হয়। সমিতির দেনার জন্য প্রত্যেক সভ্যের দায় সীমাহীন। সমিতি 'ফেল' হইলে পাওনাদারেরা প্রত্যেক সভ্যের সর্বস্ব লইয়া টানাটানি করিতে পারে। প্রত্যেক সভ্যকে ভর্তি ফি দিতে হয় এবং এক বা একাধিক অংশ বা শেয়ার কিনিতে হয়। সমিতির সকল সভ্যকে লইয়া সভা হইলে তাহাকে সাধারণ কমিটি বলা হয়। এইরূপ সভা একটি পরিচালন-কমিটি নির্বাচিত করিয়া উহার উপর সমিতির পরিচালনার ভার দেয়। সেক্রেটারী ছাড়া আর কাহাকেও পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। প্রত্যেক সভ্যের একটি করিয়া ভোট আছে। পরিচালনা গণতান্ত্রিক এবং প্রধানতঃ অবৈতনিক।

* বর্তমানে 'প্রদেশের' পরিবর্তে 'রাজ্য' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত।

এইরূপ গ্রাম্য ঋণদান সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য সভ্যদিগকে ঋণ দেওয়া। সমিতি নিম্নলিখিত উপায়ে টাকা সংগ্রহ করেঃ (১) ভর্তি ফি; (২) শেয়ার হইতে প্রাপ্ত মূলধন; (৩) সভ্যদের আমানত; (৪) বাহিরের লোকের আমানত; (৫) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত ঋণ। সভ্যদিগকে ধার দেওয়া হয় কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যঃ বীজ, চাষের যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি ক্রয়; পুরাতন ঋণ পরিশোধ; বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষে ব্যয়। যে কোন দুইজন সভ্য জামীন হইলে প্রার্থী সভ্যকে ঋণ দেওয়া হয়। কিস্তিবন্দী হিসাবে এই ঋণ শোধ দিতে হয়। মোট মুনাফার অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ রিজার্ভ ফাণ্ড বা সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখিতে হইবে। ইহার পর লভ্যাংশ বণ্টিত হইতে পারে এবং শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত সৎকাজে ব্যয়িত হইতে পারে। প্রত্যেক সমিতির হিসাব প্রতি বৎসর সরকারী সমবায় বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। প্রত্যেক সমিতি কতকগুলি সরকারী সুবিধা ভোগ করে। যেমন, সমিতি আয়-কর ও ষ্ট্যাম্প-শুল্ক হইতে রেহাই পায়।

গ্রাম্য ঋণদান সমিতির কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক (Central and Provincial Co-operative Banks):

প্রাথমিক সমিতির হাতে মোট যে টাকা থাকে তাহার খুব কম অংশই শেয়ার হইতে প্রাপ্ত মূলধন, সভ্যদের আমানত ও বাহিরের লোকের আমানত হইতে সংগৃহীত হয়। গ্রামবাসীদের সঞ্চয় খুব বেশী হয় না; তাহাদের আমানত ঋণের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কাজেই প্রাথমিক সমিতিকে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে অনেক টাকা ঋণ লইতে হয়। প্রাথমিক সমিতি ও ব্যক্তি—দুই রকমের সভ্য লইয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রাথমিক সমিতি এবং ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ লোক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভ্য হয়। সভ্য প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণ দেওয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রধান কর্তব্য। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পুঁজি প্রধানতঃ সভ্য ও বাহিরের লোকের আমানত এবং প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত ঋণ দ্বারা গঠিত। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে (Provincial or State Co-

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক সমিতিকে ঋণ দান করে

operative Bank) 'শীর্ষ' ব্যাঙ্ক (Apex Bank) বলা হয়। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ইহার সভ্য এবং তাহারাই ইহার পরিচালনার ব্যবস্থা করে।

বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট সমবায় সমিতি (Multi-purpose Co-operative Societies) :

ভারতে সমবায় সমিতিগুলির অধিকাংশই এক-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট—তাহারা একটি মাত্র কাজে নিয়োজিত। কৃষি ও সমবায় সম্পর্কে নিযুক্ত কমিশন ও কমিটির অধিকাংশই এই ধরণের সমবায় সমিতি ভারতের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন, কারণ ইহা পরিচালনা করা সহজ। বর্তমানে কিন্তু দেখা যাইতেছে যে অনেকেই বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট সমবায় সমিতি গঠনের পক্ষপাতী। 'বহু উদ্দেশ্য' বলিতে প্রধানতঃ ঋণদান, ক্রয় ও বিক্রয় বুঝায়। একটি উদাহরণ লওয়া যাক। বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট একটি গ্রাম্য বা কৃষি সমবায় সমিতি কৃষকগণকে ঋণদান করা ছাড়াও তাহাদের জন্য বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কেনা এবং উৎপন্ন ফসলের বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রভৃতি করিবে। এই ধরণের সমবায় সমিতি গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কাজও হাতে লইতে পারে।

বর্তমানে অনেকেই এই ধরণের সমবায় সমিতি সংগঠনের পক্ষপাতী

ইহা গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক হইতে পারে

১৯৩৭ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি-ঋণ বিভাগ বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমোদন করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশের সমবায় সমিতির নিয়ামকগণের যে সম্মিলনী হয় তাহাতে পরীক্ষামূলকভাবে এই ধরণের সমবায় সমিতির সংগঠন অনুমোদন করা হয়। বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট সমবায় সমিতি জার্মানী, নিউজীল্যাণ্ড, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বহুসংখ্যক আছে এবং তাহারা ঐ সমস্ত দেশের কৃষকের আর্থিক উন্নতিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ

ভারতে বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশে সসীম দায়ের ভিত্তিতে বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট সমবায় সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশে এই ধরণের সমিতির সংখ্যা এক হাজারেরও উপর।

ভারতে বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশে এই প্রকাব সমিতি সংগঠিত হইয়াছে

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Banks) :

অল্প মেয়াদী সাধারণ ঋণদান সমিতিগুলি সামান্য পরিমাণে ঋণদান করিতে

পারে মাত্র। কিন্তু কৃষকের পূর্বের ঋণ শোধ করিবার জন্য এবং জমির উন্নতি প্রভৃতি কার্যের জন্য অধিক পরিমাণে এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণেরও প্রয়োজন হয়। কৃষকের এই অভাব পূরণ করিতে পারে এক বিশেষ ঋণদান সমিতি। ইহাদের জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক বলা হয়। ইহারা জমি বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য ঋণদান করে। এই জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক সমবায়ের ভিত্তিতেও গঠিত হইতে পারে। ভারতে সমবায়ের ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংগঠনে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গদেশে এই ধরণের ব্যাঙ্ক ছিল মাত্র সংখ্যায় ৫টি, কিন্তু মাদ্রাজে ছিল ১১৯টি এবং মধ্যপ্রদেশে ২১টি।

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

সমবায়ের ভিত্তিতে এইপ্রকার ব্যাঙ্কের সংগঠনে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে

সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি এবং তাহার সুবিধা ও ত্রুটি (Progress of Co-operation : Merits and Defects) :

প্রথম দিকে সমবায় আন্দোলন অতি দ্রুত প্রসারিত হইতেছিল; কিন্তু এই দ্রুত গতির মধ্যেই দুর্বলতা নিহিত ছিল। তাই সরকার কিছুকাল পরেই এই আন্দোলনের ক্রমপ্রসারকে উৎসাহ দেওয়া বন্ধ করে এবং আন্দোলনের তদানীন্তন অবস্থাকে সংহত করার চেষ্টা করিতে থাকে। ১৯২৯-৩৩ সালের মন্দা বাজারের জন্য সমবায় আন্দোলনের গতি ব্যাহত হয়। তাহার পর হইতে সমবায় আন্দোলনের সামান্য মাত্র অগ্রগতি হইয়াছে বলা চলে। ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে সমস্তপ্রকার সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা হইল ১ লক্ষ ৭৩ হাজার। ১৯৪৭-৪৮ সালে ছিল ১ লক্ষ ৪৯ হাজার মাত্র। সুতরাং দুই বৎসরেই সমিতির সংখ্যা প্রায় ২৪ হাজার বাড়িয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনারের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে গত পাঁচ বৎসরে সমবায় সমিতি ও সমিতির সভ্যসংখ্যা বিশেষ বাড়িয়াছে। সমিতি ও সমিতির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধিই যদি আন্দোলনের অগ্রগতির লক্ষণ হয় তবে ভারতে এই আন্দোলনের অগ্রগতিতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু সংখ্যা ছাড়াও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা আন্দোলনের অগ্রগতি বিচার করিতে হয়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে

স্বাধীন ভারতে সমিতির সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে

বৈশিষ্ট্য ঃ
(১) আন্দোলন প্রধানতঃ কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ
(২) আন্দোলনের প্রসার ঋণের ক্ষেত্রেই হইয়াছে
(৩) আন্দোলনের উপর সরকারী কর্তৃত্ব অত্যধিক

প্রধান বিশেষত্ব ঃ ভারতের সমবায় অন্দোলনের নিম্নোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ আন্দোলন প্রধানতঃ কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অ-কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা কম। দ্বিতীয়তঃ, সমবায় আন্দোলনের যতটুকু প্রসার হইয়াছে, তাহা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ঋণের ক্ষেত্রেই হইয়াছে। উৎপাদন, ভোগ, ক্রয়, বিক্রয়, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের মোটেই প্রসার হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ভারতের সমবায় আন্দোলনের উপর সরকারী কর্তৃত্ব বড় বেশী।

প্রত্যেক রাজ্যে সমবায় সমিতির একজন করিয়া নিয়ামক (Registrar of Co-operative Societies) আছেন। তিনি সরকারী লোক। তাঁহার অধীনে অনেক কর্মচারী থাকে। এই সকল কর্মচারীর সাহায্যে তিনি সমবায় সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহাকে রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের একচ্ছত্র নায়ক বলা যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগ

সামান্য অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতে সমবায় আন্দোলনের সহায়তা করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগ নামে একটি বিভাগ আছে। এই বিভাগ কৃষিঋণসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজন হইলে সরকার ও সমবায় সমিতিগুলিকে উপদেশ দেয়। ইহা আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণসংক্রান্ত কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করে।

সমবায় কৃষকশ্রেণীর জন্য অল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছে

মহাজনেরা সুদ কমাইতে বাধ্য হইয়াছে

সুবিধা ঃ ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন প্রধানতঃ কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পেই সুরু করা হইয়াছিল। ইহার দ্বারা জনসাধারণের, বিশেষভাবে কৃষকশ্রেণীর, যে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। কৃষকেরা অল্প সুদে মূলধন এবং অনুৎপাদনশীল ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছে। কৃষকের পক্ষে এই অনুৎপাদনশীল ঋণেরও প্রয়োজনীয়তা কম নহে। সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হওয়ায় মহাজনেরা সুদের হার কমাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সমবায় বিক্রয় সমিতির কল্যাণে কৃষকেরা

ফসলের ন্যায্য দাম পায়। অসম্বদ্ধ জমির সংহতি, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার কেনা, পশুপ্রজনন, গো-মহিষ বীমা, সেচ, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যেও সমবায় সমিতি গঠিত হইতেছে। কোন জায়গায় সুসংগঠিত সমবায় সমিতি থাকিলে তাহার প্রভাবে মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস পায়, মিতব্যয়িতা উৎসাহিত হয়, শিক্ষার প্রসার হয় এবং সভ্যেরা নানা ব্যবসায়ী-সুলভ গুণ অর্জন করে।

সমবায় সমিতির কল্যাণে কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য দাম পায়, সস্তায় জিনিসপত্র কিনিতে পারে

কারিগর ও চাকুরিয়া প্রভৃতি অ-কৃষকেরাও সমবায় ভাণ্ডার, সমবায় ঋণদান সমিতি প্রভৃতির সাহায্যে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছে।

সমবায় জনসাধারণকে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ দিয়াছে

ত্রুটি ঃ কিন্তু ভারতে সমবায় আন্দোলন হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। এই আন্দোলন অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। কৃষকদের মোট প্রয়োজনীয় ঋণের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র সমবায় সমিতিগুলি হইতে পাওয়া যায়। মূর্তিমান অকল্যাণ হইলেও, গ্রাম্য মহাজনের প্রয়োজন এখনো ফুরাইয়া যায় নাই। সমিতিগুলির অধিকাংশই সুপরিচালিত নয়। কতকগুলি সমিতি প্রায় দেউলিয়া হইয়া রহিয়াছে।

১। মূলধনের অভাব

সভ্যেরা সমবায়ের মূল নীতি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞানলাভ করে নাই। সমিতির সাফল্য বা অসাফল্যের জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সভ্যেরা যথেষ্ট সচেতন নয়। তাহারা সমিতিকে নিজস্ব ব্যাঙ্ক বা জনগণের ব্যাঙ্ক বলিয়া মনে করে না। তাহারা নিয়মিতভাবে সমিতি হইতে গৃহীত ঋণ শোধ করে না। ফলে, সমিতির বাকী প্রাপ্যের অঙ্ক সব সময়েই বিরাট থাকে। অনেক সময় ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে পক্ষপাত দেখা যায়। পক্ষপাতিত্বের দরুণ, পরিশোধ করিতে অসমর্থ লোকও ঋণ পায়। ঋণশোধের ব্যাপারে কঠোর সময়ানুবর্তিতার উপরে তেমন জোর দেওয়া হয় না। সভ্যেরা ঋণের ব্যাপারে পারস্পরিক তত্ত্বাবধান করে না। হিসাব-পরীক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ। সভ্যদের মধ্যে ও পরিচালনা কমিটির মধ্যে সততার অভাব দেখা যায়। সভ্যদের মধ্যে দলাদলি ও উপদল-গঠন বহু সমিতির সর্বনাশ করে। উৎপাদন, ভোগ এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গঠিত অ-ঋণদান সমবায় সমিতি সংখ্যায় খুবই কম। সমস্ত সমিতিতেই সরকারী কর্তৃত্ব অত্যন্ত বেশী। ইহার ফলে সভ্যদের

২। সুপরিচালনার অভাব

৩। সততার অভাব

কর্মোদ্যোগ ব্যাহত হয় সরকার সমবায় সমিতিগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থসাহায্য করিতে পারে নাই। ভারতে সমবায় আন্দোলনের অসাফল্যের ইহা অন্যতম প্রধান কারণ।

৪। সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাত্রাধিক্য

যুদ্ধের ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কৃষকের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় সাধারণভাবে সমবায় সমিতিগুলির অবস্থা পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল। পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে সমিতির সংখ্যা ও সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু এই সংখ্যাবৃদ্ধিকে আন্দোলনের স্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে করিলে ভুল হইবে। যতদিন পর্যন্ত সমবায় আন্দোলনের উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূরীভূত না হইবে, ততদিন আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে না। ১৯৩০ সালের পূর্বে অনেক সমিতি গঠিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের সংগঠন এতই ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে ১৯২৯-৩০ সালের মন্দা বাজারের প্রথম ধাক্কাও তাহারা সামলাইতে পারে না।

বর্তমান অবস্থা অগ্রগতির লক্ষণ কি?

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রধানতঃ গ্রাম ও কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা সমবায়ের ভিত্তিতে করা হইয়াছে বলিয়া সমবায় অন্দোলনের সফলতা বিশেষ প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য বলিলেও চলে। সমবায় আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে সমবায়ের নীতিগুলি সমবায়ীর মনের মধ্যে ভাল করিয়া গাঁথিয়া দিতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ এবং নিরক্ষর সমবায়ী লইয়া সমবায় আন্দোলন সফল হইতে পারে না। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন সাধারণ ও নীতিমূলক শিক্ষা বিস্তারের। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫ বৎসরের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the fundamental principles of co-operation? (C. U., 1926, 1929) (২৪৫-২৪৭ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Discuss the main features of the co-operative movement in India. (২৪৬-২৪৮ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Discuss the organisation and functions of rural co-operative credit societies. (C. U., 1929, 1931, 1941) (২৪৮-২৪৯ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Indicate the different ways in which the co-operative movement has benefited the agriculturists, artisans and, in general, persons of limited means. (C. U., 1940) (২৫২-২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ)

সপ্তম অধ্যায়

ভূমি-রাজস্ব

(Land Revenue)

বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা (Systems of Land Tenure) :

প্রত্যেক দেশে রাষ্ট্রই শেষ পর্যন্ত সকল ভূমির মালিক। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই রাষ্ট্র সাধারণ নাগরিককে কৃষি ও অন্যান্য কার্যের জন্য জমি ব্যবহার করিতে দেয়। জমি ব্যবহারের জন্য নাগরিককে কয়েকটি সর্ত পালন করিতে হয়। অন্যতম সর্ত হইল যে জমি হইতে আয়ের একাংশ সরকারকে দিতে হইবে। জমি হইতে আয়ের যে অংশ সরকারকে দেয় তাহাকে ভূমি-রাজস্ব বলা হয়। যে পদ্ধতি অনুসারে ভূমি-ব্যবহারকারীর কর্তব্য ও অধিকারসমূহ নির্ধারিত হয় সেই পদ্ধতিকে স্বত্ব-ব্যবস্থা (Tenure) বলা হয়;—অর্থাৎ জমির স্বত্ব-ব্যবস্থার উপরই জমির মালিকানা নির্ভর করে। জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া মালিকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণকে সেট্‌ল্‌মেণ্ট বা বন্দোবস্ত বলা হয়। কাজেই স্বত্ব-ব্যবস্থার তারতম্য অনুযায়ী ভূমি-বন্দোবস্তেরও তারতম্য হয়। জমির মালিক জমিদার হইলে ভূমি-বন্দোবস্তকে জমিদারী বন্দোবস্ত বলে; কৃষকেরা জমির মালিক হইলে উহাকে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত বলা হয়। বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী ও অস্থায়ী, এই দুই রকমের হইতে পারে। বাংলা ও বিহারের জমিদারী এলাকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল। জমিদারের দেয় ভূমি-রাজস্ব এই সব অঞ্চলে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট। রায়তওয়ারী এলাকায় ও অন্যান্য জমিদারী এলাকায় অস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত।

ভূমি-রাজস্ব ও স্বত্ব-ব্যবস্থা

সেট্‌ল্‌মেণ্ট বা বন্দোবস্ত

বিভিন্ন রকমের অস্থায়ী বন্দোবস্ত (Different kinds of Temporary Settlement) :

অস্থায়ী বন্দোবস্ত নানা রকমের আছে :

১। **রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত :** বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের

অন্তর্গত বেরারে এইরূপ বন্দোবস্ত প্রচলিত। এইরূপ বন্দোবস্তে রায়তেরা জমির মালিক। ১০ হইতে ৩০ বৎসর ব্যাপী সময়ের জন্য তাহাদের দেয় ভূমি-রাজস্বের হার ঠিক করিয়া দেওয়া হয়।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে রায়তেরাই জমির মালিক

২। **মহালওয়ারী বন্দোবস্ত :** উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাবে এইরূপ বন্দোবস্ত প্রচলিত। একটি মহাল অর্থাৎ কয়েকটি গ্রামের কৃষকেরা একত্রে যৌথভাবে মালিক হিসাবে গণ্য হয়। মহালের দেয় ভূমি-রাজস্ব দেওয়ার জন্য মহালের রায়তেরা যৌথভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে। সাধারণতঃ রাজস্ব 'লম্বরদার' নামে অভিহিত গ্রামের মাতব্বরের মারফৎ সংগৃহীত হয়। সাধারণতঃ উৎপন্নের শতকরা ৫০ ভাগ খাজনা হিসাবে সরকারকে দিতে হয়।

মহালওয়ারী বন্দোবস্তে মালিকানা হইল যৌথ

৩। **মালগুজারী বন্দোবস্ত :** এইরূপ বন্দোবস্ত মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত। মহারাষ্ট্রীয় রাজত্বের সময় হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। মালগুজাররা সরকারের অধীনে তালুকদার। তাহারা নিজ নিজ তালুক হইতে ভূমি-রাজস্ব আদায় করিয়া সরকারী তহবিলে জমা দেওয়ার দায়িত্ব লয়। সরকারের দৃষ্টিতে তাহারা জমিদার হিসাবে গণ্য হয়। আদায়ীকৃত রাজস্বের উপর তাহারা নির্দিষ্ট কমিশন পায়। রায়তদের দেয় রাজস্ব সরকারই ঠিক করিয়া দেয়। কাজেই এই বন্দোবস্ত নামে জমিদারী বন্দোবস্ত হইলেও কার্যতঃ রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত হইতে বিশেষ ভিন্ন নয়।

মালগুজারী বন্দোবস্ত নামে মাত্র জমিদারী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) :

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করেন। তিনি জমিদারীগুলির দেয় রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হারে ঠিক করিয়া দেন। জমিদার তাঁহার অধীনস্থ এলাকার ভূমি-রাজস্ব কয়েকটি নির্দিষ্ট কিস্তিতে শোধ করিয়া দেওয়ার জন্য দায়ী থাকেন। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে কিস্তির টাকা জমা দেওয়া না হইলে জমিদারী নিলামে চড়ানো হয়। পূর্বে জমিদারেরা রায়তদের নিকট হইতে যত ইচ্ছা খাজনা লইতে পারিতেন, কিন্তু কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকার আইন পাশ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাহাকে বলে

করিয়া জমিদারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সময়ে, মহাল হইতে প্রাপ্য খাজনার ১১ ভাগের ১০ ভাগ সরকারের প্রাপ্য ভূমি-রাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছিল। পরে জমির মূল্য বাড়িতে থাকার দরুণ জমিদারেরা ধীরে ধীরে খাজনা বাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু ভূমি-রাজস্ব ঠিক আগের মতই আছে। ফলে, জমিদারের মোট নীট আয়ের অঙ্ক বর্তমানে বিরাট।

সুবিধা ঃ ভূমি-রাজস্ব আদায় সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত হইয়াছে। কর্ণওয়ালিসের সময়ে সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়মিত রাজস্ব আদায়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে—
১। রাজস্ব আদায় সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে
২। ব্রিটিশ সরকারের সুবিধা হইয়াছিল
৩। দেশের নানারূপ উন্নতি হইয়াছিল
৪। মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল

সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী বরাবর ব্রিটিশ শাসনের সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধে জমিদারেরা নানা ভাবে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

জমিদারেরা দাবী করিতেন যে তাঁহারা জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা। অবশ্য তাঁহাদের নেতৃত্বে ও টাকায় যে বাংলা দেশে বহু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। শিল্পের উন্নতিসাধনে, এমন কি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও অনেক জমিদার অগ্রণী হইয়াছেন।

বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বলিয়া, হঠাৎ করবৃদ্ধির দরুণ কৃষিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না। জমির মালিক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় জমিদারেরা জমির উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কারণ উন্নতির ফলটুকু তাঁহারাই ভোগ করিবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একটি মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীই সব সময়ে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জাগরণের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

দোষ-ত্রুটি ঃ কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ-শাসনের স্থায়িত্ব লাভের সহায় হইলেও ভারতীয় কৃষক-শ্রেণীর সর্বনাশ করিয়াছে। ১৯৩৮ সালে বাংলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ফ্লাউড কমিশন ইহার নিন্দা করিয়াছে। কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ করার পরামর্শ দিয়াছে।

ফ্লাউড কমিশন ইহার নিন্দা করিয়াছে

জমিদারেরা জমির উন্নতির কোন চেষ্টা করেন না। তাঁহারা শুধু খাজনা আদায় করেন এবং সহরে থাকিয়া বিলাসী জীবন যাপন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত থাকায় রাজস্ব

জমিদারেরা জমির উন্নতির চেষ্টা করেন না

বাবদ সরকারের প্রচুর ক্ষতি হয়। ভূমি-রাজস্ব বাড়ানোর উপায় নাই। জমিদারের আয় বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সরকারের প্রাপ্য ভূমি-রাজস্ব ১৭৯৩ সালে যেমন ছিল এখনও তেমনিই আছে।

ভূমি-রাজস্ব বাড়ানোর উপায় নাই

জমিদারদের আনুগত্য ব্রিটিশ শাসকগণের পক্ষে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ইহা কখনই সমর্থিত হয় নাই। জমিদারদের মধ্যে অনেকেই জাতীয় আন্দোলনে বাধা দিয়াছেন। উপরন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে জমিদারী এলাকায় কৃষকদের উপর ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছে। জমিদারদের নায়েব এবং পাইকরা কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। বাংলা সাহিত্যে এইরূপ অত্যাচারের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়।

জমিদারগণ জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছেন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ নানারকম মধ্য-স্বত্বের উদ্ভব হইয়াছে। বর্তমানে প্রকৃত চাষী ও জমিদারের মধ্যে বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী রহিয়াছে। তাহারা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতির কোনরূপ সহায়ক নয়; বরং পরগাছার মত কৃষকশ্রেণীর স্কন্ধে চাপিয়া আছে। ভাগের মা গঙ্গা পায় না,—এই প্রবাদ বাক্যটি বাংলার জমি সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অসম্বদ্ধ জমির সংহতি ও উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ একরকম অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই যে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উৎপত্তির একমাত্র কারণ সেকথা ঠিক নয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রচলিত; কিন্তু সেখানেও প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত-শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে।

মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব

জমির সংহতি ও উন্নতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বনাম অস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement vs. Temporary Settlement):

প্রথম প্রথম সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দিকেই বেশীরকম ঝুঁকিয়াছিল। ভারতীয় জনমতও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুকূল ছিল। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আজকাল মত বদলাইয়া গিয়াছে। প্রগতিশীল ভারতীয় জনমত অনুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্বে জনমত কর্তৃক সমর্থিত হইত

অত্যন্ত অকল্যাণজনক এবং অবিলম্বে ইহার লোপ বাঞ্ছনীয়। বর্তমান জনমত অস্থায়ী রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের অনুকূলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সৃষ্ট অলস খাজনা-ভোগীদের শ্রেণী সমাজের কোন প্রয়োজনেই আসে না, বরং তাহারা পরগাছার মত কৃষকদের ঘাড়ে চাপিয়া ক্রমাগত ধনী হইতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সরকার ও জনসাধারণ উভয়কেই ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে এবং জমির উন্নতির পথে নানা বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ অবশ্য ভূমি-রাজস্বের আদায় নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট হয় এবং কৃষিতে হঠাৎ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না, কিন্তু এইসব সুবিধার তুলনায় অসুবিধা ও অকল্যাণ বহুগুণে বেশী।

বর্তমান জনমত অস্থায়ী রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের অনুকূলে

বন্দোবস্ত অস্থায়ী হইলে ভবিষ্যৎ বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কৃষকদের মনে অনিশ্চয়তা-বোধ থাকে এবং নূতন বন্দোবস্তের সময় হইলে কৃষিতে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় একথা ঠিক। কিন্তু যতখানি অসুবিধার কথা বলা হয়, তাহা অতিরঞ্জিত। বন্দোবস্ত অস্থায়ী হইলে ভূমি-রাজস্বের পরিবর্তনশীলতা বা নমনীয়তা থাকে। এইরূপ বন্দোবস্তের ইহাই প্রধান গুণ। কিন্তু বর্তমানে ভূমি-রাজস্বের হ্রাসই কৃষকদের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার। প্রচলিত রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে কৃষকদের উপর অত্যন্ত বেশী হারে রাজস্বের ভার চাপানো হইয়াছে। কাজেই সরকার ভূমি-রাজস্বের হার না কমাইলে এবং জমির উন্নতির ব্যবস্থা না করিলে শুধু মাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ করিয়া বিশেষ লাভ হইবে না। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভূমি-সম্বন্ধে সরকারী নীতি এমনই হওয়া উচিত যাহাতে কৃষকেরা উৎসাহ পায় ও নিরাপত্তা বোধ করে।

ভূমি-রাজস্বের হ্রাস বর্তমানে কৃষকদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়

জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন (Abolition of the Zamindari System) :

১৯৩৮ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক ভূমি-রাজস্ব কমিশন বা ফ্লাউড কমিশন নিযুক্ত হয়। ফ্লাউড কমিশন জমিদারগণকে নগদ টাকায় বা সরকারী ঋণপত্রে ক্ষতিপূরণ

দিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপের জন্য সুপারিশ করেন। ভারতে প্রগতিশীল দৃষ্টিসম্পন্ন সকলেই শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, জমিদারী প্রথারই বিলোপের পক্ষপাতী। ১৯৩৭ সাল হইতে কংগ্রেস দল সমস্ত নির্বাচনী ইস্তাহারেই জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন প্রদেশ এই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে খানিকটা সচেতন হয়। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য এই প্রথা লোপের জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্দেশ অনুসারে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের বন্দোবস্ত হইতেছে।

প্রগতিশীল দৃষ্টিসম্পন্ন সকলেই জমিদারী প্রথা লোপের পক্ষপাতী

বিভিন্ন রাজ্যের বর্তমান অবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে জমি সম্বন্ধে সরকারী নীতির উপর। এই সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে সমস্ত মধ্যস্বত্ব লোপের। যতদিন পর্যন্ত কৃষক কৃষি-জমিকে নিজের বলিয়া মনে করিতে, না পারিবে ততদিন পর্যন্ত কৃষিজগতে কোনরূপ 'বিপ্লব' আনয়ন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং পরিকল্পনা কমিশন অবিলম্বে জমিদারী ইত্যাদি মধ্যস্বত্বলোপের যে পরামর্শ দিয়াছে তাহা সমালোচনার উর্ধ্বে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও জমিদারী প্রথা

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ (Land Revenue Assessment) :

অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় সাময়িক ভাবে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হয়। ১০ হইতে ৩০ বৎসর সময়ের জন্য ভূমি-রাজস্বের হার নির্ধারণ করা হয়। প্রথমতঃ, বিভিন্ন ক্ষেতগুলির মাপজোক লওয়া হয়। ইহাকে "Cadastral Survey" বলা হয়। তাহার পর ভূ-স্বত্ব লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পূর্বে লিপিবদ্ধ স্বত্ব সম্পর্কীয় কাগজপত্র প্রয়োজনমত নূতন ভাবে লিখিয়া লওয়া হয়। অতঃপর ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়।

অস্থায়ী এলাকায় ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের সাধারণ নীতি হইল, নীট আয়ের একটি নির্দিষ্ট শতকরা অংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বেরারের রায়তওয়ারী অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের মালগুজারী অঞ্চলে এবং পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের মহালওয়ারী অঞ্চলে এইরূপ নীতিতে রাজস্ব ধার্য করা হয়।

মাদ্রাজে জমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর এক খণ্ড জমিতে পরীক্ষা স্বরূপ ফসল কাটার কাজ করিয়া নীট আয় (অর্থাৎ চাষের খরচ পোষাইয়া মোট আয়ের উদ্বৃত্ত) স্থির করা হয়। বোম্বাই প্রদেশে কৃষিজাত পণ্যের দাম-দস্তুর, জমির উর্বরতা, সেচের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয় সম্যক্ বিবেচনা করিয়া নীট আয় স্থির করা হয়।

সাহারানপুরের নিয়ম অনুযায়ী ভূমি-রাজস্ব নীট আয়ের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কার্যতঃ, নীট আয়ের শতকরা আরো কম অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে ধার্য হয়। ১৯৩৭ সালে জনপ্রিয় মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে অনেক রাজ্যে ইহা আরো কমিয়া গিয়াছে। ভূমি-রাজস্ব গড়পড়্‌তায় নীট আয়ের শতকরা ৩০ ভাগের বেশী হয় না।

অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় এই ধরণের ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ প্রাচীন প্রথার দ্বারা বহুপরিমাণে প্রভাবান্বিত। পূর্বে চিরস্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় প্রকার বন্দোবস্তের এলাকায় ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণে প্রাচীন প্রথাই মুখ্য অংশ গ্রহণ করিত। পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং ভূমি-রাজস্ব বা খাজনা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে কৃষকেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয় এবং সরকার আইন দ্বারা খাজনা বৃদ্ধির সীমা নির্দেশ করিতে বাধ্য হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কৃষকেরা জমিদার বা সরকারকে যে রাজস্ব বা খাজনা দেয় তাহা তিনটি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়; যথা,—প্রথা, প্রতিযোগিতা এবং আইন। অন্যান্য দেশে খাজনা নির্ধারণ একমাত্র প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারাই হয়।

প্রথা, প্রতিযোগিতা ও আইন এদেশে খাজনা নির্ধারণ করে

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the main types of land revenue settlement in India. (C. U., 1945). (২৫৫-২৫৭ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Examine the merits and drawbacks of the Permanent Settlement of Bengal. (C. U., 1936, 1939, 1941). (২৫৬-২৫৮ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Compare the merits of permanent and temporary settlement of land revenue in British India. (C. U., 1947). (২৫৮-২৫৯ পৃষ্ঠা দেখ)

4. State the chief principles of land revenue assessment in the temporarily settled areas in British India. (২৬০-২৬১ পৃষ্ঠা দেখ)

অষ্টম অধ্যায়

দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষের কারণ (Causes of Famines) :

যে অর্থনৈতিক অবস্থায় দরিদ্র জনসাধারণ খাদ্য দ্রব্য কিনিতে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাকে দুর্ভিক্ষ বলে। দুর্ভিক্ষের কারণ দ্বিবিধ : (১) খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, ও (২) টাকা-কড়ির অভাব। কোন অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হইলে অজন্মা হয়। ফলে, ঐ অঞ্চলে খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়। ভারতের জনসাধারণের অধিকাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষকেরা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য উৎপন্ন করে। অজন্মার দরুণ ক্ষেতে ফসল ফলাইতে না পারিলে তাহাদের অনাহারে থাকিতে হয়। কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়ই তাহাদের উপার্জনের একমাত্র উৎস বলিয়া, কোন বৎসর ফসল ফলাইতে না পারিলে তাহাদের আয় বন্ধ থাকে। কৃষকেরা খুব দরিদ্র; স্বভাবতঃই অজন্মার বৎসর নির্ভর করিবার মত অতীত সঞ্চয় তাহাদের থাকে না। কাজেই অজন্মার দরুণ টাকাকড়ির অভাবও দেখা দেয়। কৃষকদের ক্রয়শক্তি ভয়ানক ভাবে কমিয়া যায়। কৃষকদের ক্রয়শক্তি কমার ফলে সমগ্র জনসাধারণেরও ক্রয়শক্তি কমিয়া যায়।

খাদ্যাভাব ও অর্থাভাব—দুই কারণেই দুর্ভিক্ষ হইতে পারে

একই সময়ে সারা ভারত জুড়িয়া অজন্মা কদাচিৎ দেখা দেয়। কোন বিশেষ এলাকায় খাদ্যের অভাব দেখা দিলে, অন্য এলাকা হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া এই অভাব মিটানো যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে মাল চলাচলের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। কোন এলাকায় খাদ্যের অভাব দেখা দিলে অন্য এলাকা হইতে দ্রুত খাদ্য আনার ব্যবস্থা করিয়া এই অভাব মিটানো সহজ ছিল না। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে পরিবহন ব্যবস্থায় যুগান্তর আসিয়াছে। আজকাল বাড়্‌তি এলাকা হইতে ঘাট্‌তি এলাকায় অতি দ্রুত খাদ্য চালান দেওয়া যায়। কিন্তু যথেষ্ট খাদ্য বাজারে উপস্থিত থাকিলেও টাকাকড়ির অভাবে দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা খাদ্য কিনিতে পারে না। তাহা ছাড়া চাহিদার তুলনায় খাদ্যের যোগান কম হইলে খাদ্যের দাম ভয়ানক

উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা অনেক সময় দুর্ভিক্ষের দুর্দশার লাঘব করিতে পারে

বাড়িয়া যায়; আর দেশে মুদ্রাস্ফীতি থাকিলে ত কথাই নাই। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষে চাউলের দাম অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। খাদ্যের দাম বেশীরকম বাড়িয়া গেলে দরিদ্রের পক্ষে কিনিয়া খাওয়া সম্ভবপর হয় না। ফলে, কোন এলাকায় অজন্মা হইলে দরিদ্রেরা না খাইয়া মরিতে থাকে। এইজন্যই ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অনেক সময় বলা হয় যে ইহা খাদ্যের দুর্ভিক্ষ নয়, ইহা টাকাকড়ির দুর্ভিক্ষ। কিন্তু, শস্যহানিই দুর্ভিক্ষের মৌলিক কারণ। দুর্ভিক্ষে কৃষক ও কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা বিশেষভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

ভারতে দুর্ভিক্ষ অনেক সময় টাকাকড়ির দুর্ভিক্ষ, খাদ্যের দুর্ভিক্ষ নহে

ভারতবর্ষকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিলে বর্তমান শতাব্দীতে আরো দুইটি কারণ দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনাকে বাড়াইয়া দিয়াছে। প্রথমতঃ, জনসংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে, বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ হিসাবে, বাড়িয়া চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, জনপ্রতি খাদ্যশস্যের জমি ভয়ানক ভাবে কমিয়া গিয়াছে। জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়া ত দূরের কথা, অনবরত উর্বরতা-ক্ষয় ও সারের অভাবের দরুণ কমিয়া যাইতেছে। এইভাবে ভারতীয় জনসাধারণের প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের যোগান ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং ভারতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সর্বদাই রহিয়াছে।

দ্রুতগতিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও জমির উর্বরতা-ক্ষয়—দুর্ভিক্ষের মূল কারণ

দুর্ভিক্ষ নিবারণ (Prevention of Famines):

দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে ভারতের জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইতে হইবে। খাদ্যশস্য চাষের জমি আরো বাড়াইতে হইবে। ফসল বাড়ানোর জন্য রীতিমত চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে: পতিত জমির উদ্ধার, নূতন বনের পত্তন, উর্বরতা-ক্ষয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সেচের প্রসার, জমিতে সার দেওয়া, অসম্বদ্ধ জমির সংহতি সাধন এবং কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি। কৃষি-পণ্য বাজারে বিক্রয়ের সুব্যবস্থার ফলে কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য দাম পাইবে। গ্রাম-অঞ্চলে কুটির-শিল্পকে উৎসাহ দিলে কৃষকদের আয় বাড়িবে এবং বৎসরের কয়েক-মাস তাহাদিগকে বাধ্যতামূলক আলস্যে কাটাইতে

দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে:

১। জমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি

২। খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি

৩। উন্নততর ফসল বিক্রয়-ব্যবস্থা

হইবে না ; বরং অনেক শিল্প কৃষকেরা দ্বিতীয় উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে। জল-নিষ্কাশন ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ফসলের উপর পঙ্গপালের উৎপাত বন্ধ করিতে হইবে। রাস্তাঘাট, রেলপথ প্রভৃতি যানবাহন বা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। ভালো রাস্তাঘাট ও রেলপথ থাকিলে সরকার বাড়্তি অঞ্চল হইতে ঘাট্তি অঞ্চলে অতি দ্রুত খাদ্য আমদানী করিয়া দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা রোধ করিতে পারে। দেশজোড়া খাদ্যের পর্যাপ্ততা না থাকিলে নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু করিতেই হইবে। এইরূপ অবস্থায়, খাদ্য বরাদ্দের বন্দোবস্তে গলদ থাকিলে দুর্ভিক্ষ হইবেই।

৪। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি

৫। নিয়ন্ত্রণ প্রথা

দুর্ভিক্ষ ত্রাণের সংগঠন (Oragnisation of Famine Relief) :

দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের কর্তব্য দ্বিবিধ। আদৌ দুর্ভিক্ষ হইতে না দেওয়াই সবচেয়ে কাজের কথা। 'প্রতিরোধ আরোগ্যের চেয়ে ভাল' এই প্রবাদ বাক্য সত্যই মূল্যবান। দুর্ভিক্ষ নিবারণ বা প্রতিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। দেখা গিয়াছে যে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধকল্পে নানা উপায়ে ভারতের মোট খাদ্য সরবরাহ বাড়াইতে হইবে ও বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য যোগানের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও সংরক্ষণী সেচ-ব্যবস্থার প্রসার প্রয়োজন। যে সেচ-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল কোন অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখা, তাহাকে সংরক্ষণী সেচ-ব্যবস্থা (Protective Irrigation Works) বলা হয়। এইরূপ সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণের ব্যয় অনেক সময় দুর্ভিক্ষ বীমা ভাণ্ডার বহন করে। প্রত্যেক বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা এই ভাণ্ডারে জমা করা হয়। এই ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল সংরক্ষণী সেচ-ব্যবস্থা ও সংরক্ষণী রেলপথ নির্মাণের জন্য টাকা দেওয়া এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্তদিগের জন্য ব্যয় করা।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উপায় :

১। অধিক খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা

২। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি

৩। দুর্ভিক্ষ বীমা ভাণ্ডার

প্রতিরোধের এইসকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহা হইলে সরকারের কর্তব্য হইল যাহাতে একটি লোকও না খাইয়া

না মরে তাহার ব্যবস্থা করা। উনবিংশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ প্রায় নিয়মিত ভাবে ঘন ঘন দেখা দিত। প্রত্যেক দুর্ভিক্ষেই লক্ষ লক্ষ লোককে মরিতে হইত। আর্তত্রাণের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা বা সংগঠন ছিল না। সরকার যাহা কিছু করিত, তাহাতে অনেক বিশৃঙ্খলা ও বিলম্ব ঘটিত। অবশেষে বর্তমান শতাব্দীতে সরকার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করায় দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অবশ্য ১৯৪৩ সালের বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষ এই উক্তির ব্যতিক্রম।

দুর্ভিক্ষের লক্ষণ

বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইল তাহা লক্ষ্য করা হয় এবং লিপিবদ্ধ রাখা হয়। কোন বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে, কিংবা বন্যা হইলে ইহা বিপদ-সঙ্কেত হিসাবে গণ্য হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ফসলের সম্ভাব্য উৎপাদনের হিসাবও বিশ্লেষণ করা হয়। সরকারের আনুমানিক হিসাব হইতে যদি বোঝা যায় যে কোন এলাকায় সম্ভাব্য ফসলের পরিমাণ অত্যন্ত কম, তাহা হইলে সরকার তখন হইতেই সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে থাকে। ঐরূপ এলাকায় জেলা অফিসার ও তাঁহাদের সহকারীদের উপর নির্দেশ থাকে, যাহাতে তাঁহারা দুর্ভিক্ষের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র সরকারকে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেন। ভিক্ষুক ও চোরদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ধান দুর্ভিক্ষের নিশ্চিত লক্ষণ।

দুর্ভিক্ষত্রাণের জন্য সরকার কি করে

জনসাধারণের সত্যসত্যই সাহায্যের দরকার আছে কিনা জানিবার জন্য সরকার খুব কম মজুরীতে গরীবদের কাজ দেওয়ার জন্য পরীক্ষামূলক ত্রাণ কর্মশালা (Test Relief Works) স্থাপন করে। এইসব কর্মশালায় যদি অনেক নিয়োগ-প্রার্থীর ভিড় দেখা যায়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সরকারের আর সন্দেহ থাকে না। তখন আর্তত্রাণের ব্যবস্থা আরো ব্যাপক ও প্রসারিত করা হয়। বে-সরকারী সংগঠনগুলিকেও আর্তত্রাণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। প্রত্যেক গ্রামে চরম দুঃস্থদের তালিকা প্রস্তুত হয়। গরীবখানা ও দুঃস্থশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া আর্তদের আহার ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়। বাড়্‌তি অঞ্চল হইতে ঘাট্‌তি অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য আমদানী ত্বরান্বিত করা হয়। খাদ্যের মজুতদার ও মুনাফাখোরদের কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হয়।

পরবর্তী ফসলের মরশুম সন্নিকট হইলে, সরকার ধীরে ধীরে আর্তত্রাণের ব্যবস্থা গুটাইয়া আনে এবং কৃষকদিগকে নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া চাষ সুরু করিতে উৎসাহিত করে।

চাষবাস সুরু করার জন্য কৃষকদিগকে 'তাকাভি' ঋণ দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষের পরেই আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি যে সব রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয় তাহার নিবারণকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। পুনর্বাসন সম্ভব করিয়া তোলার ব্যবস্থাগুলিই দুর্ভিক্ষকালীন ত্রাণকার্যের শেষ অধ্যায়।

দুর্ভিক্ষত্রাণের সরকারী পরিকল্পনা অনেক সময় কার্যকর হয় না। বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষের সময় সকল সরকারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য বিদেশী সরকারের সদিচ্ছার অভাবই এই ব্যর্থতার মূল কারণ। ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া দুর্ভিক্ষ সুরু হইলে, আর্তত্রাণের ব্যবস্থা আরো প্রসারিত এবং আরো উৎসাহদীপ্ত হওয়া প্রয়োজন। খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন, সুশৃঙ্খল খাদ্যবরাদ্দের প্রচলন, চোরাবাজার ধ্বংস এবং মজুতদার, মুনাফাখোর ও ঘুষখোর আমলাদের শাস্তির জন্য সরকারের দৃঢ় সঙ্কল্প ও সংগঠন থাকা আবশ্যক।

আর্তত্রাণের সংগঠন আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the causes of Indian famines. What steps have been taken to fight them? (C. U., 1926, 1927, 1929, 1931) (২৬১-২৬৩, ২৬৪-২৬৬ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Describe the organisation of famine relief in India. (C. U., 1935) (২৬৪-২৬৬ পৃষ্ঠা দেখ)

নবম অধ্যায়

শিল্প

কুটির শিল্প (Cottage Industries):

এককালে শিল্পের জন্য ভারতের পৃথিবী-জোড়া খ্যাতি ছিল। সভ্যজগতের সর্বত্র ঢাকার মস্‌লিনের আদর ছিল। রোমের রাজদরবারের অভিজাতগণ ভারতবর্ষের সোনা-রূপার কাজ করা জরিতে সজ্জিত থাকিতেন। স্যার উইলিয়ম

হাণ্টার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "প্রাকৃতিক সম্পদ ও দীর্ঘ সমুদ্রোপকূলের চেয়েও বেশী করিয়া ভারতের জনসাধারণের শিল্প-প্রতিভা ভারতবর্ষকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।" শিল্প কমিশন লিখিয়াছে যে ভারতবর্ষ যখন তাহার রাজারাজড়ার সম্পদ ও শিল্পীদের শিল্প-প্রতিভার জন্য পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ছিল তখন আধুনিক শিল্প-পদ্ধতির জন্মভূমি পশ্চিম ইউরোপে অসভ্য জাতিসমূহ বাস করিত। ভারতের প্রাচীন শিল্পগুলি ছিল ক্ষুদ্রায়তনের শিল্প। শিল্পীরা নিজেদের বাড়ীতেই সামান্য যন্ত্রপাতি ও শ্রমকৌশলের সাহায্যে পণ্য তৈয়ারী করিত। এইরূপ শিল্পকে কুটির শিল্প বলা হয়।

প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতের উন্নত শিল্প

ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড হইতে সস্তা যন্ত্র-জাত জিনিসের আমদানী সুরু হওয়ায় কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যন্ত্রপাতি ও কয়লা প্রভৃতি যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে কলকারখানায় বৃহদায়তনে পণ্যোৎপাদন হইতে থাকে।

ইউরোপীয় যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রাচীন কুটির শিল্পগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। যেগুলি কোনমতে টিকিয়া আছে সেইগুলিও নানা কারণে একে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সব শিল্পের উৎপাদনের পদ্ধতি অতি পুরাতন। যুগ যুগ ধরিয়া একই রকমের সরঞ্জাম ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ অল্প। শিল্পীরা নিরক্ষর এবং বাজারের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। তাহারা ক্রেতাদের পরিবর্তনশীল রুচি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে খোঁজ রাখে না। উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে তাহাদের পণ্যের কাটতি হয় না। কুটির শিল্পের উপর সরকারী সহানুভূতির অভাব এবং বিদেশী পণ্যের আমদানী উৎসাহিত করার সরকারী নীতি কুটির শিল্পের ক্রমাবনতির প্রধান কারণ। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসনের সুরু হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষকে শিল্পদ্রব্যের জন্য ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীল করিয়া তোলার নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি এমন ভাবে অনুসৃত হয় যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবাসীকে ব্রিটেনের শিল্পগুলিকে কাঁচা মাল যোগান দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

ভারতের কুটির শিল্পের ধ্বংসের কারণ:
১। ইউরোপীয় যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা
২। ভারতের কুটির শিল্পের নিজস্ব ত্রুটি

ভারতবাসীর রুচি ও স্বভাবের পরিবর্তনও ভারতের কুটির শিল্পের ধ্বংসের অন্যতম কারণ। ব্রিটিশ-শাসন ভারতবর্ষে কায়েমী হইয়া বসিলে ভারতবাসিগণ, বিশেষ করিয়া ধনীরা, ইংরাজ প্রভুদের অনুসরণে বিদেশজাত দ্রব্যের বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়ে। ১৯০৫ সাল হইতে অবশ্য ধীরে ধীরে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে।

৩। ভারতবাসীর রুচি ও স্বভাবের পরিবর্তন

কুটির শিল্পে উৎপাদন-ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত বেশী পড়ে বলিয়া যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা টিকিতে পারে না।

৪। কুটির শিল্পে উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক

এই সমস্ত ত্রুটি ও অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতের প্রধান প্রধান কুটির শিল্পগুলি এখনো টিকিয়া আছে। তাহাদের টিকিয়া থাকার জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: পরিবারের সভ্যদের শ্রমের জন্য কুটিরশিল্পীর মজুরী দিতে হয় না। সে গ্রামে নিজস্ব বাড়ীতে বাস করে বলিয়া তাহার জীবনধারণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। তাহা ছাড়া কৃষি ও তরিতরকারীর বাগান করিয়া সে বাড়্‌তি কিছু আয় করিতে পারে। যন্ত্র-জাত পণ্য এক ছাঁচের ও এক ডৌলের হইতে বাধ্য; কিন্তু কুটিরশিল্পী রুচির বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন ছাঁচের ও বিভিন্ন ডৌলের চারুকলাসম্মত পণ্য তৈয়ারী করে। ফলে কুটিরশিল্পী নিজস্ব পণ্যের বিশেষ চাহিদা ও বিশেষ বাজার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। অনেক সময় কুটির শিল্পজাত পণ্য যন্ত্রজাত পণ্যের চেয়ে বেশী টেকসই হয়।

কুটির শিল্পগুলির টিকিয়া থাকার কারণসমূহ

অতএব দেখা যাইতেছে যে নূতন ভাবে সংগঠিত হইলে কুটির শিল্পগুলি যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগী হিসাবে স্বচ্ছন্দে টিকিয়া থাকিতে পারে। কুটির শিল্পগুলিকে টিকাইয়া রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক। ভূমিহীন চাষীর অভাব নাই; এবং কৃষকেরা বৎসরে প্রায় ৭ মাস বসিয়া থাকে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন কুটির শিল্পের নূতন করিয়া সংগঠনের।

কুটির শিল্পগুলিকে কেন বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে

কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে: পণ্যবিক্রয়ের উন্নতিসাধন; কুটিরশিল্পজাত পণ্যের প্রদর্শনী সংগঠন;

পণ্যের নক্সা ও ছাঁচের বৈচিত্র্য ও উন্নতিসাধন; মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা; উন্নততর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার; বৈদ্যুতিক শক্তির অধিকতর উৎপাদন ও কুটির শিল্পে তাহার নিয়োগ; বুনিয়াদি শিক্ষায় ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা; রাষ্ট্র কর্তৃক কুটিরশিল্পজাত পণ্য ক্রয় এবং কুটির শিল্পগুলিকে সংরক্ষিত করার নীতি গ্রহণ।

উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে

কয়েকটি প্রধান কুটির শিল্প (Some Important Cottage Industries) :

তাঁত শিল্প : তাঁত শিল্প ভারতের প্রধানতম কুটির শিল্প। ভারতীয় তাঁতীদের তৈয়ারী কাপড় একসময়ে দেশবিদেশে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই শিল্প ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমান শতাব্দীতে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে এই শিল্প আবার কিছুটা উৎসাহ পাইতেছে। মহাত্মা গান্ধী হাতে কাটা সূতা এবং খাদি জনপ্রিয় করার জন্য এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ভারত সরকারও তাঁত শিল্পকে আধুনিক করিয়া তুলিবার জন্য অগ্রণী হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁত শিল্পের অবনতি

বর্তমানে ভারতে বিক্রীত মোট কাপড়ের প্রায় শতকরা ২৬ ভাগ এবং মোট উৎপন্নের প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ তাঁত শিল্প হইতে পাওয়া যায়। প্রায় ২৫ লক্ষ লোক জীবিকার জন্য এই কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল এবং মোট প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের তাঁতের কাপড় প্রতি বৎসর বিক্রয় হয়। পশ্চিম বঙ্গে তাঁত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইল শান্তিপুর, হুগলীর রাজবলহাট প্রভৃতি স্থান।

বর্তমান অবস্থা

তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণযোগ্য : উন্নততর তাঁতের প্রবর্তন; বয়নে নূতন নূতন নক্সার প্রবর্তন; প্রদর্শনীর মারফৎ তাঁতী ও ক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন; তাঁতীদিগকে অল্প সুদে ধার দেওয়া; তাঁত ও সূতা ক্রয় এবং কাপড় বিক্রয়ের সুবিধার জন্য তাঁতীদের মধ্যে সমবায় সমিতি সংগঠন; রং করার পদ্ধতিতে উন্নতিসাধন;

তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন

শ্রীরামপুরের মত নানা জায়গায় বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন; গ্রাম্য বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে তাঁতীর ছেলেদের জন্য কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা; সস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে সূতা সরবরাহ; এবং প্রত্যেক প্রদেশের শিল্প বিভাগ কর্তৃক তাঁত শিল্পকে উৎসাহ প্রদান।

কি কি করা হইয়াছে

ভারতে যে 'কুটির শিল্প বোর্ড' আছে তাহার হাতে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই অর্থের অর্ধেক পরিমাণ তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে। ১৯৪৮ সালে তাঁত শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই বিক্রয়কেন্দ্রের জন্য ৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও অধিকাংশ রাজ্য সরকার এক বা একাধিক বয়নশিল্প বিদ্যালয় খুলিয়াছে এবং তাঁত শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপনে উৎসাহ দিতেছে। একটি নিখিল ভারতীয় তাঁত শিল্প বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

তাঁত শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এখন তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৮০ ভাগ ধুতি ও শাড়ী উৎপাদন করিতে পারে। ইহার ফলে তাঁত শিল্পের বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যের তাঁত শিল্পের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

সূতা কাটা: মহাত্মা গান্ধী চরকায় সূতা কাটাকে জাতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ও স্বরাজলাভের প্রধান উপায় হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্বে ঘরে ঘরে মেয়েরা সূতা কাটিত। মহাত্মা গান্ধীর মত এই যে সূতা কাটার ফলে গ্রামের লোক অবসর সময়ে করার মতো কাজ পাইবে, তাহাদের কৃষিকর্ম হইতে আয়ের উপরেও উপার্জন করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া সূতা কাটার ফলে তাহারা সস্তায় নিজেদের কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। অবশ্য সূতা কাটার অর্থনৈতিক গুরুত্বকে অনেক সময় অতিরঞ্জিত করিয়া দেখানো হয়।

পিতল ও কাঁসা শিল্প: ভারতে মুর্শিদাবাদ, মোরাদাবাদ ও কাশী এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। আজকাল ইহাকে আর কুটির শিল্প রূপে গণ্য করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারিগরেরা বাঁধা মজুরীতে বা ফুরণে মহাজনের কারখানায় কাজ করে।

গুটিপোকা পালন ও রেশম শিল্প : এককালে এই শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। সরকার গুটিপোকা পালনে সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়ায় সম্প্রতি এই শিল্পে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিহার, মহীশূর, আসাম ও কাশ্মীরে গুটিপোকা পালন করিয়া রেশম তৈয়ারী করা হয়। ভারতের সর্বত্রই রেশমের কাপড়চোপড় বোনা হয়। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ স্থানের তাঁতীরা রেশমী কাপড় বয়নে বিশেষভাবে পারদর্শী।

অন্যান্য কুটির শিল্পের মধ্যে কাশ্মীর ও মির্জাপুরের পশম শিল্প, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, ভারতের সর্বত্র বিড়ি শিল্প, পুতুল শিল্প এবং ধান-ভানা ঢেঁকি ও তৈল নিষ্কাশনের ঘানি উল্লেখযোগ্য।

কুটির শিল্প সম্বন্ধে সরকারী নীতি (Government's Policy Regarding Cottage Industries) :

১৯৪৭ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি কুটির শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সুপারিশ করে। এই কমিটির অভিমত অনুসারে পুনরুজ্জীবিত ভারতের কুটির শিল্প যন্ত্রচালিত শিল্পগুলির পরিপূরক হইতে পারিবে। ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নিখিল ভারত কুটির শিল্প বোর্ড স্থাপন করেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

নিখিল ভারত কুটির শিল্প বোর্ড

এই বোর্ডের প্রথম সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারতীয় কুটির শিল্পগুলিকে শুধু স্বদেশে ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করিলে চলিবে না—বিদেশে রপ্তানীর জন্যও উৎপাদন করিতে হইবে। এই বোর্ড কুটির শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষাদানের জন্য এক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুমোদন করে। কিছুদিন হইল এই বিদ্যালয় আলিগড়ে স্থাপিত হইয়াছে। কুটির শিল্পের সাহায্যে বাস্তহারাদের পুনর্বসতির চেষ্টা পঞ্জাব ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার করিতেছেন। সম্প্রতি সরকার ১৯৪৯ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন ও জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশগুলিকে কার্যকর করিয়া কুটির এবং ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলিকে উন্নয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং আমাদের এখন এই সুপারিশগুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

কুটির শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষাদানের জন্য আলিগড়ে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলি সম্পর্কে ফিস্ক্যাল কমিশন (The Fiscal Commission on Cottage and Small-scale Industries) :

১৯৪৯ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশন, যাহা কৃষ্ণমাচারী কমিশন নামেও পরিচিত, নিম্নলিখিতভাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির সমস্যাকে দেখিয়াছে :

(ক) গ্রাম্য শিল্পগুলির উন্নয়ন-সমস্যা ;

(খ) গ্রামাঞ্চলে যে সকল নূতন শিল্প নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে পারে তাহাদের পত্তনের সমস্যা ;

(গ) শহরাঞ্চলের কুটির শিল্পগুলির উন্নয়ন-সমস্যা ;

(ঘ) শহরাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির উন্নয়ন-সমস্যা।

গ্রামাঞ্চলের কুটির শিল্পের সমস্যা

গ্রাম্য কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও নূতন শিল্পের পত্তনের সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ হইলেও, ফিস্‌ক্যাল কমিশনের মতে, এ সমস্যার সমাধান সহজেই করা সম্ভব। গ্রাম্য শিল্পীরা যদি প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি পায় তবে তাহারা উৎপাদন-কৌশলের পরিবর্তন সাধন সহজেই করিতে পারিবে। উৎপাদন-কৌশলের পরিবর্তন সাধিত হইলে বর্তমান শিল্পগুলির উন্নতি হইবে এবং নূতন শিল্পের পত্তন হইলে সেগুলি সফল হইবে।

শহরাঞ্চলের কুটির শিল্পের সমস্যা

কিন্তু শহরাঞ্চলের কুটির শিল্পগুলির সমস্যা অন্যরূপ। শহরাঞ্চলের কুটির শিল্পকে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। ফলে এই অঞ্চলের কুটির শিল্পীকে সর্বদা উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যাপারে দক্ষতা বাড়ানোর দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শুধু আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না, বিদেশের বাজারেও যাহাতে পণ্য বিক্রয় হয় তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে হইবে।

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলি সম্পর্কে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (The National Planning Commssion on Cottage and Small-Scale Industries) :

পরিকল্পনা কমিশনের মতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলি সম্পর্কে সরকারের কৃষির মতই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। কি কি বিষয়ে এবং কিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে সে সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির সম্পর্কে সরকারকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে হইবে :

(ক) এমন একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড বা এজেন্সীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহার

কর্তব্য হইবে গ্রাম্য শিল্পীদের সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করা; রাজ্যগুলিতেও এইরূপ সংগঠন থাকিলে ভাল হয়;— সরকারী কর্তব্য

(খ) কাঁচা মাল ব্যবহার ও উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়া যাইতে হইবে;

(গ) শিল্পগুলিকে কাঁচা মাল সংগ্রহে সাহায্য করিতে হইবে;

(ঘ) অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘকালীন ঋণ দিয়া শিল্পগুলিকে সাহায্য করিতে হইবে;

(ঙ) বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পগুলির সহিত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির প্রতিযোগিতা নিরোধকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে;

(চ) বিক্রয়-ব্যবস্থায় অগ্রণী হইতে হইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত ও উন্নয়ন করিবার জন্য ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কমিশনের নির্দেশ অনুসারে ইতিমধ্যেই কি কি করা হইয়াছে বা হইতেছে 'খাদি ও গ্রাম্য শিল্প উন্নয়ন বোর্ড' স্থাপিত হইয়াছে। ইহা অন্যতম সর্ব-ভারতীয় সংগঠন। একটি হস্তচালিত শিল্প বোর্ডও স্থাপিত হইয়াছে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলিকে যাহাতে বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে না হয় তাহার জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। কুটির শিল্প সম্পর্কিত নানা বিষয়ে গবেষণা কার্য চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে। শিল্পীদিগকে মূলধন দিয়া সাহায্য করা হইতেছে। নানা উপায়ে দেশ ও বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করার প্রচেষ্টাও চলিতেছে।

প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প (Important Manufacturing Industries):

বস্ত্র শিল্প: ভারতে ইহাই প্রধানতম যন্ত্রচালিত শিল্প। ভারতের প্রথম কাপড়ের কল ১৮১৮ সালে কলিকাতায় স্থাপিত হয়। কিন্তু এই শিল্পের দ্রুত প্রসার বোম্বাই-এ হয়। বোম্বাই-এর প্রথম কাপড়ের কল ১৮৫৪ সালে স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮৭৭ সালকেই বস্ত্রশিল্পের প্রকৃত সূত্রপাতের বৎসর বলিয়া ধরা হয়। ১৮৭৭ ও ১৮৮০ সালের মধ্যে বোম্বাই, আমেদাবাদ, সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। স্বদেশী আন্দোলন নবগঠিত বস্ত্রশিল্পকে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এই

শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে এই শিল্পকে বিবিধ অসুবিধায় পড়িতে হয়। ১৯২৮ সালে সীমাবদ্ধ পরিমাণে সংরক্ষণ নীতির সাহায্য পাওয়ায় এই শিল্পের অবস্থা দ্রুত উন্নত হইতে থাকে। বস্ত্র শিল্পের চারিটি প্রধান কেন্দ্র হইল বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ। ইহাদের মধ্যে বোম্বাই (আমেদাবাদ সমেত) আবার প্রধানতম কেন্দ্র। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গে এই শিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। ভারতের সমস্ত কাপড়ের কলগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা বৎসরে প্রায় ৬০০ কোটি গজ। তাঁত শিল্পের সহযোগিতায় ভারতের কাপড়ের কলগুলি ভারতীয় জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কাপড় সরবরাহ করিয়াও বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিতে সক্ষম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আশা করা গিয়াছিল যে ভারতে বস্ত্র শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল এই যে ১৯৪৮ সাল হইতে উৎপাদন কমিয়াই আসিতেছে। ১৯৪৮ সালে ৪৩১ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয়; ১৯৪৯ সালে ৩৯০ কোটি গজ; এবং পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র ৩৭০ কোটি গজ। উৎপাদন হ্রাসের কতকগুলি কারণ আছে—যথা, (১) ভারতীয় ইউনিয়নে দীর্ঘ আঁশের তুলা বিশেষ উৎপন্ন হয় না; (২) যন্ত্রপাতির অভাব; (৩) ধর্মঘট ইত্যাদি; (৪) সরকারী নীতি। এই চারিটি কারণের মধ্যে চতুর্থটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে বস্ত্র শিল্পের প্রসারের জন্য সুচিন্তিত সরকারী নীতি দীর্ঘ দিন ধরিয়া অনুসৃত হওয়া উচিত।

বস্ত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা

চিনি শিল্পঃ—ভারতবর্ষ পূর্বে যবদ্বীপ হইতে চিনি আমদানী করিত। ১৯৩১ সালে চিনি শিল্প সংরক্ষণের আওতায় আসে, এবং তখন হইতে এই শিল্প অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রসারলাভ করিয়াছে। ভারতে বর্তমানে প্রায় ১৫০টি চিনির কল আছে। ১৯৫১-৫২ সালে মোট উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪½ লক্ষ টন। চিনির কলগুলির অধিকাংশই উত্তর প্রদেশে ও বিহারে অবস্থিত। ভারতের চিনির প্রয়োজন বর্তমানে ভারতের উৎপাদন হইতে মিটে না। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকারকে ইংলণ্ড, মেক্সিকো, কিউবা ও জাভা হইতে ১ লক্ষ টন চিনি আমদানী করিতে হইয়াছে।

ভারতের চিনি শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় বিশেষ বেশী। যদি রপ্তানীর দিকে লক্ষ্য দিতে হয় তবে উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে হইবে। এতদিন পর্যন্ত এই শিল্পকে 'ভারতীয় চিনি সিণ্ডিকেট' নিয়ন্ত্রণ করিত। বর্তমানে এই সিণ্ডিকেটকে উঠাইয়া

দিবার ব্যবস্থা হইতেছে, কারণ এই সিণ্ডিকেটের কার্যে নানারূপ গলদ ধরা পড়িয়াছে।

লোহা ও ইস্পাত শিল্প: ১৯১১ সালে সাক্‌চীতে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী উৎপাদন স্থরু করে। তখন হইতেই ভারতে এই শিল্পের পত্তন হইয়াছে বলা চলে। ১৯২৪ সালে সংরক্ষণ নীতি এই শিল্পে প্রযুক্ত হওয়ায় ইহার উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিহারের জামসেদপুর, পশ্চিম বঙ্গের বার্ণপুর এবং মহীশূর এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। জামসেদপুরের লোহা ও ইস্পাতের কারখানা এশিয়ায় বৃহত্তম। ভারত এখনও ইস্পাত উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বর্তমানে উৎপাদন প্রায় ১০ লক্ষ টন। ইহাতে ভারতের প্রয়োজন মিটে না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৩ লক্ষ টনের উপর উৎপাদন বৃদ্ধির আশা করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতের ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

পাট কল শিল্প: ভারতবর্ষে ইহাই সবচেয়ে স্থসংগঠিত শিল্প। ১৮৫৫ সালে কলিকাতার নিকটে রিষড়ায় ভারতের প্রথম পাট কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতে প্রায় ১০০টি পাট কল আছে। সবগুলিই পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত। অধিকাংশ পাট কল ইউরোপীয়দের, বিশেষতঃ স্কচদের, পরিচালনাধীন। এই শিল্পের বাৎসরিক মোট উৎপাদন অত্যন্ত অনিয়মিত—কখনো খুব বেশী, কখনো বা খুবই কম। বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হইবার ফলে পাট কলের সবগুলিই ভারত ইউনিয়নে এবং কাঁচা মালের উৎপাদন-ক্ষেত্রের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ পাকিস্তানে পড়িয়াছে। ফলে এই শিল্পের বিশেষ সংকট দেখা দিয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়ন পাটের চাষ বাড়াইয়াছে এবং আরও বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; অপর দিকে পাকিস্তানও পাটের কল স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছে। অতএব অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পের সংগঠনে আমূল না হইলেও বিশেষ পরিবর্তন যে ঘটিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পাট কল শিল্পে সংকট

পাট কল শিল্পের ভবিষ্যৎ

পাটকল শিল্প আর একটি সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। বর্তমানে অনেক দেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায়, পাটজাত দ্রব্যের পরিবর্তে অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা সফল হইলে ভারতের পাট শিল্পের যে বিশেষ ক্ষতি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কাগজ শিল্প ঃ ভারতের প্রথম কাগজের কল কলিকাতার নিকটে বালীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতে বহু কাগজের কল আছে। তাহাদের মধ্যে টিটাগড় কাগজের কলই সবচেয়ে বড়। এই শিল্প সংরক্ষণের আওতায় থাকিয়াই বড় হইয়াছে। অধিকাংশ কাগজের কল ইউরোপীয়দের পরিচালনাধীন। বর্তমানে বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হয়। উৎপাদনকে বাড়াইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টনে লইয়া যাইবার আশা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করা হইয়াছে।

সিমেণ্ট শিল্প ঃ সম্প্রতি এই শিল্পের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহা প্রধানতঃ ভারতীয়দের পরিচালনাধীন। বোম্বাই ও বিহার রাজ্যে সিমেণ্ট শিল্পের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। ১৯৫০-৫১ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৭ লক্ষ টন। ইহাকে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৪৫ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার আশা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করা হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্পের অনগ্রসরতা (Backwardness of Indian Industries) ঃ

পৃথিবীতে আটটি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম। আমাদের দেশ নানা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তুলা, পাট, তৈলবীজ, লাক্ষা, তামাক প্রভৃতি কৃষিজাত ও বনজাত পণ্য এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চামড়া আর একটি মূল্যবান সম্পদ। প্রধান প্রধান প্রায় সকল খনিজ দ্রব্যই এখানে পাওয়া যায়। কয়লা ও জল-বিদ্যুৎশক্তি অজস্র পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। বিরাট জনসংখ্যা ও জনসাধারণের শ্রমশীলতা জাতির পক্ষে সম্পদ স্বরূপ। তবু এই দেশ শিল্পের দিক দিয়া অনগ্রসর। ভারতে শিল্পদ্রব্যের মোট উৎপাদন ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যাই শিল্পজগতে ভারতের স্থান নির্দেশ করিয়াছে—শিল্পদক্ষতা বলে সে আটটি শিল্পোন্নত দেশের অন্যতম বলিয়া গণ্য হয় নাই। ভারতে শ্রমিক পিছু উৎপাদন অত্যন্ত কম এবং উৎপাদন-ব্যয় অত্যধিক। উপরন্তু, অনেক শিল্পদ্রব্যের জন্য ভারত বিদেশের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১০ জন জীবিকার জন্য শিল্পের উপর নির্ভরশীল। অতএব, ভারত অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ হইলেও, ভারতীয় শিল্পের অনগ্রসরতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

ভারতীয় শিল্পের অনগ্রসরতার অর্থ

কারণঃ ভারতীয় শিল্পের অনগ্রসরতার কারণ বহুবিধ ভারতে শিল্পোন্নতি স্থরু হওয়ার আগেই অন্যান্য দেশ শিল্পক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। ফলে, অন্যান্য দেশের শিল্পের সঙ্গে প্রতিযো ি তা করিয়া ভারতে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে রাষ্ট্রের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভারত এতদিন পরাধীন ছিল বলিয়া রাষ্ট্র সব সময়েই দেশীয় শিল্পের প্রতি বিমুখ ছিল।

অনগ্রসরতার কারণঃ

১। ভারতে অন্যান্য দেশের অনেক পরে শিল্পায়ন স্থরু হয়

২। বিদেশী সরকারের বিমুখতা

শিল্পক্ষেত্রে অবাধ (Laissez Faire) বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতিই বহুকাল ধরিয়া রাষ্ট্রের নীতি ছিল। ভারতের মূলধন অল্প; যতটুকু মূলধন আছে তাহাও বিনিয়োগ-বিমুখ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারতের ধনীরা শিল্পের চেয়ে জমিতে ও সরকারী ঋণপত্রে টাকা বিনিয়োগ করা বেশী পছন্দ করিতেন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন ভারতে মূলধন খুব অপর্যাপ্ত নয়। বরং জনসাধারণ কুসংস্কার ও নিরক্ষরতায় ডুবিয়া আছে বলিয়া দক্ষ ও কুশল শ্রমিকের রীতিমত অভাব। ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। গঠনমূলক শিল্পের চেয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য লোকে বেশী পছন্দ করে।

৩। মূলধনের অভাব

। কুশল শ্রমিকের অভাব

৫। উদ্যোগী সংগঠকের অভাব

ইহার পর উৎকৃষ্ট কাঁচা মালের অভাবের কথা উল্লেখ করিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ চিনির কথা ধরা যাক। চিনি শিল্পে ভারত যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই তাহার অন্যতম কারণ হইল ভাল ইক্ষু এদেশে হয় না।

৬। উৎকৃষ্ট কাঁচা মালের অভাব

স্থলভে শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থাও ভারত আজ পর্যন্ত বিশেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতে ভাল কয়লার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প; এদেশে পেট্রোলিয়াম বিশেষ উৎপন্ন হয় না; এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে আজ পর্যন্ত ভারত অনগ্রসর।

৭। শক্তি সরবরাহের স্থবন্দোবস্তের অভাব

প্রতিকারঃ ভারতের শক্তি-সম্পদ পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। বিশেষভাবে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। দক্ষ শ্রমিকের

১। শক্তি-সম্পদকে পূর্ণভাবে কাজে লাগান

যোগান বাড়াইবার জন্য প্রচুর সংখ্যায় বুনিয়াদি কারিগরী বিদ্যালয় ও টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। শিল্পনিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাহাদের বেতন বাড়াইতে হইবে এবং ধাপে ধাপে উন্নতি কবার পথ খুলিয়া দিতে হইবে। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির যত প্রসার হইবে, ততই লোকের সঞ্চয় বাড়িবে এবং সঞ্চিত অর্থ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য পাওয়া যাইবে। শিল্প-ব্যাঙ্ক থাকিলে শিল্পগুলির পক্ষে মূলধন সংগ্রহে সুবিধা হয়।

২। দক্ষ শ্রমিকের যোগান বাড়ান

৩। শিল্প-ব্যাঙ্ক প্রভৃতির প্রসার

জাতীয় আয় বাড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় বাড়ে এবং মূলধনের অভাব হ্রাস পায়। কাজেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হইবে। ব্যবসায়িক উদ্যোগের পক্ষে উৎসাহজনক, স্বাধীন পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। একচেটিয়া কারবারের প্রসার রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সংরক্ষণনীতি আরো উদার ও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।

৪। ব্যবসায়িক উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ

পরিশেষে, অনুন্নত দেশের দ্রুত শিল্পোন্নতি একমাত্র একটি সুচিন্তিত সুশৃঙ্খল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যেই সম্ভব। স্বাচ্ছন্দ্য নীতি গ্রহণ করিলে শিল্পোন্নতি ব্যাহত না হইয়া পারে না—ইহাই আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণের মত। জাতীয় সরকার অবশ্য এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াই একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

৫। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

ভারতের শিল্প-শ্রমিক (Industrial Labour in India) :

ভারতের জনসংখ্যা বিপুল হইলেও শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগান সুপ্রচুর নয়। শিল্প-শ্রমিকের, বিশেষতঃ দক্ষ শ্রমিকের, দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে শিল্পমালিকদের মহলে অনুযোগ শোনা যায়। ভারতের শিল্প-শ্রমিক ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকের তুলনায় অনেক কম দক্ষ।

ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের দক্ষতার অভাব কেন?—নানা কারণে ভারতের শিল্প-শ্রমিকের দক্ষতার অভাব ঘটে। শিল্পক্ষেত্রের অধিকাংশ শ্রমিক আজও পূর্ণভাবে কৃষিজীবনের বন্ধনমুক্ত নয়। সেজন্য, তাহারা কারখানা

অঞ্চলে কখনও স্থায়ী ভাবে বসবাস করে না। অনেকেই গ্রাম হইতে কারখানা অঞ্চলে আসিয়া কিছুদিন কাজ করিয়াই আবার গ্রামে চলিয়া যায়। ভারতীয় শ্রমিকদের এই সঞ্চরমাণ স্বভাব শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করে। সর্দার-প্রথায় শ্রমিক সংগ্রহের নীতি এই অসুবিধাকে আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এই প্রথা অনুসারে, কোন শিল্পের পরিচালক ও সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। পরিচালনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে সর্দারের এবং সর্দার স্বয়ং প্রয়োজনীয়-সংখ্যক শ্রমিক যোগাড় করার দায়িত্ব লয়। সর্দারী প্রথার আওতায় শ্রমিকেরা সর্দারের কাছে ঋণে জড়াইয়া পড়ে। সর্দার এক কারখানা হইতে অন্য কারখানায় চলিয়া আসিলে, শ্রমিকেরাও উহার সঙ্গে চলিয়া আসে। শ্রমিকেরা প্রায়ই কাজে অনুপস্থিত থাকে এবং সুযোগ পাইলেই কর্তব্যে অবহেলা করিয়া থাকে। কিন্তু এই অভ্যাসের মূল কারণ হইল কর্মস্থলের শোচনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং কাজের কঠোরতা। শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থাও শোচনীয়; কলিকাতায় বস্তি এবং বোম্বাইএ চাওল, শ্রমিকদের দুরবস্থার জলন্ত নিদর্শন। চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অতি অল্প মজুরী, বাসস্থান ও কর্মস্থলের শোচনীয় পরিবেশ—এই সমস্তের চাপে পড়িয়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শক্তি ভাঙিয়া পড়ে, উচ্চাশা ও উদ্যোগ লুপ্ত হয় এবং তাহারা গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

শিল্প-শ্রমিকের সঞ্চরমাণ স্বভাব তাহার দক্ষতার অভাবের অন্যতম কারণ, আর একটি কারণ সর্দার-প্রথা

যে পরিবেশে ভারতীয় শিল্প-শ্রমিক কাজ করে তাহা তাহার দক্ষতার বিশেষ পরিপন্থী

ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের দক্ষতার অভাবের প্রতিকার ঃ

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়া ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব দূর করা যাইতে পারে ঃ শ্রমিকদের বাসস্থানের উন্নতি করিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমিককে সপরিবারে থাকিবার জন্য অন্ততঃ একটি করিয়া দুই কামরা-ওয়ালা বাসা দিতে হইবে। বস্তি অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ব্যবস্থাগুলির উন্নতি করিতে হইবে এবং পানীয় জলের সরবরাহ বাড়াইতে হইবে। কাজের ঘণ্টা কমাইয়া দিতে হইবে। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িতে থাকিলে সেই অনুপাতে শ্রমিকদের মজুরীও বাড়াইতে হইবে। তাহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব

পরিবেশের পরিবর্তন দ্বারাই শ্রমিকের দক্ষতার অভাব দূর করা যাইবে

সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। বৎসরে কয়েকদিন পুরা বেতনে ছুটি পাইবার অধিকারও শ্রমিকদের দিতে হইবে। শ্রমিকদের শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিতে হইবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সর্দার-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অসুস্থতা, বেকারত্ব এবং বার্ধক্যের দরুণ শ্রমিকেরা যাহাতে হঠাৎ ভিক্ষুকে পরিণত না হয় সেজন্য সামাজিক বীমা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রমিক সম্পর্কিত আইন (Labour Legislation) :

শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বেও কতকগুলি আইন পাশ করা হইয়াছিল। এই সকল আইনের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

ব্রিটিশ আমলে প্রণীত শ্রমিক সম্পর্কিত আইন

(ক) ১৯৩৪ সালের 'কারখানা আইন'। এই আইন দ্বারা কারখানায় কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ছাড়াও পরিবেশ সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়।

(খ) ১৯২৩ সালের খনি সম্পর্কিত আইন। এই আইন খনিতে কার্য সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। ১৯২৮ সালে এই আইন সংশোধিত হয়। ১৯৩৯ সালে কয়লা খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য একটি আইন পাশ করা হয়।

(গ) ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইন। এই আইনের দ্বারা, কার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন শ্রমিকের অঙ্গহানি হইলে, মৃত্যু হইলে বা শ্রমিক আহত হইলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) অধিকাংশ প্রদেশে মাতৃত্বের সুবিধা সম্পর্কিত আইন পাশ করা হইয়াছিল। এই সকল আইনের দ্বারা স্ত্রী-শ্রমিককে মাতৃত্বকালীন ছুটি, অর্থ সাহায্য প্রভৃতি কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) ১৯২৬ সালে শ্রমিক সংঘ আইন বা ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টের দ্বারা শ্রমিক সংঘগুলিকে কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হয়।

(চ) শ্রমিকেরা যাহাতে তাহাদের কাজের উপযুক্ত মজুরী যথাসময়ে পায় তজ্জন্য ১৯৩৬ সালে এক আইন পাশ করা হইয়াছে।

ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শ্রমিকের অবস্থার উন্নতির

জন্য অনেকগুলি আইন পাশ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :—

স্বাধীন ভারতে প্রণীত শ্রমিক সম্পর্কিত আইন

(ক) ১৯৪৮ সালের 'কারখানা আইন' পূর্বের সমস্ত কারখানা আইনকে বাতিল করিয়া দেয়। এই আইন সাবালক শ্রমিকদের কার্যকাল সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা এবং দৈনিক ৯ ঘণ্টা ধার্য করিয়াছে। কার্যকাল ধার্য করা ছাড়াও শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এই আইন কারখানাগুলিকে কতকগুলি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছে।

(খ) ১৯৪৮ সালের 'নিম্নতম মজুরী আইন'। এই আইন সরকারকে কয়েক ক্ষেত্রে নিম্নতম মজুরী ধার্য করিয়া দিবার ক্ষমতা দিয়াছে।

(গ) ১৯৪৮ সালে আর এক আইনের বলে শ্রমিক অসুস্থ বা অকর্মণ্য হইয়া পড়িলে সাহায্যের জন্য বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) ১৯৪৭ সালের 'শিল্পগত বিরোধ' বা সংঘর্ষ আইন। এই আইনের দ্বারা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কয়েক প্রকারের বিরোধ 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুন্যালে' নিষ্পত্তি করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

(ঙ) ১৯৫০ সালের এক আইন দ্বারা একটি শিল্প সংক্রান্ত 'আপীল ট্রাইবুন্যাল' গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই আপীল ট্রাইবুন্যাল হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণের কয়েকজন বিচারপতি লইয়া গঠিত। এই ট্রাইবুন্যালে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুন্যাল', আদালত বা মজুরী সম্পর্কিত বোর্ডের রায়, নিষ্পত্তি এবং মালিকের বিরুদ্ধে আপীল করা চলিবে।

(চ) ১৯৫২ সালের এক আইন দ্বারা আপাততঃ ছয়টি শিল্পে কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের' ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ছয়টি শিল্প হইল বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প, যন্ত্র নির্মাণ শিল্প, কাগজ শিল্প এবং সিগারেট শিল্প।

এই সকল আইন পাশ ছাড়াও শ্রমিক-সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে উপদেশ দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদ শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত।

শিল্পগত মূলধন সমস্যা (Problem of Industrial Finance) :

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন

সংগ্রহ করে। ভারতে বিনিয়োগ অভ্যাস বিশেষ গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় দ্বারা প্রয়োজনীয় সমস্ত মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য অল্প-মেয়াদী ঋণ সংগ্রহার্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, দেশী মহাজন প্রভৃতির দ্বারস্থ হইতে হয়। দুই এক ক্ষেত্রে আবার প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক ও ব্যয়-বহুল হইলেও ইহাদের নিকট হইতে অল্প-মেয়াদী ঋণ পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, বিশেষ করিয়া ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণেরও প্রয়োজন হয়। কিছুদিন পূর্বেও ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিয়া সাহায্য করিতে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না। অন্যান্য দেশে শিল্প-ব্যাঙ্ক আছে। তাহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহে সহায়তা করে। ভারতে শিল্প-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলা চলে। মূলধন সংগ্রহকার্যে সহায়তা করিবার জন্য কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান না থাকায় ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে।

ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধন সমস্যা

শিল্প-ব্যাঙ্কের অভাব

১৯৪৮ সালে ভারতে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য দ্বিবিধ—(১) যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দেওয়া; (২) তাহাদের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ে সহায়তা করা। এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন হইল ১০ কোটি টাকা। ইহার শেয়ার কোন ব্যক্তিবিশেষ কিনিতে পারে না—ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি ও সরকারের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় সীমাবদ্ধ। ইহা সরকারের নির্দেশ মত এক পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হয়।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন হইল সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহা প্রধানতঃ বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কুটির শিল্পের সহায়তায় ইহা আসিতে পারে না। এই কারণে বিভিন্ন রাজ্য একটি করিয়া রাজ্য ফিনান্স করপোরেশন প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার

স্টেট ফিনান্স করপোরেশন

কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ একটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার অনুমোদন করিয়াছে।

বিদেশী মূলধন (Foreign Capital) :

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে রেলপথ গঠিত হইতে থাকে, নীলকুঠি ও চা-বাগানের পত্তন হয়, নূতন নূতন খনিতে কাজ চালু হয় এবং ব্যাপকভাবে সর্বত্র আধুনিক যন্ত্রশিল্প প্রবর্তিত হইতে থাকে। এক কথায়, উনবিংশ শতাব্দীতেই ভারতের শিল্পোন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই শিল্পোন্নতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে বিদেশী মূলধন। তখন হইতে আজ পর্যন্ত দেশের কল-কারখানা ও পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণে বিদেশী মূলধন বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয়দের হাতে সঞ্চয় খুবই কম ছিল। আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে তাহাদের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহারা ঝুঁকি লইতেও রাজী ছিল না। ভারতীয়দের যাহা কিছু সঞ্চয়, তাহা জমিতেই বিনিয়োগ করিত। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলি শিল্পবিপ্লবের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বলিয়া, সেখান হইতে মুনাফার লোভে প্রচুর মূলধন ভারতে বিনিয়োজিত হইয়াছে। পরাধীন ভারতের সরকার সব সময়েই ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি নজর রাখিয়াছে এবং ভারতে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ উৎসাহিত করিয়াছে।

ভারতের শিল্পায়নে বিদেশী মূলধনের ভূমিকা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে বিনিয়োজিত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫১৯ কোটি টাকা। এই মূলধন ব্যবসায়-বাণিজ্য, রেলপথ, সেচের খাল প্রভৃতিতে বিনিয়োজিত আছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে প্রধানতঃ চা ও কফি বাগান, পাট শিল্প, কয়লা খনি, কাগজ শিল্প এবং ট্রাম ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতিতে বিদেশী মূলধন খাটিতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ

সুবিধা : ভারতে নূতন নূতন শিল্পের পথ প্রদর্শনের ঝুঁকি বিদেশী মূলধনই লইয়াছে। বিদেশী মূলধনের সাহায্য ছাড়া রেলপথ নির্মাণ, খাল খনন ও খনির কাজ সুরু করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। ভারতবর্ষ শুধু নিজস্ব মূলধন ও নিজস্ব ব্যবসায়িক উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল হইলে, দেশের শিল্প অনেক পিছাইয়া পড়িত।

নিজস্ব মূলধন ও উদ্যোগের উপর নির্ভর করিলে শিল্প-জগতে ভারতের এতটা উন্নতি সম্ভব হইত না

শিল্পক্ষেত্রে বিদেশীরাই ভারতীয়দের পথ দেখাইয়া দিয়াছে। বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ভারতীয়েরা শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সাহস করিয়াছে। ব্যবসায়ের কৌশল এবং নূতন নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধেও ভারতীয়েরা বিদেশীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

অসুবিধাঃ কিন্তু বিদেশী মূলধন নানা অকল্যাণের সৃষ্টি করিয়াছে। বিদেশী মূলধন ভারতীয় ব্যবসায়ীর হাতে ঋণ হিসাবে আসে নাই; বরং বিদেশী মূলধন খাটাইবার জন্য বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই, ভারত হইতে শুধু সুদ হিসাবে নয়, মুনাফা হিসাবে এবং বিদেশী কর্মচারীদের বেতন হিসাবে বিরাট অঙ্কের টাকা ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়। ভারতের অর্থনীতিতে ইউরোপীয় কায়েমী স্বার্থ জাঁকিয়া বসিয়াছে। বহু শিল্পে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত। ভারতের বিদেশী কোম্পানীগুলিও একজোট হইয়া ভারতীয় মূলধনের বিনিয়োগের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করে। জাহাজী শিল্পে বহুকাল যাবৎ ভারতীয় মূলধনকে নানা কৌশলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই।

বিদেশী মূলধন ভারতের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী

বিদেশী পুঁজিপতি ভারতের রাষ্ট্রনীতিতেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। তাহারা চিরকালই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাধা দিয়াছে এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও নানারূপে দেশের প্রগতির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। ভারতীয়গণকে উচ্চ পদে নিযুক্ত না করাই তাহাদের নীতি। ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিদেশী পুঁজিপতিরা তাহাদের মূলধন নিয়োগ করে নাই; ভারতকে দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া নিজেদের মুনাফাবৃদ্ধির চেষ্টাই সর্ব্বদা করিয়াছে। দেশীয় জনসাধারণের উপর বিদেশী পুঁজিপতির কোন দরদ থাকে না। কাজেই তাহাদের ব্যবসায়ের একমাত্র লক্ষ্য হয় শোষণ।

এই সকল অসুবিধার জন্য জাতীয়তাবাদী ভারতীয়েরা কখনও বিদেশী মূলধনকে সুনজরে দেখিতে পারে নাই। অনেকে মনে করিয়াছিল যে স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে যাঁহাতে বিদেশী পুঁজিপতিরা ভারত হইতে মূলধন তুলিয়া লইতে বাধ্য হইবে। জাতীয় সরকার অবশ্য সেইরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিল না।

বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে জাতীয় সরকারের নীতি

জাতীয় সরকারের মতে ভারতে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য বিদেশী মূলধন বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভারতে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ কয়েকটি সর্তাধীন হইবে। সর্তগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল দুইটি: (১) প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বেশী অংশ ভারতীয়দের হাতে থাকিবে; (২) ভারতীয় শিক্ষানবিশদের শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হইবে। শেয়ারের বেশীর ভাগ ভারতীয়দের হাতে থাকিলে বিদেশীর দ্বারা ভারতীয় শিল্পের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হইবে না। সরকারী নীতিকে অল্প কথায় ব্যক্ত করিলে বলা যায় যে ভারত বিদেশী মূলধন চায় কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের উপর বিদেশীর কর্তৃত্ব চায় না।

স্বাধীন ভারত বিদেশী মূলধন চায় কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের উপর বিদেশী কর্তৃত্ব চায় না

বিদেশী মূলধন সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন যে অভিমত দিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কমিশনের মতে যখন মূলধনের অভাবে দেশের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হইতেছে তখন আমরা বিদেশী মূলধনকে আহ্বান না করিয়া পারি না। বিদেশী মূলধন আসিলে তাহার সঙ্গে আসিবে বিদেশ হইতে উৎপাদকের দ্রব্য এবং বিদেশী শিল্প-কৌশল। কিন্তু আমাদের শিল্পক্ষেত্রের সর্বত্রই বিদেশী মূলধনের অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। বিদেশী মূলধনকে প্রধানতঃ নূতন নূতন শিল্পে বিনিয়োজিত হইতে হইবে। যেখানে দেশী মূলধন শিল্পের উন্নতির পক্ষে পর্যাপ্ত নয় সেখানেও বিদেশী মূলধনকে কার্য করিতে দেওয়া যাইতে পারে। বিদেশী মূলধন সম্পর্কে এইভাবে বিবেচনা করিয়াই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

রাষ্ট্র ও ভারতীয় শিল্প (The State and the Indian Industries):

আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম শিক্ষা হইল এই যে রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া কোন দেশের দ্রুত শিল্পায়ন (industrialisation) সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাষ্ট্রের সহায়তার ফলেই জার্মানী ও জাপান শিল্পে এত বড় হইতে পারিয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও বিদেশী মালের আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্য শুল্ক-প্রাচীরের ব্যবস্থা করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়া মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে বিরাট উন্নতি করিয়াছে। পরাধীন ভারতে সরকারের নীতি ছিল শিল্পক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতি। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়

রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া কোন দেশের দ্রুত শিল্পায়ন অসম্ভব

শিল্পপ্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা এবং ভারতের বাজারে বিদেশী মালের প্রবেশ সুগম করা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মেসোপোটেমিয়া, আরব এবং অন্যান্য স্থানে যুদ্ধ চালানোর জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে বলিয়া বুঝিতে পারায় ভারত সরকার শিল্পায়নে কিছুটা উদ্যোগী হয়। ভারত সরকারের প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-সামগ্রী কেনার জন্য একটি মিউনিশন বোর্ড গঠিত হয়। একটি 'শিল্প কমিশন'ও নিযুক্ত হয়। এই কমিশন ভারতীয় শিল্পপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে শিল্পবিভাগ গঠনের জন্য, তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রচারের জন্য এবং টেক্‌নিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য সুপারিশ করে।

বিদেশী সরকার যুদ্ধের জন্য ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করে

মহাযুদ্ধের শেসে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ায় শিল্প একটি প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত হয়। প্রদেশে প্রদেশে শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাহায্য' আইন পাশ হয়। এইরূপ আইনের দ্বারা ছোট ছোট শিল্পগুলিকে মূলধন দিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। আজ পর্যন্ত এই সকল প্রাদেশিক শিল্প বিভাগ যতটা কাজ করিয়াছে তাহাকে অবশ্য অকিঞ্চিৎকর ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দেওয়া যায় না।

ভারতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশনের সুপারিশে ১৯২৪ সাল হইতে ভারত সরকার শিল্পক্ষেত্রে প্রভেদাত্মক বা বিচারমূলক সংরক্ষণের নীতি (discriminating protection) গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করে। এই সংরক্ষণ নীতি লোহা ও ইস্পাত শিল্পে সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়। উহার পর বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতিকেও সংরক্ষণের সাহায্য দেওয়া হয়।

বিচারমূলক সংরক্ষণের নীতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে জিনিসপত্র আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। ভারতবর্ষ জাপান-বিরোধী যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। ভারত সরকার ভারত হইতেই প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার বন্দোবস্ত করে। ফলে, অনেক নূতন নূতন শিল্পের পত্তন হইতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ক্যানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ায় যতখানি শিল্পোন্নতি হইয়াছে, ভারতবর্ষে ততখানি হয় নাই। ইহার কারণ হইল ভারত সরকারের সহানুভূতির অভাব। ভারত হইতে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার জন্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতে শিল্পায়ন

ভারতীয় শিল্প রাষ্ট্র হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য পায় নাই

ভারতীয় শিল্পকে যতটা উৎসাহিত করার প্রয়োজন, ততটাই করা হইয়াছিল—তাহার বেশী নয়।

যুদ্ধের সময়ে সরকার কর্তৃক একটি 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ড' এবং একটি 'যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটি' গঠিত হয়। পুনর্গঠন কাউন্সিল হইতে যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে দুইটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের শেষদিকে আটজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পপতি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে শিল্পোন্নতির জন্য 'বোম্বাই পরিকল্পনা' নামে এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিও পরিকল্পনা সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রস্তাব করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

ভারত স্বাধীন হইবার পর জাতীয় সরকারকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইতে দেখা যায়। ১৯৫০ সালে সরকার পূর্ববর্তী সকল পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করিয়া 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন' গঠন করে। এই কমিশন ভারতের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারেই বর্ত্তমানে কাজ চলিতেছে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

পরিকল্পনার দ্বারা ভারতীয় শিল্পগুলির মূলধন সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন' এবং কতকগুলি রাজ্য ফিনান্স করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন

ভারতীয় শিল্পের জাতীয়করণ (Nationalisation of Indian Industries) :

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল ভারত সরকারের পক্ষে তদানীন্তন বাণিজ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সরকারী শিল্পনীতি সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতি 'শিল্পনীতি সম্বন্ধে প্রস্তাব' নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্পগুলি, আণবিক শক্তি, রেলপথ, ডাক ও তারবিভাগ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের একচেটিয়া কারবারই থাকিবে। অপরাপর

শিল্পনীতি সম্বন্ধে প্রস্তাব

শিল্পগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিতে পারে। কিন্তু লৌহ ও ইস্পাত, বিমানপোত তৈয়ারী প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় শিল্পে প্রয়োজন হইলেই সরকার নূতন কারখানা স্থাপন করিতে পারেন। বর্তমানে যে সকল শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা আছে সেগুলি সম্পর্কে দশ বৎসরের জন্য জাতীয়করণের কোন প্রশ্ন উঠিবে না। এই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে এই শিল্পগুলি সম্বন্ধে জাতীয়করণের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

ব্যক্তিগত মালিকানায় যে সকল শিল্প আছে, ১৯৫৮ সালের মধ্যে সেগুলির জাতীয়করণের প্রশ্ন উঠিবে না

ব্যক্তিগত মালিকানায় যদি কোন শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয় বা সাধারণের স্বার্থের হানি হয় তবে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করিবেন না। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে 'শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন' নামে এক আইন পাশ হইয়াছে। এই আইনের দ্বারা সরকারকে কয়েকটি শিল্পের বেলায় উন্নয়ন ও সাধারণের স্বার্থের খাতিরে নিয়ন্ত্রণ করিবারও নির্দেশ দিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

জাতীয়করণ সম্বন্ধে ১৯৪৮ সালে গৃহীত সরকারী শিল্পনীতি এখনও অপরিবর্তিত আছে। সরকারের মুখপাত্রদের বিবৃতি হইতে বুঝা যায় যে বর্তমানে ব্যক্তিগত মালিকানায় যে সকল শিল্প আছে তাহাদের জাতীয়করণের জন্য জাতীয় সরকার বিশেষ ব্যগ্র নহে। তবে প্রয়োজন হইলে জাতীয়করণে সরকার পিছাইয়া যাইবে না। প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া সম্প্রতি বিমান চলাচল ব্যবস্থার জাতীয়করণ হইয়াছে।

বিচারমূলক সংরক্ষণ (Discriminating Protection) :

১৯২১ সালের পূর্বে অবাধ বাণিজ্যই ছিল সরকারী নীতি। ব্রিটেনের রপ্তানী শিল্পের সুবিধার জন্যই ভারতের ব্রিটিশ সরকার এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের জন্য আন্দোলনের ফলে অবশেষে ১৯২১ সালে সরকার 'ফিস্‌ক্যাল কমিশন' নিযুক্ত করিতে বাধ্য হয়।

১৯২১ অবধি অবাধ বাণিজ্যনীতি

১৯২২ সালে ফিস্‌ক্যাল কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করেন। বিচারমূলক সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় যে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সাহায্য দিবার পূর্বে শিল্পটির অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। বিচার-মূলক সংরক্ষণ নীতির সমর্থনে কমিশন নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করে।

ফিস্‌ক্যাল কমিশনের অনুমোদিত বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি

দিতে হইবে। একমাত্র সংরক্ষণই এই সকল শিল্পের পক্ষে যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন হইলে সরকারকে ইহাদের মূলধন ইত্যাদি দিয়াও সাহায্য করিতে হইবে।

কৃষ্ণমাচারী কমিশন শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে :

(১) দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প। এগুলির প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করিতেই হইবে তা ব্যয় যাহাই হউক না কেন। (২) মূল শিল্প। এগুলিকে সংরক্ষিত করিতে হইবে এবং অন্য উপায়ে ইহাদের সাহায্য দান করিতে হইবে। (৩) অপরাপর শিল্প। অপরাপর শিল্পের বেলায় দেখিতে হইবে যে তাহাদের উন্নয়নের বিশেষ সম্ভাবনা আছে কি না এবং তাহারা সংরক্ষণের আওতায় আসিলে দাম বাড়ার ফলে সাধারণের উপর বিশেষ ভার পড়ে কি না।

শিল্প বনাম কৃষি (Industry vs. Agriculture) :

অনেক পাশ্চাত্ত্য লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে প্রাকৃতিক বিধানেই ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, এবং সেইজন্য ভারতের শিল্পপ্রধান দেশ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত নয়। এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল। সুদূর অতীতেও ভারতবর্ষের জগৎ-জোড়া শিল্পখ্যাতি ছিল। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার, মার্টিন, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির লেখায় এ সম্পর্কে বহু তথ্য আছে। ব্রিটিশ-শাসনই প্রাচীন শিল্পগুলিকে ধ্বংস করিয়া ভারতকে অসহায় কৃষি-সর্বস্ব দেশে পরিণত করিয়াছে। ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ভারসাম্য হারাইয়াছে।

প্রকৃতির বিধানে ভারত কৃষি-প্রধান দেশ নয়

জাতির অর্থনৈতিক জীবনে ভারসাম্য আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। শিল্পক্ষেত্রে ভারতের দক্ষতা যে অপেক্ষাকৃত কম তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু ইহার কারণ স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা নয়। আসল কারণ হইল অভিজ্ঞতার অভাব। সংরক্ষণের সাহায্যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে। যদি শিশু-শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়, তাহা হইলে অভিজ্ঞতা ও শিল্পকৌশল আয়ত্ত হইবে এবং আমাদের শিল্প পরিণামে বিদেশী শিল্পগুলির সমকক্ষ হইবে ও দক্ষতার পরিচয় দিবে। সংরক্ষণের সাহায্যে অনেক অনগ্রসর দেশে বিশেষভাবে শিল্পোন্নতি হইয়াছে।

জাতির অর্থনৈতিক জীবনে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য শিল্পায়ন অপরিহার্য

ভারতের শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা হইল মূলধন, দক্ষ শ্রমিক, শিল্পকৌশল

এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগের অভাব। এই সব অভাব দূর করা সম্ভব। ভারতের শিল্প-সম্ভাবনা অন্যান্য দেশের তুলনায় মোটেই কম নয়।

এমন কি, কৃষিতেও ভারত অনগ্রসর। ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতাও একমাত্র শিল্পায়নের দ্বারা দূর করা যায়। শিল্পায়নের ফলে জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ কমিবে, জমির অসম্বদ্ধতা কমিবে এবং কৃষি-পণ্যের ভালো বাজার গড়িয়া উঠিবে। কৃষির উন্নতি ও শিল্পের উন্নতি অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। ইহারা অর্থনৈতিক প্রগতির দুইটি দিক। কাজেই ভারতকে শিল্পের দিকে নজর দেওয়ার আগেই কৃষির উন্নতি করিতে হইবে—এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন।

কৃষির উন্নতি ও শিল্পের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত

প্রশ্নোত্তর

1. Describe four of the most important cottage industries of India and indicate the difficulties experienced by them. (C. U., 1941)

(২৬৯-২৭১ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Describe the utility of rural industries in India. Indicate the methods by which industries may be fostered. (C. U., 1945)

3. Indicate the importance of cottage industries in Indian rural economy and discuss the chief difficulties experienced by them.

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** ভারতে গ্রাম্য অর্থব্যবস্থায় কুটির শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কুটির শিল্প কৃষকদের দ্বিতীয় উপজীবিকা হিসাবে উহাদের আয় বৃদ্ধি করিতে এবং কৃষকেরা যে সময় কাজ না করিয়া বসিয়া থাকে সেই সময়ে তাহাদের নিয়োজিত রাখিতে সাহায্য করে। কুটির শিল্পের উন্নতি ভারতের গ্রামগুলিকে আবার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে। প্রাচীন কালের মত প্রত্যেক গ্রামে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা হইলে আর প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগানের জন্য গ্রামগুলিকে দূরবর্তী সহরের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। কুটির শিল্পের উন্নতির ফলে শুধু যে ধন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে তাহা নয়, উহা জনসাধারণের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হইবে। বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র-চালিত শিল্পের সাহায্যে মুষ্টিমেয় মালিক স্ফীত হয়, কিন্তু জনসাধারণের দারিদ্র্য বাড়িয়াই যায়; কুটির শিল্পের প্রসারের ফলে সকলেই উপকৃত হয়। কুটির শিল্পের প্রসার মানেই উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ। মালিক-শ্রমিক বিরোধ, মুষ্টিমেয় ধনীর একচেটিয়া আধিপত্য প্রভৃতি কয়েকটি আধুনিক সমাজ-সমস্যার অনেকখানি সমাধান কুটির শিল্পের প্রসারের মারফৎ হইতে পারে।

কুটির শিল্পের অসুবিধা ও উহার প্রতিকার ঃ—(২৬৭-২৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।)

4. Discuss the strength and weakness of cottage industries. (C. U., 1950) (২৬৬-২৬৯ পৃষ্ঠা দেখ)

5. Discuss the place and importance of cottage industries in the economy of India and indicate on what lines the co-operative methods may be helpful in solving some of their difficulties. (C. U., 1952)

[**ইঙ্গিত ঃ** সমবায় পদ্ধতির সাহায্যে সুলভে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পণ্য বিক্রয়ের উন্নতিসাধন, কুটির শিল্পজাত পণ্যের প্রদর্শনী সংগঠন, প্রাথমিক ও কারিগরী শিল্পের বিক্রয়-ব্যবস্থা—প্রভৃতি সকলই সমবায়-পদ্ধতির সাহায্যে করা যাইতে পারে। সমবায় সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হইলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপারে সুবিধা হইবে। সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রচারকার্যের দ্বারা ব্যক্তিগত রুচিরও পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে।]

6. Select two cottage industries of Bengal, and point out the difficulties under which they labour. Suggest some means to get over these difficulties (C. U., 1952)

[**ইঙ্গিত ঃ** বাংলার দুইটি প্রধান কুটির শিল্প হইল তাঁত শিল্প ও কাঁসা ও পিতল শিল্প।]

(২৬৯-২৭০ পৃষ্ঠা দেখ)

7. Describe the chief manufacturing industries of India. (C. U., 1944)

(২৭৩-২৭৬ পৃষ্ঠা দেখ)

8. Do you agree that Nature has destined India to be an agricultural, not a manufacturing country ? (C. U., 1942) (২৯১-২৯২ পৃষ্ঠা দেখ)

9. Describe the causes of the low level of efficiency of industrial labour in India. (C. U., 1934) (২৭৮-২৭৯ পৃষ্ঠা দেখ)

10. "Unrestricted admission of foreign capital can by no means be salutary from the point of view of the interest of India." Comment on the statement. (C. U., 1946). (২৮৩-২৮৫ পৃষ্ঠা দেখ)

11. Estimate the advantages and disadvantages of developing industries in India with the help of foreign capital. (C.U., 1950) (২৮৩-২৮৫ পৃষ্ঠা দেখ)

12. What is meant by discriminating protection ? What are the principal industries which have been granted protection in India ? (C. U., 1940)

(২৮৮-২৯১ পৃষ্ঠা দেখ)

13. State the ground on which a policy of discriminating protection was recommended for India in 1922. (C. U., 1947) (২৮৮-২৯০ পৃষ্ঠা দেখ)

14. What are the main grounds on which the policy of (a) Protection is justified as means of industrial development in India ? (b) Mention a few industries which developed in this country in recent years of protective duty on foreign imports. (C. U., 1952)

[**ইঙ্গিত**—প্রথম অংশের উত্তর হিসাবে ১৯২১-২২ এবং ১৯৫০ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশনের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি লিখ।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের কাঠামো—১৯৩৯ সালে সংরক্ষণের আওতায় যে সকল শিল্প ছিল তাহাদের মধ্যে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, সিল্ক শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যথা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং বস্ত্র শিল্প সংরক্ষণের সাহায্য পাইয়া যায়। চিনি শিল্পের উন্নতিতেও সংরক্ষণের দান অস্বীকার করা যায় না। কাগজ ও দিয়াশলাই শিল্পও তাহাদের উন্নতির প্রথম স্তরে সংরক্ষণের যথেষ্ট সাহায্য পায়।]

15. Discuss some of the factors hampering India's efforts at a speedy development of her industries. (C. U., 1951) (২৭৬-২৭৮ পৃষ্ঠা দেখ)

দশম অধ্যায়

পরিবহন ব্যবস্থা

(Transport System)

যে কোন জাতির অর্থনৈতিক জীবনে পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অত্যধিক। চলাচল বা পরিবহন ব্যবস্থার উৎকর্ষের উপর কোনও দেশের সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভর করে। স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত চলাচল-ব্যবস্থার অস্তিত্বের ফলে বাজার প্রসার লাভ করে, শ্রম বিভাগ ব্যাপকতর ও উৎপাদন-ব্যবস্থা উৎকৃষ্টতর হয়। চলাচলের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়।

পরিবহন-ব্যবস্থার গুরুত্ব

ভারতের বেলায় পরিবহন-ব্যবস্থা জাতির অর্থনৈতিক জীবন ছাড়াও সামাজিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। রেলপথ, রাজপথ প্রভৃতি সহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া লোকের রক্ষণশীলতা অনেকাংশে দূর করিয়াছে।

বর্তমানে ভারতের যে পরিবহন-ব্যবস্থা তাহা প্রধানতঃ বৃটিশ আমলের সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে চলাচলের উল্লেখযোগ্য উপায় হিসাবে মাত্র কয়েকটি দীর্ঘ রাজপথ ছিল; এবং গঙ্গা ও সিন্ধুর অধিকাংশ অংশ বাণিজ্যিক জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে আধুনিক পরিবহন-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় লর্ড ডালহৌসীর সময়ে। বর্তমান পরিবহন-ব্যবস্থা বলিতে রেলপথ, রাজপথ, জলপথ এবং আকাশপথ বুঝায়।

ভারতবর্ষে আধুনিক পরিবহন-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় লর্ড ডালহৌসীর সময়ে

রেলপথ (Railways) ঃ

ভারতে রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনা সর্বপ্রথম ১৮৪৪ সালে গৃহীত হয়। সেই সময়ই ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ এবং গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলপথ স্থাপন করার অনুমতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রদান করিল। কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসীর এক পত্র প্রেরণের ফলেই ভারতে রেলপথ স্থাপনের সুব্যবস্থা হয়। এই পত্রে বর্ণিত মুখ্য বিষয়গুলি ছিল এইরূপ ঃ—(১) ভারতে প্রচুর কাঁচামাল রহিয়াছে, যাহা ইংলণ্ডে প্রেরণ করা যাইবে। (২) ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ভারতে ভাল বাজার রহিয়াছে। (৩) কাঁচা মাল রপ্তানী ও ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের সহরে ও গ্রামে আমদানী করার উদ্দেশ্যে ভারতের আভ্যন্তরীণ স্থানগুলির সহিত বন্দরগুলির যোগাযোগ স্থাপন করিয়া রেলপথ তৈয়ারী করা উচিত। (৪) ভারতীয় রেলপথ তৈয়ারীর ভার ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর স্থাপন করা উচিত; কিন্তু বিনিয়োজিত পুঁজির উপর সুদের হার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং নির্ধারিত সুদ দেওয়া সম্বন্ধে সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

পুরাতন প্রতিশ্রুতি প্রথা (Old Guarantee System) ঃ এই প্রথা অনুযায়ী ভারত সবকার ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের জন্য আটটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হইল। চুক্তির সর্তগুলি ছিল এইরূপ ঃ— কোম্পানীগুলিকে বিনা মূল্যে জমি দেওয়া হইবে। কোম্পানী কর্তৃক বিনিয়োজিত পুঁজির উপর শতকরা ৪½ হইতে ৫ পর্যন্ত সুদ দিতে সরকারের প্রতিশ্রুতি রহিল। প্রতিশ্রুত হার অপেক্ষা কোম্পানীগুলি যদি অধিক মুনাফা লাভ করিত তবে সরকারকে সেই অতিরিক্ত মুনাফার অর্ধেক অংশ দিতে হইত। কোম্পানীর কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করা ও রেলপথ নির্মাণের ২৫ বৎসর অন্তে রেল লাইন ক্রয় করার অধিকার সরকারের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

পুরাতন প্রতিশ্রুতি প্রথার বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনা (State Construction and Management) ঃ প্রতিশ্রুত হারের অধিক মুনাফা লাভ করিতে কোম্পানীগুলি অসমর্থ হওয়ার ফলে "প্রতিশ্রুতি প্রথা" সরকারের পক্ষে গুরুতর আর্থিক ক্ষতির কারণ হইল। তাই ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকার স্বীয় অর্থে রেলপথ নির্মাণ করিয়া স্বয়ং পরিচালনার ভার গ্রহণ

রাষ্ট্রের উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণে অসাফল্য

করিল। এই প্রথায় রেলপথ নির্মাণের গতি শ্লথ হইল এবং সরকারকে বহু আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইল; ফলে ইহা পরিত্যক্ত হইল।

নব প্রতিশ্রুতি প্রথা (New Guarantee System) ঃ অতঃপর প্রতিশ্রুতি প্রথা পুনরায় প্রবর্তন করা হইল, কিন্তু চুক্তির সর্ত এইবার সরকারের পক্ষে অনুকূল হইল। প্রতিশ্রুত সুদের হার শতকরা ৩ হইল এবং মুনাফার অংশ এবার সরকারের ভাগে বেশী পড়িল—উহা অর্ধেক হইতে তিন-পঞ্চমাংশে উন্নীত হইল।

নব প্রতিশ্রুতি প্রথার বৈশিষ্ট্য

বিংশ শতাব্দীর সুরু হইতেই রেলপথসমূহ বেশ মোটা রকমের মুনাফা লাভ করিতে লাগিল। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর সরকার স্বয়ং রেলপথ পরিচালনা করিতে সিদ্ধান্ত করিল। রাষ্ট্র কর্তৃক রেলপথ পরিচালনার নীতি গৃহীত হইল। বর্তমানে প্রধান রেলপথগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং উহারা রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে আনীত হইয়াছে।

রাষ্ট্রের মালিকানা

ভারতে রেলপথ স্থাপনের ফলাফল (Effects of Railways in India) ঃ

ভারতে রেলপথ অবিমিশ্র আশীর্বাদ বহন করিয়া আনে নাই। একদিকে যেমন রেলপথ নির্মাণ ফলপ্রসূ হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে ইহা দেশের বহু অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।

রেলপথ স্থাপনের সুবিধা (Advantages) ঃ কৃষি ও শিল্পজাত প্রধান দ্রব্যসমূহের বাজার রেলপথ তৈয়ারীর ফলে প্রসার লাভ করিয়াছে। ফলে, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি ঘটিযাছে। দেশের বিভিন্ন অংশে দ্রব্য-মূল্যের সমতা সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অংশে কৃষি ও শিল্পজাত প্রধান দ্রব্যসমূহের দামের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। ভারতীয় গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতার অবসান হইয়াছে—ভারতের অপরাপর অংশ ও সমগ্র পৃথিবীর সহিত ইহাদের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

রেলপথ ভারতের শিল্প ও কৃষিতে বিপ্লব ঘটাইয়াছে

কৃষকেরা বর্তমানে প্রধানতঃ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শস্য উৎপন্ন করে—নিজের ব্যবহারের জন্য নহে। রেলপথ মারফৎ গ্রামাঞ্চল হইতে এই সমস্ত পণ্য দেশের অন্যান্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পাট, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি পণ্য

রেলপথ মারফৎ বন্দরে চালান দেওয়া হয় এবং তথা হইতে উহাদিগকে বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

রেলপথ স্থাপনের ফলে দেশের অভ্যন্তরে শ্রমবিভাগ ও বৃহদায়তনে উৎপাদন-ব্যবস্থা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগও ইহার ফলে উন্নত হইয়াছে। রেলপথের বিস্তৃতির ফলে কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য অধিকতর মূল্য লাভ করে। ভারতের শিল্পসমূহ কাঁচা মাল ও জালানি প্রচুর পরিমাণে ও সস্তা দরে পাইতেছে এবং দেশের ব্যাপকতর বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য রেলপথস্থাপন প্রত্যক্ষ রূপে প্রেরণা যোগাইয়াছে। অনেক শিল্প—যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কয়লা খনি শিল্প প্রভৃতি—রেলপথগুলিকে বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ করিয়া বিশেষ লাভবান হয়। রেলপথগুলি ভারতের অরণ্যজাত দ্রব্যের ব্যবহারও বিরাট পরিমাণে করিয়া থাকে।

রেলপথ মারফৎ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে দ্রুত খাদ্য সরবরাহ সম্ভব হওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হইয়াছে।

রেলপথ দুর্ভিক্ষত্রাণ সংগঠনের সহায়ক

জাতিভেদ সংক্রান্ত কুসংস্কার এবং সংরক্ষণশীলতা হইতে উৎপন্ন প্রাচীন পদ্ধতি ভাঙিয়া ফেলিয়া সকলের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করার বিষয়ে রেলপথ বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

ইহা জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি কার্যেও সহায়তা করিয়াছে

রেলপথগুলি হইতে সরকারের যথেষ্ট পরিমাণে আয় হয় এবং রেলপথগুলির সাহায্যে সরকারের প্রচারকার্যেরও বিশেষ সুবিধা হয়।

রেলপথ স্থাপনের অসুবিধা (Disadvantages): রেলপথস্থাপন ভারতের বহু অনিষ্টও করিয়াছে। রেলপথগুলির জন্য নির্মিত বাঁধ বৃষ্টির জল-নিকাশের স্বাভাবিক পথগুলিকে বন্ধ করিয়া অনেক স্থলে, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে, এ্যানোফিলিস মশার ডিম পাড়ার পক্ষে উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। ম্যালেরিয়াকে 'ভারতীয় রেলপথের দান' বলিয়াই অভিহিত করা হয়। রেলপথের এই সকল বাঁধের জন্যই বন্যার প্রকোপও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ম্যালেরিয়া ভারতীয় রেলপথের দান

রেলপথ নির্মাণের ফলে বিদেশজাত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। এই সকল দ্রব্য দামে সুলভ হওয়ায় ইহাদের সহিত প্রতি-

যোগিতায় দেশীয় কুটির শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ টিকিতে পারে না। ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পগুলি ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ভারতবর্ষ কাঁচা মাল রপ্তানী ও তৈয়ারী মাল আমদানীর স্বাভাবিক ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়।

কুটির শিল্পের ধ্বংস ও অর্থনৈতিক জীবনে ভারসাম্য নষ্ট

পূর্বে যে সকল শিল্পী ভারতের এই সকল প্রাচীন শিল্পে নিযুক্ত ছিল তাহারা কৃষিকার্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে দেশের অর্থনৈতিক জীবন ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলে এবং ভারতবর্ষ এক কৃষি-প্রধান দেশে পরিণত হয়। কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপের আধিক্যের ফলে ভারতবর্ষে ম্যাল্‌থাসবর্ণিত জনাধিক্যের সমস্ত লক্ষণগুলিই দেখা দেয়।

স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতিসাধন (Railway Development in Free India) :

অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ হাজার মাইল জুড়িয়া রেলপথ ছিল। ইহার মধ্য হইতে ৬ হাজার মাইলেরও উপর পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। ফলে ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ৩৪ হাজার মাইল ব্যাপী রেলপথ থাকে।

স্বাধীন ভারতে নূতন রেলপথ স্থাপন

স্বাধীনতার পরে ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে কয়েকটি নূতন রেলপথ স্থাপন বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আসামের সঙ্গে রেলপথে সংযোগ বজায় রাখিবার জন্য আসাম লিঙ্ক রেলপথ নির্মাণ করা হয়। ১৯৪৯ সালে ইহার নির্মাণকার্য সমাধা হয়। পঞ্জাবে পাঠানকোট পর্যন্ত একটি নূতন রেলপথ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেক ছোটখাট রেলপথ নির্মাণের কার্য চলিতেছে বা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন

নূতন রেলপথ স্থাপন ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের সীমানায় মিহিজামে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে একটি ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানায় আধুনিক ইঞ্জিন তৈয়ারীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে বৎসরে ১৭০টি করিয়া ইঞ্জিন তৈয়ারী করা সম্ভব হইবে।

পরিকল্পনায় ১৯৫০-৫১ সাল হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য রেলপথের উন্নতিকল্পে বৎসরে ৮০ কোটি করিয়া অর্থাৎ মোট ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতি সাধনের প্রসঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কিছু সুবিধা দানের কথা উল্লেখ করিতে হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধা

ভারতীয় রেলপথের পুনর্বিন্যাস (Regrouping of Indian Railways)ঃ স্বাধীন ভারতের রেলপথের উন্নতির প্রসঙ্গে পুনর্বিন্যাসের আলোচনা না করিলে চলে না। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় রেলপথগুলির সর্বোচ্চ পরিচালক মণ্ডলী (রেলওয়ে বোর্ড) রেলপথগুলির পরিচালনা সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনা করিতে সিদ্ধান্ত করে। ঐ বৎসর একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি ভারতীয় রেলপথগুলিকে ছয়টি 'গ্রুপে' পুনর্বিন্যাসের জন্য সুপারিশ করে। কমিটির মতে পুনর্বিন্যাসের ফলে ব্যয়ের হ্রাস হইবে; পরিচালনায় দক্ষতা আসিবে এবং দেশের অর্থনীতির দিক দিয়াও সুবিধা হইবে। কমিটির সুপারিশ রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয় এবং পুনর্বিন্যাসের কার্য সুরু হয়।

পুনর্বিন্যাসের কারণ

পুনর্বিন্যাসের ফলে যে ছয়টি 'জোনে'র (Zone) সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের নাম হইল উত্তর রেলপথ, উত্তর-পূর্ব রেলপথ, পূর্ব রেলপথ, দক্ষিণ রেলপথ, মধ্য রেলপথ এবং পশ্চিম রেলপথ। ইহাদের সদর কার্যালয় হইল যথাক্রমে দিল্লী, গোরক্ষপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই। বোম্বাই হইল মধ্য এবং পশ্চিম রেলপথের সদর কার্যালয়।

পুনর্বিন্যাসের ফলে সৃষ্ট ছয়টি 'জোন' (Zone)

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ রেলপথ সম্পর্কে এবং ঐ বৎসরেরই নভেম্বর মাসে পশ্চিম ও মধ্য রেলপথ সম্পর্কে পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়। অবশিষ্ট রেলপথগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনা কার্যকর করা হয় ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে।

পুনর্বিন্যাসের ফলে রেলপথের সদর কার্যালয় হিসাবে কলিকাতার গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্বে কলিকাতা ইষ্ট বেঙ্গল রেলপথ, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের সদর কার্যালয় ছিল। দেশ বিভাগের ফলে ইষ্ট বেঙ্গল রেলপথের বেশী অংশ পাকিস্তানের ভাগে পড়ায়, এই রেলপথের ভারতীয় ইউনিয়নের অংশটুকুকে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সুতরাং পুনর্বিন্যাসের পূর্বে কলিকাতা দুইটি প্রধান রেলপথের সদর কার্যালয় ছিল। এখন কলিকাতা মাত্র পূর্ব রেলপথের প্রধান কার্যালয়। এই

পুনর্বিন্যাসের ফলে সদর কার্যালয় হিসাবে কলিকাতার গুরুত্ব

পূর্ব রেলপথের মধ্যে আছে ভূতপূর্ব (শিয়ালদহ ডিভিসন সমেত) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের কিছু অংশ এবং ভূতপূর্ব বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের কিছু অংশ।

রাজপথ (Roads):

ব্রিটিশ আমলে রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয় লর্ড বেন্টিঙ্কের সময়ে, কিন্তু বিশেষ উদ্যমের সহিত নির্মাণকার্য স্থরু হয় লর্ড ডালহৌসীর সময়ে। তবে রেলপথ স্থাপনের প্রতি চিরকালই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায় রাজপথ নির্মাণের প্রতি কিছুটা অবহেলা করা হইয়াছে।

ভারতের সড়ক বা বড় রাস্তাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) পাকা, (২) কাঁচা। ভারতের পাকা সড়কগুলির সর্বসমেত বিস্তৃতি প্রায় ৪০,০০০ মাইল, এবং কাঁচা সড়কগুলির বিস্তৃতি প্রায় ২ লক্ষ মাইল। পাকা সড়কগুলির মধ্যে চারিটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই চারিটি হইল—(১) কলিকাতা হইতে খাইবার (এই সড়কের কিছুটা অংশ বর্তমানে পাকিস্তানে), (২) কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ, (৩) মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই, (৪) বোম্বাই হইতে দিল্লী। এই প্রধান নগরগুলির মধ্যে সংযোগকারী ট্রাঙ্ক রোড চারিটির বিস্তৃতি প্রায় ৫ হাজার মাইল।

কাঁচা ও পাকা সড়ক

দেশের প্রয়োজনের পক্ষে ভারতে সড়কের বিস্তৃতি যথেষ্ট নহে। স্থতরাং রাজপথ নির্মাণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। রাজপথের মোটর-যান অনেক সময় রেলপথের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে এই প্রতিযোগিতা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। বর্তমানে পরিবহন ব্যবস্থার উপর বিশেষ চাপ পড়াতে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব আর নাই। তবে ভবিষ্যতে হয়ত আবার ইহা পূর্বের ন্যায় গুরুতর রূপ ধারণ করিতে পারে। সেজন্য ভবিষ্যতে রেলপথ ও রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পনা এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাহারা পরস্পরের প্রতিযোগী না হইয়া পরিপূরক হইয়া দাঁড়ায়। মোটর-যান দেশের অভ্যন্তর হইতে রেলপথগুলির জন্য মাল ও যাত্রী বহিয়া আনিবে এবং রেলপথ-বাহিত মাল ও যাত্রী দেশের অভ্যন্তরে পৌছাইয়া দিবে। রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে এইরূপ সংযোগ স্থাপনের দ্বারা উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান করিতে হইবে।

দেশের প্রয়োজনের পক্ষে পাকা সড়কের বিস্তৃতি যথেষ্ট নহে

রেলপথ ও মোটর-যান প্রতিযোগিতা

রেলপথ ও রাজপথের সমন্বয় সাধন

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪৫০ মাইল নূতন রাজপথ ও ৪৩টি পুল নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ২২০০ মাইল রাজপথের উন্নতিসাধন করা হইবে। রাজপথের উন্নতিকল্পে পরিকল্পনায় মোট ৩১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

জলপথ (Waterways) ঃ

ভারতের জলপথকে দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ—(ক) আভ্যন্তরীণ, (খ) সমুদ্রপথ। সমুদ্রপথকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ—(১) উপকূল বাণিজ্য পথ, (২) বৈদেশিক বাণিজ্য পথ।

বাণিজ্য জাহাজের জন্য ভারতবর্ষের এককালে খ্যাতি ছিল। সুগঠিত জাহাজ এবং সাহসী সমুদ্রগামী নাবিকের অভাব ভারতে ছিল না। সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়া জাভা প্রভৃতি সুদূর অঞ্চলে প্রাচীন ভারতবাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সূচনা এবং বাষ্পচালিত ষ্টীলনির্মিত জাহাজ আবিষ্কার ভারতের প্রাচীন পোতশিল্পকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়াছে।

উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্য পথ ঃ ভারতের উপকূল রেখা বিস্তৃত হওয়ায় উপকূল বাণিজ্যের গুরুত্ব অত্যধিক। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রেও ভারতের স্থান নগণ্য নহে। ভারতের উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাণিজ্য জাহাজ ভারতের নিজের নাই।

ভারতীয় জাহাজ চলাচলক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির একচেটিয়া কর্তৃত্ব

ভারতীয় জাহাজ চলাচলক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলি দেশী জাহাজ কোম্পানীর সহিত অবৈধ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া মাশুল হ্রাস ও অন্যান্য উপায়ে শেষোক্ত কোম্পানীগুলিকে কোণঠাসা করিয়া ফেলে। ইহা সত্ত্বেও সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী ও ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী নামে দুইটি উল্লেখযোগ্য জাহাজ চলাচল সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভিজাগাপটমে একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা সম্প্রতি চালু হইয়াছে। বৈদেশিক জাহাজের অবৈধ প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় জাহাজগুলিকে সংরক্ষণ করা ভারত সরকারের উচিত এবং ভারতের উপকূলে জাহাজ চলাচলের জন্য ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র-

বাণিজ্য জাহাজের উপযোগিতা

নীতির দিক দিয়া প্রত্যেক দেশের পর্যাপ্ত পরিমাণে বাণিজ্য জাহাজ থাকা প্রয়োজন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্দরসমূহের উন্নতি ও জাহাজ চলাচল ব্যাপারে ভারতীয় উদ্যোগকে সাহায্য করিবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল ভারতীয় কোম্পানী জাহাজ কিনিবে তাহাদের সাহায্যের জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। যে দুইটি তৈল পরিশোধনাগার বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের আমদানী ও রপ্তানীর জন্য বন্দরের সুবিধার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কান্দলা উপকূলে একটি নূতন বন্দর স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। এবং কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন ও বিশাখাপত্তনের উন্নতির জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

আভ্যন্তরীণ জলপথ: নদীমাতৃক ভারতে নাব্য নদীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। নাব্য নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রই প্রধান। দক্ষিণে মহানদী, গোদাবরী এবং কৃষ্ণাও নাব্য। বর্ষাতে অন্যান্য অনেক নদী নাব্য হয়। আভ্যন্তরীণ জলপথেও ষ্টীমার চালাইবার ভার প্রধানতঃ ইউরোপীয়দের হাতে।

আকাশপথ (Airways):

যাত্রী ও মালবহনের জন্য আকাশপথের উপযোগিতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বিশেষ অনুভূত হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতীয়েরা আকাশযান সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতে থাকে। বাঙ্গালোরে আকাশযান তৈয়ারীর যে কারখানা যুদ্ধের সুরুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে প্রচুর পরিমাণে আকাশযান তৈয়ারী হইতে থাকে। স্বাধীনতার পর ব্রিটিশের স্বার্থের সহিত সংঘর্ষের ভয় দূর হওয়ায় অনেকগুলি ভারতীয় আকাশপথ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার মাইল আকাশযান চলাচলের ব্যবস্থা হয়। ভারতীয় ডাকবিভাগ প্রত্যেক সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আকাশপথে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করে। সম্প্রতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে আকাশপথের জাতীয়করণ করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the influence of the development of the Railway System in India upon (a) the rural economy of the country and (b) its foreign trade.

শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (Infant Industries Argument)ঃ ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে ও লোকবলে সমৃদ্ধ। শিল্পপ্রধান দেশ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ভারতবর্ষের রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির শৈশবাবস্থায়, পণ্যের উৎপাদন খরচ ব্রিটেন প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশের পণ্যোৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক বেশী পড়ে, কারণ ভারতবর্ষ এখনও অভিজ্ঞতা, কৌশল ও সংগঠনের দিক দিয়া অনেক পশ্চাৎপদ। কাজেই, উন্নত দেশগুলির সুসংগঠিত শিল্পের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতায় ভারতের শিল্প টিকিয়া থাকিতে পারে না। ভারতের শিশু শিল্পের জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন এইজন্যই অনস্বীকার্য।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ

শিল্প বৈচিত্র্যের যুক্তি (Diversification of Industries Argument)ঃ ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতীয় অর্থনীতি কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা অকল্যাণকর। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যথোচিত ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। নানারকমের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমিবে এবং জাতীয় প্রতিভার বহুমুখী বিকাশের সুযোগ পাওয়া যাইবে। ফলে ভারত আরও সমৃদ্ধ এবং আরও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য এবং শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তি (National Security Argument)ঃ দেশরক্ষা ও যুদ্ধকালীন অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হইতে, কতকগুলি মূল বুনিয়াদী শিল্প জাতীয় জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এই মূল শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সাহায্য দিতে হইবে।

সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাঃ কোন শিল্পে নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থা বর্তমান থাকিলে ফিস্ক্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষণ প্রবর্তিত করা যাইতে পারিত :—

সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা সর্ত

(১) শিল্পটির কাঁচা মালের যোগান, শক্তি ও শ্রমের যোগান, স্বদেশী বাজার প্রভৃতি স্বাভাবিক সুবিধা থাকা প্রয়োজন ছিল।

(২) শিল্পটির অবস্থা এমন হওয়া উচিত ছিল যে ইহা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত

সাহায্য ছাড়া গড়িয়া উঠিতে পারিত না, অথবা দেশের স্বার্থের খাতিরে যত তাড়াতাড়ি গড়িয়া উঠা দরকার তত তাড়াতাড়ি গড়িয়া উঠিতে পারিত না।

(৩) শিল্পটির অবস্থা এমন হইবে যে অদূর ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া বিনা সংরক্ষণে বিশ্বের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে।

উপরন্তু, ১৯২১ সালের কমিশনের মতে সংরক্ষণ সাময়িক হওয়া প্রয়োজন। এবং একটি শুল্ক বোর্ডের (Tariff Board) সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সাহায্য দেওয়া উচিত। এইরূপ সুপারিশের আগে শুল্ক বোর্ড সংরক্ষণ-প্রার্থী শিল্পে উল্লিখিত তিনটি অবস্থা বর্তমান আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবে।

সংরক্ষণের আওতায় উন্নত শিল্পসমূহ

শুল্ক বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী লোহা ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প ও দিয়াশলাই শিল্পকে সংরক্ষণের সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল। কেবল কতকগুলি বিশেষ অবস্থা বর্তমান থাকিলেই সংরক্ষণের সাহায্য দেওয়া হইত বলিয়া ইহাকে বাঙলায় 'প্রভেদাত্মক সংরক্ষণ নীতি'ও বলা যায়। ১৯২১ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশনের লিখিত সর্তগুলি কঠোর। ভারতের জনমত চিরকালই সংরক্ষণ নীতি আরও উদার করার পক্ষে।

জাতীয় সরকারের সংরক্ষণ নীতি

জাতীয় সরকারের ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি সম্বন্ধে প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে বিদেশী দ্রব্যের সহিত সমান প্রতিযোগিতা দূর করিবার জন্য এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন হইলেই সংরক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে ১৯২১ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশনের নির্দিষ্ট সর্তগুলি সকল ক্ষেত্রে মানা চলিবে না;—অর্থাৎ প্রভেদাত্মক সংরক্ষণ নীতি বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণমাচারী কমিশন বা ১৯৪৯ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশন

ভবিষ্যতের সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য সরকার ১৯৪৯ সালে আর একটি ফিস্‌ক্যাল কমিশন নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী ইহার সভাপতি ছিলেন। কৃষ্ণমাচারী কমিশন আরও উদার সংরক্ষণ নীতির পক্ষে। এই কমিশনের অনুমোদিত নীতির সংক্ষিপ্তসার হইল: ভারতের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় যে কোন শিল্প প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে তাহাকেই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সাহায্য

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** (১) গ্রামের আর্থিক অবস্থার উপর রেলপথের প্রভাব ঃ গ্রামের আর্থিক স্বাবলম্বন রেলপথ স্থাপনের ফলে ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি গ্রাম এখন পার্শ্ববর্তী সহর, ভারতের অপরাপর অংশ, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত। গ্রাম এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের অঙ্গ। চিকাগোতে তুলার মূল্যের বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের সহিত ভারতের অখ্যাত পল্লীর চাষীর ভাগ্য বিজড়িত। ইহার ফলে ভারতের গ্রামের অর্থনীতিতে বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর 'প্রাচুর্য' (prosperity) ও 'মন্দা'র (depression) তরঙ্গ ভারতীয় গ্রামের জীবনকেও আঘাত করে।

রেলপথ স্থাপনের ফলে সুলভ বিদেশী দ্রব্য ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকায় দেশীয় কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হইতে থাকে। শিল্পীরা গত্যন্তরবিহীন হইয়া কৃষিকার্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে জমির উপর জনসংখ্যার বিশেষ চাপ পড়ে এবং গ্রামগুলি ক্রমশঃই দরিদ্র হইতে থাকে। ফলে গ্রাম ছাড়িয়া সহরাঞ্চলে আসিবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা দেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সহরাঞ্চলে উন্নততর জীবিকার জন্য গ্রাম ত্যাগ করেন। দরিদ্র চাষী মিল-মজুরের চাকুরী পাওয়ার জন্য সহরে আসে।

(২) বহির্বাণিজ্যের উপর রেলপথের প্রভাব—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়নের উদ্দেশ্যে লর্ড ডালহৌসী ভারতে রেলপথের প্রবর্তন করেন। সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য রেলপথ যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছে। কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য গ্রামাঞ্চল হইতে বন্দরে চালান করা হয় এবং তৈয়ারী মাল বন্দর হইতে রেলপথে গ্রামে ও দেশের অভ্যন্তরস্থিত সহরগুলিতে চালান করা হয়।]

2. Give a brief account of the history of Railway construction in India showing the changes in the policy of the Government from time to time. (C. U., 1943) (২৯৫-২৯৬, ২৯৮-৩০০ পৃষ্ঠা দেখ)

3. What is the present position of shipping in India ? What provision has been made for its improvement in the Five-year Plan ?

(৩০১-৩০২ পৃষ্ঠা দেখ)

একাদশ অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য

(Foreign Trade)

বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল বৈশিষ্ট্য (Chief Features of Foreign Trade) ঃ

অবিভক্ত ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ—

(১) ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কাঁচা মাল রপ্তানী ও তৈয়ারী মাল ও যন্ত্রপাতি

আমদানী করিত। এই ধরণের বহির্বাণিজ্যকে ঔপনিবেশিক বহির্বাণিজ্য বলা হয়। ভারতের এই ধরণের বহির্বাণিজ্যের জন্য দায়ী ছিল ভারতে শিল্পোন্নতির অভাব। (২) ভারতের বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশ ছিল ব্রিটেন অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে। যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধকালেও ভারতবর্ষ আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক করিত। ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটেনের নিকট দেনাদার, ব্রিটেনের পাওনা শোধ করিবার জন্যই তাহাকে রপ্তানীর এই আধিক্য বজায় রাখিতে হইত। (৩) ১৯৩১ সালের পূর্বে ভারতবর্ষ নিয়মিত সোনা আমদানী করিত। (৪) ভারতবর্ষের মোট বহির্বাণিজ্যের মধ্যে স্থল-বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অল্প।

অবিভক্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের বহির্বাণিজ্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হইল:—(১) দেশবিভাগের ফলে ভারতের যে কেবলমাত্র কাঁচা পাট ও কাঁচা তুলা রপ্তানী করিবার ক্ষমতা গিয়াছে তাহাই নয়, বর্তমানে ভারতকে এই দুইটি কাঁচা মাল বহুল পরিমাণে আমদানী করিতে হয়। পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে ভারত কাঁচা পাটের প্রধান আমদানীকারক দেশ। (২) ভারতের বহির্বাণিজ্যকে আর 'ঔপনিবেশিক ধরণের' বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের মোট রপ্তানীর মধ্যে তৈয়ারী মালের পরিমাণ অর্ধেকের অনেক বেশী। (৩) ১৯৪৭ সাল হইতে ভারত রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীই বেশী করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইল যে ভারতকে বহুল পরিমাণে খাদ্য ও যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইতেছে। (৪) পাকিস্তান গঠিত হওয়ার ফলে স্থলপথে বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। (৫) এখনও ব্রিটেন ও কমনওয়েলথের দেশগুলির সঙ্গে ভারতে বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রধান হইলেও, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে।

ভারতীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

ভারতের আমদানী ও রপ্তানীর "ব্যালান্স" (India's Balance of Payments):

ভারতের 'অদৃশ্য আমদানী'র (Invisible Imports) পরিমাণ যথেষ্ট। পূর্বে ইহা আরও বেশী ছিল, বর্তমানে কিছু কমিয়াছে। ১৯৩৯-৪৫ খৃষ্টাব্দের

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষকে বিদেশে, বিশেষ করিয়া ব্রিটেনে, নিম্নলিখিত 'অদৃশ্য আমদানীগুলি'র জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রেরণ করিতে হইত :

বিভিন্ন ধরণের অদৃশ্য আমদানী

(১) "হোম চার্জ" বা বিলাতী দক্ষিণা (Home Charges)—ভারতবর্ষ হইতে নিম্নলিখিত বাবদে ব্রিটেনকে অর্থ প্রেরণ করা হইত : ভারত সরকারের ষ্টার্লিং দেনার উপর সুদ; যে সমস্ত ব্রিটিশ অফিসার ভারতে চাকুরী করিতেন তাঁহাদের পেন্‌সন; ভারত সরকারের তরফ হইতে ব্রিটেনে যে সমস্ত জিনিস ক্রয় করা হইয়াছে তাহার মূল্য, ইত্যাদি। এই সমস্ত খাতে দেয় অর্থকে "হোম চার্জ" বা বিলাতী দক্ষিণা বলা হইত।

যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেনের নিকট ভারতবর্ষের যে ঋণ ছিল তাহা সমস্ত পরিশোধ হইয়া ব্রিটেনের নিকট ভারতের বিরাট অঙ্কের টাকা পাওনা হয়। এই পাওনাকে ষ্টার্লিং পাওনা বলা হয়। মোট যত ষ্টার্লিং পাওনা ছিল তাহার অর্ধেকের উপর ইতিমধ্যেই খরচ হইয়া গিয়াছে।

(২) বৈদেশিক ব্যাঙ্ক, জাহাজ ও বীমা কোম্পানীর প্রাপ্য : ভারতের নিজস্ব জাহাজ অল্পই আছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্য প্রধানতঃ বিদেশী জাহাজ বহন করে; এজন্য ভারতকে মূল্য বা ভাড়া দিতে হয়। বৈদেশিক ব্যাঙ্ক ও বৈদেশিক বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্যের জন্যও ভারতকে বহু টাকা দিতে হয়।

(৩) বিদেশস্থ ভারতীয় ছাত্র ও ভ্রমণকারীদের জন্য ব্যয় : এই খরচ নির্বাহের জন্য ভারতকে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয়।

যুদ্ধের পূর্বে বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত ভারতের অনুকূলে থাকার ফলে ভারতের যে আয় ছিল তাহা এই "অদৃশ্য আমদানী" বাবদই ব্যয়িত হইত। তবু যদি ভারতবর্ষের অনুকূলে কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকিত তবে উহা সোনা আমদানীতেই ব্যয় করা হইত। গত মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পূর্ব পর্যন্ত ইহাই ছিল সাধারণ অবস্থা। যুদ্ধের ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিলাতী দক্ষিণা আর দিতে হয় না। উপরন্তু, ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা হওয়ায় ভারতবর্ষ উত্তমর্ণ দেশে পরিণত হইয়াছে। এই সকল কারণে

যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষের অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ছিল

'অদৃশ্য আমদানী' জনিত ব্যয় বহন করার জন্য ভারতের পক্ষে আর পূর্বের ন্যায় অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বজায় রাখার প্রয়োজন হয় না।

এইরূপ ভাবে প্রয়োজন না হইলে, অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত দেশের সুগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিদর্শক। কিন্তু ভারতের গত পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূলই রহিয়াছে। ইহার কারণ হইল :—(১) খাদ্য ঘাটতি মিটাইবার জন্য প্রতিবৎসর ভারতকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আমদানী করিতে হইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই আমদানীর পরিমাণ ছিল ২৫৮ কোটি টাকার উপর বা মোট আমদানীর শতকরা ৩০ ভাগ।

গত চার বৎসর ধরিয়া ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূলই রহিয়াছে

(২) পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের কাজের জন্য ভারতকে বহু উৎপাদকের জিনিসও আমদানী করিতে হইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে এই খাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী আমদানী করা হয়।

প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের কারণ-সমূহ

(৩) ভোগ্য দ্রব্যের আমদানীও মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়।

(৪) ভারতকে কাঁচা পাট, দীর্ঘ-আঁশ-সমন্বিত কাঁচা তুলা ইত্যাদি আমদানী করিতে হইতেছে।

(৫) নানাকারণে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাহত হইতেছে।

১৯৫৩ সালের সুরু হইতে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের মোড় ঘুরিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আশা করা যায় যে আবার ভারতের পক্ষে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত শীঘ্রই দেখা দিবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্যসমূহ (Articles entering into Foreign Trade) :

মাত্র জিনিসপত্রের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব ধরিলে ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫২৩ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আমদানীর পরিমাণ হইল ৮৪৪ কোটি টাকা এবং রপ্তানীর পরিমাণ ৬৭৯ কোটি টাকা।

ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য

রপ্তানী : ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা তুলা, তুলাজাত বস্ত্র, চা, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানীজ, মাইকা, খাদ্যশস্য, কফি,

লাক্ষা, রবার ও চামড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য হইল ভারতের প্রধানতম রপ্তানী দ্রব্য। দেশ বিভাগের ফলে অধিকাংশ পাট বর্তমানে পাকিস্তানে উৎপন্ন হইলেও এখনও পাট রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা বন্দর। কিন্তু ক্রমশঃ ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে পাটের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহ এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা পাটের প্রধান ক্রেতা।

কাঁচা তুলা প্রধানতঃ জাপান, চীন এবং ব্রিটেনে রপ্তানী করা হইত। গত যুদ্ধে জাপানে তুলা রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। দেশ বিভাগের ফলে তুলার রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে এবং ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ব্যবহারের জন্য লম্বা আঁশ-ওয়ালা তুলা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। কিন্তু তুলাজাত বস্ত্রের রপ্তানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তুলাজাত বস্ত্র ব্রহ্ম, মালয়, সিংহল, কেনিয়া, জাঞ্জিবার, পাকিস্তান প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী করা হয়। চা প্রধানতঃ ইংলণ্ড, আমেরিকা, ক্যানাডা, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হয়। তৈলবীজ প্রধানতঃ ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে রপ্তানী করা হয়। কাঁচা ও তৈয়ারী চামড়া ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হয়। দেশ বিভাগের ফলে ভারতের চামড়া রপ্তানী করিবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, লাক্ষা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হয়।

আমদানী ঃ আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খাদ্য, উৎপাদকের জিনিস, মোটর গাড়ী, ইলেকট্রিক দ্রব্য, কৃত্রিম সিল্ক, তুলাজাত খণ্ডবস্ত্র, কাঁচের বাসন, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, পেষ্ট বোর্ড, মনোহারী দ্রব্য, কাঠ, খাদ্যশস্য, মশল্লা, মদ, সিল্ক, পশম প্রভৃতি প্রধান।

আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, রাশিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্য আমদানী করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, পূর্ব আফ্রিকা এবং পাকিস্তান হইতে কাঁচা তুলা আমদানী হয়। সূতা ও বস্ত্র ব্রিটেন, জাপান, চীন, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় হইতে তুলাজাত বস্ত্রের আমদানী ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। কাঁচা পশম ও পশমজাত দ্রব্য ব্রিটেন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করা হয়। সিল্ক ও সিল্কজাত দ্রব্য চীন, জাপান, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করা হয়। কৃত্রিম সিল্কজাত দ্রব্য জাপান,

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করা হয়। উৎপাদকের জিনিস আমদানী করা হয় প্রধানতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ক্যানাডা ও বেলজিয়াম হইতে। ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য জার্মানী, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড এবং ব্রিটেন হইতে আনা হয়। কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড আমদানী করা হয় নরওয়ে, সুইডেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে। ব্রহ্মদেশ হইতে কাঠ আমদানী করা হয়। মোটরগাড়ী আনা হয় ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে।

প্রধান দেশগুলির সহিত বাণিজ্য (Trade with Principal Countries) ঃ

ব্রিটেন ঃ আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটেনের স্থান সর্বপ্রধান। ব্রিটেন আমাদের বাজার হইতে চা, পাট, তুলা, চামড়া, তৈলবীজ প্রভৃতি ক্রয় করে এবং উৎপাদকের জিনিস, মোটরগাড়ী, সাইকেল, তুলাজাত বস্ত্র, কৃত্রিম সিল্ক, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য, মনোহারী দ্রব্য, তামাক ইত্যাদি আমাদের নিকট বিক্রয় করে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঃ আমাদের বাজার হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পাট ও পাটজাত দ্রব্য, লাক্ষা, ম্যাঙ্গানীজ, চা, ফল, পশম প্রভৃতি ক্রয় করে এবং আমাদের নিকট যন্ত্রপাতি, ফিল্ম, মোটরগাড়ী, ঔষধ, কাগজ, তৈল ইত্যাদি বিক্রয় করে।

পাকিস্তান ঃ পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্য স্বভাবতঃই খুব বেশী। বর্তমানে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহার স্থান দ্বিতীয়। পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্যের অধিকাংশই স্থলপথে পরিচালিত হয়। ভারত পাকিস্তানের নিকট হইতে পাট, তুলা, গম, গন্ধক ইত্যাদি ক্রয় করে এবং পাকিস্তানের নিকট কয়লা, কাপড়, কাগজ, দিয়াশলাই, লোহা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। গত কয়েক বৎসরেই পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্যে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৬২ কোটি টাকা।

জাপান ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটেনের পরেই জাপানের স্থান ছিল। কিন্তু, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। লোহা, কাঁচা তুলা প্রভৃতি জিনিস সম্বন্ধে জাপান আমাদের প্রধান খরিদ্দার ছিল। পাট, লাক্ষা, চামড়া, অভ্র

প্রভৃতিও আমাদের নিকট হইতে জাপান ক্রয় করিত। জাপান আমাদের নিকট তুলাজাত বস্ত্র, সিল্ক, খেলনা, মনোহারী দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাতের জিনিস, কাগজ ইত্যাদি বিক্রয় করিত। সম্প্রতি জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং জাপানী জিনিস ভারতে আসিতেছে।

জার্মানীঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে জার্মানী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিত। কিন্তু, ক্রমশঃই জার্মানীর সহিত ভারতের বাণিজ্য কমিয়া আসিতেছিল এবং গত যুদ্ধে উহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের নিকট হইতে পাট, তৈলবীজ, চামড়া, কাঁচা তুলা, চা ইত্যাদি জার্মানী ক্রয় করিত এবং কলকব্জা, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, ইলেকট্রিক দ্রব্য, লোহালক্কড়, কাঁচের বাসনপত্র ইত্যাদি এদেশে বিক্রয় করিত।

অন্যান্য দেশঃ গত মহাযুদ্ধের ফলে ব্রিটেন ব্যতীত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত অন্যান্য প্রদেশগুলির সহিত আমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডাই প্রধান। অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার পরে আছে নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড, কেনিয়া প্রভৃতি।

অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, মিশর, ইরাণ, চীন প্রভৃতি

ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্য, তুলাজাত বস্ত্র, কয়লা, চিনি প্রভৃতি আমদানী করে এবং ভারতকে প্রধানতঃ কাঠ বিক্রয় করে। পূর্বে ব্রহ্মদেশ প্রচুর পরিমাণে চাউল ও খনিজ তৈল ভারতে রপ্তানী করিত। এখন আর তাহার এই দুইটি জিনিস রপ্তানী করিবার বিশেষ শক্তি নাই।

এশিয়ার মধ্যে মিশর, ইরাণ, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও ভারতের বিশেষ বাণিজ্য-সম্বন্ধ আছে। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। ব্রিটেন, কমনওয়েলথ দেশগুলি এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে অন্যান্য যে সকল দেশ থাকে তাহাদের সহিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ হইল ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the chief characteristics of India's foreign trade. (C. U., 1934) (৩০৩-৩০৪ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Give some idea of the distribution of India's foreign trade (a) by principal countries, (b) by principal commodities. (C. U., 1935) (৩০৬-৩০৯ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Explain why India has normally a favourable balance of trade. (C.U., 1938, 1945)

[**ইঙ্গিত** ঃ বর্তমানে ভারতের অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত নাই; অবিভক্ত ভারতবর্ষের ছিল। তাহার কারণের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখ]

4. Give an account of India's foreign trade. (C. U., 1942),

(৩০৬-৩০৯ পৃষ্ঠা দেখ)

5. Give some reasons why nations find it advantageous to trade with one another. Mention some of the invisible items in India's Foreign Trade. (C. U. 1951) (৩০৪-৩০৬ পৃষ্ঠা দেখ)

6. What are the principal items of India's import and export trade? What is meant by an 'unfavourable' balance of trade? (C. U., 1953)

(৩০৬-৩০৮ পৃষ্ঠা দেখ)

দ্বাদশ অধ্যায়

কারেন্সী ও ব্যাঙ্কিং

(Currency and Banking)

ভারতের কারেন্সী-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(A short history of the Indian Currency System) :

ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় কারেন্সী-ব্যবস্থার ইতিহাস সুরু করিতে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বি-ধাতুমান কারেন্সী-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করে।

দ্বি-ধাতুমান কারেন্সী-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা

এই চেষ্টা সফল না হওয়ায় ১৮৩৫ সালে এক-ধাতু রৌপ্যমান প্রবর্তিত হয়। ১৮৩৫ হইতে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত এই এক-ধাতু রৌপ্যমানেরই আমল ছিল। তাহার পর স্বর্ণ-মূল্যের তুলনায় রৌপ্য-মূল্য ভীষণভাবে পড়িতে থাকায় ১৮৯৩ সালে রৌপ্যমান ভাঙিয়া পড়ে। রৌপ্যমান ভাঙিয়া পড়ায় ভারতীয় মুদ্রার অর্থাৎ টাকার বিনিময়-মূল্যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। কারেন্সী বিনিময়-মূল্যে

১৮৩৫ সালের এক-ধাতু রৌপ্যমান

স্থায়িত্ব না থাকিলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। এইজন্য ১৮৯৮ সালে নিযুক্ত ফাউলার কমিটি ভারতকে স্বর্ণমান অবলম্বন করিতে বলে। ভারত সরকার স্বর্ণমান অবলম্বন সম্বন্ধে ফাউলার কমিটিব সুপারিশ নীতিগত-ভাবে গ্রহণ করে; কিন্তু এই নীতিকে কার্যকর করিতে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল ভারত সরকার তাহার সবগুলিই অবলম্বন করে নাই। ফলে স্বর্ণমানের পরিবর্তে ভারতবর্ষে এক অদ্ভুত কারেন্সী-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। ইহার নাম হইল স্বর্ণ-বিনিময় মান।

ফাউলার কমিটি কর্তৃক স্বর্ণমান অবলম্বন করিতে সুপারিশ

স্বর্ণ-বিনিময় মান

১৮৯৮ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই স্বর্ণ-বিনিময় মান প্রবর্তিত থাকে। ইহাতে ভারতীয় কারেন্সী ষ্টার্লিং-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। টাকাকে আভ্যন্তরীণ আদান-প্রদানের জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যাইত না; বৈদেশিক পাওনা মিটানর জন্য যাইত—তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে। প্রথমে ভারতীয় কারেন্সীকে ষ্টার্লিং-এ রূপান্তরিত করিতে হইত। টাকাকে ষ্টার্লিং-এ রূপান্তরিত করার অর্থই ছিল স্বর্ণে রূপান্তরিত করা, কারণ ষ্টার্লিং তখন স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্বর্ণ-বিনিময় মানের বৈশিষ্ট্য

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিক হইতে রৌপ্যের দাম বিশেষ বাড়িতে থাকায় এই স্বর্ণ-বিনিময় মান প্রবর্তিত রাখা সম্ভব হইল না। তখন হিল্টন-ইয়ং কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯২৭ সালে স্বর্ণপিণ্ড মান প্রবর্তিত হইল। এই স্বর্ণপিণ্ড মান চার বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল বলা চলে। ১৯৩১ সালে মন্দা বাজারের জন্য ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং ষ্টার্লিং অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রায় পরিণত হয়। ভারতীয় কারেন্সীকেও স্বর্ণের সহিত সকল সম্বন্ধ চুকাইয়া ষ্টার্লিং-এর সহিত সংযুক্ত হইতে হয়। এই সময় হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে কারেন্সী-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল তাহাকে বলা হয় ষ্টার্লিং-বিনিময় মান।

স্বর্ণপিণ্ড মান

ষ্টার্লিং বিনিময় মান

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সভ্য হয়। এই সভ্যপদের ফলে যে কারেন্সী-ব্যবস্থার উদ্ভব হয় তাহাকে আন্তর্জাতিক মান বা আন্তর্জাতিক স্বর্ণ-বিনিময় মান বলা হয়। এই ব্যবস্থায় ভারতীয়

আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান

টাকার স্বর্ণ-মূল্য নির্ধারিত থাকাতে ভারতকে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের প্রত্যেক সভ্য দেশের মুদ্রার সহিত টাকার বিনিময়-হার বজায় রাখিতে হয়।

ভারতের বর্তমান কারেন্সী-ব্যবস্থা (Present Currency System of India) :

আমরা দেখিয়াছি, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সভ্য হওয়ার পূর্বে ভারতীয় টাকা ষ্টার্লিং-এর সহিত সংযুক্ত ছিল। তখন বিনিময়-হার ছিল ১ টাকা = ১ শিলিং ৬ পেনি। এই বিনিময়-হার বজায় রাখিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইত। বর্তমানে ভারত ও ব্রিটেন উভয়েই আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সভ্য, উভয়েরই কারেন্সীর স্বর্ণ-মূল্য নির্দিষ্ট আছে এবং উভয়েই ষ্টার্লিং অঞ্চলের (Sterling Area) সভ্য। ১৯৪৯ সালে ডলার প্রভৃতি কারেন্সীর সহিত ষ্টার্লিং ও ভারতীয় টাকার একই হারে বিনিময়-মূল্যের হ্রাস হয়। ফলে ষ্টার্লিং-এর সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময়-মূল্য অপরিবর্তিতই রহিয়াছে (১ টাকা = ১ শিলিং ৬ পেনি)।

ভারত ও ষ্টার্লিং অঞ্চল

বাজারে নোট ছাড়িবার একক অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, কিন্তু সে নোটের পশ্চাতে ভারত সরকারের 'গ্যারাণ্টী' প্রয়োজন হয়। আবার, নোটের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সোনা ও বিদেশী কারেন্সীর 'সিকিউরিটি'র আকারে কিছু জমা বা 'রিজার্ভ' রাখিতে হয়। সেই জমার পরিমাণ ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তির (assets) অন্যূন দুই-পঞ্চমাংশ বা শতকরা ৪০ ভাগ হইবে। এই শতকরা ৪০ ভাগের মধ্যে অন্যূন ৪০ কোটি টাকার সোনা রাখিতে হইবে। বাকী নোট ভারত গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি, একটাকার মুদ্রা প্রভৃতির পরিবর্তে ছাড়া হয়।

কাগজী কারেন্সী-ব্যবস্থা

প্রচলিত নোটগুলি ১৲, ২৲, ৫৲, ১০৲ ও ১০০৲ টাকার। পূর্বে আরও বেশী মূল্যের নোট বাজারে প্রচলিত ছিল, এখন তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ৫০৲ টাকার ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা প্রচলন করা হয় নাই। নোটগুলিকে সাধারণতঃ ধাতুনির্মিত টাকায় পরিবর্তন করা চলে, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে কেবলমাত্র নোট দিয়াও দেনা শোধ করিতে পারে।

মুদ্রা প্রচার করার একক অধিকার ভারত সরকারের। ধাতুনির্মিত টাকা হইল অসীম বিহিত মুদ্রা, কিন্তু ইহার বাহ্যিক মূল্য ইহার ধাতব মূল্য অপেক্ষা

বেশী। সুতরাং ইহা প্রতীক বা নিদর্শন মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নয়। ধাতুনির্মিত টাকার ওজন এক তোলা বা ১৮০ গ্রেণ। পূর্বে টাকার মধ্যে ১৬৫ গ্রেণ পরিমাণ খাঁটি রূপা থাকিত। গত মহাযুদ্ধের সময় রূপার পরিমাণ কমাইয়া ৯০ গ্রেণ করা হয়। সম্প্রতি রূপার মুদ্রা তৈয়ারী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে প্রচলিত টাকা নিকেল-নির্মিত। ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থা হইতে রৌপ্য সম্পূর্ণভাবে বিদায় লইয়াছে। নিদর্শন মুদ্রা ৪ আনা, ২ আনা, ১ আনা, দুই পয়সা ও এক পয়সা প্রভৃতি মূল্যের খুচরা মুদ্রার আকারেও তৈয়ারী করা হইয়া থাকে। ইহারা সসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া কথিত হয়।

রূপার মুদ্রা আর তৈয়ারী হয় না

ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা (Banking System of India) :

ভারতের ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থায় বহুবিধ ব্যাঙ্ক আছে। ভারতে যে বিভিন্ন ধরণের ব্যাঙ্ক দেখা যায় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India) : ভারতের ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার শীর্ষে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবস্থিত। ইহাই ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ১৯৩৪ সালের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট অনুযায়ী এই ব্যাঙ্ক ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইহা অংশীদারগণের ব্যাঙ্ক ছিল। ১৯৪৮ সালে ইহা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। অংশীদারগণের ব্যাঙ্ক থাকাকালীন ইহার পুঁজি-মূল্য ছিল ৫ কোটি টাকা এবং প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য ১০০৲ টাকা। বর্তমানে পুঁজি-মূল্য ঐ একই আছে, তবে সমস্ত শেয়ার বা অংশের মালিক হইল রাষ্ট্র। প্রথমে ভারতে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং দিল্লী, এই চারিটি স্থানে, এবং কিছুদিনের জন্য রেঙ্গুনে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা ছিল। ইহা একটি কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত। এই বোর্ড পূর্বে আংশিকভাবে অংশীদারবর্গের প্রতিনিধি ও আংশিকভাবে সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইত। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবার পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিযুক্ত বা মনোনীত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ডের সদস্য-সংখ্যা হইল ১৪। ইহার মধ্যে একজন গভর্ণর ও দুইজন সহকারী গভর্ণর আছেন; আবার ১১ জন পরিচালকের মধ্যে ৪ জন স্থানীয় বোর্ড হইতে মনোনীত হন। প্রত্যেক স্থানীয়

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গঠনতন্ত্র

বোর্ড ৩ জন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত। এই সদস্যেরা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান দপ্তর হইল সংখ্যায় দুইটি—(১) 'ইস্যু' বা নোট প্রচলন বিভাগ বা দপ্তর ; এবং (২) ব্যাঙ্কিং বিভাগ বা দপ্তর। ব্যাঙ্কিং দপ্তরের অন্যতম প্রধান বিভাগ হইল কৃষিঋণ বিভাগ।

বিভাগ বা দপ্তর

(১) নোট প্রচলন করিবার একচেটিয়া অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। (২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার রূপে কাজ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক (Scheduled Banks) বলিয়া পরিচিত। পূর্বে মাত্র তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ এবং চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হইত। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন দ্বারা তপশীলের বাহিরের ব্যাঙ্কগুলিকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ঐ একই পরিমাণে জমা রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে কয়েকটি সর্তে টাকা ধার দিতে পারে। (৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্কার রূপে কাজ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিনা সুদে সরকারী টাকা ব্যবহার করিতে পারে। সরকারকে ধার দেওয়া ও সরকারী ঋণ (Public Debt) পরিচালনা করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তব্য। টাকার নির্দিষ্ট বিনিময় মূল্য বজায় রাখাও ইহার কর্তব্য। (৪) মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা, ধার (Credit) নিয়মিত করা, ব্যাঙ্কিং প্রথার স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার প্রতি নজর রাখা এবং সমবায় সমিতির বিস্তার দ্বারা কৃষিঋণ প্রথার উন্নতি সাধন করা এই ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্তব্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন দ্বারা দেশের সমগ্র ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। ঐ আইনের ৫৫টি ধারার মধ্যে ২৭টি শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা লইয়া। এই আইনের বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেমন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে, তেমনি অনেক দায়িত্বও ইহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই আইনের দ্বারা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হইয়াছে যে দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিচালনার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (Imperial Bank of India)ঃ পূর্বে সরকারের ব্যাঙ্কার রূপে ইহা কাজ করিত, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইহা বে-সরকারী ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। ১৯২০ সালের একটি বিশেষ আইন বলে Bank of Bengal, Bank of Bombay এবং Bank of Madras, এই তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক একত্রিত করিয়া এই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতের মধ্যে ইহা সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্ক এবং প্রধানতঃ ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ইহা পরিচালিত। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কার্যই ইহা সম্পাদন করে এবং যে সমস্ত জায়গায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোনও শাখা নাই সে সমস্ত জায়গায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট রূপে ইহা কাজ করে।

বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank)ঃ ভারতে চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, হংকং ও সাংহাই ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বহু বৈদেশিক ব্যাঙ্ক আছে। ইহাদের হেড অফিস ভারতের বাহিরে। আমদানী ও রপ্তানী, এই উভয় প্রকার বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ-সাহায্য করার প্রায় একচেটিয়া অধিকার এই সমস্ত ব্যাঙ্কের। আমানত গ্রহণ করা ব্যাপারে অথবা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহারা ভারতের বাণিজ্যিক জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগকে ইহারা পর্যাপ্ত সাহায্য দেয় না। কিছুদিন পূর্ব হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বিনিময়ের কার্য করিতেছে।

ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্ক (Indian Joint Stock Banks)ঃ ভারতে রেজিষ্ট্রীকৃত এই ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত নানাপ্রকার কার্য করে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, পঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এবং ইউনাইটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক—এই সাতটিই বৃহৎ ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান। ইহারা ভারতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগকে অল্প-মেয়াদী ঋণ দিয়া সাহায্য করে। ইহা ব্যতীত আইনসঙ্গত সকল ব্যাঙ্কিং কার্যও ইহারা করে। জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ অভ্যাস গড়িয়া তোলা হইল ইহাদের অন্যতম প্রধান কার্য।

ভারতের বৃহৎ যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্কগুলি

ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর আইন অনুসারে ইহাদের চলতি আমানতের শতকরা

৫ ভাগ এবং স্থায়ী বা মেয়াদী আমানতের শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট রাখিতে হইবে। যে সমস্ত যৌথ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের (Paid-up Capital and Reserve) পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা বা তাহার অধিক, তাহারা আবেদন করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক "তপশীলভুক্ত" ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ও যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্কগুলি

আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা ও ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের অগ্রগতির জন্য ১৯৪৯ সালে যে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন পাশ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। যৌথ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, অত্যধিক ব্যবসায় (Over-Trading) বন্ধ করা, ইহাদের পরিচালনাকে উন্নত করা সম্বন্ধে নানাবিধ ব্যবস্থা এই আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সমবায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Banks) ঃ সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত ব্যাঙ্কগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মালিক কৃষিজীবী অথবা অ-কৃষিজীবী খাতক। সমবায় সমিতি আইন অনুসারে ইহারা রেজেষ্ট্রীকৃত। উৎপাদনের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া ইহাদের উদ্দেশ্য। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের অধিকাংশই গ্রামে অবস্থিত এবং সভ্যদের অসীম দায়িত্বের ভিত্তিতে ইহারা গঠিত। কিন্তু, সহরে অবস্থিত সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সভ্যদের দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Banks) ঃ জমি জামিন রাখিয়া কৃষিজীবীদিগকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৫ হইতে ২০ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন কিস্তিতে ঋণ শোধ করা চলিবে। এই ব্যাঙ্কগুলির কতকগুলি সমবায় প্রথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত,—কতকগুলি আবার সাধারণ ব্যাঙ্কের ন্যায় গঠিত। সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। তিনটি উদ্দেশ্যে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দেওয়া হইয়া থাকে ঃ (১) পুরাতন দেনা শোধ করা, (২) জমির উন্নতি করা, ও (৩) নূতন জমি খরিদ করা। এই ঋণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই ডিবেঞ্চারের উপর সুদ সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত। এই ধরণের ব্যাঙ্ক মাদ্রাজে বহু রহিয়াছে। মাদ্রাজের পরই

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য

মধ্যপ্রদেশের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এই ধরণের ব্যাঙ্ক এখনও বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই।

পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক (Post Office Savings Bank)ঃ ভারত সরকারের ডাকবিভাগের পরিচালনাধীন সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কে সুদের হার অত্যন্ত অল্প। চেক দ্বারা টাকা উঠানো যায় না। স্বল্পবিত্ত লোকদিগকে সঞ্চয়ের উৎসাহ দেওয়া এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য।

দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী (Indigenous Bankers)ঃ উপরোক্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও ভারতে অনেক দেশীয় ব্যাঙ্ক আছে, যাহারা স্বল্পবিত্ত ব্যবসায়ী ও কৃষকদিগকে ঋণ দিয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোথাও বা তাহাদের বলা হয় মহাজন, কোথাও বা শ্রোফ, কোথাও বা সাউকর। যে সুদে এই সকল ব্যবসায়ী টাকা ধার দিয়া থাকে তাহা অধিকাংশ সময় অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সকল ব্যবসায়ীর খাতকেরা সাধারণতঃ দরিদ্র ও অশিক্ষিত এবং তাহারা গ্রামাঞ্চলে বাস করে। তাহারা দরিদ্র বলিয়া উপযুক্ত জামিন দিতে পারে না; অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের প্রবঞ্চনা করা সহজ। গ্রামাঞ্চলে ঋণ সংগ্রহ করাও কঠিন; গ্রামাঞ্চলে ঋণ দান সংক্রান্ত আইনের বিধিগুলিকেও সহজেই এড়াইয়া চলা যায়। এই সমস্ত কারণে দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়িগণ অত্যধিক সুদ আদায় করিতে সক্ষম হয়।

কি কারণে দেশীয় ব্যাঙ্কব্যবসায়ীরা উচ্চ সুদ আদায় করিতে সক্ষম হয়

প্রশ্নোত্তর

1. Explain the constitution and functions of Land Mortgage Banks in India. How far have they succeeded in achieving their aims? (C. U., 1941) (৩১৬-৩১৭ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Give an account of the functions of the Reserve Bank of India. (C. U., 1944, 1951) (৩১৪ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Describe the functions of *two* of the following types of Banks in India :—(a) Co-operative Banks, (b) Postal Savings Bank, and (c) Exchange Banks. (C. U., 1936) (৩১৫, ৩১৬, ৩১৭ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Describe the main types of Banks in India. Indicate also their functions. (C. U., 1947) (৩১৩-৩১৭ পৃষ্ঠা দেখ)

5. Enumerate the different types of banks prevailing in India and state the functions of the Reserve Bank of India. (C. U., 1950)

(৩১৩-৩১৭ পৃষ্ঠা দেখ)

6. Discuss the functions of the various types of banks operating in India. (C. U., 1953) (৩১৩-৩১৭ পৃষ্ঠা দেখ)

7. Explain how the rate of interest is determined. How do you account for the high rates of interest charged by the village money-lender as compared with the rates charged by the City Banks in India? (C. U., 1950)

8. It is the function of the banking system to keep the wheels of production running. Elucidate the above statement and indicate the economic benefits that a country derives from a sound banking organization. (C. U., 1952).

[**ইঙ্গিত ঃ** ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম কার্য হইল দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখা। দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ চারিটি ক্ষেত্রে ভাগ করা চলে—কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য। এই চারিটি ক্ষেত্রেই সংগঠকগণের পক্ষে কার্যকরী মূলধনের জন্য স্বল্প মেয়াদী এবং স্থায়ী মূলধনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। এই ঋণ দিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ না থাকিলে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা এক রকম অচল হইয়া পড়ে। ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহই এই ঋণ দিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে।

উপরন্তু, ব্যবসায়িগণকে নানারূপ উপদেশ প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিয়া, তাহাদের হইয়া জামিন দাঁড়াইয়া, প্রারম্ভিকভাবে তাহাদের জন্য মূলধন সংগ্রহ করিয়া দিয়া ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে সাহায্য করে।]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বণ্টন

(Distribution)

খাজনা (Rent) ঃ

ভূমিরাজস্ব আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে ভারতে কৃষিভূমির খাজনা তিনটি শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় :—(১) প্রথা (Custom); (২) প্রতিযোগিতা (Competition); (৩) আইন (Legislation)। অর্থবিদ্যার নীতি অনুযায়ী

খাজনা কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভূম্যধিকারী প্রজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সুযোগ লইয়া তাহাদের নিকট হইতে "উৎপাদকের উদ্বৃত্তে"র (Producer's Surplus) পূর্ণ মূল্য আদায় করে। ভারতের বেলায় এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। অবশ্য ভারতে খাজনা নির্ধারণক্ষেত্রে প্রতিযোগিতারও কিছুটা অংশ রহিয়াছে। গত দুই শতাব্দীতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য, জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য এবং শিল্পোন্নতির অভাবের ফলে জমির চাহিদা অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, খাজনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে খাজনা নির্ধারিত হয় প্রচলিত প্রথা, প্রতিযোগিতা এবং আইন দ্বারা

কিন্তু জমির জন্য প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইলেও অনেক সময় বহুকাল ধরিয়া যে খাজনা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রচলিত প্রথার (custom) ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না।

পরিশেষে আছে খাজনাবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বহু আইন। সুতরাং ভারতে খাজনা নির্ধারণে উপরোক্ত তিনটি শক্তিই কার্য করে।

সুদ (Interest) :

ভারতে বহুবিধ ঋণের বাজার (Loan Market) রহিয়াছে। বিভিন্ন ঋণের বাজারে সুদের হার বিভিন্ন প্রকার।

ভারত সরকার সাধারণতঃ বার্ষিক ৩৲ টাকা হইতে ৩॥০ টাকা সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই স্বল্প হারের কারণ নিম্নরূপ। (১) সরকারী ঋণে পুঁজি নিয়োগ যথেষ্ট নিরাপদ। এই ধরণের ঋণে কোনরূপ আশঙ্কা নাই। সরকারের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের যথেষ্ট উচ্চ ধারণা আছে। (২) ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও অছি গুলি (Trustees) তাহাদের পুঁজির এক বড় অংশ সরকারী 'বণ্ডে' (Bond) বা তমসুকপত্রে নিয়োগ করিতে বাধ্য। ইহার ফলেই সরকারী ঋণের উপর সুদের হার অল্প হয়।

ঋণের বিবিধ বাজারে সুদের হারেব পার্থক্যের কারণ

ব্যবসায়িগণকে সরকার অপেক্ষা উচ্চতর সুদে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইতে হয়। এই প্রকার ঋণে যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সুদের বিভিন্ন

হারে ঋণ পাইয়া থাকেন। জামিনের ধরণ এবং ব্যবসায়ীর আর্থিক সঙ্গতির উপর সুদের হার নির্ভর করে।

কৃষিজীবিগণকে সরকার ও ব্যবসায়ী অপেক্ষা অনেক উচ্চতর হারে সুদ দিতে হয়। কৃষিজীবীদের আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত অল্প—এবং সেহেতু তাহাদের ঋণের বাজারে "সুনাম" (Credit) খুব কম। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষিজীবী কোনও উপযুক্ত জামিন দিতে পারে না। জামিন দিবার মধ্যে তাহার আছে কেবলমাত্র জমি। কিন্তু পাওনাদার সহজে খাতকের জমির দখল পাইতে সমর্থ হয় না। ইহার ফলে দীর্ঘদিনব্যাপী ব্যয়বহুল মোকদ্দমা চলে। সুদ সহ মূল অর্থ পাইতে হইলে উত্তমর্ণকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনেক ব্যয় করিতে ও হাঙ্গামায় পড়িতে হয়। ইহার ফলে কৃষিজীবীকে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদের হার বেশী হয়। কৃষকের দারিদ্র্য অথবা কোন প্রকার দুর্ভাগ্যের ফলে কৃষক তাহার দেনা পরিশোধ করিতে সক্ষম না-ও হইতে পারে। সেইজন্য এই সমস্ত ঋণের ক্ষেত্রে পুঁজি না ফিরিয়া পাইবার আশঙ্কা যথেষ্ট রহিয়াছে। কৃষকদের অসহায় অবস্থার সুযোগে উত্তমর্ণ অধিকতর সুদ ধার্য করিতে সাহসী হয়। কৃষিজীবীকে প্রদত্ত ঋণের উপর সর্বাধিক সুদের হার ধার্য করিয়া অবিভক্ত বাঙ্গালায় একটি আইন পাশ করা হইয়াছিল। সে আইন এখনও বর্তমান আছে। অন্যান্য রাজ্যেও সম্প্রতি একটি এই ধরণের আইন পাশ করা হইয়াছে বা হইতেছে।

মজুরী (Wages) :

ব্রিটিশ শাসনের সূচনার পূর্বে ভারতে মজুরীর সমস্যা আদৌ মুখ্য ছিল না। সেই সময় ভাড়া করা মজুর খুব অল্পই ব্যবহৃত হইত। যাহারা ভাড়া খাটিত তাহারা মজুরী নগদ টাকার আকারে না পাইয়া অন্য প্রকারে পাইত। পুঁজিবাদ ও মুদ্রা অর্থনীতি (Money Economy) প্রবর্তিত হওয়ার পর মজুরীর সমস্যার গুরুত্ব ব্যাপক আকার গ্রহণ করিল। ভারতে মজুরীর হারের বিলক্ষণ পার্থক্য রহিয়াছে। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে, এক জেলা হইতে অন্য জেলায়, এক পেশা হইতে অন্য পেশায় মজুরীর পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। এই পার্থক্যের কারণ একাধিক। শ্রম-চলাচলের (mobility of labour) অসুবিধা, বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রম-চাহিদার বিভিন্নতা, জিনিসপত্রের মূল্য ও জীবনধারণের ব্যয়ের বিভিন্নতা, দক্ষতা ও

মজুরীর হারের পার্থক্যের কারণ

ক্ষমতার পার্থক্য, বহুবিধ সামাজিক স্তরে শ্রমবিভাগ, শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধতার অভাব—এই সমস্ত কারণে মজুরীর পার্থক্য হইয়া থাকে।

কৃষি-মজুরের মজুরী স্বল্প কেন

কৃষি-মজুর সর্বনিম্ন মজুরী পাইয়া থাকে। ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু ক্ষেত-মজুরের চাহিদা সাধারণতঃ খুব বেশী নহে, এবং সে চাহিদাও সাময়িক ধরণের। কৃষি-মজুরগণ একান্তই দুর্বল এবং তাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার একান্ত অভাব। এই সমস্ত কারণেই কৃষি-মজুরের মজুরী এত অল্প হইয়া থাকে।

নগরাঞ্চলে শ্রমিকের মজুরী

গ্রাম্য মজুর অপেক্ষা নগরাঞ্চলে শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরী অধিক। সহরগুলিতে শ্রমিকের চাহিদা যথেষ্ট রহিয়াছে, শ্রমিকের সরবরাহও সকল সময় পর্যাপ্ত নহে। সহরগুলিতে জীবনধারণের ব্যয় অধিকতর। সেইজন্য ভারতের নগরাঞ্চলে সাধারণ শ্রমিকের প্রকৃত বা আসল মজুরীর মান অত্যন্ত অল্প। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে মিল-মালিকেরা প্রচুর মুনাফা লাভ করিয়াছিলেন এবং জিনিস-পত্রের মূল্য অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু মজুরীর ক্ষেত্রে কোনপ্রকার উন্নতিই দেখা গেল না। যুদ্ধের পর ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনা হইল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও ধর্মঘট মারফৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরীর কিছুটা উন্নতি হইল। ১৯৩৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধে জিনিসপত্রের মূল্য অত্যন্ত চড়া হইল এবং জীবনধারণের ব্যয় চতুর্গুণ হইল। কিন্তু শ্রমিকেরা সে তুলনায় বর্ধিত হারে মজুরী আদায় করিতে সক্ষম হইল না। মাগ্‌গী ভাতা অত্যন্ত কম হারে দেওয়া হইত। তাই যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত মজুরীর দাবীতে গোটা দেশে শ্রমিক ধর্মঘটের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছিল। বর্তমানে ধর্মঘটের বেগ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে।

ভারতে উচ্চ চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত অ-সমানুপাতিক হারে মোটা বেতন পাইয়া থাকেন। ভারতই একটি দেশ যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক রাজসিক হারে বেতন লাভ করেন, অন্যদিকে অসংখ্য সাধারণ শ্রমিকের ভাগ্যে নগণ্য মজুরী জোটে।

ভারতে জাতীয় ভিত্তিতে একটি ন্যূনতম মজুরীর হার নিধারণ করার জন্য ১৯৪৮ সালে এক আইন পাশ করা হয়। সমগ্র দেশে কয়েকটি স্থান ব্যতীত এই আইন কার্যকর করিবার চেষ্টা আজ পর্যন্ত হইতেছে না।

যে মজুরী শ্রমিকের পুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, বাসযোগ্য গৃহ, পরিধানের জন্য বস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য জোগাইতে পারে সেই মজুরীই আদর্শ ন্যূনতম মজুরী। গোড়াতে ন্যূনতম মজুরী স্বল্প হারে নির্ধারিত হইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের ক্রমশঃ ইহার হার বাড়ানো উচিত—যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারতের প্রত্যেকটি লোক পর্যাপ্ত খাদ্য, গৃহ ও বস্ত্র পায়।

নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ

প্রশ্নোত্তর

1. "Rent of agricultural land in India depends on the inter-action of three forces—Custom, Competition and Legislation". Explain the statement. (C. U., 1943) (৩১৮-৩১৯ পৃষ্ঠা দেখ)

2. Why does the Government of India borrow at cheaper rates than the Indian peasant in the villages ? (C. U., 1942) (৩১৯-৩২০ পৃষ্ঠা দেখ)

চতুর্দশ অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়

(Public Finance)

শাসনতন্ত্রে আর্থিক সম্পদের বণ্টন (Allocation of Financial Resources in the Constitution) :

১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল বলিয়া কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পদের বণ্টনও আবশ্যক হইয়াছিল। তাই ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল (এই তারিখে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন আংশিকভাবে প্রবর্তিত হয়) হইতে আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব হইতে পৃথক করা হয়।

১৯৩৫ সালের আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে প্রাদেশিক রাজস্ব পৃথক করা হয়

১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী বন্টিত রাজস্বের উৎসসমূহকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়:—

১৯৩৫ সালের আইনে বন্টিত রাজস্বের উৎস-সমূহের শ্রেণী বিভাগ

(১) কতকগুলি রাজস্ব ছিল যাহা ধার্য করার ভার এবং ভোগ করার অধিকার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। আমদানী শুল্ক, কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক, লবণ কর প্রভৃতি এই শ্রেণীর রাজস্ব। তবে এইরূপ একটি বিধান ছিল যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক ও লবণ করের একটি অংশ প্রাদেশিক সরকারসমূহকে দিতে পারিতেন।

(২) কতকগুলি রাজস্ব ছিল যাহা ধার্য করিবার অধিকার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের, ব্যয়ের অধিকার ছিল কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের। অ-কৃষি সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, বাণিজ্যিক ষ্ট্যাম্পের উপর কর প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) কতকগুলি রাজস্ব ছিল যাহা ধার্য করিত কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু ব্যয় করিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উভয়েই। আয় কর (কোম্পানীর আয় কর ছাড়া), পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত ছিল।

(৪) কতকগুলি রাজস্ব ছিল প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে—অর্থাৎ এই রাজস্বগুলি ধার্য ও ভোগ করার অধিকার ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক সরকারগুলির। এই রাজস্বগুলিকে প্রাদেশিক রাজস্ব বলা হইত। ইহাদের মধ্যে ভূমি-রাজস্ব, প্রমোদ কর, বিক্রয় কর ও প্রাদেশিক আবগারী শুল্কই প্রধান।

রাজস্বের এইরূপ বণ্টন ছাড়াও কতকগুলি প্রদেশকে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে সাহায্য বরাদ্দ করার বিধান ছিল।

নিমেয়ার রোয়েদাদ

এই সাহায্য বরাদ্দ এবং আয় কর ও পাটের উপর রপ্তানী শুল্কের বণ্টন স্যার অটো নিমেয়ারের সুপারিশ অনুসারে নির্ধারিত হয়। নিমেয়ারের সুপারিশকে নিমেয়ার রোয়েদাদ (Niemeyer Award) বলা হয়।

ডোমিনিয়ন ভারতে নিমেয়ার রোয়েদাদের পরিবর্তন সাধন

ডোমিনিয়ন ভারতে রাজস্ববিভাগের মূলসূত্রগুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই; তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিমেয়ার রোয়েদাদ অচল হইয়া পড়ায় আয় কর ও পাটের উপর রপ্তানী শুল্কের বণ্টন এবং কেন্দ্র হইতে প্রদেশগুলিকে বরাদ্দ সাহায্য সম্বন্ধে নূতন বিধান প্রণয়ন করা হয়।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রেও রাজস্ব বিভাগের মূলসূত্রগুলি অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আয় কর প্রভৃতির বণ্টন ও সাহায্য বরাদ্দ সম্পর্কিত বিধানগুলির পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পরেই এই পরিবর্তন সাধিত করা হইয়াছিল শ্রীযুক্ত দেশমুখের সুপারিশ অনুসারে। দেশমুখের সুপারিশের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া বিধানগুলি সমগ্রভাবে দেশমুখ রোয়েদাদ (Deshmukh Award) বলিয়া অভিহিত হইত।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রাজস্ব বিভাগের মূলসূত্রগুলির পরিবর্তন সাধন করে নাই

দেশমুখ রোয়েদাদ

শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য একটি অর্থ কমিশন নিযুক্ত করিবেন। এই বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ১৯৫২ সালে একটি অর্থ কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিশন ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার সুপারিশগুলি পেশ করে এবং ইহা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। সুতরাং বর্তমানে রাজস্বের বণ্টন অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারেই হইতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব (Revenues of the Central Government):

১৯৫২-৫৩ সালের বাজেটের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্ব ছিল ৪১৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ৪৩৯ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

১৯৫২-৫৩ সালে মোট রাজস্ব

বাণিজ্য শুল্ক (Customs): এই ৪৩৯ কোটির মধ্যে বাণিজ্য শুল্ক হইতে আয় ১৭০ কোটি হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে বাণিজ্য শুল্ক হইতে ১৭৭ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল।

বর্তমানে বাণিজ্য শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান রাজস্ব।

বাণিজ্য শুল্ক বলিতে আমদানী ও রপ্তানী উভয়ের উপর নির্ধারিত শুল্ক বুঝায়, যদিও আমদানী শুল্কই অপেক্ষাকৃত প্রধান। পাট রপ্তানী শুল্ক হইতে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যাকে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ পায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ।

বাণিজ্য শুল্ক বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান রাজস্ব

কেন্দ্রীয় আবগারী বা অন্তঃশুল্ক (Central Excise Duties)ঃ ভারতে তৈয়ারী মালের উপর এই শুল্ক নির্ধারিত হইয়া থাকে; যথা চিনি, দিয়াশলাই, কেরোসিন, দালদা বনস্পতি, টায়ার, টিউব প্রভৃতি। মদ্যজাতীয় পানীয় ও ঔষধের উপর শুল্ক ব্যতীত ভারতে তৈয়ারী অন্য সমস্ত দ্রব্যের উপর ধার্য শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। মদ্য, অহিফেন প্রভৃতির উপর যে শুল্ক আছে তাহা রাজ্য সরকারের অধীনে। ভারতের শিল্পবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটি প্রধান উৎস হইয়া দাঁড়াইতেছে। ১৯৫২-৫৩ সালে এই উৎস হইতে আয় হয় ৮০ কোটি টাকা; ১৯৫৩-৫৪ সালে আয় ৯৪ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। আয় ধরিলে কেন্দ্রীয় রাজস্বের মধ্যে আবগারী শুল্কের স্থান তৃতীয়—দ্বিতীয় স্থানে আছে আয় কর।

আয় কর (Income Tax)ঃ বর্তমানে আয় কর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও দুই বৎসর পূর্বে এবং যুদ্ধের সময় ইহাই ছিল কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস এবং আশা করা যাইতেছে যে শীঘ্রই আবার ইহা প্রথম স্থান অধিকার করিবে।

ভারতীয় আয় করকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য কর (Tax on Personal Incomes), উপরিস্থ কর বা অতিরিক্ত আয় কর (Super Tax) এবং করপোরেশন কর বা কোম্পানীর আয় কর (Corporation Tax)। ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য কর কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করা হয়। এই উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৪৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব ব্যয়ের জন্য রাখে। অবশিষ্টাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। বণ্টিত অংশের শতকরা ১১·২৫ ভাগ পশ্চিম বঙ্গ পাইয়া থাকে। ১৯৫২-৫৩ সালে আয় কর হইতে (কোম্পানীর আয় কর বাদ দিয়া) কেন্দ্রীয় সরকারের মোট প্রাপ্য হইয়াছিল প্রায় ৭৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা কমিয়া প্রায় ৬৮ কোটি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ভারতীয় আয় করের তিনটি অংশ

ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য কর কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়

করপোরেশন কর বা কোম্পানীর আয় কর কোম্পানীর মুনাফার উপর ধার্য হয়। ইহা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় রাজস্ব। ১৯৫২-৫৩ সালে এই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের

পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ কোটি টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই পরিমাণ প্রায় ৩৬ কোটিতে নামিয়া আসিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

রেলপথ (Railways) ঃ বর্তমানে সরকারের মালিকানায় ও পরিচালনাধীনে যে সকল রেলপথ আছে (বর্তমানে প্রায় সকল রেলপথই সরকারের মালিকানায় ও পরিচালনাধীনে ন্যস্ত) তাহাদের উদ্বৃত্ত মুনাফার একাংশ কেন্দ্রীয় সরকার লাভ করিয়া থাকে। ১৯৫২-৫৩ সালে রেলপথের মুনাফা হইতে কেন্দ্রীয় সরকার ৭ কোটি টাকার উপরও পাইয়াছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রাপ্যের পরিমাণ অনুরূপ হইবে বলিয়াই অনুমান করা হইয়াছে।

মুদ্রা-প্রচলন ও মুদ্রাঙ্কন (Currency and Coinage) ঃ মুদ্রাঙ্কন হইতে উদ্ভূত মুনাফা এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুনাফার একাংশ কেন্দ্রীয় সরকার লাভ করে। এই দুই উপায়ে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ১৯৫২-৫৩ সালে ছিল ১০ কোটি টাকার উপরে। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই আয় ১৫ কোটি টাকার উপরে হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ডাক ও তার (Posts and Telegraphs) ঃ ডাক ও তার হইতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ১৯৫২-৫৩ সালে ছিল প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই উৎস হইতে আয় মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

আয়ের বিবিধ উৎস ঃ তারপর আছে পূর্তবিভাগ, আফিমের একচেটিয়া কারবার হইতে আয় প্রভৃতি। আফিমের চাষ হইতে পূর্বে বহু আয় হইত, বর্তমানে আয়ের পরিমাণ প্রায় আড়াই কোটি টাকা। পূর্বে লবণের উপর শুল্ক ছিল এবং ইহা হইতে বৎসরে প্রায় ১০ কোটি টাকা আয় হইত। বর্তমানে লবণের উপর শুল্ক নাই।

দুই শ্রেণীর আয়

কেন্দ্রীয় সরকারের উপরোক্ত রাজস্বগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—কর-রাজস্ব (Tax Revenue) এবং কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (Non-tax Revenue)। বাণিজ্যিক শুল্ক, কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক, আয় কর প্রভৃতি হইল কর-রাজস্ব; রেলপথ হইতে আয়, ডাক ও তার বিভাগ হইতে আয়, পূর্তবিভাগ হইতে আয় প্রভৃতি হইল কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় (Expenditure of the Central Government) :

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় প্রধানতঃ দেশরক্ষা ও কয়েকটি সর্বভারতীয় বিভাগের খরচের মধ্যে নিবদ্ধ।

দেশরক্ষা (Defence) : গত মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পূর্বে দেশরক্ষার খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। কিন্তু যুদ্ধের সময় ১৯৪৫-৪৬ সালে এই ব্যয় ৪০০ কোটি টাকাতে উঠিয়াছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৯২ কোটি টাকার উপরে। ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা সমগ্র ব্যয়ের শতকরা প্রায় অর্ধেক। ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

দেশরক্ষা-ব্যয়ই কেন্দ্রের সর্বপ্রধান ব্যয়

বে-সামরিক শাসন বা জন-পালন (Civil Administration) : ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সংক্রান্ত ব্যয় এই শীর্ষে ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। অর্থ বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, ডাক ও তার, বাণিজ্য, সরবরাহ, শিক্ষা, বেতার, আইন, মুদ্রাপ্রচলন প্রভৃতি এই সকল দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। দপ্তরের সংখ্যা ও কার্যকলাপ বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধির জন্য বেতন বৃদ্ধির ফলে যুদ্ধের সময় বে-সরকারী দপ্তরের জন্য ব্যয় বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে বে-সামরিক শাসনের জন্য ভারত সরকার ৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৭১ কোটি টাকার উপর ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি টাকা।

ঋণজনিত ব্যয় (Debt Services) : ভারত সরকার একজন বড খাতক। সরকারী ঋণের উপর স্থদ এবং ঋণ পরিশোধের জন্য ইহার বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে স্থদ ইত্যাদি বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যকে প্রদত্ত সাহায্য (Central Subvention) : ভারত সরকারকে কোন কোন রাজ্যকে বরাদ্দ আর্থিক সাহায্য করিতে হয়—যথা, উড়িষ্যা ও আসাম। বরাদ্দ সাহায্য ছাড়াও অনেক সময় বিভিন্ন

কারণে কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন রাজ্যকে সাহায্য করিতে হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি টাকার উপর। ১৯৫৩-৫৪ সালে কেন্দ্রকে ২৬ কোটি টাকার উপরেও এইরূপ সাহায্য করিতে হইবে।

উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয় (Expenditure on Refugees)ঃ ১৯৫২-৫৩ সালে এই খাতে প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয় হয়; ১৯৫৩-৫৪ সালে এই ব্যয় ১২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

খাদ্যশস্যের জন্য অর্থ সাহায্য (Subsidy on Food-grains)ঃ ১৯৫২-৫৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই খাতে ২১ কোটি টাকারও উপর ব্যয় করিতে হইয়াছিল; ১৯৫৩-৫৪ সালে এই ব্যয় মোটেই বরাদ্দ করা হয় নাই।

পেন্সন (Pensions)ঃ এই খাতে ১৯৫২-৫৩ সালে প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে অনুরূপ ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

১৯৫২-৫৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪২২ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ও ব্যয় নীতির সমালোচনা (Criticism of the Revenue and Expenditure Policy of the Union Government)ঃ

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট হইতে দেখা যায় যে মোট রাজস্বের অর্ধেকের কিছু কম পাওয়া যায় বাণিজ্য শুল্ক হইতে। যুদ্ধের সময় বাণিজ্য শুল্ক হইতে আয় অনেক কম হইত। যুদ্ধের পরে, বিশেষতঃ দেশবিভাগের পরে, সরকার কয়েকটি দ্রব্যের উপর অধিক হারে বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করে। অনেকের মতে এই হার অত্যধিক—ইহাতে ভারতের বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হয়।

বাণিজ্য শুল্কের হার অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক হওয়ার ফলে বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হইতেছে

কেন্দ্রীয় আবগারী বা অন্তঃশুল্কের সম্বন্ধে বলা যায় যে ইহা এমন কয়েকটি দ্রব্যের উপর ধার্য করা হইয়াছে যাহা প্রয়োজনীয়ের পর্যায়ে পড়ে; উদাহরণ স্বরূপ আমরা চিনি, দিয়াশলাই, কেরোসিন তৈল, সুপারি, তামাক প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতে পারি। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য না করাই উচিত।

অন্তঃশুল্কের ভার দরিদ্র জনসাধারণের উপর পড়ে

ব্যক্তিগত আয় কর ও কোম্পানীর আয় কর সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে এই করের হার অত্যধিক হওয়ার জন্য ইহা ব্যক্তিগত উদ্যোগের (enterprise) পরিপন্থী। এইজন্য দেশের উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে।

আয় করের হার অত্যধিক হওয়ার জন্য ইহা ব্যক্তিগত উদ্যোগের পরিপন্থী

রেলপথ হইতে আয় সম্পর্কে বলা হয় যে রেলের ভাড়া ও মাশুল অসাধারণভাবে বাড়াইয়া এই আয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

লবণ কর তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে বলা হয় যে নিছক ভাবপ্রবণতার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নীতি সম্পর্কে সামান্য সমালোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে, যেমন বলা হইয়াছে যে ভারতের দেশরক্ষা ব্যয় অত্যধিক। জনপালন বা বেসামরিক শাসনের জন্য যে খরচ তাহাও অত্যধিক। দেশরক্ষা ও বেসামরিক শাসনের জন্য বেশী পরিমাণ ব্যয় করা হইলেও শিক্ষা, জন-স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হয় মোট রাজস্বের শতকরা ২-৩ ভাগ। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষা ও জন-স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করা হয় মোট রাজস্বের শতকরা প্রায় ২০-৩০ ভাগ।

দেশরক্ষা ও বেসামরিক শাসনে অত্যধিক ব্যয়

উপসংহারে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ও ব্যয়নীতি কল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) সূচক নহে।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ও ব্যয়নীতি কল্যাণকর রাষ্ট্রের সূচক নহে

রাজ্য সরকারের রাজস্ব (Revenue of the State Government) :

ভূমি-রাজস্ব (Land Revenue) : রাজ্যের রাজস্বের ইহা অন্যতম প্রধান উৎস, যদিও রাজস্ব লাভের অন্যান্য পন্থা আবিষ্কারের ফলে ভারতের সকল রাজ্যেই ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পশ্চিম বঙ্গে ভূমি-রাজস্ব অপরিবর্তনীয়। অবিভক্ত বাংলায় এই রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টাকা। পশ্চিম বঙ্গের ভূমি-রাজস্ব ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। অন্যান্য রাজস্ব হইতে ইহার অনেক অধিক আয় পশ্চিম বঙ্গে হয়।

ভূমি-রাজস্বের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে

প্রাদেশিক আবগারী বা অন্তঃশুল্ক (Provincial Excise

Duties)ঃ এই সমস্ত শুল্ক মদ্যজাতীয় পানীয় ও ঔষধ এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্যের উপর ধার্য হয়। কংগ্রেস-শাসনের সময় বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি কোনও কোনও প্রাদেশিক সরকার মাদক দ্রব্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল; ফলে রাজস্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি বোম্বাই ও মাদ্রাজে এই ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হইয়াছে। সাধারণতঃ পশ্চিম বঙ্গে আবগারী শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উপর।

জলসেচ বা সেচন (Irrigation)ঃ কোন কোন রাজ্যের জলসেচ-কার্য হইতে প্রচুর আয় হয়। পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ আয় নগণ্য।

বন (Forests)ঃ সংরক্ষিত বন এলাকা হইতে কাঠ ও বনজ পদার্থের বিক্রয় মারফৎ সরকারের আয় হয়। মধ্যপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে ব্যাপক ও সম্পদশালী বন রহিয়াছে সে সব প্রদেশে এই রাজস্বের গুরুত্ব আছে। পশ্চিম বঙ্গের বন-সম্পদ খুব বেশী নয়। বন হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ সমগ্র রাজস্বের শতকরা দুই ভাগেরও কম।

রেজিষ্ট্রেশন (Registration)ঃ সম্পত্তির স্বত্ব সম্পর্কীয় দলিল প্রভৃতি রেজিষ্ট্রী করাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উপর প্রাদেশিক সরকার ফি ধার্য করে। পশ্চিম বাংলার সমগ্র রাজস্বের শতকরা প্রায় ১.৫ ভাগ এই সূত্র হইতে প্রাপ্ত।

আয় করের অংশ (Share of Income Tax)ঃ ব্যক্তিগত আয় করের প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। অবিভক্ত বাংলা দেশ এই বণ্টনযোগ্য অংশের শতকরা ২০ ভাগ লাভ করিত। অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পশ্চিম বঙ্গ বর্তমানে মাত্র শতকরা ১১-২৫ ভাগ পাইয়া থাকে। ১৯৫২-৫৩ সালে এই সূত্র হইতে পশ্চিম বঙ্গ প্রায় ৭ কোটি টাকা পাইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ সালে ইহা হইতে ২৭ লক্ষ টাকা বেশী পাইয়াছিল। এই আয়ের পরিমাণ অবশ্য বৎসর বৎসর পরিবর্তিত হয়।

বিক্রয় কর (Sales Tax)ঃ পশ্চিম বঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী এবং পঞ্জাবে সাধারণ বিক্রয় কর আদায় করা হয়। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের সরকার পেট্রোল, মোটর গাড়ী প্রভৃতির উপর বিশেষ বিক্রয় কর স্থাপন করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে এই করের হার টাকায় তিন পয়সা। বিক্রয় করের ভার বহন করে ক্রেতাই। ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য এক রাজ্য হইতে অন্যান্য রাজ্যে হস্তান্তরিত হয়, অর্থাৎ যে রাজ্যে বিক্রয় করের হার বেশী সেই রাজ্য হইতে অন্যান্য রাজ্যে

বিক্রয় করের বিরুদ্ধে অভিযোগ

স্থানান্তরিত হয়। বিক্রয় কর হইতে কিন্তু প্রচুর আয় হয়। পশ্চিম বঙ্গে এই কর হইতে প্রতি বৎসর ৪ কোটি টাকার উপরও আদায় হইয়া থাকে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ বাৎসরিক গড় আয়ের পরিমাণ হইল যথাক্রমে ১৫ ও ১০ কোটি টাকা।

কৃষি-আয়কর (Agricultural Income Tax)ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় ভূমি-রাজস্বের অপরিবর্তনীয়তা দূর করার জন্য এই কর ধার্য হইয়াছে। বাংলা দেশে ৩,৫০০ টাকার বেশী কৃষি-আয়ের উপর ক্রমোন্নত হারে (Graduatod Scale) এই কর ধার্য হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে এই সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা।

ষ্ট্যাম্প কর (Stamp Duties)ঃ ষ্ট্যাম্পের উপর শুল্ক বা কর দুই শ্রেণীর— আদালত সম্পর্কিত (Judicial) এবং আদালত-নিরপেক্ষ (Non-Judicial)। দুই শ্রেণীরই ষ্ট্যাম্প কর হইতে আয় ভোগ করে রাজ্যগুলি, যদিও শেষোক্ত কর ধার্য করার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। ষ্ট্যাম্পের উপর ধার্য আয় হইতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বৎসরে ২½ কোটি টাকার উপরেও আয় হয়।

রাজস্বের অন্যান্য উৎস (Other Sources of Revenue)ঃ প্রাদেশিক রাজস্বের অন্যান্য উৎসের মধ্যে প্রমোদ কর, বিদ্যুৎ কর, খনি-স্বত্বের উপর কর, পেশার উপর কর, রেলভাড়ার উপর প্রান্তীয় কর, মোটর গাড়ীর উপর কর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২-৫৩ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উপরোক্ত বিবিধ সূত্র হইতে প্রাপ্ত মোট আয় প্রায় ৩৮ কোটি টাকার কিছু উপরে হইয়াছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রায় ঐ পরিমাণই আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

রাজ্য সরকারের ব্যয় (Expenditure of the Provincial Governments)ঃ

রাজ্য সরকারের ব্যয়ের প্রধান শীর্ষগুলি এইরূপ :

সাধারণ শাসন পরিচালনা (General Administration)ঃ রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন জোগাইতে রাজ্য সরকারের বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ভারতের জনসাধারণের অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিলে এই বেতনের হার অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হইবে।

পুলিশ বা আরক্ষা ব্যবস্থা ঃ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ বিভাগের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। পঞ্জাব এবং পশ্চিম বঙ্গের সমগ্র রাজস্বের শতকরা ১৫-১৬ ভাগ কেবলমাত্র এই খাতেই ব্যয়িত হয়।

পশ্চিম বঙ্গে পুলিশ বিভাগের জন্য ব্যয় অত্যধিক

বিচার ও কারাগার (Justice and Jails) ঃ কারাগার ও আদালত রক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। পুলিশ, বিচার ও কারাগার একসঙ্গে ধরিলে পশ্চিম বঙ্গে এই খাতে মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশের উপরে ব্যয়িত হয়।

শিক্ষা (Education) ঃ যে সকল জাতিগঠনমূলক কার্যে রাজ্যের সরকার অর্থ ব্যয় করে তন্মধ্যে শিক্ষা সর্বপ্রধান। ভারতের জনসাধারণের ব্যাপক নিরক্ষরতার তুলনায় শিক্ষার খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ একান্তই অপর্যাপ্ত। পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষার উপর ব্যয়ের শতকরা হার অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম।

অন্যান্য বিভাগ (Other heads) ঃ অন্যান্য ব্যয়-খাতের মধ্যে নিম্ন-লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ—শিল্পবিকাশ, সমবায়, জনস্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি। ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট বক্তৃতায় পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন যে পশ্চিম বঙ্গ মোট রাজস্বের শতকরা ২২ ভাগ জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করিয়া থাকে। জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলিতে সর্বসমেত খুব সামান্যই ব্যয়িত হইত; পক্ষান্তরে পুলিশ, কারাগার, বিচার প্রভৃতি বিভাগের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ছিল অত্যধিক। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের ব্যয়নীতিতে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখা যায়। রাজ্যগুলি জাতিগঠনমূলক কার্যে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে। উপরোক্ত ব্যয়গুলি ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গ ও পঞ্জাব সরকারকে উদ্বাস্তুদের জন্য বহু টাকা ব্যয় করিতে হয়। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই খাতে ১২ কোটি পরিমাণ টাকা সাধারণতঃ ব্যয় করিয়া থাকে।

সম্প্রতি রাজ্যগুলি জাতিগঠন-মূলক কার্যে মনোযোগী হইয়াছে

ভারতে সরকারী ঋণ (Public Debt in India) ঃ

সরকারী ঋণ বলিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ বুঝায়। ভারত সরকার সময় সময় জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ ঋণ করিয়াছে। এই ঋণ আংশিক রূপে উৎপাদনশীল (Productive) এবং আংশিক রূপে অনুৎপাদনশীল

(Unproductive)। উৎপাদনশীল ঋণ জলসেচ, খাল এবং রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি লাভজনক উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়। ঋণজনিত ব্যয় এই সমস্ত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা অনায়াসেই বহন করা যায়। নিষ্ফল ঋণ ঘাট্‌তি বাজেট পূরণ করা এবং যুদ্ধ, মহামারী প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করার জন্য গৃহীত হয়। নিষ্ফল ঋণ বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধব্যয়ই মূলতঃ দায়ী। গত যুদ্ধে ভারত সরকারের নিষ্ফল ঋণের পরিমাণ প্রচুর বাড়িয়া গিয়াছে।

সরকারী ঋণের শ্রেণী-বিভাগ

সরকারী ঋণ আংশিক ভাবে স্বদেশ হইতে ও আংশিক ভাবে বিদেশ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। গত যুদ্ধের পূর্বে ভারত সরকারের প্রধানতঃ ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের নিকট প্রচুর ষ্টার্লিং দেনা ছিল। যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে ভারতের অনুকূলে সঞ্চিত ষ্টার্লিং পাওনা হইতে উক্ত ষ্টার্লিং দেনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হইয়াছিল। বর্তমানে সরকারী ঋণের শতকরা ৯০ ভাগের উপর আভ্যন্তরীণ—অর্থাৎ ইহা ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ অবধি ২৬১৯ কোটি টাকা ছিল। ঋণের এক অংশ—যেমন ট্রেজারী বিল (Treasury Bill), পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে আমানত প্রভৃতি—তাড়াতাড়ি শোধ করিতে হয়, কিন্তু ঋণের অপর অংশ শোধের জন্য কোন ব্যস্ততা নাই। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের সমগ্র দেনার অনুপাতে নিষ্ফল ঋণের পরিমাণ সামান্য। আমাদের ঋণের অধিকাংশ উৎপাদনশীল, কিন্তু গত যুদ্ধে নিষ্ফল ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সরকারের ঋণের প্রয়োজন অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৫২০ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে সাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা ও সবকারী ঋণের গুরুত্ব

ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের সংশোধিত হিসাব

(১লা এপ্রিল ১৯৫২ হইতে ৩১শে মার্চ ১৯৫৩)

রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত আয়	লক্ষ টাকার অঙ্কে হিসাব	ব্যয়সমূহ	লক্ষ টাকার অঙ্কে হিসাব
কাষ্টম্‌স্ বা বাণিজ্যশুল্ক	১,৭৭,০০	রাজস্ব হইতে সরাসরি ব্যয়	৩১,৯৫
কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক	৮০,০০	সেচন বিভাগ	১৭
কর্পোরেশন কর	৩৯,৮৩	ঋণ বাবদ	৩৫,০৩
রাজ্য সরকারের অংশ বাদে আয় কর	৭৩,৩৫	বেসামরিক শাসন বিভাগ	৫৬,২৩
কারেন্সী ও টাকশাল	১০,৭৭	পূর্ত বিভাগ	১৪,৮২
বেসামরিক শাসন বিভাগ	১১,৭৪	কারেন্সী ও টাকশাল	৩,০৪
অহিফেন	১,৯৫	পেন্সন্	৮,০৭
সুদ	২,৫০	বিবিধ :	
পূর্ত বিভাগ	১,৪৭	(১) আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ব্যয়	১১,৩২
বিবিধ সূত্রে প্রাপ্ত	১০,৪৮	(২) খাদ্যশস্যের জন্য সরকারী সাহায্য	২১,১১
ডাক ও তার	১,৪০	(৩) রাজ্যসমূহকে সাহায্য বাবদ	২৩,০৪
রেলপথ	৭,৬৮	(৪) অন্যান্য ব্যয়সমূহ	১২,৬১
অস্বাভাবিক আয়	৪৭	(৫) অস্বাভাবিক ব্যয় খাতে	১৩,২১
		দেশরক্ষা (নীট)	১৯২,৭৩
মোট	৪,১৮,৬৪	মোট	৪২৩,৩৩ ৪,৬৯ ঘাটতি

প্রশ্নোত্তর

1. Comment on the main heads of revenue and expenditure of the Government of India. (C. U., 1946) (৩২৮-৩২৯ পৃষ্ঠা দেখ)

2. State the sources of revenue of (a) the Government of India and (b) the Government of Bengal or Assam. Indicate the importance of these sources in the Central and Provincial Budgets. (C. U., 1937, 1942)
(৩২৪-৩৩২ পৃষ্ঠা দেখ)

3. "The revenue of the Government may be divided into two parts, namely, tax-revenue and non-tax revenue." Illustrate this proposition with reference to the Government of India. (C. U, 1943, 1948)

[**উত্তরের কাঠামো ঃ** কর (Taxes) হইতে প্রাপ্ত রাজস্বকে কর-সাপেক্ষ রাজস্ব বলে। সরকারকে যে অর্থ প্রদানের বিনিময়ে নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে কোন কাজ (Service) পায় না তাহাকে কর (Tax) বলা যায়। কর প্রদান বাধ্যতামূলক। ভারত সরকারের Tax revenue-র মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ঃ (১) বাণিজ্যশুল্ক, (২) কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক, (৩) আয় কর, (৪) করপোরেশন কর, (৫) অতিরিক্ত মুনাফা কর।

সরকারী কার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য (Government business enterprises) হইতে যে আয় হয় তাহাকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব বলে। যেমন,—পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার বিভাগ হইতে আয়, রেলপথ হইতে আয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আয়, সরকারী জমি ও বাড়ী হইতে আয়, ইত্যাদি]

4. Give an account of the public debt of India. (C. U. 1944)
(৩৩২-৩৩৩ পৃষ্ঠা দেখ)

5. (a) Classify the sources of revenue of a modern State. (C. U. 1952)

(b) Enumerate, in order of importance, the sources of revenue and heads of expenditure of the State of West Bengal. (C. U. 1949, 1952)

[প্রথম অংশের উত্তরের জন্য অর্থবিদ্যা অংশের ১৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, এবং দ্বিতীয় অংশের উত্তরের জন্য ৩২৯-৩৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

(Economic Planning in India)

উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনেতা ও সমাজবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করিতেন যে রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করে তবেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হয়। উনবিংশ শতাব্দী ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (laissez faire) যুগ। কিন্তু দেখা গেল যে এই নীতি দেশের আপামর সাধারণের পক্ষে কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বলশেভিক রাশিয়া এই নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিল। কয়েকটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কাজে লাগাইয়া বলশেভিক সরকার অল্প সময়ের মধ্যে দেশের এইরূপ অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিল যে অর্থবিদ্যাবিদ্ ও রাষ্ট্রনেতাগণের অনেকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বর্তমানে অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণের অধিকাংশই এই সম্বন্ধে একমত যে সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্য ব্যতিরেকে অনুন্নত দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হয় না।

অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাসের সুরু করিতে হয় ১৯৩৮ সাল হইতে। এই বৎসর তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে কংগ্রেসের একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে কয়েকটি পরিকল্পনার রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করে। পরাধীন ভারতবর্ষের উন্নয়ন সম্বন্ধে এই পরিকল্পনাগুলি বিদেশী শাসকগণের দৃষ্টি মোটেই আকর্ষণ করিতে পারে নাই বলা চলে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাস

কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি

ইহার পর ১৯৪৪ সালে আটজন বিখ্যাত শিল্পপতি মিলিয়া বোম্বাই পরিকল্পনা নামে এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বোম্বাই পরিকল্পনা ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা

বোম্বাই পরিকল্পনা

দোষে দুষ্ট। এই কারণেই ইহা স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইহাও অবশ্য সত্য যে স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের ফলে পরিবর্তিত পরিবেশের জন্যও পরিকল্পনার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হয়।

পরিবর্তিত পরিবেশে নূতন পরিকল্পনার প্রয়োজন

১৯৫০ সালে জাতীয় সরকার পূর্ববর্তী সকল পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করিয়া নূতন পরিবেশের উপযোগী এক নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু হইলেন এই কমিশনের সভাপতি। কমিশন প্রথমে ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করে। খসড়ার নানাভাবে আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়। এই সকল আলোচনা ও সমালোচনাকে ভিত্তি করিয়া কমিশন চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করে এবং তাহা ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পনা 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' নামে পরিচিত।

পরিকল্পনার লক্ষ্য: প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিকে স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে বলা যায়। পরিকল্পনা কমিশনের মতে ভারতে পরিকল্পনার লক্ষ্য হইবে সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন এবং সর্বসাধারণের জন্য পূর্ণতর এবং অধিকতর বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের নূতন নূতন সুযোগ। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা একই সঙ্গে সমৃদ্ধির সকল উপাদানকে নিয়োজিত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে। কমিশনের মতে এই ভাবে উৎপাদন ও বণ্টন উভয়ের দিকে একই সঙ্গে লক্ষ্য না রাখিলে পরিকল্পনার 'সামাজিক উদ্দেশ্য' সফল হইবে না।

জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য হিসাবে কমিশন যতশীঘ্র সম্ভব মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করিতে চাহিয়াছে, এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুকর ধার্য করা, কর-বৈষম্য দূরীকরণ, জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ প্রভৃতি সুপারিশ করিয়াছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার: পরিকল্পনায় মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই প্রস্তাবিত ব্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে: (১) বর্তমানে যাহা সংগ্রহ করা সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। পরিকল্পনায় ভারত বর্তমানে ১৭০৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে বলিয়া আশা

করা হইয়াছে। (২) বাকী ৩৬৫ কোটি টাকা বিদেশ হইতে এবং তাহা সম্ভব না হইলে দেশ হইতেই কর ও ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে হইবে। ঠিক কি ভাবে সংগ্রহ করা হইবে তাহা এখন নির্ধারণ করা হয় নাই।

প্রথম অংশের ১৭০৪ কোটি টাকার ৭৩৮ কোটি টাকা আসিবে ইউনিয়ন ও রাজ্যসমূহের সরকারের রাজস্বের ও রেলপথের আয়ের মধ্যে সমন্বয় হইতে, ৫২০ কোটি টাকা আসিবে সাধারণের সঞ্চয় হইতে, ১৫৬ কোটি টাকা বিদেশ হইতে সাহায্যস্বরূপ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে, এবং ২৯০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে 'ঘাটতি বাজেট' পদ্ধতির মাধ্যমে।

কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে পরিকল্পনার ব্যয়ভারের বণ্টন

মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ভারকে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত-ভাবে বণ্টিত হইয়াছে :

ইউনিয়ন সরকার	১২৪১ কোটি টাকা
'ক' অংশের রাজ্যসমূহ	৬১০ "
'খ' অংশের রাজ্যসমূহ	১৭৩ "
'গ' অংশের রাজ্যসমূহ	৩২ "
জম্মু ও কাশ্মীর	১৩ "
	২০৬৯ "

বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রের মধ্যে মোট ব্যয়ের বণ্টন

মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়কে আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টিত করা হইয়াছে :

	মোট ব্যয় বা বিনিয়োগ (কোটি টাকা)
১। কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	৩৬০·৪৩
২। জলসেচ ও শক্তি উৎপাদন	৫৬১·৪১
৩। পরিবহন ব্যবস্থা	৪৯৭·১০
৪। শিল্প	১৭৩·০৪
৫। সমাজ-সেবা	৩৩৯·৮১
৬। পুনর্বাসন	৮৫·০০
৭। অন্যান্য	৫১·৯৯
	২০৬৮·৭৮

দেখা যাইতেছে যে কৃষির উপরেই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যের উন্নয়নের জন্যই ২০৬৯ কোটি টাকার প্রায় অর্ধেক ব্যয় করা হইবে। প্রথম দফার ৩৬০ কোটি টাকার মধ্যে সমাজ বা পল্লী উন্নয়নের জন্য ব্যয় হইবে ৯০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় দফায় যে টাকা ধার্য করা হইয়াছে তাহা বর্তমানে যে সকল বহুমুখী-নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার কার্য চলিতেছে বা ভবিষ্যতে যে সকল কার্যে হাত দেওয়া হইবে প্রধানতঃ তাহাতেই ব্যয়িত হইবে। তৃতীয় দফায় পরিবহন ব্যবস্থা বলিতে জাতীয় রাজপথ, বন্দর ও জাহাজ-চলাচল বুঝায়। এগুলির বিশেষ উন্নয়ন করা হইবে। বর্তমানে কোন নূতন রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা নাই। তবে রেলপথের অন্যান্য উন্নতিসাধন করা হইবে। চতুর্থ দফায় যে টাকা ধার্য করা হইয়াছে তাহা শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে। পঞ্চম দফার ব্যয় প্রধানতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উপরেই হইবে।

পরিকল্পিত ফল

শিল্পের ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসর পরে বস্ত্র, চিনি, ইস্পাত, সিমেণ্ট, কাগজ, লবণ, এলুমিনিয়ম প্রভৃতির উৎপাদন অনেক বাড়িয়া যাইবে। কৃষির ক্ষেত্রেও উৎপাদন বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। কি কি পরিমাণ বাড়িবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জাতীয় আয় এই পাঁচ বৎসরে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বা বর্তমানের জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ১১ ভাগ বাড়িয়া যাইবে। কমিশন আশা করে যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর তৃতীয় পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হইবে এবং এই ভাবে চলিলে আগামী ২৭ বৎসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উচ্চাকাঙ্ক্ষা দোষে দুষ্ট নহে

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমালোচনা নানাভাবে করা হইয়াছে। সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক হইয়াছে। একথা সর্বস্বীকার্য যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বোম্বাই পরিকল্পনার ন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা দোষে দুষ্ট নহে। আশা করা যায় যে জাতীয় সরকার যদি পূর্ণ উদ্যমের সহিত পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাইবে।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) :

কৃষির আলোচনা কালে বলা হইয়াছে যে সমাজ বা পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার

মাধ্যমেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপ্লব সংঘটিত করিতে চায়।

গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গ্রামাঞ্চলের উন্নতির ভার প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপর অর্পিত ছিল। এই সময় কৃষকের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হইত। ফলে গ্রাম্য জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিশেষ কোন প্রচেষ্টাই আজ পর্যন্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। গ্রাম্য জীবনের সমস্যাগুলি পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সাধারণ সত্যটি স্মরণ রাখিয়া গ্রাম্য সমস্যার উপর দৃষ্টিপাত করিলে তবেই সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভবপর ও সহজ হয়। এই দিক দিয়াই আলোচনা করিয়া সমস্যাগুলির সমাধানের যে সকল উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে সামগ্রিকভাবে তাহাদিগকে "সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

গ্রাম্য জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিকল্পনা

এই উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে কতকগুলি অঞ্চল নির্বাচিত করা হইয়াছে এবং এই নির্বাচিত অঞ্চলগুলিতেই ১৯৫২ সাল হইতে পরিকল্পনার কর্মসূচীকে কার্যকর করা হইতেছে। প্রত্যেক নির্বাচিত অঞ্চল ৪৫০ হইতে ৫০০ বর্গমাইল ভূভাগ লইয়া গঠিত এবং ইহাতে প্রায় ৩০০ গ্রাম, দেড়লক্ষ একর কৃষিজমি এবং প্রায় ২ লক্ষ জনসংখ্যা আছে। প্রত্যেক পরিকল্পিত অঞ্চলকে (Project area) তিনটি করিয়া উন্নয়ন ব্লকে (block) ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক উন্নয়ন ব্লকে ১০০ শত করিয়া গ্রাম এবং ৬০ হইতে ৭০ হাজার জনসংখ্যা আছে। প্রত্যেক উন্নয়ন ব্লককে আবার ৫টি করিয়া গ্রাম লইয়া গঠিত অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই উন্নয়ন অংশ হইল সাধারণ গ্রাম্য কর্মীর কার্যক্ষেত্র।

উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য নির্বাহ

পাঁচটি গ্রাম লইয়া যে উন্নয়ন অংশ গঠিত তাহার প্রত্যেকটিতে বহুবিধ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য একজন করিয়া কর্মী আছেন। এই কর্মীকে কৃষিবিজ্ঞান, পশুপালন, জনস্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা সমস্যা প্রভৃতিতে বিশেষভাবে শিক্ষিত হইতে হয়। তিনিই হইলেন গ্রামবাসীদের নিকট আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রতিশ্রুতির প্রধান বাহক।

৫০০ বর্গমাইল ভূভাগ ও ৩০০ গ্রাম লইয়া যে পরিকল্পিত অঞ্চল গঠিত হয় তাহার প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া পরিকল্পনা কর্মচারী (Project Officer)

আছেন। তিনি পরিকল্পনার পরামর্শমূলক কমিটির নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই পরামর্শমূলক কমিটি রাজ্যের আইন-সভায় স্থানীয় প্রতিনিধি, জেলা বোর্ডের সভাপতি, কৃষকদের প্রতিনিধি প্রভৃতি লইয়া গঠিত। পরিকল্পনা কর্মচারী রাজ্য সরকারের উন্নয়ন বিভাগ হইতেও সাহায্য পাইয়া থাকেন।

রাজ্য উন্নয়ন কমিটি

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য উন্নয়ন কমিটি (State Development Committee) আছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন ইহার সভাপতি। ইহা ছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যে পরিকল্পিত অঞ্চল সমূহের কার্য তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত একজন করিয়া কার্যনির্বাহক (Executive officer) আছেন। তাঁহাকে উন্নয়ন কমিশনার বলা হয়।

কেন্দ্রীয় উন্নয়ন কমিটি

সকল রাজ্যে সমাজ উন্নয়নের পদ্ধতি একই প্রকার। সারা ভারতের ভিত্তিতে সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে নীতি প্রভৃতি নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় উন্নয়ন কমিটির দ্বারা। ভারতের প্রধান মন্ত্রী হইলেন ইহার সভাপতি। কমিটিতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সভ্যগণও আছেন।

কর্মসূচী

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যসূচী সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কিছু বলা হইয়াছে। কৃষির উন্নতিই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য বলা যায়। কৃষির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, যথা পতিত জমির পুনরুদ্ধার, জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট বীজ, যন্ত্রপাতি ও সারের যোগান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য শিক্ষা দেওয়া, পশু-চিকিৎসার উন্নততর ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা প্রভৃতি। তাহার পর আছে গ্রামাঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, বসবাসের ব্যবস্থা ও গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়ন। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সমাজসেবামূলক অন্যান্য কার্যও কর্মসূচীর অন্তর্গত করা হইয়াছে।

আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমাজ বা পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়

পাকিস্তানের আর্থিক সম্পদ

(Economic Resources of Pakistan)

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে স্থষ্ট পাকিস্তান ডোমিনিয়ন দুইটি অংশে খণ্ডিত। এক অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত; অপরাংশ ভারতের পূর্বাঞ্চলের দুইটি রাজ্যের (পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম) মধ্যে অবস্থিত। এই দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান এক হাজার মাইলের উপর।

পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান

শাসনকার্য পরিচালনা এবং সাময়িক নিরাপত্তার দিক হইতে এই ভৌগোলিক অবস্থান আদৌ সন্তোষজনক নহে। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের দিক দিয়া ইহা বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সহিত পূর্ব এশিয়ার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত মধ্য এশিয়ার ও পাশ্চাত্ত্য জগতের দেশগুলির বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের দূরত্বের দিক দিয়া সুবিধা আছে।

আয়তন ও জনসংখ্যা (Area and Population) :

পাকিস্তানের মোট আয়তন ৩৬১,২১৮ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৪,১০০ বর্গ মাইল, পশ্চিম পাকিস্তানের ১৭৯,০০০ বর্গ মাইল; এবং বাকী—অর্থাৎ ১২৮,১১৮ বর্গ মাইল—দেশীয় রাজ্যসমূহের অন্তর্গত। পাকিস্তানের আয়তন ভারতীয় ইউনিয়নের আয়তনের ২৭ ভাগ।

লোকবসতির বণ্টন

সমগ্র পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ৭ কোটি ৫৬ লক্ষের কিছু উপর। ইহার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ২২ লক্ষ; জনসংখ্যার বাকী অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭২ ভাগের উপর মুসলমান।

লোকবসতি বণ্টনের দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন সমগ্র পাকিস্তানের আয়তনের প্রায় এক-সপ্তমাংশ হইলেও ইহার জনসংখ্যা সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য (Geographical Features) :

পশ্চিম পাকিস্তানকে চারিটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—যথা, (১) উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল; (২) বেলুচিস্তানের মালভূমি; (৩) সিন্ধুপ্রদেশের মরু অঞ্চল এবং (৪) সিন্ধু ও তাহার উপনদীগুলির বিধৌত উপত্যকা বা মালভূমি অঞ্চল। এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টিপাত বিরল। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় জলসেচের সুবন্দোবস্ত থাকায় এই অঞ্চল কৃষিকার্যে বিশেষ অগ্রসর।

বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল

বৃষ্টিপাত

পূর্ব পাকিস্তানকে দুইটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—যথা, (১) উত্তরের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত উপত্যকা বা সমভূমি অঞ্চল, এবং (২) দক্ষিণের ব-দ্বীপ অঞ্চল। এই উভয় অঞ্চলই মৌসুমী বায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত এবং বিশেষ উর্বর।

পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ ভাগ অরণ্য অঞ্চল। পশ্চিম পাকিস্তানে অরণ্য নাই বলিলেই চলে।

কৃষি (Agriculture) :

পাকিস্তান মূলতঃ একটি কৃষি-প্রধান রাষ্ট্র এবং ইহার কৃষি-সম্পদ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের মোট কৃষি-জমির আয়তন প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ একর।

প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল।

শস্য	চাষযোগ্য এলাকা (প্রতি একে দশ লক্ষ একর)	উৎপাদন (প্রতি একে দশ লক্ষ টন)
চাউল	২২	৮
গম	১০	৪

(উৎপাদনের পরিমাণ সকল বৎসর একই থাকে না। যেমন ১৯৫১ সালে ৮১ লক্ষ ৯৫ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। উপরের দিকে উৎপাদনের যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে বা পরে যাহা দেওয়া হইবে তাহা গড় উৎপাদন বলিয়া মনে করিতে হইবে।)

অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে বার্লি, জোয়ার, ভুট্টা এবং ছোলা প্রধান। প্রায় ১½ লক্ষ টন বার্লি, ৬ লক্ষ টন জোয়ার, ৩½ লক্ষ টন ভুট্টা এবং ৭½ লক্ষ টন ছোলা উৎপন্ন হয়।

খাদ্যশস্যের দিক হইতে সমগ্র পাকিস্তান শুধু স্বাবলম্বী ছিল না, কিছু পরিমাণে চাউল ও গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য রপ্তানী করিতেও সক্ষম ছিল। বর্তমানে পাকিস্তানকে বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইতেছে। এককভাবে পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু কখনই খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। চাউল প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানে ও গম পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্যিক শস্য

আঁশ জাতীয় শস্য সম্বন্ধেও পাকিস্তানের অবস্থা বেশ ভাল। নিম্নে উহা বর্ণিত হইল।

শস্য	আয়তন (প্রতি এককে দশ লক্ষ একর)	উৎপাদন (প্রতি এককে দশ লক্ষ বেল)
পাট	১.৩৫	৪.১
তুলা	২.৯৫	১.৭

ভারতের পাটকলসমূহ প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট ব্যবহার করে। তাহাদিগকে কাঁচা মালের জন্য প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতীয় ইউনিয়নে পাট উৎপাদন বাড়ান হইয়াছে এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কাঁচা পাট রপ্তানীর উপর উচ্চহারে শুল্ক নির্ধারিত হইয়াছে। ইহার ফলে বিদেশের বাজারে পাটের বদলে অন্যান্য দ্রব্য ক্রমশঃ ব্যবহৃত হইতেছে। অপরদিকে পাকিস্তানে পাটকল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

তুলা উৎপাদন ক্ষেত্রেও পাকিস্তান পশ্চাৎপদ নহে—আমেরিকা ও মিশরে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট লম্বা আঁশযুক্ত তুলার ন্যায় তুলা পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়। তুলা এখন পর্যন্ত প্রধানতঃ রপ্তানীর মাল; কিন্তু পাকিস্তানে সূতা-শিল্প গঠন করিতে পারিলে তুলার আভ্যন্তরীণ ব্যবহার প্রয়োজন হইবে।

অন্যান্য শস্যের মধ্যে চা, তামাক ও তৈলবীজ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উহা বর্ণিত হইল।

শস্য	আয়তন (প্রতি এককে এক হাজার একর)	উৎপাদন
চা	৭৩	১৫ হাজার টন
তামাক	২০০	৯০ হাজার টন
তৈলবীজ	১৬৯৩	৩ লক্ষ ২২ হাজার টন.

পশ্চিম পাকিস্তানে জলসেচের অধিকতর সুবন্দোবস্ত করার জন্য কতকগুলি বাঁধ বাঁধার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বাঁধগুলির কার্য সমাপ্ত হইলে বৃষ্টিবিরল সিন্ধুপ্রদেশ সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত-নিরপেক্ষ হইবে।

খনিজ পদার্থ (Minerals) :

পাকিস্তানে মূল খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ক্রোমাইট, খনিজ লবণ, জিপসাম, গৃহনির্মাণের উপাদানসমূহ এবং কিছু পরিমাণে সোনা পাওয়া যায়। কয়লা, লৌহ ও তৈলসম্পদ আহরণের সম্ভাবনা প্রচুর এবং এই সকল খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে পাকিস্তান স্বাবলম্বী হইবে বলিয়া আশা করে।

পাকিস্তানের খনিজ সম্পদ প্রচুর কিন্তু আহরণের মাত্রা অত্যল্প

লৌহ : বর্তমানে খনি হইতে লৌহ আহরণ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই।

কয়লা : বর্তমানে উৎপাদন অত্যন্ত অল্প। বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪½ লক্ষ টন। পাকিস্তানের প্রয়োজনের পক্ষে এই পরিমাণ আদৌ পর্যাপ্ত নহে।

পেট্রোলিয়াম : পঞ্জাবের তৈলখনি এলাকা হইতে বৎসরে প্রায় ১৫০ লক্ষ গ্যালন তৈল আহরণ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে তৈলসম্পদ প্রচুর বলিয়া অনেকেঁর বিশ্বাস।

অন্যান্য খনিজ পদার্থ : ক্ষার জাতীয় ধাতু (Saltpetre) আহরণের পরিমাণ ৫,০০০ টন এবং জিপ্‌সাম ১৯,০০০ টন। লবণ আহরণের পরিমাণ প্রায় ৯২,০০০ টন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানে তামার খনির এবং বান্নুর দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পর্বতে লৌহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

শক্তি সম্পদ (Power Resources) :

বর্তমানে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের বিশেষ অভাবের জন্য পাকিস্তান জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সকল পরিকল্পনা পাকিস্তানে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। পঞ্জাবের মিয়ানবালি জেলার পরিকল্পনা।

২। ওয়ারমাক পরিকল্পনা। পঞ্জাবের এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা ৬৫০,০০০ একর জমিতে জলসেচেরও ব্যবস্থা করিবে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন

৩। চট্টগ্রামের কর্ণফুলি পরিকল্পনা। ইহার দ্বারা ৬০,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে।

শিল্প (Industries):

পাকিস্তানে বৃহৎ শিল্প বাস্তবিক পক্ষে নাই বলিলেই চলে; কিন্তু পাকিস্তান সরকার দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে। শিল্পায়নের পথে পাকিস্তান ভারতের মত আমেরিকা ও কমন্‌ওয়েলথ দেশগুলির সাহায্য পাইতেছে। উল্লেখযোগ্য শিল্পসমূহের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শিল্প

শিল্পের নাম	কলের সংখ্যা
সুতা ও কাপড়ের কল	১৫
চিনির কল	৯
সিমেণ্ট কারখানা	৫
এনামেলের বাসনপত্রের কারখানা	৩
রেল কারখানা	৩৪
ময়দা কল	১২
তেল পরিষ্কার করার কল	২

তাহা ছাড়া কয়েকটি বিদ্যুৎ ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, রসায়নাগার, রবার কারখানা এবং ছোটখাটো পাটকল আছে।

পাকিস্তানে শিল্পে নিয়োজিত মজুরের মোট সংখ্যা ২ লক্ষ মাত্র।

পাকিস্তানের শিল্পায়নের পথে বাধা: লৌহ ও ইস্পাতের অভাব এবং কয়লার অপ্রাচুর্য পাকিস্তানের শিল্পায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুলা, পাট প্রভৃতি কাঁচা মালের দিক দিয়া পাকিস্তানের বিশেষ সুবিধা আছে। অধিকাংশ বৎসর অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত থাকার ফলেও পাকিস্তানের পক্ষে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনয়ন করিয়া শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হওয়া সহজসাধ্য। ভারতের শেষোক্ত দুইটি সুবিধা নাই।

পাকিস্তানের পক্ষে শিল্পায়নের সুবিধা ও অসুবিধা

পরিবহন-ব্যবস্থা (Transport System) :

পাকিস্তানের রেলপথগুলি দেশবিভাগের পূর্বে নির্মিত। পূর্ব বঙ্গে সামান্য সংযোগ সংস্থাপক রেলপথ ছাড়া পাকিস্তান স্থষ্টির পর আর কোন রেলপথ স্থাপিত হয় নাই। পাকিস্তানে দুইটি প্রধান রেলপথ আছে; যথা—পশ্চিম পাকিস্তানে উত্তর-পশ্চিম রেলপথ এবং পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ব বঙ্গ রেলপথ। উত্তর-পশ্চিম রেলপথের বিস্তৃতি হইল প্রায় ৫৩৬২ মাইল এবং পূর্ব বঙ্গ রেলপথের বিস্তৃতি প্রায় ১৬০০ মাইল। রেলপথের মোট বিস্তৃতি ৬৯৮১ মাইল।

রেলপথ

পাকিস্তানে কাঁচা ও পাকা সড়কের মোট বিস্তৃতি হইল প্রায় ৫৭ হাজার মাইল।

সড়ক বা রাজপথ

পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু, শতদ্রু এবং চন্দ্রভাগা নৌবাহ্য হইলেও আভ্যন্তরীণ জলপথ হিসাবে এই নদী তিনটির গুরুত্ব বিশেষ নাই। পূর্বে যতটা গুরুত্ব ছিল তাহাও সিন্ধু উপত্যকায় রেলপথ স্থাপনের পর কমিয়া গিয়াছে।

জলপথ

পূর্ব পাকিস্তান নদীমাতৃক প্রদেশ। এখানে আভ্যন্তরীণ জলপথ হিসাবে নদী ও খাল বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

বাণিজ্য (Trade) :

পশ্চিম পাকিস্তানে করাচী এবং পূর্ব পাকিস্তানে চট্টগ্রামই প্রধান বন্দর। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে খুলনার অন্তর্গত চালনায় একটি পোতাশ্রয় নির্মাণ করা হইয়াছে। পোতাশ্রয় হিসাবে চট্টগ্রামের অবস্থা বর্তমানে ভাল নহে ; তবে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতির জন্য পাকিস্তান সরকার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

পোতাশ্রয়

ভারতের সহিত বহু পরিমাণে স্থলবাণিজ্য ছাড়াও পেশোয়ারের পথে পাকিস্তানের কিছু পরিমাণে সীমান্ত বাণিজ্য চালু আছে।

স্থল বাণিজ্য

বহির্বাণিজ্যে ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। সাধারণতঃ পাকিস্তানে এমন কৃষিজাত দ্রব্য ও খাদ্যশস্য বহু পরিমাণে উদ্বৃত্ত হয় যাহাদের বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী বিশেষ চাহিদা রহিয়াছে।

বহির্বাণিজ্যে পাকিস্তানের সুবিধা

ভারতের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। ভারত হইতে পাকিস্তান প্রধানতঃ কয়লা, বস্ত্রাদি, চিনি, চা, পাটজাত দ্রব্য. ...হ ও ইস্পাতের দ্রব্য, টায়ার ও টিউব, সিমেণ্ট এবং কাগজ আমদানী করে; এবং ভারতে প্রধানতঃ কাঁচা পাট, তুলা, কাঁচা চামড়া, চাউল, জিপ্‌সাম এবং সময় সময় গমও রপ্তানী করে।

পাকিস্তানের অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

ভারতের সহিত বাণিজ্যে পাকিস্তানের সকল সময়েই অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

ব্যাঙ্কিং এবং কারেন্সী-ব্যবস্থা (Banking and Currency System):

১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের মূলধন ৩ কোটি টাকা। মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ সরবরাহ করিয়াছে রাষ্ট্র; বাকি ৪৯ ভাগ আসিয়াছে অংশীদারগণের নিকট হইতে। এই ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার আট জন সদস্য লইয়া গঠিত এক কেন্দ্রীয় বোর্ডের উপর ন্যস্ত; আট জন সদস্যের মধ্যে তিন জন অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পাকিস্তানে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রধানতঃ হিন্দুদের হাতে ছিল। দেশ বিভক্ত হইলে বিত্তশালী হিন্দুদের অধিকাংশই ভারতে চলিয়া আসায় পাকিস্তানে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সংকট দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সুসংগঠিত। বর্তমানে সমগ্র পাকিস্তানে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের প্রায় ২০০ শাখা আছে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় উন্নত নহে

বর্তমানে পাকিস্তান নিজস্ব কাগজী ও ধাতব মুদ্রা প্রস্তুত করিতেছে।

১৯৫০ সালে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সভ্য হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় টাকা ও ষ্টার্লিংএর বিনিময়-মূল্য যখন হ্রাস করা হয় তখন পাকিস্তান তাহার টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস করে নাই। বর্তমানে পাকিস্তানী টাকা ২ শিলিং ১.৯ পেন্স অথবা ১.৪৪ ভারতীয় টাকার সমান।

পাকিস্তানী টাকার বিনিময় মূল্য

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় (Public Finance) :

পাকিস্তান কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে রাজস্বের উৎসগুলির বণ্টন বিষয়ে মূলত ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিলেও উভয় পদ্ধতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য হইল বিক্রয় কর সম্পর্কিত। বিক্রয় কর ভারতে রাজ্যের রাজস্ব, পাকিস্তানে কিন্তু ইহা কেন্দ্রীয় রাজস্ব।

পাকিস্তানে বিক্রয়কর কেন্দ্রীয় রাজস্ব

১৯৫১-৫২ সালে পাকিস্তানের বাজেটে প্রায় ২০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যায়। এই উদ্বৃত্তের ফলে পাকিস্তান আয় করের হার কমান ছাড়াও দুইটি তহবিলের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রথম তহবিলকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগান হইয়াছে; দ্বিতীয় তহবিলের অর্থ হইতে পাকিস্তান ট্যাঙ্ক, কামান, উড়োজাহাজ প্রভৃতি তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৯৫৩ সালে কিন্তু আর্থিক অবস্থার অনেকটা অবনতি হয়।

উদ্বৃত্ত বাজেট ও উন্নয়ন তহবিল

আর্থিক নীতি (Economic Policy) :

১৯৪৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর পাকিস্তান শিল্প সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তদানীন্তন বাণিজ্য-সচিব মিঃ চুন্দ্রীগড় পাকিস্তান ডোমিনিয়নে প্রস্তাবিত আর্থিক নীতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে মূল ও প্রধান শিল্পে এবং অস্ত্র নির্মাণ, রেলপথ, ডাক ও তার, বেতার, জলবিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি শিল্পে সরকারী মালিকানা স্থাপিত হইবে; কয়লা-খনি, রাস্তা, জল ও ব্যোমযান এবং অন্যান্য খনি-স্বত্বের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার ব্যক্তিগত উদ্যোগে (Private enterprise) সহায়তা করিতে ইচ্ছুক এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পূর্ণ অবকাশ ও সকল প্রকার সাহায্য দিতে পাকিস্তান সরকার প্রস্তুত। গোড়াতে সংরক্ষণ (Protection) ও করভার লাঘবের (Tax remission) আকারে এই সাহায্য দেওয়া হইবে। পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের জন্য বিদেশী পুঁজি প্রয়োজন হইবে এবং পাকিস্তান উহা সানন্দে গ্রহণ করিবে। অবশ্য এই বিদেশী পুঁজি গ্রহণ সর্তাধীন হইবে; যথা, দেশী পুঁজির সহায়তা গ্রহণ, পাকিস্তানবাসীদের

মিঃ চুন্দ্রীগড় বর্ণিত আর্থিক নীতি

ব্যবসায় পরিচালনায় সুযোগ দেওয়া; পাকিস্তানবাসীদের শিল্পগত শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া, ইত্যাদি।

মিঃ চুন্দ্রীগড়ের নীতিগুলি গৃহীত হইয়াছে

১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত পাকিস্তান সরকারের শিল্পনীতিতে মিঃ চুন্দ্রীগড়ের বিশ্লেষিত নীতিগুলি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে।

———